য়	পৃষ্ঠা
ৱ দূর—জ্যোতিভূষণ চাকী	৪৩০
দ-বিদায়—নৃপেন আকুলি	৪৪৫
বি-প্রণাম—অজিতকুমার সু	৪৪৫
খ	
লাধূলা—মেঠুড়ে	৬৫, ১০৪, ১৪৪, ১৮৩, ২২৪, ৩২৯, ৩৬৭, ৪১২, ৪৫১, ৪৯০
ী কে—অঞ্জলি চৌধুরী	১৩১
াকার কথা—আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৯
াকার প্রশ্ন - প্রভাকর মাঝি	৩৪৩
ঁজে বার করো—	৩৬৯
াড়া, কুঁজো, অন্ধের গল্প—কুমারেশ ঘোষ	৩৭৭
াইথাই—আশুতোষ সান্যাল	৪০১
গ	
ালটেবিল—স্থনির্মল রায়	৬৩
!— সবজান্তা	১৮৭
াহক-গ্রাহিকাদের লেখা	১০৮, ৩৩১, ৩৭১, ৪৪৬
ায়ের ছবি—কার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৬৫
ল্ল বলিয়ের গল্প—রমেশ দাস	৪৬৭
ঘ	
াত-প্রতিঘাত—সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৭৮
চ	
ড়াই-চড়ুনির গল্প—ফণিভূষণ বিশ্বাস	২৭৩
ম্বুক আর সীতার গল্প—অরূপরতন ভট্টাচার্য	৪৩৯
নকাম—প্রফুল্লচন্দ্র বসু	৪৬৬
ডুইভাতি—বিকাশ বসু	৪৮২
্যাম্পিয়ান স্কাইস্ক্রেপার—অনিল সোম	৪৮৭
ছ	
ছড়া—বিমানকুমার দত্ত	১৭০
ছড়া—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১৩
ছড়া—আশিস সান্যাল	২৮৯
ছড়া—অশোক হালদার	৩৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ	
জয়তু লেনিন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৭
জঙ্গলের বিভীষিকা—ঋতীন্দ্রকুমার সরস্বতী	৩৩
জাদু আংটি—রবিদাস সাহারায়	৭১
জগদীশপুর—শান্তি বসু	২০৫
জিব-কাটা চড়াই পাখী—শৈলেশ ভড়	৫১২
ঝ	
ঝড়ের পরে—ইফতেখার হোসেন	৪২৬
ট	
টপ-সিক্রেট—বিক্রমাদিত্য	২৯৯
টেপ-রেকর্ডার—স্থনির্মল রায়	৩৫৪
টেনিদার তিরোধানে—সন্তোষকুমার দে	৪০৮
ঠ	
ঠিক দুপুরে—হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৬৬
ঠাকুমা—রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৬৬
ত	
তবু মস্তান বলে !—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬
তরু দত্ত—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস	২৮২
তিনটি হাঁচি—ডঃ প্রদোষচন্দ্র রায়চৌধুরী	৩৯৬
তুচ্ছ—মৃণালকৃষ্ণ দেব	৪৩৪
তুষার-ধবলের দেশে—শৈবাল চক্রবর্তী	৪৯৭
দ	
দত্যি—রবি গুপ্ত	১৫৩
দশভুজার পূজা—অমিয়কুমার চক্রবর্তী	২৩৭
দুই রাজা—বেলা দে	২৫৭
দেশবন্ধু স্মরণে - গোপালদাস কাব্যতীর্থ	৩৬১
দেশদ্রোহীর পরিণাম—নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়	৩৯৯
দুঃসাহসের এক ইতিহাস—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৫১.

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধ	
ধাঁধার পাতা—	৬৬, ১০৭, ১৫১, ১৮৯, ২৩০, ৩৩২, ৩৭০, ৪১১, ৪৫০, ৪৯২
ধরণী—সুখরঞ্জন রায়	১৯৪
ন	
নিশির ডাক—ধীরেন্দ্রলাল ধর	৯
নববর্ষের স্বাদ—আশীষকুমার গুপ্ত	৩৫
নাম—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৮
নূতন বই—	১০৯, ১৫২, ১৮৮,
নতুন ছড়া—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	১৫০
নেকিরাম—মনোজ বসু	২৩৫
নন্দখুড়ো—দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৮
নাসের স্মরণে—প্রকৃতি সরকার	৩০৫
নোতুন শপথ—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮
নৌকা ভাসায় খোকা—কালিদাস ভট্টাচার্য	৩২৮
নানক—অশোককুমার ভঞ্জ চৌধুরী	৩৮২
নটরাজের রূপকথা—সুধা বসু	৪০৬
নেতাজী—বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪৪
প	
প্রেতাত্মার চোখ—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়	৩৬
প্রবাসী মাকড়সা—সলিল মিত্র	৭৯
পুতুল নিয়ে—বিশ্বপ্রিয়	৯৪
প্রার্থনা—দুর্গাপদ বর্মণ	১১৪
পেনাং-এর মাসী—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৯
পাখী-টিকটিকির কথা—অর্ণবজ্যোতি দেব	২১৩
পশুদের মিটিং—নৃপেন্দ্রকুমার বসু	২৪৪
প্রশ্নোত্তর—সুশীলকুমার গুপ্ত	২৭৮
প্রকৃতির খেলনা রেলগাড়ী—তৃপ্তি রায়	৩৬২
পুজো—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রশ্ন ও উত্তর—নবগোপাল সিংহ	৪৯
পুলকবাবু বনাম পকেটমার—সৈয়দ হাসমত জালা	৫২
ফ	
ফাঁকি—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৭
ফস্ত—হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮
ফুল ঝরে যায়—মিতা চক্রবর্তী	১৭
ব	
বাপকো বেটা—শিবরাম চক্রবর্তী	৩
বড় কে—মঙ্গলময় দত্ত	১৬
বাণ-খেলা—গোপাল দে সরকার	২০:
বৃষ্টি-গান—স্মৃতিবিকাশ ঘোষ	২১:
বিদ্যাসাগর—রাণা বসু	২৩৫
বাহাদুর ভাইপো—সত্যানন্দ ভট্টাচার্য	২৪:
বিবেক-শিলা দর্শনে—নবগোপাল সিংহ	৩৭৫
ব্যথার ব্যথী—ফণিভূষণ বিশ্বাস	৪০০
বলতে পারো ?—সবজান্তা	৪৪৯
ব্যর্থ অহমিকা—ফণিভূষণ বিশ্বাস	৪৮০
বাবলুর সখ—শিবানী বসু	৫১৯
ভ	
ভবঘুরে কুকুর 'ল্যাম্পো'—প্রণতা দে	৩০, ৯৮, ১৩৫, ১৭৯, ২১৪, ৩২০, ৩৪০, ৩৮৩, ৪৩১, ৪৭৯, ৫২৫
ভারত-প্রতিভা—সলিল বাগচী	৫৭
ভোরের নদী—সতীন্দ্রনাথ লাহা	১২০
ভাইবোন—নবগোপাল সিংহ	২১৬
ভাইফোঁটার দিন—আশীষকুমার গুপ্ত	৩৬৩
ভগবান যীশুর উপদেশ—মঙ্গলময় দত্ত	৪৪৭
ভোটটা কি মা—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬০

পৃষ্ঠা

ম

া-ভাগনে—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০
মুখী মাছ—ননীগোপাল চক্রবর্তী ৯২
াকপি—আবু কায়সার ১৩৯
চক্র—মধুদি ৬৭, ১১০, ১৯০, ২৩১, ৩৩৩, ৩৭২, ৪৯৩
র গুড়গুড়—বন্দে আলী মিয়া ১৮৬
চ ধরা—অশোক ধর ২০২
াসমুদ্রে দুঃসাহসিক অভিযান—সুনীল সরকার ২৩৯
ড়াই—দুর্গাদাস সরকার ২৪৩
 রাজার অদ্ভুত বিচার - ধরেশ্বর দাস ৩২১
ইকেলের পুনর্জন্ম—অজিতকৃষ্ণ বসু ৩৩৫
 ও শাঁখ—বিশু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪:৫
কড়সা—ননীগোপাল চক্রবর্তী ৪১৭
ার প্রতিকৃতি—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৩৫
চাকের মৌমাছি—বিমল দত্ত ৪৫৫
ক্ত—মঞ্জিল সেন ৪৭৬
মলা খারিজ—শিশির ভট্টাচার্য ৪৭৮

য

 ব্যাঙ্কে রক্ত থাকে—অমরনাথ রায় ৪৮৫

র

ায়ন—বাঙ্গীরাও সেন ২৯
ামাহুজন—বিমলাংশুপ্রকাশ রায় ৪৬
াখাল ছেলের রাজ্যলাভ অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য ২০৩
াবণের পরাক্রম—শতক্রশোভন চক্রবর্তী ২১৭
াজকন্যা কমললতা—সুধাংশুকুমার গুপ্ত ২৪৯
ক্ত-ঝরা গড়—ছবি মুখোপাধ্যায় ২৯৩
াখাল—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ৩১৯
াম-রাবণের যুদ্ধ শিশির মজুমদার ৩৮৭
পকথা থেকে নাটক : রূপবদল—অনিলেন্দু চক্রবর্তী ৪৪২

বিষয় পৃষ্ঠা

রোমানভ বংশের শেষ বংশধর—সুধাংশুকুমার গুপ্ত ৪৬১

ল

লাভ—সুখেন্দু দত্ত ১২১
লোভী কোলাব্যাঙ—রথীন সরকার ২০০
লম্বা নাকের বড়াই—মঙ্গলময় দত্ত ৩১৭

শ

শরতের ভোরে—নবগোপাল সিংহ ৩১০
শীত-সকালে—ত্রিদিবকুমার রায় ৪৪৮

স

স্বাগত নববর্ষ—সেখ সদরউদ্দীন ৪৫
সাপের কথা—আশীষ রায়চৌধুরী ৭৬
সিঙ্গি মাছের চাষ—অনিল সোম ১২৫
সুকৃতির স্বীকৃতি—ফণীভূষণ বিশ্বাস ১৩০
স্পোর্টস কুইজ—ক্ষেত্রনাথ রায় ১৪৭
সারনাথ শান্তিপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৬৬
সংবাদ-বিচিত্রা— ২২২
সব কাজ থাক না—নগেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার ২৩৮
সাপের ছোবল—বিমল দত্ত ২৬৭
সভাপতি—ইন্দিরা দেবী ২৭৯
স্বপ্নের চড়াই—শুভ্রা ঘোষ ৩১৮
স্কুলের জন্মদিন—সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী ৩৫৯, ৪০২, ৪১৯, ৪৭০, ৫০৭
সীমান্ত যখন জেগে ওঠে—চিত্তরঞ্জন রায় ৪২৪
সয়াবিন—সতীন্দ্রনাথ লাহা
সাগরের বিভীষিকা—অলোককুমার সেন ৪৫৭
সমস্যা—বন্দে আলী মিয়া ৪৮৯

হ

হে নূতন—সুনীল রায় ১
হ্যানিবল—শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭
হরতন—নির্মল সরকার ১২৫
হবি—বিশ্বনাথ দে ১২৬
হিমালয়ের বিভীষিকা—চিত্তরঞ্জন রায় ১৫৫

বিশ্বের সর্বহারাদের দরদী মানুষ

লেনিন
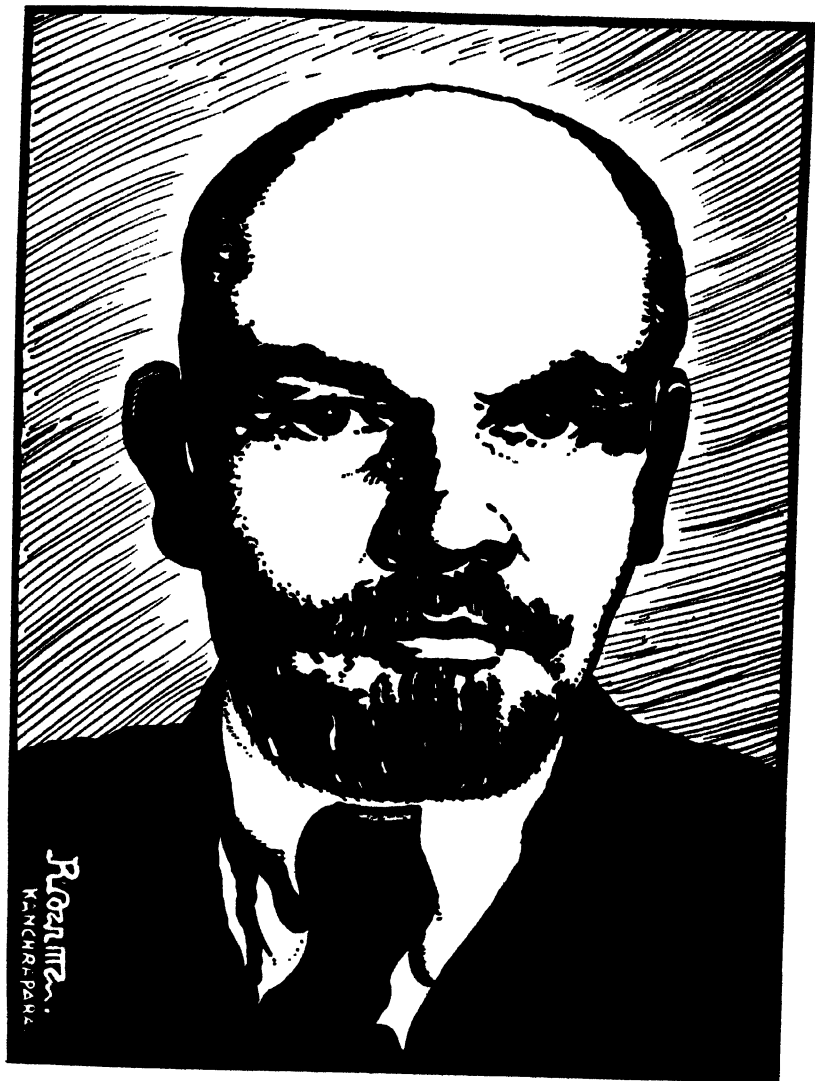
শিল্পী ঃ শ্রীরণজিৎ শর্মা

৫১শ বর্ষ] বৈশাখ ঃ ১৩৭৭ [১ম সংখ্যা

হে নূতন

শ্রীসুশীল রায়

একটা বছর আগে যাকে নতুন ব'লে বরণ করেছিলাম
সে হয়েছে পুরোনো আজ। আজকে আবার নতুন তোমায় পেলাম।
এমনি ক'রে কতই নূতন
ধীরে ধীরে হয় পুরাতন
কাছের যারা এমনি করেই হয় ক্রমশ অনেক দূরের যেন !
নতুনেরা পুরোনো হয়, পুরোনোরা নতুন হয় না কেন।

এমন মধুর মনোহরণ বেশে যদি হলে নয়নগোচর
তোমায় নতুন নমস্কারে স্বাগত আজ জানাই, নতুন বছর।
তোমার নবীন এই আগমন
জীবনে আজ ঘটল যখন
সারা বছর দিন কাটাব সাধনাতে এবং আরাধনায়
মিলিয়ে দিতে থাকব রত সোহাগাতে এবং খাঁটি সোনায়।

ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে গড়ছে ইমারত ওদিকে ওরা,
ওই রকমই উঠল গ'ড়ে ধীরে ধীরে সকল বয়স্করা।
তোমার যোগেই—যোগফলেতেই—
আজ যা আছি কালকে তা নেই
তুমিই ক্রমে তুলবে গ'ড়ে ইমারতের চেয়েও উচ্চতর
তোমার ছোঁয়া পেয়ে-পেয়ে ছোটরা সব হবে অনেক বড়।

যে পুরাতন গত হল তাকে এখন বিদায় জানাব না,
মর্মে-মর্মে শিরায়-শিরায় আছে যে তার নিত্য আনাগোনা।
পুরাতনে আর নূতনে
জড়িয়ে হল এক দু'জনে
তাই তো সকল কথায়-কাজে লক্ষ্য করি ওদের আত্মীয়তা,
পুরাতন না থাকত যদি নূতনেরে খুঁজে পেতাম কোথা ?

যতক্ষণ না পুরোনো হও ততক্ষণই হৃদয়রাজ্যে রাজা—
নূতন তুমি, তাই চেহারা দেখছি এমন সতেজ এবং তাজা।
তোমার জাদুস্পর্শ পেয়ে
ভাবছি বটে—কে এ, কে এ,
কিন্তু তোমায় চিনেছি ঠিক, জীবনে দাও তুমিই উদ্দীপনা,
এক-নিমেষে তোমার সঙ্গে তাইতে হল এমন চেনাশোনা।

যে প্রেরণায় করলে জীবন এমন ভাবে হঠাৎ সঞ্জীবিত
প্রভাবে তার পারি যেন নিজেদেরই করতে পুরস্কৃত।
তিন-শত-পঁয়ষট্টি দিনই
যেন নতুন বলেই চিনি,
শিথিল যেন না হই কাজে, শিথিল যেন না হই আরাধনায়
সাদর নমস্কারের সঙ্গে এ-ইচ্ছেটা জানিয়ে রাখি তোমায়।

কম্বলের কেরামতি

শ্রীবিমল দত্ত

বিদ্যুৎ বললে, "হ্যাঁরে হ্যাঁ—সিংখুড়োর ছেলেরে—বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া ; কুছ নহি ত' থোড়া থোড়া !"

সবাই টেবিল বাজিয়ে বৈঠকখানাটাকে মেছোহাটা করে তুললে।

নিতু বললে, "আসছে। আসছে।"

সবাই বলে উঠল, "কে ? কে ?"

বাবলু বললে, "১০ নং-এর ফুটবল !"

আলোক বললে, "তার চেয়ে বল না একটা বেলুন !"

কিন্তু গবেষণা স্তব্ধ হয়ে গেল। দ্বারে এসে দাঁড়াল দ্বারের ফাঁক সম্পূর্ণ ব্লক করে, অর্থাৎ আটকে—ইয়া মোটা, হোঁদলকুৎকুৎ—সিংখুড়োর ছেলে ; সিংখুড়োর ভাষায় 'ক্ষুদ কুঁড়ো'।

হাসলে অভদ্রতা হবে। তাই কেউ হাসল না, কিন্তু পেটের নাড়িতে হাসিটা পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগ্‌ল।

বিদ্যুৎই বরফ ভাঙল অর্থাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বললে, "এসো ভাই—"

মোটা মুখের ভাঁজে হাতীর চোখের মত ডুবে যাওয়া চোখ দুটো কুতকুত করে সিংখুড়োনন্দন যখন হাসল, তখন চোখ দুটো মাংসের ভাঁজে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আসরের মধ্যমণি হয়ে বস্‌ল—চিদাম্বরম্ সিংহ।

বিদ্যুৎ বললে, "তোমার মুখ থেকে সিংখুড়োর সব আশ্চর্য য়্যাডভেঞ্চারগুলো আমরা শুনতে চাই !"

লাজুক লাজুক হেসে চিদাম্বরম্ বললে, "ভাই, "সে সব ত' বাবার মুখ থেকে শুনেছ—তাছাড়া আমার জন্মের আগে ঘটেছে সে সব। আমারও ত' শোনা কথা—"

নিতু বললে, "প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা আছে তোমার ?"

"তা আছে। তবে তাতে বাবার চেয়ে মায়ের কৃতিত্বই বেশী।" বলে সে একবার আসরের সভ্যদের ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলে।

"তাই বলো। তাই শুনব আমরা।" সবাই দাবী করল।

চিদাম্বরম্ শুরু করলে, "আমরা সাতপুরুষ য়্যাডভেঞ্চার-প্রিয় আর মায়েরও ঐ রকম সাতপুরুষ। আমার দাদামশাই মানে মাতামহ সর্বস্ব খুইয়ে এক সাধুর কাছ থেকে একটা কম্বল যোগাড় করেছিলেন।"

গণেশ বললে, "তিনি কি লোটা-কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান নাকি ?"

চিদাম্বরম্ বললে, "না গো, না, শোনোই না মন দিয়ে—এই কম্বল দৈবশক্তি সম্পন্ন—"

বিদ্যুৎ বললে, "ঐ রকমই আশা করছিলাম আমরা—"

চিদাম্বরম্ বললে, "ঐ কম্বল কারো গায়ে জড়িয়ে দিলে সে জিরাফ হয়ে যেত। দেখতে ঠিক জিরাফ আর জিরাফের মত একটুও শব্দ করতে পারত না।"

গজানন বললে, "একি তুমি রূপকথা শুরু করলে নাকি ? কলিকালে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে নাকি ?"

চিদাম্বরম্ বললে, "সে অন্য প্রশ্ন। বড় বড় বৈজ্ঞানিক যাঁদের চশমার কাঁচ ষাঁতার মত—যাদের ভুরু মোটা, যাঁরা বলে দিতে পারেন আকাশে কতগুলো নক্ষত্র আছে, আর গাছ থেকে কেন শীতকালে পাতা ঝরে যায়—ব্যাঙাচি কি করে ব্যাঙ হয়ে ওঠে—তাঁরাও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে থাকেন। জে. সি. বোস্ রোজ প্রাণায়াম করতেন, আচার্য প্রফুল্ল রায় নিমের দাঁতন ব্যবহার করতেন, সি. ভি. রমন…

বাধা দিয়ে নিতু বললে, "গল্পটা চলুক—বিশ্বাস, দাঁতন—এসব পরে হবে —"

চিদাম্বরম্ বললে, "তবে শোন—মায়ের দাদামশাই এই কম্বলের সাহায্য কত ভিখিরীদের ছেলেকে জিরাফ বানিয়ে বিক্রী করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মোদ্দা কথা, ঐ কম্বলের জন্য সর্বস্ব খুইয়েছিলেন, আবার ঐ কম্বলের দৌলতে তাঁর সর্বস্ব হ'ল। কিন্তু কম্বলটা ছোট হয়ে ক্রমশঃ একটা কম্ফর্টারের মত হয়ে গেল।"

বিদ্যুৎ বললে, "তার কারণ ?"

ঘোঁতা বললে, "কেচে শ্রিঙ্ক করে গেল বোধহয় ?"

চিদাম্বরম্ বললে, "হুঁ, জিরাফ করার সঙ্গে সঙ্গে কম্বলটা একটু করে ছোট হয়ে যেত। ওর ক্ষমতা হ্রাস পেত না, আয়তন কম্‌ত।"

বিদ্যুৎ বললে, "সে কমুক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা রইল না গেল তাই বলো—ও কম্বল যে গল্পের শেষ পর্যন্ত থাকবে না তা আমরা আন্দাজ করে নিয়েছি—"

চিদাম্বরম্ গুম্ খেয়ে গেল। খানিক চুপ করে বসে রইল। তারপর সবাই শুনতে ইচ্ছুক দেখে বললে, "মায়ের দাদামশাই সেটা আমার মাকে দিয়ে যান। মা সেটা ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দেন। সে কথা কাউকে বলেন নি।"

"বাবা সেবার কোথায় সুন্দরবন না কোন্ বনে কয়েকজন সাহেবের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে গেছেন—সেখান থেকে ফিরে এত গল্প করছেন, আর সেই গল্প শুনতে রোজ বড়ীতে এত

ভিড় হচ্ছে, আর সেই জনতাকে চা খাওয়াতে মায়ের যা দুর্দশা তা কি বলব! শেষে মা আর সহ্য করতে না পেরে একদিন আসরের মাঝেই হানা দিলেন। দিয়ে বললেন, "বলি তুমি থামবে কিনা, বলো?"

বাবা প্রথমটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন, "থামব কেন? একি মিথ্যে বানানো গল্প—এসব সত্যঘটনা—বাঘের লেজ দেখা গেছে খাগড়া বনের ধারে—মাচায় ব্লাণ্ট্ আর ফুলিস্ সাহেব ট্রিগার টিপে নিশানা করেছে—এখন কি থামা যায়?"

'বাবা যেখানে বসেছিল, সেখানে দেখা গেল একটা জিরাফ'—

মায়ের হাতে ছিল কাগজে মোড়া সেই কম্বলের কম্ফর্টার—কাগজের মোড়ক খুলে মা সেটা খঁা করে ছুটে গিয়ে বাবার গলায় জড়িয়ে দিলেন।

সহসা কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। ঘরময় হইহই—বাবা যেখানে বসেছিল, সেখানে দেখা গেল একটা জিরাফ—মাথাটা কড়িকাঠে ঠেকেছে।

শ্রোতারা সব উঠে দাঁড়িয়েছে—দারুণ ভয়ে তাদের চোখ ছানাবড়া! মা তাদের শাসালেন, "তোমাদেরও ব্যবস্থা করছি—অমনি সব চোঁচা দৌড় ঘর ছেড়ে।

বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তক্তপোশের ওপর।

আমি কেঁদে উঠলাম, "মা, বাবাকে জিরাফ করে দিলে যে বড়!"

"তুই যা ফ্রিজ থেকে পান্তাভাতের কাঁসিটা নিয়ে আয় ওঁর খাবার সময় হয়েছে—"

এই সময় বৈঠকখানায় যা হৈহুল্লোড় বাধ্‌ল তাতে পাড়ার বহুলোক সন্ত্রস্ত হয়ে উঁকি মেরে দেখে গেল আর আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করে গেল তা আর উল্লেখ করবার নয়।

নিতু বললে, "কিন্তু জিরাফ-খুড়োর কি হ'ল?"

বিদ্যুৎ চিদাম্বরম্‌কে জিজ্ঞেসা করলে, "ফ্রিজের পান্তাভাত খেয়ে বুঝি জিরাফ আবার সিংখুড়ো হ'ল?"

চিদাম্বরম্ বললে, "মোটেই না। মা বাবাকে নিয়ে বাগানে ছেড়ে দিলেন। বাবার মাথা আকাশে, গলা নীচু করতে পারলেন না—চার পা চারটে খুঁটির মত ঘাসের জমিতে। পান্তাভাত খাবে কি করে, অত ওপরে মুখটা—পাশের তিনতলা বড়ীর ছাদ থেকে বহুকষ্টে বাবাকে পান্তাভাত খাওয়ানো হ'ল।"

ফটকে বললে, "তারপর কি হ'ল তাই বলো" —

চিদাম্বরম্ বললে, তারপর আর কি, মা কান্না জুড়ে দিলেন। জিরাফ করার কৌশল জানতেন মা, জিরাফকে আবার মানুষ কি করে করা যায় তা ত' তাঁর দাদামশাই বলে যাননি। খবর ক্রমশঃ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ছড়াতে লাগল। সবই বাবাকে দেখতে এল—সবাইয়েরই চোখে জল—মুখ শুকনো—সবাই মাকে দুষতে লাগল। মা কিন্তু উপায় বার করে ফেললেন। তিনি একটা লগী দিয়ে বাবার গলা কম্বলের কম্ফর্টারটা টেনে' নিতেই…

"কি হ'ল? কি হ'ল?" একসঙ্গে সকলের চোখ বিস্ময়ে কৌতূহলে সুপুরির মত হয়ে উঠল!

চিদাম্বরম্ বললে, "সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেখা গেল বাবা বাগানে দাঁড়িয়ে ন্যাসপাতি গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাড়ীতে এত লোক দেখে তিনি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এঁরা সব কেন?"

মা চট্ করে একগলা ঘুমটা টেনে বললেন, "সুন্দরবনের ম্যাডভেঞ্চার শুনতে এসেছেন—আমি যাই ওঁদের জন্যে চা করে আনি।" বলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন।

বিদ্যুৎ বললে, "কম্বলের কম্ফর্টারটা নিশ্চয়ই ছোট হয়ে গেছিল?"

চিদাম্বরম্ বললে, "সেটা যে কি হ'ল তা মা-ও বলতে পারেন না। সেটা সেই থেকে আর পাওয়াই গেল না। আর বাবাকে জিরাফ হয়ে যাবার ঘটনাটা মা পরে জানালে বাবা বলেছিলেন—ওসব গুল্ আর আমাকে শোনাতে এসো না—যাও, যাও!"

॥ জয়ন্তু লেনিন ॥

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভ্লেডামির ইলিচ লেনিন (শিল্পী: শ্রীগোপীনাথ দাস)

ইভান—ভ্লেডামিরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক গ্রামেই দু'জনার বাড়ী, এক ক্লাসেই পড়ে। ইভানের বাবা ভাগ-চাষী। অন্যের ক্ষেতে চাষ-আবাদ করেন। কঠোর পরিশ্রম করেও নায্য মজুরী পান না। ইভানরা তাই খুবই গরীব। কোনদিন দু'বেলা আহার জুটত না—এমনই অবস্থা! সম্পত্তি বলতে তাদের ছিল মাত্র কাঠা তিনেক জমি। একটা আধ-ভাঙা কুঁড়ে ঘর আর একটা তেজী গরু। ইভানরা গরুটাকে যত্ন করত খুব। নিজেরা উপোষ করেও গরুটাকে পেট ভরে খাওয়াতো।

একদিন হয়েছে কি, ইভান কিছুতেই স্কুলে যেতে চাইছিল না। মাইনে বাকী পড়ায় তার নাম কাটা গেছে। হেডমাষ্টার মশাই তাকে স্কুলে আসতে নিষেধ করেছেন। 'গরীবের ছেলের আবার পড়া! যা, যা—খেটে খে-গে যা!' ইভান হেডমাষ্টারের কথাগুলো ভুলতে পারছিল না, কাঁদছিল। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। ইভানের বাবার সেদিন কাজ ছিল না, ঘরে বসেছিলেন। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখেন জমিদারের পেয়াদা এসেছে খাজনা নিতে। হতবাক ইভানের বাবা

হাতে তাঁর একটি পয়সাও নেই। খাজনা দেওয়া ত' দূরের কথা, সেদিন তাঁরা কি খাবেন তাই ছিল সমস্যা! পেয়াদাকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন, অনুরোধ জানালেন আর কিছুদিন পরে আসবার জন্য। কিন্তু কে-কার কথা শোনে। পেয়াদা গর্জে উঠল—'ওসব চালাকি ছাড়ো, খাজনা এখনই চাই! যদি না পারো, গরু নিয়ে যাব।' পেয়াদার পায়ে পড়লেন ইভানের বাবা, কিন্তু কোন ফল হ'ল না! এক ঝটকায় তাঁকে লাথি মেরে, গরু ছিনিয়ে নিয়ে গেল পেয়াদা। ইভানদের সঙ্গে বালক ভ্লাদিমির-ও কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এরকম অত্যাচার শুধুমাত্র ইভানদের বাড়ীতেই নয়, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই এমন চলত। ঘটি, বাটি, থালা, গরু, মোষ, ভেড়া যা পেত—তাই নিয়ে যেত পেয়াদার দল। চাষীদের চোখে নামত অশ্রুর বন্যা। মুখ ফুটে কিছু বলবার জো নেই! তারা শুকিয়ে মরত তিলে তিলে।

কল-কারখানাতেও শ্রমিকদের প্রতি মালিকরা চরম অত্যাচার চালাত। বেশি খাটিয়ে, কম মজুরি দেওয়া হ'ত। কেউ প্রতিবাদ জানালে জারের পুলিশরা নির্মম ভাবে মারধোর করত। তাদের জেলে বন্দী করে রাখত। এই সমস্ত ঘটনাবলীর ছাপ বালক ভ্লাদিমিরের মনে গভীরভাবে এঁকে রইল।

বড় হয়ে ভ্লাদিমির আইন পাশ করে আর ওকালতি করলেন না। 'এন. লেনিন' এই ছদ্মনাম নিয়ে, নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রবল পরাক্রমশালী জারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলেন। দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করে তুললেন। শেষ পর্যন্ত জয় হ'ল তাঁর।

দুনিয়ার সর্বহারাদের নেতা লেনিন মানুষের সুখ-শান্তির জন্য লড়াই করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীতে একটিমাত্র সমাজ—যে সমাজ শুধু মানুষের। ধনীদের ভোগ-বিলাস চলবে না। মাটি, খনি, কারখানার কেউ ব্যক্তিগত মালিক থাকবে না। কৃষক-শ্রমিকের মিলনে জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হোক—এই তিনি চাইতেন। অত্যাচারী জারকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়েছেন তিনি।

লেনিনের যাদুমন্ত্রে—রাশিয়ার রক্ত-কলঙ্কিত ইতিহাস রূপান্তরিত হয়েছে এক নতুন মুক্তি জাগরণে। আজ লেনিনের পুণ্য-জন্মশতবার্ষিকী দিবসে সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরাও বলব—'জয়তু লেনিন! লেনিন জিন্দাবাদ!'

নিশির ডাক

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গোবিন্দ এসেছিল বিন্ধ্যাচলে।

কাশী থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ। ট্রেনের চেয়ে বাসে আসাই সুবিধা। ট্রেন সব সময় াকে না, কিন্তু বাস দু-ঘণ্টা পর পর পাওয়া যায়। মির্জাপুর অবধি বাস, তারপর মাইল ার সাইকেল-রিক্‌সায়, একেবারে মন্দিরের সামনে গলি-পথে এনে পৌঁছে দেয়।

গলিটা বড় রাস্তা থেকে বরাবর চলে গেছে মন্দিরে, আবার মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাট অবধি।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরটি প্রাচীন। অনেক কালের পুরানো হলেও এর গঠন নৈপুণ্যে কান বিশেষত্ব নেই। চত্বর অনেকখানি হলেও, মন্দিরটি ছোট; তার চেয়েও ছোট এর বেশ পথ। তন্ত্র-সাধনার জন্য এই অঞ্চল এক সময় ছিল বিখ্যাত। বিন্ধ্যবাসিনী তান্ত্রিক-দের জাগ্রত দেবী হিসাবে আরাধ্য ছিলেন। একালে তান্ত্রিকদের তন্ত্রচর্চার সে প্রাধান্য প্ত হয়েছে, কিন্তু ভক্তদের কাছে দেবীর মাহাত্ম্য কমেনি।

মন্দির থেকে মিনিট দুয়েক গেলেই গঙ্গা। উঁচু পাথর বাঁধানো ঘাট, আর ঘাটের াশেপাশে ভাঙা খিলানের পাথর এখানে অনেক রাজা-মহারাজার কীর্তিকে জাগিয়ে রখেছে।

খুব পুরানো তীর্থস্থান হলেও বিন্ধ্যাচল তেমন জনবহুল শহর নয়। মন্দিরের অঞ্চলটা ছড়ে গেলে, বাকি যা জনবসতি আছে ষ্টেশনের কাছে। সেদিকে বাড়ীগুলি শীতের রশুমে ভরে ওঠে, লোকে আসে স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় দেহ-মনকে চাঙ্গা করে নিতে।

গোবিন্দ এসেছিল পাঁচ-সাতদিন এখানে নিরিবিলিতে নিরবচ্ছিন্ন আয়েসে কাটিয়ে দিতে।

হোটেলে একখানি নিজস্ব ঘর সে ভাড়া নিয়েছিল। খুশিমত সেখানে শুয়ে-বসে াকা। আর মনোমত এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো। শুধু জলের বোতলটা আর খানকয়েক াড়া কাঁধের ঝোলাটার মধ্যে থাকলেই হ'ল। খিদেটা এখানে বেশী হয়। চলতে চলতে -চারখানা প্যাঁড়া মুখে ফেললেই চলে।

সবটায় পায়ে হেঁটে ঘোরাফেরা। সাইকেল-রিক্‌সায় চড়লে বেড়ানো হয় না। সাইকেল রানোর দোকান আছে, কিন্তু সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় না। তবে সেজন্য গোবিন্দর রাফেরা আটকায় না। শীতের দিনে দুপুর বেলা পথচলা ও রোদ-পোহানো দুটো জই হয়।

তবে গবিন্দর পথচলা সাধারণ নয় সে ঘড়ি ধরে চলে, দু'ঘণ্টা যাবে, ঘণ্টাখানেক বসবে, আবার দু'ঘণ্টায় ফিরবে, এমনি তার নিয়ম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে সঙ্গে আছে টর্চ, হাতে আছে লাঠি।

গোবিন্দ নির্ভাবনায় চলাফেরা করে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে গোবিন্দ পাহাড়ের কোলে এক গাঁয়ে গিয়ে পড়েছিল। একটি ইঁদারাকে ঘিরে সামান্য কয়েক ঘর লোকের বাস। সবই গরীব লোক। সমৃদ্ধির কোন চমক কোথাও নেই, কিন্তু চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর। মাঠের পর মাঠ ঢেউ তুলে উঠেছে আর নেবেছে। সবুজ আর ধূসর, তার মাঝে কোন কোন জায়গায় কালো কালো পাথরের চাঙড় মাথা তুলেছে। নীল আকাশের মাঝে যেমন তারা ফুটে থাকে, এও তেমনি সবুজ ও ধূসরের মাঝে কালো কালো পাথর ফুটে উঠেছে।

গোবিন্দ একটি তেঁতুল গাছের তলায় বসে পড়লো। তাকিয়ে রইল আকাশের পানে, দিগন্তের পানে।

সূর্য যত পশ্চিমের আকাশে ঢলে পড়ছে, আকাশে তত রং ধরছে। দিগন্ত অবধি প্রান্তরে স্নিগ্ধতার পূর্ণতা। কোথাও কোন প্রাণীর গতি নেই। জীবনের সাড়া আছে পাখীর কলরবে। একান্ত নিঃসঙ্গ হয়েও কিন্তু গোবিন্দর নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় না। বিশাল বিপুল বিশ্বের বিস্তারের মধ্যে মানুষ কত ছোট, কত স্বল্পস্থায়ী। গোবিন্দ বসে থাকে আর ভাবে। বেশ লাগে এমনি নিরিবিলিতে বসে বসে ভাবতে। অপরাহ্ণ বেলা ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসে।

এবার গোবিন্দ উঠে দাঁড়ালো, ঘণ্টা দু'য়েক হেঁটে এবার হোটেলে ফিরতে হবে।

ইতিমধ্যে একটি লোককে দেখা গেল, একটি মোষ নিয়ে গাঁয়ে ফিরছে, গোবিন্দকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো, বললো—হেই বাবু, এই গাঁয়ে কোথায় এসেছিলি ? কার ঘরে ?

—ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলাম।

—বিন্ধ্যাচল থেকে আসছিস্?

—হ্যাঁ।

—সেখান থেকে এই দেহাতে এসেছিস্ বেড়াতে? এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী যা, এখনি আঁধার হয়ে আসবে।

—আমার কাচে আলো আছে, এই লাঠি আছে।

—ও কোন কাজের হোবে না বাবুজী।

—কেন, বাঘ বেরুবে নাকি ?

—বাঘ নয় বাবুজী, তান্ত্রিক মহারাজ। তার সঙ্গে মুলাকাৎ হলে আপনার সবকিছু সে লিয়ে লিবে।

—ডাকাত নাকি ?

—ডাকাত নয় বাবুজী, বড় সাধু, একবার আপনার মুখের সামনে এসে পড়লে আপনি আর কিছু করতে পারবেন না। সে যা বলবে শুনতে হবে।

—তাই নাকি ? সে কোথায় থাকে ?

—ওই জঙ্গলের পাহাড়ে কোথাও থাকে। মাসে একবার নেমে আসে পাহাড় থেকে। আজ অমাবস্যা, আজ আসবে। দেখছেন না, গাঁয়ের কোন মানুষ আজ বাইরে নেই। আমরা তাকে বড় ভয় করি বাবুজী।

—তাকে ভয় কর কেন ?

—যাকে দেখতে পাবে, তার তো আর রক্ষে নেই। বয়স্ক মানুষ হলে এমন এক থাপ্পড় মারবে যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে, আর ছোট ছেলেমেয়ে হলে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে, সে আর ফিরবে না।

—ছেলেমেয়ে নিয়ে গেছে একটাও ?

—আগে আগে দু-একটা করে নিয়ে গেছে, এখন সবাই সাবধানে থাকে তাই আর নিয়ে যেতে পারে না।

—এমন মানুষকে তোমরা কিছু বল না ?

—কে কি বলবে বাবুজী, ইয়া দুষমনের মত চেহারা। তন্তর-মন্তর জানে, বাণ মেরে গুষ্টিশুদ্ধ মেরে দেবে, তাই সবাই ভয় করে।

—সে কি গাঁয়ে আসে ওই ছেলে নিয়ে যেতে ?

—না, সে আসে সিধে নিতে, আমরা যে যা পারি, ছাতু ডাল আটা রেখে দিই বাড়ীর বাইরে সে নিয়ে চলে যায়, আমরা দরজা বন্ধ করে বসে থাকি।

—তাজ্জব ব্যাপার !

—প্রতি অমাবস্যায় সে আসে। আজও আসবে। আশপাশের অন্য-অন্য গাঁয়েও সে যায়। কখন যে আসবে ঠিক নেই। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান বাবুজী।

—তোমরা পুলিশকে কোন খবরও তো দাওনি ?

—না বাবুজী, কেউ সাহস পায় না।

—তাহলে মানুষটিকে তো একবার দেখতে যেতে হয়, কোথায় থাকে ?

—ওদিকের পাহাড়ে।

—একা থাকে ? না, চেলা-সাগরেদ্ আছে ?

—ভগবান জানে।

—ছেলেদের নিয়ে যায় কোথা ?

—কালীমায়ের কাছে তাদের বলি দেয় বাবুজী।

—সে তো তাহলে খুনী! বদমাস!

—সে আপনি যা বলেন বলুন বাবুজী, আমরা তাকে ভয় করি।

কথায় কথায় বুড়ো তার বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিল। মোষটা বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। বুড়ো বললো—রাম রাম বাবুজী, তুমি যাও—

গোবিন্দ বললো—আমার আর এখন যাওয়া হবে না। আমি সেই সাধুজীকে একবার দর্শন করবো।

—সে তো আপনাকে জানে মেরে দেবে বাবুজী!

—তবু একবার দেখবো।

বুড়োর ঘরের রোয়াকের উপর গোবিন্দ বসে পড়লো।

বুড়ো বললো—এখানে বসছেন বাবুজী ? সে কখন্ আসবে তার কি কিছু ঠিক আছে ?

—আমি সারারাত তার জন্যে বসে থাকবো।

—এখানে বসবেন না বাবুজী, আমার ঘরের বাইরে বসলে আমার বিপদ হবে।

—তাহলে সামনের ওই গাছতলায় গিয়ে বসি গে—

—না না, বাবুজী, আপনি বরং ঘরের ভিতরে বসুন।

—ভিতরে থাকলে, কখন্ এলো কখন্ গেল জানবো কেমন করে ?

—সে তো চুপি চুপি আসবে না বাবুজী। সে তো হাঁক দিয়ে আসবে—'কালভৈরবী মহামায়া, দুনিয়াদারি বিলকুল মায়া—' হাঁক শুনলে জানালার ফাঁক দিয়ে একবার দেখে নেবেন।

—তা হতে পারে, এখন একটু বাহিরে বসি। পরে ভিতরে যাবো।

বুড়ো ঘরের ভিতর চলে গেল।

গোবিন্দ বাহিরে বসে রইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগলো।

শীতের রাত পাড়াগাঁয়ে এমনিই নিঝুম, তার উপর অমাবস্যার রাত অন্ধকারে আরো জমাট। গাঁয়ের কোন ঘরে যদি বা একটা আলো দেখা যেত, যদি বা একটা মানুষের সাড়া পাওয়া যেত, তান্ত্রিকের ভয়ে তা-ও নেই। মানুষ যে এখানে আছে, তা আর মনে হয় না। প্রান্তর ও বাড়ীঘর অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে। ঝিঁঝি পোকারও সাড়া নেই। চারিপাশের নিঝুমতা যেন জড়িয়ে ধরে। সব ছম্‌ছম্‌ করে, নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়। গোবিন্দ এক আকাশ তারার পানে তাকিয়ে বসে থাকে।

কোন একসময় বুড়ো বেরিয়ে আসে অন্ধকারে, বলে—বাবুজী, কুছু খাবেন ?

গোবিন্দ বললো—আমার কাছে মিঠাই আছে, পানি আছে।

—দুঠো চাপাটি আর পাওভর দুধ খান। আমার ঘরে এসে আপনি উপোসী থাকবেন, অতিথ্‌ নারায়ণ।

—বেশ, দিও।

—ভিতরে আসুন, বাবুজী।

গোবিন্দ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ঘরের এক পাশে মিট্‌মিট্‌ করে একটা পিদিম জলছে। গজনে তেলের গন্ধ। একপাশে দু'খানি দড়ির খাটিয়া। তার একটার উপর একটা বছর বারো-চোদ্দর ছেলে বসে আছে, আর কেউ নেউ। বুড়ো একটা টুল দিল বসতে। বললো—এই আমার একটি নাতি বাবুজী, আমার মেয়ের বেটা। মেয়ে মরে গেছে, জামাই আবার সাদি করেছে, এই নাতিটাকে আমি আমার কাছে রেখেছে। ওই তান্ত্রিকের জন্য বড় ভয় বাবুজী। এখন ভাবছি, ওকে ওর বাপের কাছেই পাঠিয়ে দিই। সেখানে এসব ভয় নেই।

গোবিন্দ ছেলেটির পানে তাকায়।

বুড়ো বলে—রাজকিশোর, যা, বাবুজীর জন্যে দো চাপাটি ও পাওভর দুধ লা,—

ছেলেটি ভিতরে চলে যায়।

একটু পরেই পাতায় করে দু'খানি চাপাটি ও এক বাটি দুধ নিয়ে আসে।

বুড়ো বললে—ডাল ভাজি কিছু দিলিনি ?

—ভাজি কুছু নেই, ডাল হচ্ছে।

গোবিন্দ বললো—থাক্‌ থাক্‌ আর কিছু চাই না। দুধে ভিজিয়ে আমি রুটি খাবো।

গোবিন্দ কাঁধের ঝোলা থেকে প্যাঁড়া বের করে, রাজকিশোরের হাতে একখানি প্যাঁড়া দিয়ে বলে—তুমি খাও।

রাজকিশোর দাদুর মুখের পানে তাকালো, দাদু হেসে বললো—খা—খা—

গোবিন্দ বললো—বাচ্চা আর কে আছে বাড়ীতে?

—বুড়ো বললো—আর কে? আমি, আমার বহু আর ওই রাজকিশোর।

—তোমরা এই তিনখানা প্যাঁড়া রাখো, রাতে খাবে।

—না না, বাবুজী, আপনি খান।

—আমার আছে।

গরম রুটি খাঁটি দুধে ভিজিয়ে খেয়ে, একখানি প্যাঁড়া ও এক লোটা জল গলায় ঢেলে গোবিন্দ বেশ তৃপ্তি পেল। বুড়ো বললো—আপনি এই খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ুন বাবুজী। সারা রাত তো আর জেগে বসে থাকতে পারবেন না, সাধু দর্শন করেও তো যাবেন সেই সকালে। শুয়ে পড়ুন।

—আমি সাধুজীর সঙ্গে যাবো।

—সঙ্গে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার জানের মায়া নেই বাবুজী!

—না।

বুড়ো আর কিছু বললো না।

গোবিন্দ একখানি খাটিয়ার উপর গিয়ে বসলো।

রাজকিশোর বসেছিল পাশের খাটিয়াখানির উপর, দেখছিল গোবিন্দকে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ের ভাব। গোবিন্দ ভাবলো—ওই ছেলেটার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললে ও বোধ হয় একটু সাহস পায়। একটু জমিয়ে বসে সে ছেলেটির সঙ্গে গল্প জমাবার উদ্যোগ করলো। এমন সময় সহসা দূর থেকে মানুষের গলার স্বর শোনা গেল।

প্রথমটায় গোবিন্দ ঠিক বোঝেনি, এবার যেন শুনতে পেল—মহাকালী মহামায়া—

বুড়ো বললে—ওই আসছে, আজ অনেক আগেই এসেছে।

—মহাকালী মহামায়া, দুনিয়াদারি বিলকুল মায়া—

এবার কণ্ঠস্বর কাছে এসেছে, অনেক স্পষ্ট।

এক বুড়ী হন্তদন্ত করে ঘরে এলো, হাতে এক গোছা চাপাটি আর একটা ছোট ঝুড়িতে কয়েকটা পেয়ারা। বুড়ো সেগুলি নিল তারপর দরজাটা খুলে গিয়ে দাঁড়ালো দরজার সামনে। বুড়ী গিয়ে দাড়ালো তার পিছনে।

এবার অনেক কাছে শোনা গেল—মহাকালী মহামায়া।

একটা গরুর ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। বুড়ী হাত জোড় করে বুড়োর পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো কালোমত দীর্ঘ এক মানুষ, পেছনে একটা সাদা গরু।

— মহাকালী মহামায়া —

—মহাকালী মহামায়া—

বুড়ো চাপাটি আর পেয়ারার টুক্‌রীটা এগিয়ে দিল।

তান্ত্রিক হাঁক দিল চাপাটি

—কয় গো ?

বুড়ো বললো—বিশ।

—আমরুদ্‌ ?

—বিশ।

—বহুৎ কম।

—আর কিছু নেই আমার ঘরে।

—দেখে গা !

বুড়ো-বুড়ী সসম্ভ্রমে পিছু হটে এলো। তান্ত্রিক ভিতরে এসে ঢুকলো।

পিদিমের আলো যত অল্পই হোক্‌, এবার মানুষটিকে ভাল করে দেখে নেবার সুযোগ পেল গোবিন্দ। কালো দোহারা মানুষ, বয়স বছর চল্লিশের বেশী হবে না। মাথায় জটার আভাষ আছে, কিন্তু জটা মুখে-গোঁপ-দাড়ি ভরা। পরণে লাল কাপড়, কপালে লাল চন্দন লেপা, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষ, প্রথম নজরেই ভক্তি হওয়ার চেয়ে মানুষটিকে ভয় করে বেশী।

ঘরে ঢুকে তান্ত্রিক একবার চারিপাশে তাকালো, খাটিয়ার উপর রাজকিশোরের পানে নজর পড়তেই হাঁক দিল—ইধার আ—চল্‌—।

রাজকিশোর কাঁপতে কাঁপতে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো

তান্ত্রিক এগিয়ে গিয়ে রাজকিশোরের হাত ধরলো।

গোবিন্দ সাড়া দিল—নেহি!

তান্ত্রিক ঘুরে দাঁড়ালো গোবিন্দের পানে। রুক্ষস্বরে বললো—তুম্ কৌন হ্যায়?··· বাংগালী! যাও, আপনা কাম করো।

ছেলেটির হাত ধরে তান্ত্রিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুড়ো-বুড়ী কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো—সাধু বাবা?

তান্ত্রিক ধমক দিল—চুপ রহ! মাইজীর লেড়কা মাইজীর কাছে যাবে, মাইজীর বন্দনা কর!

বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই বসে পড়লো—হা ভগবান!

বুড়ো কাঁপতে লাগলো।

গোবিন্দ দু'জনকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

তান্ত্রিক রাজকিশোরের হাত ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। গোবিন্দ পিছনে গিয়ে হাঁক দিলে এই, ঠারো!

তান্ত্রিক ঘুরে দাঁড়ালো—তুম কৌন হো?

—লেড়কাকে ছেড়ে দাও, আমি নিয়ে যাবো।

—নেহি।

—কাহে নেহি?

—মাইজীর লেড়কা, মাইজীর কাছে যাবে।

—বুজরুকি ছাড়ো, ছেলেকে দিয়ে দাও।

—বাংগালী বাবু, নিজের কাজে যাও—

তান্ত্রিক রাজকিশোরের হাত ধরলো।

গোবিন্দ ছুটে গিয়ে রাজকিশোরের হাত ধরলো।

—কেয়া! তান্ত্রিক গর্জে উঠলো, মারলো এক ঘুষি।

গোবিন্দ চকিতে মাথা নামিয়ে ঘুষি কাটালো। প্রচণ্ড এক ঢুঁ মারলো তান্ত্রিকের পেটে। তান্ত্রিক উল্টে পড়লো। কিন্তু পড়ার সময় জড়িয়ে ধরলো গোবিন্দকে। গোবিন্দও পড়লো তান্ত্রিকের সঙ্গে।

গোবিন্দ বুঝলো তান্ত্রিকের দেহ লোহার মত কঠিন। তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। এর কবল থেকে মুক্ত হতে না পারলে লড়ার সুবিধা নেই। পর পর কয়েকটা ঘুষি সে মারলো তান্ত্রিকের মুখে। কিন্তু সে মার অগ্রাহ্য করে তান্ত্রিক গোবিন্দর বুকের উপর উঠে বসলো। দুই হাঁটু দিয়ে গোবিন্দর দুই হাত চেপে ধরলো। এবার বুঝি গলা টিপে মারবে।

রাজকিশোর এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, গোবিন্দর লাঠিটা ছিটকে পড়েছিল পাশে। হঠাৎ লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে এক ঘা বসিয়ে দিল তান্ত্রিকের মাথায়।

তান্ত্রিক সেইখানে লটকে পড়লো।

গোবিন্দ লাফিয়ে উঠলো। অন্ধকারে ভালো করে একবার তান্ত্রিককে দেখে নেবার চেষ্টা করলো, তারপর রাজকিশোরের হাত ধরে বললো—এসো—

বুড়ো-বুড়ী দরজার সামনে বসেছিল, গোবিন্দ এসে বললো—এই নাও তোমাদের নাতি। তান্ত্রিক খতম্!

বুড়ো-বুড়ী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল, তারপর বুড়ো বললে—তান্ত্রিককে তুমি খুন করলে?

—আমি খুন করিনি, করেছে তোমার ওই নাতি!

বুড়ী বলে উঠলো—সাধুসন্ত খুন…মহাপাপ…এ তুই কি করলি রাজকিশোর!

গোবিন্দ বললো—সে ওকে খুন করতো তাতে পাপ হতো না, ও তাকে খুন করেছে তাতে পাপ হবে কেন? যাক্ সে মরেনি। ওখানে মার খেয়ে পড়ে আছে, তোমরা গাঁয়ের দু'চারজন জোয়ান মরদকে ডেকে দাও, ওকে বেঁধে নিয়ে আমার সঙ্গে থানায় যাবে।

বুড়ো এবার যেন স্বাস্তি পেল। বললে—যাগ তবু ভাল, মরেনি!

তারপর সেই বুড়োর সঙ্গে বাড়ী বাড়ী ঘুরে তিন চারজন জোয়ান মরদ পেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো। তান্ত্রিককে বেঁধে থানায় নিয়ে যেতে সহজে কেউ রাজী নয়।

একঘণ্টা পরে লোকজন নিয়ে গোবিন্দ যখন এলো, তখন সেখানে তান্ত্রিক নেই, তার গরুও নেই।

গোবিন্দ ক্ষুণ্ণ মনে সেখান থেকে বিদায় নিল।

বিন্ধ্যাচলের পুলিশকে পরদিন গোবিন্দ সব কথা জানালো। না জানালেও ক্ষতি ছিল না। সেই অঞ্চলে আর কখনো সেই ভয়াবহ নিশির ঢাক শোনা যায়নি।

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সৌভাগ্যক্রমে সামুদ্রিক পীড়া রজত ও লিলিকে পীড়িত করেনি। এ ক'দিন তারা জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে থেকে পীড়িতদের শুশ্রূষা করতে লাগলো। কেবিন অপেক্ষা জাহাজের খোলের যাত্রীদের কষ্টই বেশী। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবাসী। এই সেবাকার্যে রজত ও লিলি তাদের মন জয় করে ফেললে। একজন ইংরেজ বালিকাকে এই কার্যে ব্রতী দেখে জাহাজের সাহেব ডাক্তারও এদের প্রতি বেশী যত্ন নিতে লাগলেন। ফলে খোলের যাত্রীরা যন্ত্রণার মধ্যেও সান্ত্বনা লাভ করলো।

খুব ভোরে ওঠা রজতের চিরকালের অভ্যাস। জাহাজেও সে খুব ভোরে উঠে ডেকের উপর রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সামুদ্রিক শোভা দেখতো। আসবার সময় সে লিলিকে ডাক দিয়ে আসতো। সেও অল্প পারে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ত।

একদিন রজত এ রকম দাঁড়িয়ে আছে, তখনও লিলি এসে পৌঁছায় নি, এমন সময়ে কালো কাপড়ে ঢাকা দু'জন লোক সেখানে এসে রজতকে পিছন থেকে ধরে ফেললে। আত্মরক্ষা করার কোন উপায় না দেখে রজত চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা তাকে ধরে রেলিঙ দিয়ে

গলিয়ে নীচে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিলে। রজতের মুখ দিয়ে 'help' 'help' এই কথা দুটি মাত্র বার হ'ল। অল্প পরে সমুদ্রের জলে ঝুপ করে একটা শব্দ শোনা গেল।

এ দিকে লিলি ডেকে আসতে আসতে রজতের আর্তনাদ শুনতে পেলে, আর কিছু দূরে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা দু'জন লোককে ছুটে পালাতে দেখলে। কিন্তু তখন আর তাদের অনুসরণ করে কোন লাভ নেই। তাহলে হয়তো তারা ধরা পড়তো, কিন্তু তার রজতদা'কে বাঁচানো আগে দরকার বলে লিলি মনে করলে। সে খালাসীদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে রেলিং-এর ধারে গেল।

রজত যখন জলে পড়লো তখনও তার অস্পষ্ট চেতনা ছিল। প্রায় আড়াই তোলা উঁচু ডেক থেকে পড়ে প্রথমে সে জলের তলায় নেমে যেতে লাগলো। তার প্রধান ভয় হ'ল—সে যদি একেবার জলের টানে জাহাজের তলায় চলে যায়, তাহলে তার আর উদ্ধার নেই। জলের নীচে জাহাজের চাকার জল-কাটবার শব্দ তার কানে গেল। সে তখন প্রাণপণ চেষ্টায় জলের ওপরে ওঠবার চেষ্টা করলে। ওপরে উঠেই লিলির কথা শুনে সে দেখলে যে, সে জাহাজ থেকে একটু পিছনে চলে এসছে।

রজতকে জলের ওপর ভাসতে দেখে লিলি তাকে সাহস দিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে চললো। রজত ও লিলির চীৎকারে কয়েকজন খালাসী সেখানে ছুটে এসেছিল। রজতকে দেখিয়ে লিলি তাদের একটা 'লাইফ-বেল্ট' ফেলে দিতে বললে। তারপর ক্যাপটেনকে বলতেই তিনি জাহাজ থামাবার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা নৌকা নেমে গেল। ইতিমধ্যে রজত 'লাইফ বেল্ট' আশ্রয় করে ভাসছিল। নৌকোর সাহায্যে জাহাজে উঠেই সে লিলিকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য অজস্র প্রশংসা করলো ও ক্যাপটেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো।

পোষাক পরিবর্তন করার পর জাহাজের পাটাতনের ওপর বসে মিঃ ও মিসেস পিয়ার্সন, ক্যাপটেন, রজত ও লিলি ঘটনার বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু জাহাজের মধ্যে রজতের শত্রু কে থাকতে পারে, তা কেউ বুঝে উঠতে পারলেন না। মিঃ পিয়ার্সন রজতকে একটু সাবধানে থাকতে বললেন।

রজত বুঝতে পারলে না যে, কে তার শত্রু? এ জাহাজে এমন কারা আছে যারা তাকে পৃথিবী হতে সরিয়ে ফেলতে চায়। তারা কারা? সে তো জ্ঞানতঃ কারও অপকার করেনি। তবে এ শত্রুতা কেন? সে বহুক্ষণ চিন্তা করেও এ বিষয়ের মীমাংসা করে উঠতে পারলো না।

মিসেস পিয়ার্সন রজতকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি রজতের এই আকস্মিক বিপদে

সব সময়ে কাছে রেখে দিও, বাবা। এটা থাকলে বদমায়েসগুলো আর কাছে আসতে সাহস করবে না।

রজত উত্তরে বললো, আপনার আশীর্বাদই আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তবে আপনি যখন দিচ্ছেন তখন এটা নিচ্ছি। কেবল আত্মরক্ষা করার জন্যই এর সাহায্য নেব।

জাহাজের সকলেই এই অল্প সময়ের মধ্যে রজতকে ভালবেসেছিল। সকলেই তার উদ্ধার-প্রাপ্তিতে তাদের আনন্দ জানিয়ে গেল।

এই সময় দু'জন বাঙালী যুবক তার এই আকস্মিক বিপদ কেটে যাওয়ায় তাদের আনন্দ প্রকাশ করে বললে, রজতবাবু, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমরা আপনার শরীর-রক্ষক হিসাবে সব সময় কাছে থাকতে ইচ্ছা করি। আর বাঙালী হিসাবে আপনাকে সাহায্য করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।'

এই অযাচিত সৌজন্যের জন্য তাদের ধন্যবাদ দিয়ে রজত বললে, না, এখন আর দরকার হবে না। তারপর তার রিভলবার দেখিয়ে সে বললে, বর্তমানে এই আমার রক্ষক। দরকার হলে আপনাদের জানাব।'

'বেশ জানাবেন'। এই কথা বলে তারা চলে গেল।

অবশেষে রজতরা একদিন আফ্রিকায় এসে পৌছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সময়ের আফ্রিকা—ইউরোপীয়েরা সবেমাত্র কয়েকটি স্থান অধিকার করে বসতি স্থাপন করেছে। এ সেই তমসাচ্ছন্ন মহাদেশ—যার ঝোপঝাড়ে সিংহ, চিতা, সাপ ওত পেতে বসে আছে। বনের মধ্যে গণ্ডার ও হাতী দলে দলে বিচরণ করছে আর জলে আছে অসংখ্য হিংস্র কুমীর ও হিপোপটেমাস। যার নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বাস করছে মহাবলী গরীলা, যাকে পশুরাজ সিংহ পর্যন্ত ভয় করে। নরখাদক জংলী মানুষরা বিষাক্ত তীর নিয়ে দেশের স্থানে স্থানে বাস করে। মানুষ এদের কাছে উপাদেয় খাদ্য।

তীরে নেমে সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে চললো। ভারতের নিরাপদ অঞ্চলের অধিবাসী এরা। বনের মধ্যে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে সে কথা তাদের মনেই হয় না। চারিদিকের বিরাট বিরাট বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে তারা গন্তব্যস্থানের দিকে এগিয়ে চললো।

বাস করার জন্য একটা বিস্তীর্ণ প্রস্তার স্থির করা হয়েছিল। তার কাছ দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে। নদীর ওপারে একটা পাহাড়, ঘনবনে আচ্ছন্ন।

কয়েক দিনের মধ্যে সেখানটা পরিষ্কার করে বিভিন্ন আকারের তাঁবু পড়লো। স্থানে স্থানে ঘাসের চালাও তৈরী হ'ল। সমস্ত জায়গাটা ছ'ফুট উঁচু কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হ'ল। কাঁটা তার দিয়ে এরকম করে ঘেরার মানে অনেকেই বুঝতে পারলে না।

মিঃ পিয়ার্সন সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তারা যেন সন্ধ্যার মধ্যেই কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে চলে আসে। সাহেবের এই সতর্কবাণী কয়েক জনের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হ'ল। কিন্তু শীঘ্রই তারা এর সার্থকতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে।

এদের কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো। বন-জঙ্গল পরিষ্কার হতে লাগলো আর বিরাট বিরাট বনস্পতিগুলো কাটা হয়ে সদ্য নির্মিত রেলপথের ওপর দিয়ে বন্দরের দিকে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো।

রাত্রে ওপারের পাহাড় থেকে মধ্যে মধ্যে সিংহের গর্জন ভেসে আসে। তার গুরুগম্ভীর শব্দ সকলের মনে ভয় অপেক্ষা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। নদীর এপারে কোনদিন সিংহের সাড়া পাওয়া যায়নি বলে সকলে নিশ্চিন্ত ছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর কিছু দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল। লাইন বসাবার কাজে কয়েক জন স্থানীয় কাফ্রীও নিযুক্ত হয়েছিল। একজন কাফ্রী বলে উঠলো যে সিংহ মানুষ ধরেছে।

মিঃ পিয়ার্সনের কাছে এ সংবাদ যেতে তিনি বাইরে এসে সকলের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলেন,—একজন কুলি কি কাজে বাইরে গিয়েছিল, সে আর ফিরে আসেনি।

তারপর থেকে প্রতি রাত্রে বেড়ার চারিদিকে সিংহের গর্জন বেড়ে চলতে লাগলো। কাফ্রীরা বলাবলি করতে লাগল—সিংহ যখন একবার মানুষের আস্বাদ পেয়েছে, তখন আরও কয়েকটাকে না নিয়ে ছাড়বে না। সাহেব অগত্যা তারের বেড়া আরও দু'ফুট উঁচু করে দেওয়ালেন।

মিঃ পিয়ার্সন রজতকে সব সময়ে অস্ত্র সঙ্গে রাখতে উপদেশ দিলেন আর একা কোথাও যেতে নিষেধ করলেন।

মধ্যাহ্নে কুলিরা আহারাদির জন্য ছুটি পেত। সে সময়ে রজত ও লিলি তাদের বন্দুক নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতো। একদিন নদী হতে জল আনবার সময় একজন কুলি অল্পের জন্য কুমীরের পেটে যেত। লোকটা অন্যমনস্ক হয়ে জল তুলছিল। অল্প দূরেই যে একটা কুমীর তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে তা সে লক্ষ্য করেনি। রজত কাছেই ছিল, সে পর পর দুটো গুলী ছুড়তেই কুমীরটা আহত হয়ে জল তোড়পাড় করতে লাগলো।

গেল। অল্প পরে কুমীরটা মরে ভেসে উঠতে কাফ্রীরা দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে ডাঙায় তুলে ফেললে। সেদিন তাদের একটা ভোজ লেগে গেল।

এই ভাবে কিছুকাল যাবার পর একদিন সকালে রজত কুলিদের কাজ তদারক করছে, এমন সময়ে হঠাৎ তার দৃষ্টি কিছু দূরে একটা ছোট ঝোপের ওপর পড়লো। তার যেন মনে হ'ল যে, সেখানটায় কিছু আছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে গিয়ে সে একটা সিংহকে সখানে দেখতে পেলে। দিনের বেলায় এরকম প্রকাশ্য স্থানে সিংহ কি করে আসতে পারে তা তার কল্পনার অতীত ছিল। বোধ হয়, রাত থেকেই সেখানে সে অপেক্ষা করছিল।

রজত পশুরাজকে ভাল করে দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়লো। সে লক্ষ্য করলো যে, সিংহটা ঝোপের মধ্য দিয়ে গুঁড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ঝোপ থেকে হাত কুড়ি পঁচিশ তফাতে মিঃ পিয়ার্সন কুলিদের কাজ তদারক করছিলেন। তাঁর দিকেই যে সিংহের লক্ষ্য এটা বুঝতে পেরে রজত তার একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে সিংহের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে লাগলো।

রজত মিঃ পিয়ার্সনকে সতর্ক করে দেবারও সময় পেলে না। সে হঠাৎ দেখলে যে, সিংহ তাঁকে আক্রমণ করার জন্য গুঁড়ি মেরে বসেছে। কুমীর শিকারের পর মিঃ পিয়ার্সন তাকে একটা রাইফেল দিয়েছিলেন। সে সেটাকে সব সময়েই সঙ্গে নিয়ে বেরুতো। সেটিকে সিংহের দিকে তাগ করে গুলী ছুড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো চীৎকারে চতুর্দিক কম্পিত করে আহত সিংহটা মিঃ পিয়ার্সনের কাছ হতে প্রায় দশ হাত তফাতে এসে পড়লো। রজত প্রস্তুত হয়েছিল। সিংহটা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তেই সে আবার তাকে তাক করে গুলী ছুড়লো। গুলীটা তার বুকে গিয়ে বিঁধল। তবুও পশুরাজ একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই মিঃ পিয়ার্সনের বন্দুক গর্জে উঠলো, আর প্রাণহীন সিংহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

রজত নিকটে আসতেই মিঃ পিয়ার্সন তার হাত ধরে 'শেক হ্যাণ্ড' করে বললেন, 'তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ রজত। তোমার কাছে আমি ঋণী রইলুম।'

রজত হেসে বললে, 'তার আগে আপনার কাছে আমার ঋণের বোঝাটা একটু হাল্কা করতে দিন। আমি যে আপনার কোন কাজে আসতে পেরেছি এ জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।'

সিংহের মাংস কাফ্রীদের খুব প্রিয়। তারা সাহেবকে বলে নিহত সিংহটা তাবুতে নিয়ে এল।

এই রকম ক'রে রজত ক্রমশঃ সকলের প্রিয় হয়ে পড়লো। দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ কাফ্রীদের তার খুব ভাল লাগতো। তারাও তাকে খুব পছন্দ করতো। রজত ধীরে ধীরে তাদের আচার-ব্যবহার, ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করে নিলে।

(ক্রমশঃ)

একটি কুকুর ছানা

শ্রীপ্রভাত দেব সরকার

'নেড়া কুকুরছানাটাকে যেন বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চাইলে'—

কুকুরটা আবার ডাকল। শীত ক'রে জ্বর আসার মত কুকুরের ডাকটা কেঁপে কেঁপে উঠল—কেঁউ-উ্ কেঁউ-উ্-উ্ কেঁউ-উ্-উ্!

হরিহরবাবু ঘর থেকে তাড়া দিলেন, আবার কুকুর ছানাটা কে আনলে? বার করে দে, শিগ্গীর তাড়া, তাড়া!

বাইরে কুকুর ছানাটা তখন গলার দড়িটা ছেঁড়বার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে যেন কাঁদতে শুরু করেছে, কাঁই-ই কাঁই-ই কাঁ-আঁ-আঁ উঃ।

হরিহরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারাদিন খেটে-খুটে এসেও নিস্তার নেই, একটা-না-একটা গোলমাল লেগেই আছে। একটু যদি শান্তিতে থাকতে দেবে—

হরিহরবাবু আশপাশ লক্ষ্য করলেন, চেয়ে চেয়ে দেখলেন, কুকুরটা কোথায় যেন ডাকছিল, বিশ্রী কাঁই কাঁই, কেঁউ কেঁউ।

কুকুরটার আর সাড়া নেই। কে জানে বাড়ীর কর্তার গলা পেয়ে সেও গা-আড়াল দিয়েছে কিনা। এই তো ডাকছিল, এইখানে মনে হ'ল যেন।

হরিহরবাবু ঘরের রোয়াক পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নেমে এলেন। অর ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুর ছানাটা ডেকে উঠলো। হরিহরবাবুর মনে হ'ল, কুকুরটা যেন কাঁদছে। ভয়

হরিহরবাবু পিছন ফিরে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এসে দেখতে পেলেন; কুকুর ছানাট সদর দরজার গা ঘেঁষে যে পাঁচিলটা রয়েছে তার এক ধারে টগর গাছের ডালে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। কুকুরটা তাঁকে দেখে কাঁই কাঁই করে লাফিয়ে উঠে গলার দড়িটা নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করলে—পুরনো শ্যাওলা-ধরা টগর গাছের ডালটা মড়মড় করল, মনে হ'ল এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে ডালটা!

হরিহরবাবু অদূরে দাঁড়িয়ে কুকুর ছানাটা লক্ষ্য করে বললেন, হারামজাদার কাণ্ড দেখ, ফুল গাছটা ভাঙ্গে বুঝি! কুকুর বাঁধবার আর জায়গা পেলে না

কিন্তু ভরসা করে কুকুরটার দিকে এগোতেও পারলেন না, তাঁকে দেখে কুকুরছানাটা বড় লাফাতে-ঝাঁপাতে লাগল, গলার দড়িটা নিয়ে টানাটানি করল!

হরিহরবাবু কুকুর ছানাটাকে ধমকে বললেন, এই, এই! চোপরাও-ও-ও!

আর এই কুকুরছানাটা বুঝি তাঁর দিকেই দড়ি ছিঁড়ে ছুটে আসে, ভয় পেয়েছে না ক্ষেপে গেছে কে জানে। টগর গাছের ডালটা বুঝি ভেঙ্গে পড়ে।

হৈ-হৈ করে হরিহরবাবু এক পা এগোন, এক পা পেছন। কুকুরের স্বভাব বলা যায় না, যদি দড়ি ছিঁড়ে এসে কামড়ে দেয় খ্যাঁক করে?

হরিহরবাবু এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন একটা কিছু যদি পান হাতে নেবার মত; লাঠিতে কুকুর জব্দ—তেড়ে এলে লাঠি পেটা করবেন। না, কাঠকুটো বা লাঠি-নগুড় ধারে-কাছে কোথাও কিছু নেই। টগর গাছের মরা ডাল একটা ভেঙ্গে নিলে হয়, কিন্তু কুকুরটার কাছে যান কি করে, গলার দড়িটা ছেঁড়ার জন্যে কি টানাটানি করছে। শেষটা ফাঁস না লেগে যায়, জীব-হত্যা না হয়।

হরিহরবাবু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, এই হারামজাদা নিড়া! শুয়ার! কুকুরটাকে এমনি বেঁধে রেখেচিস, ফুলগাছটাকে দিলে শেষ করে! এই, এই—কোথায় রে?

নিড়ার সাড়া পাওয়া গেল না। সে কি আর ধারে-কাছে আছে। নিড়ার বদলে কুকুর ছানাটা আপন বন্ধন-দশা থেকে মুক্তির জন্যে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

নিড়ার খোঁজে হরিহরবাবু ত্রস্তপদে ঘরে এলেন। বার কয়েক ছেলের নাম ধরে ডাকলেন। নেড়ার টিকির ঠিকানা পেলেন না। শোবার ঘরে বসে গর্জাতে লাগলেন! সেই হারামজাদা কুকুর ছানাটাকে ঘরে এনেছে? এত করে বললুম যেখান থেঁকে এনেছিস সেখানে দিয়ে আয়, তা নয় কুকুর-পোষা! আসুক একবার দেখাচ্ছি।

স্বামীর তর্জন-গর্জনে সিন্ধুবাসিনী রান্না ঘর থেকে ছুটে এলেন। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, অত চেঁচাচ্ছ কেন? নেড়াকে কোথায় পাবে এখন, সে তো খেলতে গেছে।

হরিহরবাবু ভেঁংচে উঠলেন, খেলতে গেছে। আসুক খেলা দেখাচ্ছি।

সিন্ধুবাসিনী অতর্কিত কণ্ঠে বললেন, কেন কি হয়েছে? এই তো ছিল—সঙ্গে সঙ্গে বাইরে টগর গাছের ডালে বাঁধা কুকুর ছানাটা যেন কেঁদে উঠল—উ-উ-কেঁউ্-উ্-উ্!

হরিহরবাবু কটমট করে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন, যেন এরপর আর তাঁকে বলতে হবে না নেড়ার প্রয়োজনটা কি, কেন তিনি গুণধর পুত্রকে খুঁজছেন।

কুকুর ছানার ডাক শুনে সিন্ধুবাসিনী অপ্রস্তুত হলেন, অপরাধ স্বীকারের মত বললেন, আমিও বলেছিলুম কুকুরটাকে যেখান থেকে এনেছে রেখে আসতে!

হরিহরবাবু বললেন, তা হ'লে? বাড়ীতে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, আসুক, এখুনি বিদেয় করছি!

হরিহরবাবু আদেশ জারী করলেন, হ্যাঁ এখুনি, এই মুহূর্তে! যত সব নোংরামি! কোথাকার রাস্তার কুকুর ঘরে এনে আদিখ্যেতা! তারপর হাগুক, মুতুক তোমরা মুক্ত কর!

সিন্ধুবাসিনী দোর গোড়া থেকে সরে গেলেন। বোধ হয় ছেলে খেলাধুলা করে ফিরছে কিনা এগিয়ে দেখতে গেলেন। কুকুর ছানাটাকে নিয়ে তাঁরও জ্বালা মন্দ নয়। স্বামীকে তিনি চেনেন, তাঁর মনঃপূত নয় ছেলেমেয়ের এমন কোন শখ তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না।

ছেলেকে সিন্ধুবাসিনী কত বলেছেন, ওরে কুকুরটাকে আর কোথায় রেখে আয়, নয় তো কাউকে বিলিয়ে দে, তোর বাবা যখন একবার বলেছেন তখন আর রক্ষে নেই—তোর কপালে দুঃখু আছে, পিঠের ছাল-চামড়া উঠে যাবে। তোর বাবা আপিস থেকে আসবার আগেই বিদেয় কর জিনিসটা।

ছেলেটা কিছুতে কথা শুনবে না, বলে বলে সিন্ধুবাসিনী হেরে গেছেন, যত উদ্ভট শখ ছেলের! মনে নেই সেবারে পায়রা পোষা নিয়ে কি কাণ্ড হ'ল, বাড়ীতে মার-ধোর রাগ কিছুই বাকি ছিল না! তারপর পায়রাগুলো যখন গেল তিনি স্বস্তি পেলেন! হরিহর এসব ব্যাপারে বড় কড়া, তাঁর মত হ'ল ছেলেদের কোন বিষয়ে আশকারা দিতে নেই, লেখাপড়া ছাড়া কোন ব্যাপারে উৎসাহ দিতে নেই—ছেলে মানুষ করা সহজ নয়!

কিন্তু নেড়াকে বুঝিয়ে সিন্ধুবাসিনী পারেন নি। সিন্ধুবাসিনী নেড়া, নেড়া! বলে বার কয়েক ঘর-বার করে ডাকলেন। একবার ছেলেদের পড়বার ঘরে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনের রাস্তায় দৃষ্টি দিলেন। সেই কখন খেলতে গেছে এখনো ফেরবার নাম

বড় অবাধ্য হয়ে উঠেছে, বাপ-মা গুরুজন কারো কথা আর গ্রাহ্য করছে না। সিন্ধুবাসিনী যা ভয় করেছিলেন তাই কর্তা এসে সেই কুকুর ছানাটাকে নিয়ে পড়েছেন! আজ কপালে অনেক দুঃখ আছে। মার-ধোর খেয়ে মরবে! না, তিনি আর কিছু করতে পারবেন না. মরে মরুক যেমন বেয়াড়া ছেলে!

আর যত বিদঘুটে শখ ছেলের—কুকুর-বেড়াল, পাখী-খরগোশ পুষবে! কোথা থেকে যে নিয়ে আসে! কে দেয় ওকে? কেন দেয়? ছেলের চেয়ে যারা নেড়াকে এই সব শখের জীব যোগায় তাদের ওপর সিন্ধুবাসিনীর রাগ বেশি. একবার যদি জানতে পারেন আচ্ছা করে শুনিয়ে দেন, কেন তারা জেনেশুনে এইসব হতচ্ছাড়া জিনিস তাকে দেয়! আর লোক পায় না—

হ্যাঁ, পরশু দিনই তো, সন্ধ্যেবেলায় কুকুর ছানাটাকে কোলে করে নিয়ে চুপিচুপি ঘরে ঢুকলো নেড়া। বেশ নাদুস-নুদুস, হৃষ্টপুষ্ট কুকুর ছানা!

সিন্ধুবাসিনী ঘর-দোরে সন্ধ্যে দেখিয়ে শাঁক বাজিয়ে, প্রদীপটা কুলুঙ্গিতে রাখতে গিয়ে দেখলেন, শোবার ঘরের কোণে কুকুর ছানাটা বুকে চেপে নেড়া দাঁড়িয়ে আছে, যেন সন্ধ্যে রাত্তিরে ঘরে চোর ঢুকেছে।

সিন্ধুবাসিনী যেন চোর দেখে চমকে উঠলেন, দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ওকি অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? আরে হাতে ওটা কি? কুকুর!

নেড়া কুকুর ছানাটাকে যেন বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চাইলে, কিন্তু কুকুর বাচ্চাটা ছট্‌ফট্ করে মুখ বার করে কুঁই কুঁই করে প্রতিবাদ জানালে। তার কোলে থাকার আদৌ ইচ্ছে নেই। নেড়া কুকুর ছানার মুখটা কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করলে।

সিন্ধুবাসিনী কঠিন স্বরে বললেন, সেই আবার ঐসব ঘরে এনে জুটিয়েছ! মনে নেই সেবারের কাণ্ড!

মনে থেকেও যেন মনে থাকে না, পশুপাখীর ছানা দেখলে যেন নেড়ার মন কেমন করে ওঠে, কোলে পিঠে কাঁকে যতক্ষণ না নেয়, ততক্ষণ যেন কোন স্বস্তি পায় না।

তিরস্কারের সুরে সিন্ধুবাসিনী বললেন, ঘরের মধ্যে নেড়ী কুকুর এনেছিস, তোর কি আক্কেল রে! বিদেয় কর এখ্‌খুনি! যা যা, বেরো হতভাগা!

নেড়া অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলে কুকুর ছানাটা নেড়ী কুকুরের বাচ্চা নয়, সে অভিজাত বংশোদ্ভব! পার্কের ঐ ওদিকে যে বড় বাড়ীটা আছে, যার মালিকরা পাড়ার মধ্যে বিশিষ্ট ধনী বলে খ্যাত, তাদের এক ছোকরা চাকরের কাছ থেকে সে অনেক করে যোগাড় করেছে! এটা যে-সে কুকুর নয়!

হোক, তবু কুকুর! কুকুর পোষবার বাড়ী তাদের নয়, যেখানকার কুকুর সেখানেই যেন এখুনি দিয়ে আসে। সিন্ধুবাসিনী সাফ কথা বললেন।

নেড়া অনেক অনুনয়-বিনয় করলে, কুকুর পোষার অনেক সুবিধা দেখালে। তাদের কত বন্ধু এমনি কত না কুকুর পুষছে।

সিন্ধুবাসিনী রাগ করে বললেন, আমি মানি না, তোমার বাবা কি বলেন দেখ!

বাবা কি বলবেন নেড়া জানে, সুতরাং কুকুর ছানাটা বাবার চোখের আড়াল করবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু সেই বাবা জেনে ফেললেন, রেগে বললেন, রাত প্রভাত হলেই যেন কুকুর ছানাটাকে বাড়ীর বাইরে করে দিয়ে আসে! অত আর কুকুর পুষতে হবে না, শুয়ার কোথাকার!

তারপর কান-মোলা, চড়চাপড় যা পাওনা তা নেড়া নিয়ম মত পেয়েছিল। কিন্তু সকাল বেলা বাবা আপিস চলে যেতেই সব ভুলে গেল। সারা সকাল, সারা দুপুর সেই কুকুর নিয়ে পড়ে রইল, নাওয়া-খাওয়াই বুঝি ভুলে গেল।

সিন্ধুবাসিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টগর গাছটার সামনে দাঁড়ালেন—কুকুর ছানাটা তাঁকে দেখে কান্না ভুলে চিৎ হয়ে হাত-পা তুলে কেমন যেন করতে লাগল! কত যেন আশ্বস্ত আর খুশি হয়েছে!

সিন্ধুবাসিনী এসে টগর গাছের ডাল ধরে দড়িটা খুলে দিলেন, তারপর নুয়ে পড়ে কুকুর ছানার গলার দড়ির গেরো আলগা করে দিলেন, ভাবলেন এইবার বুঝি কুকুরটা ছুট দেবে। এতক্ষণ চেঁচাবার কারণটা তো ঘুচে গেছে!

সিন্ধুবাসিনী অপেক্ষা করলেন, কুকুর ছানাটা তেমনি চিৎ হয়ে ধুলোর মধ্যে চার পা তুলে যেন নাচতে শুরু করেছে। ইস্-স্ এই ভর-সন্ধ্যে বেলায় আবার তাঁকে না ছুঁয়ে ফেলে! শুধু কি অস্পৃশ্য, এঁটো-কাঁটার জায়গাটা কি হয়ে আছে। টগর গাছের তলাটা একশা করে রেখেছে।

হুঁ, এতক্ষণে সিন্ধুবাসিনী বুঝতে পেরেছেন, এলুমিনিয়মের বাটিটা কোথায় গেছে—নেড়ার দুধ খাবার বাটিটাই বা কোথায়! ঠিকে ঝিকে এই দুটো জিনিসের খোঁজ করতে বলেছেন। তাই বলি নেড়া নিজের পাতের ভাত মাখিয়ে ঐ বাটিতে রেখে গেছে, আবার বাটিতে করে জলও রেখেছে! আহা কি দায়া ছেলের, এদিকে গলায় দড়ি বেঁধে কুকুর ছানাটাকে ঝুলিয়ে রেখে গেছে! এই না হলে [illegible]

সিন্ধুবাসিনী মুখে শব্দ করে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন। তবু কর্তাকে বলা যাবে, যাক্, আপদ যখন গেছে তখন আর ছেলেটাকে মার-ধোর নাই করলে। আর কখনো এমন কাজ করবে না, এই বারের মত মাপ করে দাও।

কিন্তু সিন্ধুবাসিনী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, হতবুদ্ধি হয়ে কুকুর ছানাটার কাণ্ড দেখলেন —হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কুকুরটা তার শাড়ির প্রান্ত ধরে যেন কোলে উঠতে চাইলে, স্পর্ধা কম নয়! তাই বলে কুকুরকে নাই দিতে নেই! সাধে আর নেড়ার বাবা রাগ করেন, এসব কুকুর বেড়াল নিয়ে আদিখ্যেতা দেখতে পারেন না!

সিন্ধুবাসিনী হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন, হতচ্ছাড়া কুকুর! বের বের দূর হ!

আর ঠিক সেই সময় হাতে একটা বকলোস নিয়ে নেড়া বাড়ী ঢুকলো। সিন্ধুবাসিনী ছেলেকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন, হারামজাদা ছেলে, কুকুর নিয়ে আদিখ্যেতা! দেখ দিকি আমার কাপড়টা ফালা ফালা ক'রে দিয়েছে। এই ভর-সন্ধ্যে বেলায় দিলে সব নষ্ট ক'রে! এখুনি বিদেয় কর, নইলে তোর একদিন কি আমার একদিন!

কুকুর-বাঁধা বকলোস হাতে ক'রে মার কাছে এগিয়ে আসতে কুকুর ছানাটা ছুটে গিয়ে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে তেমনি চিৎ হয়ে চার পা তুলে যেন নৃত্য করতে লাগল। কত যেন পেয়ারের লোক পেয়েছে, কত যেন বন্ধু!

নেড়া কুকুর ছানার মাথায় হাত বুলিয়ে তু-তু করলে, জিম্ জিম্ ব'লে আদর করলে। সিন্ধুবাসিনী মনে মনে হাসলেন, এর মধ্যে আবার নামও রাখা হয়েছে! তাঁর মনে হ'ল থাকলেই বা কুকুর ছানাটা, ক্ষতি কি, ঘরে-দোরে তো উঠবে না; এই গাছতলায় থাকবে আর রাত্তির বেলায় বাড়ী পাহারা দেবে! নেড়ার কুকুর পোষার যুক্তি যেন সিন্ধুবাসিনী মেনে নিলেন। আর ওটা নেড়ী কুকুরের বাচ্চা নাও হতে পারে!

সিন্ধুবাসিনী চেয়ে চেয়ে দেখলেন, নেড়াকে যেন কুকুর বাচ্চাটা কত চেনে! কত প্রভুভক্ত যেন ঐ একরত্তি ছানাটা!

এদিকে সিন্ধুবাসিনীর চোখ দুটো আপ্লুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে যেন ঘটনাটা ঘটে গেল।

নেড়ার গলা পেয়ে হরিহরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে প্যাক্ ক'রে ছেলের পিঠের ওপর সজোরে এক বাড়ি মারলেন। নেড়া উ ব'লে পালাবার চেষ্টা করবার আগেই কুকুর ছানাটা এক দৌড়ে বাড়ীর বাইরে গিয়ে বার কয়েক ডাকল, যেন মারটা সেই খেয়েছে।

হরিহরবাবু আবার ছড়ি তুলতে, সিন্ধুবাসিনী বাধা দিলেন। ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, যা পালা, পালা রে হারামজাদা মার খেয়ে মরবি।

* * *

কুকুর বাচ্চাটার ডাকে হরিহরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। থেকে থেকে কুকুরটা ডাকছে, কান্নার মত!

হরিহরবাবু শোয়ার ঘরের খিল খুলে বাইরে এলেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন, বিগত-যৌবন টগর গাছের তলাটা শূন্য; এলুমিনিয়মের পাত্রে নেড়ার দেওয়া ভাতগুলো এই ভোরে কাকে ঠোক্‌রাচ্ছে, জলের বাটি উল্টে গেছে।

হরিহরবাবু চোখ মুছে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওপরে কুকুর ছানাটা যেন দরজাটা আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে আর কেঁউ কেঁউ করছে!

আচ্ছা জালাতন এই কুকুর নিয়ে! কাল তাড়িয়ে দিলেন, আজ ভোর না হতেই আবার এসেছে! হরিহরবাবু হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরলেন, এবার এমন মার মারবেন আর ডাকতে হবে না, একেবারে শেষ করে দেবেন!

হরিহরবাবু এক হাতে লাঠি ধরে, এক হাতে যেই দরজাটা ফাঁক করলেন কুকুর ছানাটা অমনি পোঁ করে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল, পিছন দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই হরিহর দেখলেন, কুকুরের ডাক শুনে নেড়াও কখন তার পিছন পিছন উঠে এসেছিল, কুকুর ছানাটা তখন তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কুঁই কুঁই করে বিশ্বস্ততা জানাচ্ছে।

হরিহরবাবু কটমট করে দেখলেন। তারপর হাতের লাঠিটা টগর গাছে ঝুলিয়ে রেখে রোয়াকের ওপর উঠে বললেন, যা বকলোস নিয়ে আয়। কুকুরটাকে বাঁধ! খুব হয়েছে!

রসায়ন

শ্রীবাজীরাও সেন

রোজ যদি হাওয়া খাও
ভালো করে চিবিয়ে,
বিট নুন, ধানী ঝাল,
আদা কুচি মিশিয়ে—
মাঝে মাঝে গুঁতো খাও
ষণ্ড কি মহিষের;
আলবৎ সেরে যাবে যত রোগ হৃদয়ের।
শরীরটা ভালো চাও?
দিন খাও নিম্ব;
রোজ ভরে ফুটো করে

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"কিন্তু ও একটা মাছিকেও কখনও আঘাত করেনি।" আমি বলি, "ও আমাদের সঙ্গে থাকায় কী দোষ আমি বুঝতে পারছি না। যেমন ধরুন আমেরিকানরাও ম্যাসকটের মত জানোয়ার পোষে।"

কণ্ঠস্বর একটু বাড়িয়ে এবার উনি প্রতিবাদ করেন, "আমরা ইটালীতে আছি। হয় আপনি কুকুরটিকে সরাবার ব্যবস্থা করুন, নচেৎ আমাকে কুকুর-ধরাদের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কাজটি আমি মোটেও খুশি মনে করব না।"

"সে বিষয় আমার সন্দেহ আছে।" উত্তর দিয়ে উঠে পড়ি।

"ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ করব।" শেষের কথাটি রীতিমত রাগতঃ এবং ব্যঙ্গস্বরে বলি। ইচ্ছে ছিল বেশ আরো খানিকটা খুলে ওঁকে জানিয়ে দিই আমার মনোভাব, কিন্তু নিজেকে দমন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বুদ্ধির কাজই করেছিলাম। নিজের আপিসে ফিরে এসে একটা সিগারেট জ্বালালাম। একমুখ তিক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলাম। নিজের কোণটিতে ল্যাম্পো তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে জানেও না তার কী ঘটতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তা'হলে আমাকেই ভেবে ঠিক করতে হবে, কী করে ওকে তাড়ানো যায়? সেইটাই ভাববার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন্ পন্থা, কেমন করে? এখানে যে কেউ আছে

প্রত্যেকেই ল্যাম্পোর পক্ষে বিপজ্জক ও অনিশ্চিত। তাই এ দুরূহ দায়িত্ব আমার ওপরে। আমি ওকে বড়ই ভালবেসেছিলাম। তাকে চিরতরে আমাদের এখান থেকে নির্বাসন আমাকেই দিতে হবে, ভাবতে ব্যথা পাচ্ছি।

এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল—যদি আমি ওকে আমার কাছে, আমার বাড়ীতে এনে রাখি। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। যদিও ও আমাদের সকলেরই খুব অনুগত, কিন্তু রাখব কী করে? দিনরাত বাগানে বেঁধে? ও যে জন্মেছে বাঁধনহীন কুকুর হয়ে। কী করে ওর বেড়ানোর নেশা, বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয় ষ্টেশান থেকে সামলে সরিয়ে রাখব?

আমি এ দায়িত্ব আমার ওপর থেকে সরাতে চাইছিলাম। তাই ষ্টেশানের অন্য কর্মীদের ডেকে তাদের মতামত চাইলাম। অতঃপর আমরা ঠিক করলাম ও যেভাবে আমাদের কাছে এসেছিল, সেইভাবেই ওকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেব।

এমন একটা ট্রেনে ওকে আমরা বসিয়ে দেব যেটার গন্তব্যস্থল দক্ষিণে—বহু দূরে। ষ্টেশনে একসারি খালি ট্রাক ও ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। ওগুলো পথে কোথাও না থেমে দক্ষিণের দিকে যাবে। ব্রেকম্যান আমাদের কথা দিল যে, সে ওকে দূরে এমন এক খোলা মাঠে ছেড়ে দেবে যার আশেপাশে কোন রেল ষ্টেশন নেই।

ল্যাম্পোকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম। ট্রাকের ওপরে বসে ল্যাম্পো অত্যন্ত দুঃখিত এবং অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। একে তো ও মালগাড়ী কখনও পছন্দ করত না, তাছাড়া বোধহয় ভেতর থেকে কেমন বুঝতে পেরেছিলো যে একটা খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এঞ্জিন যেই বাঁশী বাজালো আমরা ট্রাকের দরজা বন্ধ করে দিলাম। ট্রেন চলতে শুরু করল। আমরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে চলতে লাগলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না গাড়ীটা একটা কালো বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল দূরে।

আকাশটা ধূসর হয়ে উঠেছে। সীমাহীন জলের ঢেউ যেন আক্রোশ ভরে ছুটে চলেছে দিগন্তের পানে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠল সঙ্গে বজ্রপাত ও ধূসর আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের ঝলক। যেন শয়তানের সংগীতের আসর বসেছে—

সেদিনকার পরিবেশে এই অশুভ ঝড়টি মোটেও বাঞ্ছনীয় ছিল না। আমরা আরও চিন্তিত হয়ে পড়লাম ঝড় দেখে। অনুতাপ হ'ল যে ল্যাম্পোকে আমরা খোলা ট্রাকে বসিয়ে দিয়েছি। প্রকৃতির তাণ্ডবের মুক্ত অঙ্গনের নীচে সে একেবারে আচ্ছাদনহীন। কিন্তু কী করি? এছাড়া আন উপায় ছিল না। কোন ঢাকা ভ্যানে ওকে দিলে হয়ত ওরা ওর কথা ভুলেই যেত।

নামাতে ভুলে যায়, গাড়ী গন্তব্য স্থলে পৌঁছলে ও নিজেই যা' হোক করে নেমে পড়তে পারবে।

ঝড় প্রশমিত হবার কোন লক্ষণ নেই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছিল।

ক্যাম্পিগ্‌লিয়া ষ্টেশনের বিজলীর তার ঝড়ে খারাপ হয়ে গেল। অতএব পুরোনো কেরসিনের বাতিগুলি ধুলো ঝেড়ে কাজ চালাবার জন্য জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। আপিস-ঘর আলোকিত হ'ল বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা অশুভর ইঙ্গিত সে আলোকে।

সেদিন যতক্ষণ ডিউটিতে ছিলাম, মেজাজটা খুব বিগড়ে ছিল। চেষ্টা করেছিলাম চীফ অফিসার এড়িয়ে থাকবার। আর উনিও আমাকে এড়িয়ে চলছিলেন।

মাত্র দু'দিন পরেই ল্যাম্পোর অনুপস্থিতি বড় বেশী অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন কত বছর হ'ল ও চলে গেছে। এমন সময় একদিন দক্ষিণ দিক থেকে আগত একটা গাড়ী থেকে একজন ব্রেকম্যান নেমে এল ষ্টেশনে। এই লোকটাই ল্যাম্পোকে তার জিম্মেদারীতে নিয়েছিল। আমরা ছুটে ওর দিকে গেলাম।

হাতের কালো থলেটা মাটিতে রেখে সে বল্লে, "বেজায় ঝড় এসে আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে।" ও বুঝল যে আমরা ওর কাছে ল্যাম্পোর খবর চাই। বল্লে, "এ্যানজিও আর নেট্টুনো ষ্টেশনের মাঝামাঝি আমাদের গাড়ী থামাতে হয়েছিল। কারণ ঝড়ে ওখানকার ব্রিজটা ভেঙ্গে গিয়েছে। সেই ফাঁকে কুকুরটা গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রথমে জমির ওপরে খানিকটা গড়াগড়ি খেয়ে, খোলা মাঠের দিকে পালিয়ে যায়।"...

আমরা আপিসে ফিরে এলাম। আমি বল্লাম, "তার মানে, শ' দুই মাইলের রাস্তা মাত্র। বেশী দেরি নেই। দেখ, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হবে।

আমার আন্দাজ মিথ্যে নয়, হলও তাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোম এক্সপ্রেস এলে দেখা গেল, তা থেকে নেমে লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন শ্রীমান্ ল্যাম্পো।

সন্ধ্যে ৮টায় নেপল্‌স্ গামী একটা এক্সপ্রেসে আমরা ল্যাম্পোকে আবার ভরে দিলাম। এবারে আমরা বেশ আটঘাট এঁটেই পাঠালাম। ল্যাগেজ-ভ্যানের কুকুরের খাঁচায় ওকে ভরে দিলাম। গার্ড আমাদের আশ্বাস দিল যে, নেপল্‌সে নেমে তারা দূর-যাত্রার কোন এক্সপ্রেস গাড়ীর গার্ডের কাছে ওকে সঁপে দেবে, সে ওকে আরও দূরে কোথাও নিয়ে যাবে।

(ক্রমশঃ)

জঙ্গলের বিভীষিকা

শ্রীঋতীন্দ্রকুমার সরস্বতী

"আমি তখন কাজ করি জলপাইগুড়ি ষ্টেটে, বন-বিভাগে। বাইরের লোক এসে যাতে বনের মধ্যে ঢুকে বন্য পশু মারতে না পারে, সেই দেখাই হচ্ছে আমার কাজ। আমি যে কোয়ার্টারে থাকতাম, সেই কোয়ার্টারে আরও দু'জন বন-বিভাগের কর্মচারী থাকতেন। একই সঙ্গে থাকতে থাকতে আমাদের তিনজনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আমার বন্ধুদের নাম ছিল যথাক্রমে বিপিনবাবু ও শশীবাবু। আমাদের আর একজন বন্ধু জ্যোতিষবাবুর কাছ থেকে একদিন রাত্রিবেলায় খাওয়ার নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। আমাদের কোয়ার্টার থেকে জ্যোতিষবাবুর কোয়ার্টার যেতে হলে বনের মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকতে হয়। জ্যোতিষবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে অনেক কিছু খাব বলে সেদিন দুপুরবেলা বিশেষ কিছুই খেলাম না। সন্ধ্যা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা জীপ গাড়ি আর একজন গাইড নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে বিশেষ কিছুই অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। গাইডের সঙ্গে শুধু একটা বন্দুক আর আমার সঙ্গে ছিল একটা গুপ্তি। গাড়ি কিছুক্ষণ বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর শশীবাবু বললেন, "কি লজ্ঝড়-মার্কা গাড়িরে বাবা, শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছুলে হয়!"

বিপিনবাবু বললেন, "বুঝলেন শশীবাবু, মরা হাতীর দাম লাখটাকা!" আমিও তার কথায় সায় দিয়ে হাসতে লাগলাম। কিন্তু শশীবাবুর কথাই যে শেষ পর্যন্ত ঠিক হবে তা তখন কে জানত! বনের মধ্যে মাঝে মাঝে কতকগুলো হরিণ চোখে পড়তে লাগল। তাদের চোখে আলো পড়তেই তাদের নীল চোখগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল। চারিদিকে গাছ আর পাথর ছাড়িয়ে রয়েছে। যারা কখনো জঙ্গলে যায়নি তারা কখনো এই অপূর্ব দৃশ্য কল্পনা করতে পারবে না। আস্তে আস্তে অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগল। কিছুক্ষণ

পড়ল। ড্রাইভার অনেক চেষ্টা করেও ইঞ্জিন চালু করতে পারল না। তখন আমরা সাবধানে টর্চ জ্বেলে ধরলাম। ড্রাইভার গাড়ির তলায় কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে কোথায় কি খারাপ হয়েছে তাই দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা তাকে পাহারা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভার বেরিয়ে এসে বলল, "গাড়ির কিছুই খারাপ হয়নি।" আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম, গাড়ির কোথাও কিছু খারাপ হয়নি—অথচ গাড়ি চলছে না, একি অদ্ভুত ব্যাপার!

এই গভীর বনের মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া যে কি ভয়ঙ্কর বিপদের ব্যাপার তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। চারিদিকে একটা মাকড়সার জালের মতো কালো অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে। আশপাশের গাছের পাতাগুলো থেকে থেকে সর্‌সর্‌ করে কেঁপে উঠছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম অন্ধকারের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ছমছমে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে দু'একটা প্যাঁচার কর্কশ চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলের কান্না শোনা গেল। আমরা সবাই ভয়ে চমকে উঠলাম। গাইড বললে, "ওটা শকুনের কান্না।" কতক্ষণ আর এইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, বিশেষতঃ রাত্তির ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—বাঘ-ভালুকের হামলা এ অবস্থায় মোটেই আশ্চর্যজনক নয়! জঙ্গলের মাঝে মাঝে এক-একটা শালকাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী উঁচু মাচা থাকে, সেইরকমের একটা মাচা আমাদের কাছাকাছি ছিল। গাইড বললে, "আসুন বাবুরা, আমরা ঐ মাচার উপরে উঠে রাতটা কাটিয়ে দিই।" এইসব মাচার সঙ্গে একটা করে মই লাগানো থাকত। আমরা সেই মই বেয়ে মাচার উপর উঠে, মইটা টেনে উঠিয়ে নিলাম; কেননা রাত্রিতে যদি কোন হিংস্র জন্তু মই বেয়ে উঠে আমাদের উপর হামলা করে। আমরা এক-একটা পাথরের মূর্তির মতন সেই মাচার উপরে বসে ভয়ে জড়সড় হয়ে চারিদিকে ধীরে ধীরে দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দূর থেকে দু'একটা হিংস্র জন্তুর ডাক শোনা যেতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ যাবার পর হঠাৎ একটা অঁা...অঁা...অঁা শব্দ শোনা গেল, আর সেই সঙ্গে দূরের একটা ঝোপ মড়মড় শব্দ করে ভেঙে, একটা ভীষণ-দর্শন পাগলা হাতী ছুটে বেরিয়ে এল। তারপর হাতিটা তার শুঁড় উপরে তুলে ধরে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে গন্ধ শুঁকতে লাগল মাচার নীচে দাঁড়িয়ে, আর আমাদের দিকে মাথা তুলে দেখতে লাগল। আমরা তখন উপরে বসে ভয়ে কাঁপছি। এরপর পাগলা হাতিটা সেই শালকাঠের গুঁড়িগুলোতে একবার ধাক্কা দেয় আর একবার শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। এই সময় আমরা উপরে বসে ভাবতে লাগলাম যে, এখন যদি আমরা ভেঙে পড়ি তাহলে এই নিথর কালো অন্ধকার রাত্রিরের এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যাবে! আরও

কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর হাতিটা আস্তে আস্তে চলে গেল। আমরা উপরে বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা ভোরের আভাস পাওয়া যেতে লাগল, আরও কিছুক্ষণ পর পাখীদের মিষ্টি ডাক শুনতে পাওয়া গেল, গাছের পাতাগুলো আবার যেন সজীব হয়ে উঠল। আমরা তখন মাচার থেকে নেমে পড়লাম।

তারপর আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলাম, আর ড্রাইভার পরিষ্কার দিনের আলোয় গাড়ির কোথায় খারাপ হয়েছে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "কোথাও কিছু খারাপ হয়নি।" শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু আরও বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, যখন ড্রাইভারের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবু গাড়ী চলছে!"

আমরা আরও অবাক হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, এ কিরকম অদ্ভুত গাড়ি যে রাত্রিতে চলে না—অথচ সকালে চলে! এই আমার জীবনের সেই অদ্ভুত বা অলৌকিক ঘটনা।"

এই অবধি বলে দাদাই চুপ করলেন। আর আমরা ঘাটশীলার রাত্রিতে আমাদের বাসার বারান্দায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকলাম কয়েকটি প্রাণী, যারা এতক্ষণ দাদাই-এর জীবনের সত্য ঘটনাটা উপভোগ করছিলাম।

নববর্ষের স্বাদ

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

নববর্ষের সুখহর্ষের যে মাধুরিমা
প্রীতির অর্ঘ্যে স্মৃতির স্বর্গে তাহারি সীমা।
মনের গহনে আর বাতায়নে কে দেয় উঁকি?
নববর্ষের স্পর্শে ধন্য সূর্যমুখী।
সাজালো কে আজ ধরণীপ্রান্ত বাজায়ে তূর্য?
নববর্ষের নবপ্রভাতের নবীন সূর্য।
চোখে লাগে ঘোর কোন্ মন্তর জাগালো ছন্দ?
বন্ধনহীন স্পন্দিত দিনে নব-আনন্দ।
নববর্ষের নবীন প্রভাতে কী কোলাহল
জলাশয় জলাধারে ফোটাল রবি কে নীলোৎপল।

প্রেতাত্মার চোখ

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

ইংরেজের রাজত্বে যাই থাক্ ইদানীং পাটকলে খাটুনি খুব, যাকে বলে হাড়ভাঙা খাটুনি।... তবেই পয়সা।

নরেশ মণ্ডল পাটকলে চাকরি করে। বাবু-র কাজ। 'বাবু' মানে হলো কেরানী। নরেশ মণ্ডলের পরিশ্রম যেমন অধিক, তার ঘুমের পরিমাণও তেমন হওয়া উচিত। কিন্তু ঘুম বল্‌তে তার কিছু নেই, নরেশ মণ্ডলের ঘুম হরণ করেছে একটা হুলো বেড়াল।...সেই গল্পই বলছি।

গাধার খাটুনি খেটে এসে নরেশ মণ্ডল বিছানায় শরীরটাকে ভাসিয়ে দিতে চায় এবং তার চোখ দুটিতে ঘুমের ছোঁওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। হয়ত ঘুম আস্‌বো-আসবো করছে অথবা একদম কাছে এসেই পড়েছে, এমন সময় হুলো বেড়ালটা চিৎকার করে ওঠে—চিৎকারটা চলতে থাকে এক নাগাড়ে। বিরামহীন বিশ্রামহীন। সেই হুলোর ডাক যেমন বিকট, তেমনি বিরক্তিকর। তাতে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম হেঁচ্‌কি তুলে পালাবে।

নরেশ দু-চার বার হ্যাঃ হ্যাঃ হুশ্‌ হুশ্‌ করে মুখে কৃত্রিম শব্দ তুলে হুলোটাকে ভয় দেখিয়ে খেদিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু নরেশ যা চায় হুলো তাতে নারাজ। হুলোটা ভীষণ বিচ্ছিরি ভাবে ডেকেই চল্‌ল।

শরীর ক্লান্ত হলে মনটাও বিগড়ে থাকে। নরেশ তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠল। তাকাল ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বাইরে, যদি বদ জানোয়ারটাকে দেখতে পাওয়া যায়; দেখতেও পেল জানালাটার বাইরে। তখন অবশ্য সব দিকটাই অন্ধকার। চাঁদ ওঠেনি এবং গ্রাম বলে বিজলী বাতিরও রোশনাই নেই।

আন্দাজে মনে হলো হুলোটা নিকষ কালো। খুব মোটাসোটা শরীরটা তার, তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দুটো কি ধক্‌ধক্ করে জলছে। ও দুটো হলো হুলোটারই চোখ-দুটো। নরেশের কিছু দূরে সেই জীবটা এবং তার তীক্ষ্ণ নজর নরেশের পানেই। যেই দেখুক, হাচমকা নজর পড়লে আঁতকে ওঠারই কথা।

নরেশ তৎক্ষণাৎ মনটা শান্ত করে, মুখে আওয়াজ তুলে, হাতে পট্‌পট্ শব্দে তালি দিল। কিন্তু হুলো তবু গ্রাহ্য করল না। বরং যেন ব্যঙ্গ করল—"ম্যাঁও"। একটু থেমে দ্বিতীয় বার আবার—"ম্যাও"।

নরেশ বিদ্যুৎগতিতে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। হাতের কাছে ছিল একটা অত্যন্ত মজবুত [illegible]রী খেটে লাঠি। তুলে নিল সেটা। সমস্ত শক্তি উজাড় করে ছুঁড়ল বেড়ালটাকে লক্ষ্য করে।

নরেশের লক্ষ্য ব্যর্থ হবার নয় এবং লাঠিটার যা গতি ও শক্তি তা'তে একটা হুলো কেন, একটা বাঘ-ই ঘায়েল হবার কথা, কিন্তু কিমাশ্চর্যম—সেই শব্দ উঠল "ম্যাও"। অথচ এ কোন অন্তিম আর্তনাদ অথবা কাতর-ধ্বনি নয়। সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ-ধ্বনি নরেশ শুনল দ্বিতীয় বার। এবার গোটাকতক জলন্ত উনুন ঢুকল যেন নরেশ মণ্ডলের মাথায়।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার—মুখের সামনে দুটো আগুনের টুকরো দপ্‌দপ্‌ করছে। হঠাৎ নরেশের ক্রোধ নেমে এল অনেক নীচে এবং সে ভাবতে লাগল, তবে কি কোন ভূতের পাল্লায় পড়লাম! ওটা কি সত্যই হুলো, না ভূত-প্রেত-দত্যি-দানা যাহোক একটা কিছু হবে। ওটা তো মরল-ই না, বরং এখনও পর্যন্ত জলজ্যান্ত ঠায় দাঁড়িয়ে! সজাগ চোখ, বিকৃত কর্কশ আওয়াজ-এর আস্ফালন।

ঘামতে শুরু করল নরেশ, আস্তে আস্তে মনের জোর হ্রাস পেতে লাগল তার।

নরেশ ছুটে পালিয়ে এল ঘরে—ঘরে ঢুকেই খিল তুলে দিল। আর যে জানালাটার ফাঁক দিয়ে হুলোটা দেখছিল—সেই জানালাটাও তাড়াতাড়ি দিল বন্ধ করে।

"ম্যাও"—এ কি!...আবার সেই উত্যক্ত করা শব্দ!

নরেশ নিজের চোখেই দেখল—জলন্ত কয়লার টুকটো দু'টো এবার বাইরে নয়, তার ঘরেই ঢুকে পড়েছে। আর যে জানালাটা সে বন্ধ করেছিল, সেই জানালাটার গায়ের ওপরই যেন ও দুটো লটকানো।

নরেশের গোঙানি উঠল। হাতে-পায়ে খিল ধরতে শুরু করেছে। বুঝল, ভাববার পালা শেষ, এবার জ্ঞান হারাবার সময় হয়েছে।

এমন সময় নরেশ মণ্ডল একটা অপরিচিতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কানের কাছে বলছে—আমি তোদের কাছে-কাছেই থাকতে চাই; কারো মায়া এখনও ছাড়তে পারছি না যে!...

ভোর বেলা আর চাকরিতে যাওয়া হ'ল না নরেশ মণ্ডলের। সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল এবং যখন নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব অনুভব করে তখন যথেষ্ট বেলা—রোদ উঠে গেছে অনেক ওপরে।

নরেশ অপরিচিত কণ্ঠস্বরটা দুঃস্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিল, কিন্তু বেয়াদব বেড়ালটার কথা মনে পড়তেই হয়তো সে জন্যই তার বুড়ী মা-কে তার জ্যাঠামশাইয়ের কথা জিগেস করল।

নরেশ এবার একটু আশ্চর্য হলো। মা'র মুখে শুনল তার জ্যাঠামশাইয়ের অপমৃত্যু হয়েছিলো। তিনি একটা মাদার ফলের গাছ থেকে পড়ে মারা যান। এখনও সেই মাদার

'নরেশের চোখ পড়ল মাদার গাছটার তলায়।'

একটা মস্ত দুর্ঘটনার কারণ যে গাছটা, তাকে এতদিন কেন সমূলে উৎপাটিত করা হয়নি ভাবছিল নরেশ, ঠিক এই সময় আবার শব্দ উঠ্‌ল—"ম্যাও!"

আবার নরেশের চোখে পড়ল মাদার গাছটার তলায়। তখন পুরো দুপুর; সূর্য মাথায় মাথায়। এক চুল পূবে অথবা পশ্চিমে হেলে নেই। দেখল বিভীষিকার মতো কালকের সেই কালো বেড়লটা। যেটা তাকে অত্যন্ত ভয় দেখিয়েছে, জ্বালিয়েছে। আর সম্ভবতঃ ওটাই 'জ্যাঠামশাই' বলে শ্রদ্ধাভক্তি পেতে চেয়েছে।

কোথা থেকে প্রচণ্ড রাগ এল নরেশের মাথায়। বললে, মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়ান জ্যাঠামশাই। পায়ের কাছেই পড়েছিল কয়লা-ভাঙা বেশ বড়সড় একটা লোহার গুলো। হুলোটাকে তাক করে ছুঁড়ল সেটা।

হুলোটাকে এক রত্তিও কাতরাতে হলো না, নেতিয়ে পড়ল একেবারে ধুলো আর ঘাসের ওপর।

ভর-দুপুরে অবাক কাণ্ড। নরেশ ছুটে গেল; অন্যান্যরাও এল। সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকায় যখন কারো ছায়াই দীর্ঘ ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না, ঠিক সেই সময় বেড়ালটার একটা বড় মাপের ছায়া পড়েছে একেবারে তার পাশেই, যেমন সাধারণতঃ দূর থেকে গায়ে আলো পড়লে প্রতিবিম্ব পড়ে। বেড়ালটার মাথায় মস্তবড় একটা ক্ষতচিহ্ন, মনে হলো সম্প্রতি কেউ তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ নরেশ 'জ্যাঠামশাই' বলে সেখানে ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও হারাল।

ধীরে ধীরে যখন তার চেতনা ফিরে আসতে লাগল, সবাই দেখল, বেড়ালের ছায়াটাও অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। আর অন্যান্যদের ছায়াতে দীর্ঘতা দেখা দিয়েছে তখন।

নরেশ চোখ চাইল। তার বুড়ী মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বললেন, কি অলুক্ষণে কাণ্ড! ওখানেই ওর জ্যাঠামশাই বেঘোরে প্রাণটা দিয়েছিল!

বাপকো বেটা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

আমার ভাগনে টিকলু মোটেই মাতুলক্রম হয়নি। বরং পিতৃতুল্যই হয়েছে বলা যায়…।

মামার মতন হয়নি বলছি এই কারণেই।…

যার মামা নাকি পুলিসের নাম শুনলে আঁৎকে ওঠে, ঘরের ভেতরে দোর বন্ধ করে ডরে কাঁপতে থাকে আর দেখলে পরে সভয়ে সাত হাত পিছিয়ে যায়, পুলিসের থেকে সব সময় যে পাঁচ মাইল তফাত, সে কিনা গায় পড়ে পুলিসের সঙ্গে ভাব জমায়! ভাব কিংবা অভাব যাই হোক না, তাই জমাতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে · হাতে-নাতে তাকে ধরে থানায় নিয়ে যায়?

পুলিসের গায়-পড়া আর পুলিসকে গায়ে পড়তে দেওয়া একই কথা! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আবার বাঘকে ছুঁলেও, ছুঁতে গেলেও সেই একই দশা।--কিন্তু বলে কে!

বলল জবাই।

তাদের বাড়ি যেতেই আমার বোন কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে যে, 'টিকলুকে আজ সকালে থানার দারোগা পাকড়ে নিয়ে গেছে।'

'কারণ?'

কারণ সে জানে না, তবে যদ্দূর জানা গেল তার বন্ধুদের নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল, পরীক্ষা-টরিক্ষা সব চুকে-টুকে গেছে তো ওদের—এমন সময়ে কী করেছিল কে জানে, পুলিসের খপ্পরে পড়েছে।

'বোমবাজি করছিল বোধ হয়? তোদের এই যাদবপুর এলাকায় দিনরাতই তো বোমা পটকার মহড়া চলে বলে শুনেছি।' আমি বললাম।

'পটকা বাজি কি ছুঁচো বাজি তা আমি জানিনে, ওদের বন্ধুদের সবাইকে একসঙ্গে ধরেছে।'

'আমার উপযুক্ত ভাগনে হলে ডিগবাজি খেয়ে পালিয়ে আসতে পারত।' আমি বলি—'থাকগে, অশোক কোথায়? খবর দেওয়া হয়েছে তাকে?'

'উনি তো খেয়ে-দেয়ে আপিস চলে গেছেন, তারপরেই এই কাণ্ড! আসবেন সেই সন্ধ্যের পর। কে খবর দিতে যাবে এখন?'

'আমি তো তার আপিসও জানি না। কোন ঠিকানায় কোথায় কী ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে কে জানে! কী হবে তাহলে?'

'ওঁর আপিসে যেতে হবে না তোমায়। তুমি সোজা থানাতেই যাও বরং, গিয়ে জামিন মুচলেখা জরিমানা যা হয় দিয়ে টিকলুকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো গে।'

যেতেই হোলো থানায়। আমার কষ্টিবিরুদ্ধ কাজ—কিন্তু কী করব?

প্রাণে যতই ভয় থাক্, ছাড়াতে গিয়ে নিজেই না ধরা পড়ে যাই, আমাকেই না পাকড়ে রাখে ধরে—যতই বুক কাঁপুক, এগুলাম টুকটুক করে। বাড়িতে বোনের বিষণ্ণ বদন দেখার চেয়ে দারোগার গম্ভীর গোঁফ আর কড়া মেজাজ বরদাস্ত করা ঢের সোজা আর সহনীয়।

যাবার পথে খবর নিতে যাই। দারোগা লোকটা কেমন, কী ধরনের মেজাজ, কেমন ধারা মর্জি—লোকের সঙ্গে ব্যাভার-স্যাভার কি রকমের—সেসব জানবার চেষ্টা করি।

'আপনি এই ধুতি-পাঞ্জবী পরে যাচ্ছেন তো? তাহলে কিচ্ছু বলবে না আপনাকে।' বলল একজন।

শুনে সাহস হ'ল। কৌতূহলও হ'ল একটু—কেন, কী পরে গেলে বলত? বলতই বা কী?

'চোস্ত প্যাণ্ট পরে গেলে আর রক্ষা ছিল না আপনার। একেলে ফ্যাশানের পোষাক-আশাক তাঁর দু'চক্ষের বিষ।' জানলো আরেক জন।

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে। রোজই তিনি ঐ চোঙা প্যাণ্ট-পরা ছোকরাদের পাকড়ে নিয়ে যাচ্ছেন রাস্তার থেকে, আজকেও নিয়ে গেছেন গাদা খানেক!'…

'কেন, তাদের অপরাধ?'

'রাস্তায় বেরিয়ে বেল্লিকপনা করা। চোঙা-প্যাণ্ট পরাটাই তাঁর মতে হচ্ছে বেল্লিকপনা।'

'তা, দারোগা চোঙা-প্যাণ্ট পরাদেরই ধরছে তবে কেবল?' আমি জানতে চাই, 'হাফ-প্যাণ্ট পরাদের তো ধরচে না?'

'তাদের ধরবে কেন? তারা তো বাচ্চা ছেলে। তারা হয়ত একটু দুষ্টুমি করে—তাদের তো বেল্লিকপনা করার বয়স হয়নি এখনো। দুষ্টুমির জন্মে কি ধরে নাকি পুলিস?'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো আমার—টিকলু তো বাচ্চা ছেলেই বলা যায়। হাফ-প্যাণ্ট পরাই রীতিমতন, তবে তাকে পাকড়ায় নি নিশ্চয়ই!

তবু যাহা রটে তাহা সত্যই বটে কিনা জানার জন্যেও থানায় গিয়ে যাচাই করে দেখতে হোলো একবার।

হাফ-প্যাণ্টই পরে বটে টিকলু। কিন্তু এই তের বছর বয়সেই হাফ-প্যাণ্টে তার দারুণ অনীহা। আমি জানি।

এই তো সেদিন তার জন্মতিথিতে আমি পেড়েছিলুম—চ টিকলু, আমার সঙ্গে চল। আমাদের পাড়ার এক নামকরা দোকানে, বড়ুয়া টেলারিং-এ তোর নতুন হাফ-প্যাণ্ট বানাবার অর্ডার দিয়ে আসি গে। মাপ দিবি চল্।

'তুমি আমায় মাপ করো মামা! তোমার বড়য়াকে আর আমায় মাপতে হবে না।' সে বলেছে।

'কেন রে? হাফ-প্যান্ট কি তোর এনতার নাকি? চাইনে আর একদম?'

কথাটা শুনেই সে নাক-সিঁটকেছে—'হাফ-প্যান্ট কেন মামা? হাফ-প্যান্ট কি পরে নাকি কেউ!'

'কেন পরে তো আছিস দিব্যি। বেশ দেখাচ্ছে তো। যাদের রোগা রোগা পা, তাই ঢাকবার জন্যে সেইসব ছেলেরা ছোটবেলাতেই লং প্যান্ট পরে নিজেদের ঢেকেঢুকে রাখে—তোর তো আর তা নয় রে! হাফ-প্যান্ট তোকে খাসা মানায়।'

'চাষারা পরে!' আমার কথার ওপর টেক্কা দিতে চায় সে—আমার কথায় টেক্কা দিয়ে।—'যদি তুমি দিতেই চাও তো আমায় লং প্যান্ট বানিয়ে দাও।'

লং প্যান্ট পরার বয়স হয়নি তোর এখনো। কলেজে উঠে পরিস্। এই তো সবে তের পেরিয়েছিস।'...

'সবে তের! ত্যাখ তো মাথায় লম্বা হয়েছি কতো! বাবার মতন লম্বা হয়েছি আমি, ছাড়িয়ে গেছি তোমাকে, দেখছ না?'

'দেখছি বটে! ঢ্যাঙা হয়েছিস বেশ। আমার কথায় জবা তোকে কচিবেলার থেকে ভিটামিন এ-ডি খাইয়েছিল তাই এমনটা! কিন্তু ঢ্যাঙালে তো আর বয়স বাড়ে না বৎস! তের তেরই থেকে যায়, সতের হয় না কখনো!'

'তেরই হই আর সতেরই, আমি এখন টীন্‌এজার একজন! রীতিমতন ক্যান্‌টিনে খাই। আমাদের কলেজ ক্যান্‌টিনে।'

'তোর কলেজ! তার মানে?' অবাক হতে হ'ল আমায়।

'আমাদের ইস্কুলের সঙ্গে অ্যাটাচড কলেজ আছে না? কিংবা আমাদের কলেজের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড আমাদের ইস্কুল—তাও বলতে পারো। তার ক্যান্‌টিন আছে না? লং প্যান্ট পরে দিব্যি যাওয়া যায় আর খাওয়া যায় সেখানে। কতো সস্তায় যে সব খাবারদাবার কী বলবো মামা? চারানায় অমলেট্‌...চপ কাটলেট সব!'

প্রলুব্ধ হলেও প্রলোভন সম্বরণ করে বলি—'কে আর খাওয়াচ্ছে বল্‌! তা যাস যে তুই, লং প্যান্ট পাস কোথায়?'

'কোথায় পাবো আর! সেইজন্যেই তো তোমাকে লং প্যান্ট দিতে বলছি না?'

'তাই বল্‌।' বলে আমি হাঁফ ছাড়লাম। হাঁফ ছেড়ে বললাম—'আসছে বছর পনেরয় পড়লে আরো একটুখানি ঢ্যাঙা হলে তখনই তোকে লং প্যান্ট বানিয়ে দেব!' বলে দ্বিতীয়বার হাঁফ

ছেড়েছি—হাফ-প্যান্ট বানাবার বেমক্কা এক খর্চার দায় থেকে এবছর বেঁচে গিয়ে—ধাক্কাটা সামলে।

'থানায় পৌঁছে দারোগার কাছে জানাতে গেলাম—আজ সকালে যেসব ছেলেদের আপনি ধরে এনেছেন···

'হ্যাঁ, এনেছিলাম এক গাদাকে।' বাধা দিয়ে তিনি বললেন—'রাস্তায় বেরিয়ে বেল্লিকপনা করছিল তাই। রোজই ধরে আনতে হয় এম্‌নি। বাধ্য হয়েই ধরি—করব কী? এখনই যদি এদেরকে না সামলানো যায় পরে এরা মাস্তান হবে, উঠতি গুণ্ডা হয়ে উঠবে, সমাজ-বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে নির্ঘাত। তাই এখন থেকেই সাবধান হাওয়া দরকার। গরজ অবশ্যি বাপমায়েরই—কিন্তু তাঁরা নিজেদের দায়িত্বে অচেতন—তাই সেই কর্তব্য বাধ্য হয়েই আমাদের করতে হচ্ছে।'

'তা করুন, সে তো বেশ ভাল কথাই।' খুসি করার মতলবে তাঁর কথায় আমি সায় দিই—'শুনলাম যে তার মধ্যে আমার ভাগনেও ছিল নাকি। তাই আমি থানায় এলাম।' তাঁকে জানালাম।

'আপনার ভাগনে? কী নাম বলুন দেখি?'

'টিকলু।'

'টিকলু! না, ঐ নামের কেউ ছিল বলে তো মনে পড়ছে না। তাছাড়া, তারা তো সবাই ছাড়া পেয়ে গেছে অনেকক্ষণ!'

'ছাড়া পেয়ে গেছে সব? টিকলু বলে কেউ ছিল না বলছেন?' এতক্ষণে আমি তৃতীয়বার হাঁফ ছাড়তে পারলাম।

'হ্যাঁ, খবর পেয়ে সবার বাবা-কাকারা এসে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল একজন বাদ—'

'একজন বাদ্ কেন?' আমার কেমন খট্‌কা লাগে।—'সে বাদ গেল কেন? তাকে কেউ ছাড়াতেই আসেনি নাকি?'

'সে তার ঠিকানাই দেয়নি, তাই তার বাড়িতে খবর দেওয়া যায়নি। নামও বলেনি নিজের। লক্ আপে রেখে দেওয়া হয়েছে তাকে। এখনো আছে লক্ আপে।'

একলা একজন এখনো টিকে রয়েছে থানায়! এমন টিকসই ছেলে আমাদের টিকলু না হয়ে আর যায় না, আমার সন্দেহ হ'ল কেমন!

'আমি একবার দেখতে পারি ছেলেটিকে?' অনুরোধ জানাই।

'নিশ্চয় নিশ্চয়! আসুন না!' তিনি বলেন—'ইনিই হয়ত আপনার গুণধর ভাগনে হতে পারেন!' তিনি সঙ্গে করে নিয়ে চললেন।

গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, সে-ই বটে! লং প্যাণ্ট পরে, তাও আবার চোস্‌ত্‌ চোঙা প্যাণ্ট! লক্‌ আপ্‌-এর ষ্ট্রং রুম্‌ আলো করে বসে রয়েছেন!

আমাকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠেছে—'আমি এখানে রয়েছি বাবাকে-মাকে যেন বোলো না মামা! খবর্দার না। খবর্দার!'

'ও! এই তাহলে আপনার সেই টিকলু!' হাসলেন দারোগাবাবু: 'কিছুতে নিজের নাম কি বাড়ির ঠিকানা বলে না! কোনো খবর বার করতে পারিনি ওর কাছ থেকে। বলে কিনা আমি একটি অনাথ বালক। আমার বাড়ি ঘর নেই। রাস্তায় থাকি।'

'অনাথ বালক!' আমি আপত্তি করি। 'দারুণ বড়লোক ওরা, তা জানেন? ওদের বাড়ি আমি খেতে আসি—চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—প্রায়ই এসে খেয়ে যাই। আজও এসেছিলাম সেই রকম। এসেই আমার বোনের কাছে শুনি এই ব্যাপার!'

'আমিও সেইরকম আঁচ করেছি মশাই!' দারোগাবাবু জানান: 'ওর সাজ পোষাক হাবভাবেই টের পেয়েছি। ধমক দিয়েছি ওকে—অনাথ বালক কাকে বলে জানো তুমি? তাদের এমন সাজ পোষাক থাকে? তখন বলে—অনাথ বালক না হই, কিছুতেই আমার বাড়ির ঠিকানা জানাব না—মার দিলেও না—মরে গেলেও নয়। কী গোঁয়ার ছেলে, বাপ্‌!'

'বাড়ির ঠিকানা না দিলে, অশোককে না জানালে কি করে হবে টিকলু! কে তোমাকে থানায় এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে তাহলে?'

'বাড়ী যাচ্ছে কে? ছাড়া পেতে চাচ্ছে কে? আমি এইখানেই থাকব যদ্দিন ইচ্ছে —ওরা না ছাড়ালেই তো আমার ভালো!'

ও বাবা! এই বেপরোয়া ছেলে বলে কী! পুলিসের পরোয়ানাকেও পরোয়া করে না—এ ছেলে যেই হোক, আমার ভাগনের মতন নয় কখনই! না, মাতুলক্রম একে বলা যায় না কিছুতেই! এর পরাক্রম আমার ওপর দিয়ে যায়—অন্ততঃ একশগুণ বেশি তো বটেই!

'চিরদিন কি এঁরা তোমায় এখানে বসে বসে খাওয়াবেন তুমি ভেবেছ? একদিন না একদিন বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হবে তোমায়…তখন কী করবে?'

'যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। বাড়িতে যাব না। বাড়ি আমি যদি না আর….'

'এখানকার এই জেলখানার খাওয়া পোষাবে তোমার? এই থানার চাইতে বাড়ির খাওয়াদাওয়া কতো ভালো—' লোভ দেখাই আমি, 'জবা আজ আবার মাংস আনিয়েছে! পায়েস বানাবে বলছিল।'

'এমন কথা কেউ বলে না মশাই !'

'চাই না খেতে পায়েস ! এখানে বেশ আয়েসে আছি। এখানকার খাওয়াদাওয়াও খাসা। রুটিগুলো একটু আধ-পোড়া হলেও খেতে মন্দ না। তরকারিটা যে কিসের তা অবশ্যি ধরতে পারিনি, নুন-ঝালও দেয়নি তেমন, ডালটাও জোলো আর মাছ ছিল না। কিন্তু তাহলেও আমার বেশ ভালোই লেগেছে মামা !'
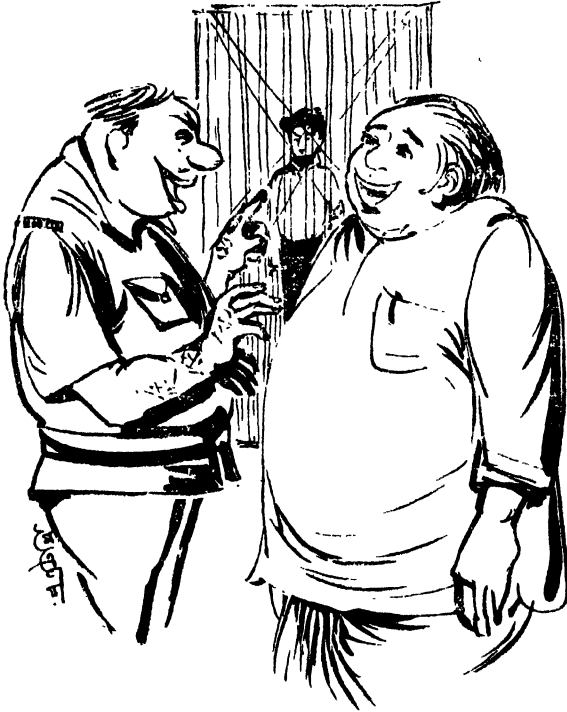
টিকলুর কাছ থেকে খাবারের সার্টিফিকেট পেয়ে দারোগাবাবু একটু বুঝি খুসি হলেন মনে হোলো। বললেন, 'এমন কথা কেউ বলে না মশাই ! এই হাজতে এর আগে আরো কতো লোক আটক থেকেছে, তাদের কারো মুখ থেকে এমন সত্যি কথা বেরয় নি কখনো, কাউকে একথা বলতে শুনিনি। নাঃ, আপনার ভাগনের রুচি আছে, মানতেই হবে আমায়।'

'শুনছ তো টিকলু ! তোমার খানার প্রশংসায় থানার দারোগাবাবু খুসি হয়েছেন খুব ! ছাড়া পাবার পরও তুমি মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে এসো না কেন ! দারোগাবাবু নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন তোমায়। খাওয়াবেন না মশাই ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয় ! মাঝে মাঝেই এসে খেয়ে যেয়ো তুমি—তাতে কী হয়েছে ? মাঝে মাঝে আসামীর জন্যে আমাদের লপ্‌সিও হয়ে থাকে। সেও খেতে খাসা—আর খুব পুষ্টিকর—খেয়ে দেখো তুমি। এখন মামার সঙ্গে বাড়ি যাও, বুঝেছ ?'

'কিছুতেই যাব না। কে আমায় বাড়ি নিয়ে যায় দেখি।' গোঁ ধরে বসে সে।

'আমার সঙ্গে যাবে। ভয়টা কি তোমার ? বাবা কি মা কেউ কিচ্ছু বলবে না।'

'সহজে না গেলে আমি পাহারোলার ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে। নিয়ে যান

ওকে মশাই! বাঁচান আমায়! এমন নাছোড়বান্দা বন্দী সেই এক গান্ধীজীর আন্দোলনের সময় দেখেছিলুম—কিছুতেই পালাতে চায় না। জেলখানার ফাটক রাত্তিরে খুলে রেখেও—বিনা পাহারায় রাখলেও যায় না। পালাবার নামটি নেই কিছুতেই।'

'দোহাই দারোগাবাবু! পায়ে পড়ি আপনার!' টিকলু ক'কিয়ে উঠল এবার: 'আমাকে ছাড়বেন না দোহাই! বরং আপনি আমায় জেলে দিন, ফাটকে পুরুন, যা খুসি করুন—চাইকি আন্দামানে পাঠান, আমি যাবজ্জীবনের নির্বাসনে যাব, কিংবা ফাঁসি যেতেও রাজি আছি আমি, কিন্তু বাড়িতে আমি পা বাড়াব না আর। ছাড়বেন না আমায়, দোহাই!'

'কেন টিকলু! এমন কথা কেন বলছ? কী হয়েছে তোমার?'

'বাবার প্যাণ্ট পরে বেরিয়েছি জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না! বাবা আপিস গেলে রোজ আমি বাবার প্যাণ্ট পরে বেরুই, ইস্কুলে যাই, ক্যান্টিনে খাই—আর বাবা আপিস থেকে ফিরে আসার আগে খুলে রাখি—' সে ব্যক্ত করে: 'বাবা যদি তা টের পায় তো আস্ত রাখবে না আমায়!'

॥ স্বাগত নববর্ষ ॥

সেখ সদর উদ্দীন

পুরোন দিনের জঞ্জাল গ্লানি
যাহা কিছু আছে পড়ে,
সব কিছু আজ উড়ে চলে যাক
কালবোশেখের ঝড়ে।

নবীন প্রাণের সূর্য উঠুক
আসুক নবীন আলো,
পহেলা বোশেখ, নব-জীবনের
জ্বালো হে মশাল জ্বালো!

পুরোন দ্বন্দ্ব ঘৃণা ভেদাভেদ
হানাহানি—বিদ্বেষ,—
সব মুছে যাক ধরাতল হতে
মুক্ত হউক দেশ।

অনেক আশায় স্বাগত জানাই
এসো হে নববর্ষ,
বিষাদ-মগন মানুষের বুকে

রামানুজন

শ্রীবিমলাংশু প্রকাশ রায়

ক্লাসে ফেল-করা ছাত্রও যে কত বড় পণ্ডিত হতে পারে সেই আশ্চর্য জীবন-কথা আজ তোমাদের বলছি। কিন্তু স্কুলের কোন ক্লাসে তিনি ফেল হয়নি, ফেল হয়েছিলেন কলেজের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায়। সে কথা পরে হবে, আগে তার জন্মবৃত্তান্ত বলে নিই।

তার পিতা ও পিতামহ উভয়েই খুব গরীব ছিলেন। সামান্য গোমস্তার কাজ করতেন। তার মা ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। তার মা, বাবা অনেক তপস্যা করে এই ছেলেকে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ অনেক বছর পর্যন্ত তাঁদের কোন সন্তান না হওয়ায়, তাঁদের দেশের (মাদ্রাজ) অধিষ্ঠাত্রী দেবী নমগিরির কাছে গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকেন একটি পুত্ররত্নের জন্যে। অবশেষে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর ইরোড নামক গ্রামে তাঁদের পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় রামানুজন। পাঁচ বৎসর বয়সে রামানুজনের পাঠশালায় পড়া আরম্ভ হয়। দু'বছর পরে সে কোনাম শহরের টাউন স্কুলে ভর্তি হয়ে এবং এখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। কিন্তু তার আগে স্কুলের নীচের ক্লাসে থেকেই তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বালক আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতো—আকাশের ঐ অসংখ্য তারা পৃথিবী থেকে কত দূরে? যখন সে দ্বিতীয় ফর্মে পড়ে, তখনই পুরাকালের পণ্ডিত পিথাগোরাসের অঙ্ক কেতাব পড়ে তন্ময় হয়ে যেতো। রামানুজন যখন তৃতীয় ফর্মে, তখন ক্লাসে শিক্ষক বলেছিলেন, "যে কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল ১ হয়।" তখন রামানুজন ব'লে বসলো, "যদি শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায়?" সে চতুর্থ ফর্মে যখন সে পড়ছে, তখন কলেজের পাঠ্য ত্রিকোণমিতি পড়তে যেতে গেল এবং বি এ ক্লাসের এক ছাত্রের কাছ থেকে Soney's Trigonometry-র দ্বিতীয় ভাগ মাঝে মাঝে চেয়ে এনে এমনই আয়ত্ত করে ফেললো যে, সেই ছাত্রকে সে অনেক জায়গায় বুঝিয়ে দিতে লাগলো। জ্যামিতির জটিল উপপাদ্য, বীজগণিতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্ক এই বয়সেই আশ্চর্যভাবে ক'ষে যেত সে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে বালক রামানুজন বলতো তার অঙ্ক নাকি দেবী নমগিরি, যাঁকে ভজনা করে তার পিতামাতা তাকে পেয়েছেন, তিনিই তাকে বুঝিয়ে দেন। বিশেষ করে যখন কোন সমস্যা চিন্তা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়তো, দেবী নমগিরি স্বপ্নে এসে তার সমাধান বাতলে দিতেন। তাই প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠেই তার প্রথম কাজ—সেই সমাধানগুলো টকটক করে লিখে নেওয়া।

১৯০৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে রামানুজন একটা কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তাঁর জীবনের একটা বিপর্যয় ঘটে। খালি অঙ্কের মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতেন, অন্য সব

বিষয়ে মনোযোগ দিতেন না। অন্য বিষয়ের ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা না শুনে, মাথা গুঁজে নিজের মনে রাশি রাশি অঙ্ক কষে যেতেন। সে সব অঙ্ক নিজের ক্লাসের চেয়ে অনেক উন্নত স্তরের কঠিন অঙ্ক, সহপাঠীরা দেখে অবাক হয়ে যেতো। এর ফলে হলো এই—বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি ফেল হলেন, প্রমোশন পেলেন না এবং বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। এই সব কারণে তিনি এতই ভগ্নমনোরথ হলেন যে, একজন বন্ধুর সাহায্যে দেশ থেকে পালিয়ে অন্ধ্র প্রদেশে প্রস্থান করলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে কিছুকাল উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ ক'রে, শেষটায় কুম্বাকোনালেই ফিরে আসেন ও আবার পড়াশুনায় মন দেন। কিন্তু কলেজ থেকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি না পেয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ফেল হন।

এরপর রামানুজন কিছুকাল নানা জায়গায় চাকরির সন্ধান করেছেন, অস্থায়ী ভাবে কয়েকটা চাকরিও করেছেন, কিন্তু অবসর সময় তাঁর নেশা রাশি রাশি ঐ অঙ্ক ক'ষে খাতাও বোঝাই করেছেন। এই সময় বিলাতের বিখ্যাত গণিতবিদ G. H. Hardy ছিলেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো', যাঁর নানা গণিতসংক্রান্ত লেখা কাগজে ছাপা হতো। ১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে মিষ্টার হার্ডিকে রামানুজন একটা চিঠি লিখে পাঠান। তাতে লেখা ছিল যে, মিঃ হার্ডির একটা প্রবন্ধ রামানুজন পাঠ করেছেন এবং সেই প্রবন্ধে যে সব গণিত বিষয়ক সমস্যার উল্লেখ আছে, রামানুজন সে সবের সমাধান করে ফেলেছেন। এই লেখার পর সেই কষা অঙ্কগুলোও জুড়ে দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কষা অনেক কঠিন অঙ্কও লিখে দিয়েছিলেন তিনি। হার্ডি সাহেব সেই সব দেখে একেবারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে লিখে পাঠালেন যে, এমন প্রতিভাবান যুবককে যেন একটা বৃত্তি দিয়ে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়, নতুবা তাঁর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবে না। বৃত্তির ব্যবস্থাও হলো, কিন্তু সাগর-পাড়ি দিলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান রামানুজন জাতিচ্যুত হবেন এই ভয়ে বিলাত যেতে রাজী হলেন না।

হার্ডি সাহেব মনঃক্ষুন্ন হলেন, কিন্তু আশা না ছেড়ে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সুযোগ একটা জুটেও গেল। তাঁর বন্ধু কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের আর একজন ফেলো, Mr. E. H. Neville-কে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ করে পাঠালেন, মাদ্রাজে গিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটা বক্তৃতা দেবার জন্যে। Mr. Hardy এই সুযোগে Mr. Neville-কে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি যেন মাদ্রাজে গিয়ে রামানুজনকে পাকড়াও ক'রে বিলাত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন।

Mr. Neville-র যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় এবং বন্ধুদের পরামর্শে রামানুজনের মন টললো বটে, কিন্তু মুশকিল হলো তাঁর মাকে নিয়ে। তাঁর মা মত না দিলে তিনি

কালাপানি পার হতে পারেন না। এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে যখন রামানুজন দিন কাটাচ্ছেন, তখন আশ্চর্যভাবে একদিন প্রত্যূষে তাঁর মা এসে তাঁকে বিলাত যেতে অনুমতি দিলেন। সে এক সত্যিকার আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর মা বলতে লাগলেন—"আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, তুই যেন বিলাত গিয়েছিস্। সেখানে মহা গুণীজ্ঞানীর কাছে খুব সমাদর লাভ করছিস, আর তোর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই সঙ্গেই দেখলুম, দেবী নমগিরি এসে আমায় আদেশ দিলেন, আমি যেন তোর উন্নতির পথে বাধা না দিই, যেন তোকে বিলাতে যাবার অনুমতি দিই।"

এই ব্যাপারে সকলেই চমৎকৃত ও খুশি হয়ে গেল। রামানুজন বিলাতে যেতে রাজী হয়েছেন জানতে পারা মাত্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি তাঁকে দেওয়া স্থির করে পাথেয়র ব্যবস্থাও করে দিলেন। রামানুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করলেন যে, তাঁকে ঐ বৃত্তি থেকে মাসে মাসে ৬০ টাকা করে তাঁর মা'র কাছে পাঠান হবে।

কেম্ব্রিজে গিয়ে একাগ্রমনে গণিত অধ্যয়ন ও গবেষণায় ডুবে গেলেন রামানুজন। দেশে থাকতে অর্থ উপার্জনের ধান্দায় যে পড়াশুনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো, তা আর রইল না। তাঁর বিস্তর প্রবন্ধ অনেক সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হতে লাগলো। চারিদিকে সত্যিই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অত পড়াশুনার মধ্যেও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যুবক নিজের হাতে স্বপাক নিরামিষ আহার করতেন।

কিন্তু ১৯১৭ সালের মে মাসে জানা গেল যে, রামানুজন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসা অবশ্য চলতে লাগলো যথারীতি। হাসপাতালেও মাঝে মাঝে যেতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্বর্ধনাও চলতে লাগলো এমন ভাবে যে, ১৮১৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি এই F.R.S. পদবীতে ভূষিত হলেন, আর মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, তবু এই মহা সম্মানিত পদবীতে ভূষিত হয়ে নতুন উৎসাহে কাজ করতে লেগে গেলেন রামানুজন। ১৯১৮ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' ব'লে ভূষিত হন এবং ছয় বৎসরের জন্যে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এর জন্যে বিশেষ কাজ করবার বাধ্যবাধকতা ছিল না। কারণ এটা বৃত্তি নয়, এটা ছিল পুরস্কার।

কিন্তু রামানুজনের শরীর বিলাতে আর ভাল থাকছিল না। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন বোঝা গেল। তাই ১৯১৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বিলাত থেকে রওনা হয়ে ২৭শে মার্চ তারিখে বোম্বাই পৌছলেন এবং মাদ্রাজে এলেন ২রা এপ্রিল। তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হলেন। বহু লোক তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে লাগলো, বহু

চিকিৎসা হলো রীতিমত, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ১ ২০ সালের ২৬শে এপ্রিল এই প্রতিভাসম্পন্ন যুবক মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন—পিতামাতা ও পত্নীকে রেখে অনন্তপ্রয়াণ !

অসুস্থতার আগে রামানুজন একটু স্থূলকায় যুবক ছিলেন। উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। তাঁর ছিল বৃহৎ মস্তিষ্ক, প্রশস্ত ললাট, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়ানো কেশরাশি, আর ছিল তীক্ষ্ণ দীপ্তিমান কাজল আঁখি দুটি। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর দেয়ালে ঝোলানো আছে তার ছবিখানি।

হাতের কাজ
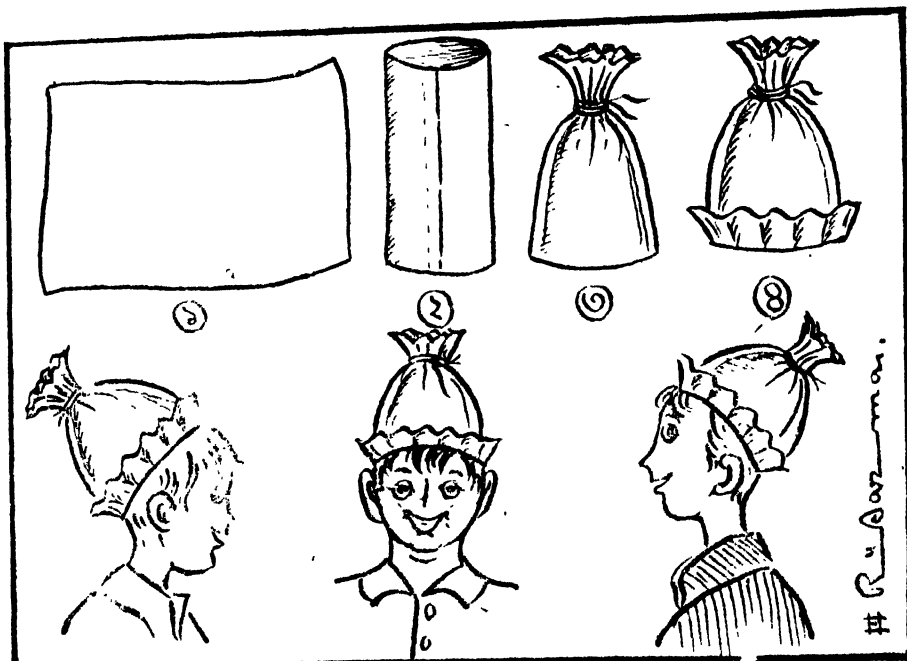
এমন অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে, যা একটু পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটালে সহজেই তোমরা নিজেরা করে আনন্দ পেতে পারো। কাগজের টুপি তৈরির ব্যাপারটি তেমনি একটি আনন্দদায়ক সুন্দর সহজ কাজ। একটুকরো রঙিন কাগজ নিয়ে, গোল করে পাকিয়ে, তার মাথা মুড়ে, কেটে, সুতো বেঁধে তোমরাও ইচ্ছে করলে এই ধরনের টুপি করতে পারো নিজেরাই এবং কোন উৎসবের সময় মাথায় পরে মজা দেখাতে পারো সবাইকে।

মামা-ভাগনে

(মৈথিলী উপকথা)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের বাইরে নদীর কাছে বনের ধারে একটা মাটির বাড়ী, সেখানে এক বুড়ী থাকে তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। বুড়ীর এক সময়ে অবস্থা ভালো ছিল; আত্মীয়স্বজন কম ছিল না। স্বামীও তার পয়সাওলা মানী লোক ছিল। গ্রামে মড়ক লেগে কয়েক দিনের মধ্যে সবাই হঠাৎ মারা গেল। বিধবা অনেক কষ্টে বাড়ীর বাসনকোসন বেচে, এর-তার বাড়ীর ধান ভেনে, ছোট ছেলেটিকে মানুষ করেছে? এখন বুড়ীর চোখে ছানি পড়েছে, সে আর খাটতে পারে না। যোলো-সতেরো বছরের ছেলে রামপূজনই এখন কাঠ কেটে ঘাস বেচে মাকে ছু'বেলা কিছু এনে দেয়, তাতেই কষ্টেসৃষ্টে তাদের সংসার চলে।

ভিন্ গ্রামের দু'জন চোর সেই বাড়ীর সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। তারা লোকমুখে শুনেছে, বুড়ীর ঘরে এখনও কিছু বাসন এবং রুপোর গহনা আছে, ছেলেটাও বেশ জোয়ান হয়েছে। হাটে মানুষ বিক্রি হয়, রামপূজনের মতো তাগ্‌ড়া একটা ছেলেকে বেচলে পাঁচ-সাতশ' টাকা কোন্ না পাওয়া যাবে! দুই চোরে যুক্তি ক'রে বুড়ীর বাড়ী গিয়ে ডাক দিল, "দিদি দিদি, বাড়ী আছ?"

বুড়ী লাঠি ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে। বললে, "কে ভাই, তোমরা! আমি চোখে ভালো দেখি না, চিনতে পারছি না।"

চোরেরা গ্রামে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল কোন্ গ্রামে বুড়ীর বাপের বাড়ী। বললে, "আমরা মধুবনী থেকে আসছি, দিদি। মা তোমার জন্য এইসব মিঠাই-মোয়া পাঠিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের চিনবে কি করে, দিদি? বিয়ের পর তো তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে দেয়নি। আমরা তো তোমার বিয়ের পরে জন্মেছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি কখনও। যাই হোক, এবার আমরা রামপূজনকে নিয়ে যাব। তার মামীরা, দিদিমা তাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। চমৎকার ছেলে হয়েছে তোমার দিদি। যাই বলো এত বড়োটি হ'ল, এর মধ্যে একবার তাকে মামার বাড়ী পাঠানো উচিত ছিল।"

প্রথমে বুড়ী আপত্তি করলে, তারপর দুই ভাইয়ের মিষ্টি কথায় এবং কাতর অনুরোধে মত না দিয়ে পারলে না। রামপূজন ভালো কাপড় জামা প'রে, কানে মাকড়ি এবং দুই হাতে সোনার বালা প'রে মামাদের সঙ্গে মামার বাড়ী চলল। তাকে দেখলে মনে হয় নেহাৎ ভালোমানুষ, কিন্তু আসলে ছিল সে খুব চতুর। দু'চার ক্রোশ গিয়েই মামাদের ধরন-ধারণে সে বুঝতে পারলে, তারা তাকে বেচে দেওয়ার মতলব করছে। একটা গ্রামে ঢুকে দূরে একটা ময়রার দোকান দেখে সে বায়না জুড়লে, "মামা, বড্ড খিদে পেয়েছে, মিঠাই কিনে দাও, খাবো।"

'দু'জন কেনা গোলাম তাই বেচে দেবে।'

চোরদেরও খিদে পেয়েছিল, কিন্তু ঘরের কড়ি খরচ করে, রামপূজনকে খাওয়ানো তাদের মত নয়। তাই রামপূজনকে বললে, "তুই ঐ দোকানটায় গিয়ে হাতের বালা বিক্রি করে মিঠাই কিনে আন। অনেক টাকা হ'বে বালার দাম, এক টাকার বেশী মিষ্টি কিনিস নি যেন। টাকা যা ফেরত দেয় নিয়ে আসবি।" রামপূজন তো তাই চায়, চোরদের দাঁড় করিয়ে রেখে সে মিষ্টির দোকানে গেল। দোকানী বেশ বড় কারবারী, মিষ্টির দোকান ছাড়া তার ক্ষেত-খামারও ছিল। রামপূজনের সুন্দর চেহারা আর সাজ পোষাক দেখে সে তাকে বড়োঘরের ছেলে ব'লে বুঝতে পারলে, খাতির-যত্ন ক'রে বসিয়ে অনেক মিঠাই খাওয়ালে। কথায় কথায় রামপূজন জিজ্ঞেস করলে, "হাঁ মশাই, এখানে কেউ চাকর কিনবে বলতে পারেন? আমাদের এবার ফসলের অবস্থা ভালো নয়, দু'জন কেনা গোলাম তাই বেচে দেব ঠিক করেছি। শহর তো অনেক দূর, কাছাকাছি যদি কেউ নেয়। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কাজের লোক, বিশ্বাসী।"

দোকানী বললে, "আমিই তো লোক খুঁজছি। তবে দু'জনকে তো কিনতে পারব না, একটা চাকর হলেই আমার চলবে।"

রামপূজন বললে, "ওরা ছেলেবেলা থেকে আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, ওদের বিক্রি করছি নিতান্ত দায়ে প'ড়ে। মামা ব'লে ডাকি ওদের। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি কি বলে দেখি।" সে সেখান থেকেই হাঁক দিলে, "মামা, মামা, একটা না দুটো?"

ভাবলে আর একটা বেচতে কোথায় আবার যাব ; তাই বললে, "দুটোই বেচতে হবে একসঙ্গে।"

রামপূজন দোকানীকে বললে, "শুনলেন তো, দুটোই একসঙ্গে বেচতে বলছে। আসলে কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারে না কিনা, খুব ভাব দু'জনে।"

দোকানী রাজি হয় না বেশি খরচ করতে। শেষে একজনের দামে দু'জন গোলাম পাবে শুনে সে মত দিলে। তখনি কাগজে লেখাপড়া করে পাঁচশ'টি টাকা সে রামপূজনের হাতে দিলে। রামপূজন বললে, "এখন একটু চোখে চোখে রাখবেন ক'দিন ; খুব মন খারাপ হবে। আবোলতাবোল বকবে, ও সবে কান দেবেন না। মাটি কোপাতে, কাঠ কাটতে, লাগিয়ে দেবেন। দু'দিনে মন ব'সে যাবে।"

চোরেরা হাঁক দিলে, "কই ভাগনে, দেরি কিসের?" রামপূজন বললে, "দোকানী বাবু বলছেন, রোদে দাঁড়িয়ে থাবে কেন, এখানে এসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো। তারপর রোদ পড়লে বেরোনো যাবে।" দোকানীও ডাকলে, "এসো, বাবা, তোমরা তো ঘরের ছেলে।"

রামপূজন চাকর বেচা টাকা থেকে পাঁচ টাকা দিলে দোকানীকে নিজের এবং চোরেদের খাবারের দাম ব'লে। চোরেরা এসে ঠোঙা ভরতি খাবার পেয়ে খুশি, পেট ভ'রে খেয়ে যেই তারা বিশ্রাম করবার জন্য শুয়েছে, অমনি রামপূজন চুপি চুপি সরে পড়েছে। বাড়ীর পথে সে চাল-ডাল-ঘি-তেল এক মাসের খোরাক কিনে নিলে। তার মা তাকে দেখে অবাক। বললে, "এখনি ফিরে এলি যে বড়ো?" রামপূজন সব কথা খুলে বললে। মা তো শুনে ভয়ে কেঁপে মরে। বলে, "সর্বনাশ করেছিস, আবার কোন্ দিন তারা এসে হাজির হবে।" রামপূজন বললে, "ভয় কি, সব ঠিক করে দেব।"

চোরেরা ঘুমোতেই দোকানী দরজার শিকল তুলে দিয়েছিল, তারা চেঁচামেচি করতে বললে, "তোমাদের মনিব নগদ পাঁচশ' টাকা নিয়ে তোমাদের বেচে গেছে, এই দেখ তার রসিদ। এখন গোলমাল করে লাভ হবে না, লক্ষ্মী ছেলের মতো মাটি কোপাবে চলো। আমার আরও দশজন কেনা চাকর আছে, তাদের সঙ্গে খাটবে খাবে। পালাতে চেষ্টা কোরো না, ওরা আমার পুরোনো লোক, তোমাদের মেরে বেঁধে আনবে।"

চোরেরা অগত্যা কিছুদিন দোকানীর ক্ষেতে-খামারে খাটলে। অভ্যাস নেই, হাতে ফোস্কা পড়ল ; রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, দুর্বল হয়ে পড়ল ক্রমশঃ। শেষে একদিন রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়েছে, তখন আস্তে আস্তে বাঁশের আগড়ের বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়ল। তাদের রাগে তখন সর্বাঙ্গ জ্বলছে। প্রথমেই তারা চলল রামপূজনের গাঁয়ের দিকে।

মাঠের মধ্যে বাড়ী, অনেক দূর থেকে রামপূজনও দেখতে পেলে তাদের। ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে তার মাকে বললে, "মা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে এই তুলসীতলায় চাটাই বিছিয়ে দিচ্ছি

শুয়ে পড়ো। আমি তোমাকে কাপড় চাপা দিচ্ছি, তুমি যেন মরে গেছ। আবার যখন ঠক করে একটা লাঠি ছোঁয়াব তোমার নাকে তখনই তুমি বেঁচে উঠবে। তার আগে খবরদার একটুও নড়বে না।"

চোরেরা বাড়ীর কাছাকাছি এসে শুনতে পেলে রামপূজন চিৎকার করে কাঁদছে, "ওগো মা গো, তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে গো? আমাকে কে রেঁধে ভাত দেবে গো? আমাকে কে ছাতুর লাড্ডু করে খাওয়াবে গো?"

চোরেরা একটু অপ্রস্তত হয়ে গেল। যতই অপরাধী হোক, অল্পবয়সী ছেলেটা অঝোরে কাঁদছে আর মাকে জড়িয়ে ধরে আকুলি-বিকুলি করছে দেখে তাদের মায়া হ'ল। রামপূজনও তাদের পেয়ে আরও জোরে কান্না জুড়ে দিলে, "ওগো মামা গো, তোমাদের ঠকিয়ে বেচে দিয়েছিলুম, সেই পাপে আমার কি শাস্তি হয়েছে, দেখ গো। তোমাদের দিদিকে ফিরিয়ে আনো গো।"

চোরেদের মুখে কথা নেই, তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণ পাড়ার পাঁচজন ছুটে এসেছে কান্না শুনে, তারা বুড়ীর অনেক প্রশংসা করে শেষে পোড়াবার জন্য কাঠ কাটতে গেল। ওরা বুড়ীর ভাই শুনে ওদেরও ধরে নিয়ে গেল শ্মশানের কাজের জন্য। যোগাড় যন্ত্র শেষ হলে যখন সবাই বাঁশে বেঁধে বুড়ীকে নিয়ে যাবে, তখন হঠাৎ রামপূজন বলে উঠল, "ও মামা, ও ভাই, ও কাকা, আমার এতক্ষণ মনে ছিল না। আমার বাবার একটা মন্ত্রপূত লাঠি আছে। কোন্ সন্ন্যাসী দিয়ে বলেছিলেন, "সেটার গন্ধ নাকে গেলে নাকি মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। তা, তোমরা একটু অপেক্ষা করো আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।"

রামপূজন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একটা পুরোনো বাঁশের লাঠি এনে মায়ের নাকে ঠেকালে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মা আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসল, ঢাকার কাপড় ফেলে। বললে, "এত লোকের ভিড় কেন? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এরা সব তামাসা দেখতে এসেছে বুঝি?"

রামপূজন হেসে-কেঁদে মাকে জড়িয়ে ধরলে। গাঁয়ের লোক "রামজী কি জয়", "হনুমানজী কি জয়", বলতে লাগল। সকলকে মিঠাই-মণ্ডা খাইয়ে বিদায় দিয়ে রামপূজন চোরেদের বললে, "মামা, তোমাদের পুণ্যে মা আমার বেঁচে উঠেছে। যা হবার হয়ে গেছে। টাকাও তো অধিকাংশ পুরানো দেনা শোধ করতে আর খেতেদেতে ফুরিয়ে গেছে, এখন শ'খানেক টাকা আছে, এনে দিচ্ছি। তাই নিয়ে তোমরা আমাকে ক্ষমা ক'রে বাড়ী যাও।"

চোরেরা বললে, "ভাগনে, টাকা চাই না, ঐ লাঠিটা আমাদের দিতে হবে।" রামপূজন কিছুতেই রাজী হয় না, শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর বললে, "তোমরা আপনার লোক,

চোরেরা ভারী খুশি। তাদের নিজেদের গ্রামে একজন আত্মীয়ের সঙ্গে ঝগড়া ছিল। লোকটি খুব দুর্বল, তাকে মারধোর করা যেত না, পাছে ম'রে যায় এই ভয়ে, সে কিন্তু গলা ছেড়ে এদের গালাগালি দিত। এবার আর ভয় কি! গালাগাল দিলে লাঠির ঘায়ে শুইয়ে দেবে, মরে গেলে আবার বাঁচিয়ে দেবে। দেশের লোকে ধন্য ধন্য করবে তাদের শক্তি দেখে।

যে কথা সেই কাজ। গাঁয়ে ঢুকেই সেই আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। সে বললে, "কোথায় গেছলি হতভাগারা? কি করতে এলি আবার পোড়ামুখ দেখাতে?" চোরেদের মধ্যে যার হাতে লাঠি ছিল সে বললে, "খবরদার, শুধু শুধু মুখ খারাপ করো তো, এই লাঠির ঘায়ে আজ শেষ ক'রে দেব।" সে লোকটা তখনও গালাগালি দিচ্ছে, দু'চার জন লোক দাঁড়িয়ে গেছে মজা দেখতে। চোর এক লাঠি মারলে লোকটার মাথায়। লোকটা পড়ল, আর মরল। তখন হইহই পড়ে গেল চারদিকে। গ্রামের লোক চোরেদের ঘিরে ফেললে, তারা বললে, "কোনো ভয় নেই, আমরা ওকে আবার বাঁচিয়ে দিচ্ছি।" তারা সেই মৃত আত্মীয়ের নাকে মুখে দশবার করে লাঠি ছোঁয়ালে, কিন্তু কিছুই হ'ল না। রাজার পিয়াদা বেঁধে নিয়ে গেল তাকে। পাড়ার দু'একজন ভালো লোক তাদের হয়ে সাক্ষী দিলে, "লোকটাই আগে গালাগালি দিয়েছিল, ওরা রাগের মাথায় মেরেছে; মেরে ফেলবার মতলব ছিল না মনে হয়।" রাজা গর্দান নিলেন না, চোরেদের ভিটেমাটি যা ছিল বেচে সেই আত্মীয়ের পরিবারকে দেবার হুকুম দিলেন। সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

চোরেরা আবার চলল রামপূজনের বাড়ীর দিকে। রাজপূজন জানতো তারা আসবে। সে দুটো শিয়াল ধরেছিল, একটাকে বেঁধে রেখে এসেছিল বাড়ীতে, আর একটাকে দড়ি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। সে একটা মাঠে ঘাস কেটে খোলেয় ভরছে, এমন সময় দেখে সামনেই দুই মামা উপস্থিত। একগাল হেসে বললে, "এস, মামা, এস। কি খবর?"

চোরেরা বললে, "আমাদের আবার ঠকিয়েছিস, এ লাঠিতে কোন কাজ হয় না। একটা মানুষ মেরে আমরা বাঁচাতে পারিনি, আর একটু হ'লে জীবন যেত, রাজা সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। আজ তোরই একদিন, কি আমাদেরই একদিন!"

রামপূজন আকাশ থেকে পড়ল। বললে, "বলো কি, মামা! তিলকচাঁদ বাবার দেওয়া লাঠি, বিশ-বছর রামভজন ঝাঁ'র বাড়ী পূজো পেয়েছে, সেই লাঠিতে কাজ হ'ল না! তোমরা নিশ্চয় কিছু অনিয়ম করেছিলে। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লাঠিবাবাকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়েছ তো? বাসি কাপড়ে গায়ে হাত দাওনি তো?"

চোরেরা অবাক্। বললে, "নিয়মের কথা তো কিছু ব'লে দিসনি। আর বাড়ীতে পৌঁছবার আগেই মারামারিটা হয়ে গেল।"

রামপূজন বললে, "তাহলে তেমন অপরাধ হয়নি। আচ্ছা, রাস্তায় যেতে হ্ঁাচোনি তো! হ্ঁাচি-কাসির শব্দে লাঠিবাবা বড়ো চ'টে যান।"

চোরেদের রাত জেগে পালাবার সময় ঠাণ্ডা লেগেছিল, রামপূজন লক্ষ্য করেছিল তার বাড়ীতেই তারা দু'বার হেঁচেছিল। চোরেরা স্বীকার করলে, তা হেঁচে থাকবে দু'একবার, আগে সাবধান করো নি কেন ভাগনে?

রামপূজন বললে, "যা হবার হয়েছে বাড়ী চলো। আমি তোমাদের লাঠি সোধন করে দেব, আবার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি ফিরে আসবে ওর। পাঁচকড়া কড়ি, তেল, সিঁদুর, পান-সুপুরি সঙ্গে আছে? একঘড়া গঙ্গাজল, পাঁচটা বটের পাতা আছে তো! ফুল, বিল্বপত্র?"

চোরেরা বললে, "ও-সব আবার কে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়? ঠাট্টা করছিস?" ভাগনে বললে, "ভয় নেই, আমি এই শিয়ালটাকে পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি, ও বাড়ী গিয়ে বললেই মা যোগাড় করে রাখবে। বাড়ী গিয়েই হাত-পা ধুয়ে কাজ আরম্ভ করব। বাবার বইয়ে শ্লোক লেখা আছে, একজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে দিয়ে ক্রিয়া করাব।"

বলতে বলতে রামপূজন শিয়ালটার বাঁধনের দড়ি খুলে দিয়ে বললে, "যাতো বাবা গিধ্বড়রাম, মাকে গিয়ে বল, মামারা আসছেন। লাঠিবাবার সোধন হবে, সব যোগাড় ক'রে রাখে যেন। আর মামাদের জলখাবার যেন তৈরি থাকে।"

বনের শিয়াল ছাড়া পেয়ে বনের দিকে অর্থাৎ রামপূজনের বাড়ীর দিকে ছুটল তীরবেগে। সে অদৃশ্য হয়ে যেতে চোরেরা বললে, শিয়াল আবার পোষ মানে নাকি! ও কি ক'রে খবর দেবে তোর মাকে?"

রামপূজন বললে, "ও আসলে শাপভ্রষ্ট ভৈরব, তিলকচাঁদ বাবার দয়ায় আমার চাকর হয়ে আছে। ওকে দিয়ে আমার যাকে যা দরকার খবর দিই। যার কাছে পাঠাই তার কাছে ও গিয়ে দাঁড়ালেই সে ওর মনের কথা বুঝতে পারে, মুখে কিছু বলতে হয় না।"

চোরেদের বিশ্বাস হ'ল না। তবু তারা মজা দেখবার জন্যে লাঠি হাতে রামপূজনের সঙ্গে চলল; তার ঘাসের বস্তাটাও পালা করে খানিকটা ব'য়ে নিয়ে এল।

রাজপূজন আগে থেকে মাকে বলে রেখেছিল, রোজই ঐ পুজোর যোগাড় সে করে রাখে; সেই সঙ্গে তিলের খাজা, মুড়ির নাড়ু ও গাড়ু-ভরা খাবার জল, গামছাও থাকে।

চোরেরা বাড়ী ঢুকেই অবাক্। উঠোনে পরিপাটি পুজোর ব্যবস্থা, তাদের অভ্যর্থনার এবং জলযোগের ব্যবস্থা, পাশেই শিয়ালটা খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে! হাত পা ধুয়ে খাটিয়ায় ব'সে যখন তারা খেয়েদেয়ে ঠাণ্ডা হ'ল, তখন রামপূজন গাঁ থেকে ঘুরে এসে খবর দিলে, "আজ ব্রাহ্মণ মিলল না, তিনদিন পরে শুভ লগ্ন রয়েছে তখন কাজ হবে। তোমরা এই ক'দিন বিশ্রাম করো এখানে।"

চোরেরা তাতে রাজি নয়। কখন কি বিপদ হয়। তার চেয়ে লাঠিটা রেখে তারা বিদায় চাইলে। বললে, পরে এক সময় লাঠি নিয়ে যাবে। উপস্থিত তার বদলে তাদের শিয়ালটাকে দিতে হবে।

অগত্যা অনেক আপত্তি করে রামপূজন রাজি হ'ল। সেইদিন রাত্রে এক জায়গায় চুরির ব্যবস্থা ক'রে ছোটো চোর বড়ো চোরকে পাহারায় রেখে, সিঁদের মুখ দিয়ে একটা ঘরে ঢুকল, শিয়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে। মালপত্র এনে সে সিঁদের গর্তের মুখে জড়ো করবে, তারপর শিয়াল পাঠিয়ে খবর দিলে বড়ো চোর এসে বাইরে থেকে সেগুলো সরিয়ে নেবে, এই ব্যবস্থা রইল। তখন রাত দুপুর, হঠাৎ বাইরে আশেপাশে জঙ্গলে কয়েকটা শিয়াল ডেকে উঠল, "হুয়া হুয়াকাক্যা হুয়া।" ব্যস, চোরের সঙ্গী ঘরের শিয়ালটাও "হুয়া কাক্যা" করে জাতীয় সংগীতে যোগ দিল। বাড়ীর লোক ছুটে এল, মারের চোটে আধমরা হয়ে গেল ছোটো চোর। সিঁদের মুখে শিয়ালটা পালাল, পালাবার মুখে তাকে বাধা দিতে যাওয়ায় বড়ো চোরকে খ্যাঁক ক'রে একটা কামড় দিয়ে গেল।

বড়ো চোর প্রাণ নিয়ে পালাল, ছোটো চোরকে রাজার দরবারে নিয়ে গেল সে গ্রামের লোক। বিচারে দশ বছরের ফাটক হ'ল তার। বড়ো চোর পরের দিন সকালে রামপূজনের গ্রামে উপস্থিত। নদীর ধারে রামপূজন তখন বড়ো বড়ো ঘাস কাস্তেয় কেটে থলিতে ভরছে একমনে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখে বড়ো চোর দাঁড়িয়ে। হাতে রক্ত চাপ বেঁধে আছে, রাগে অগ্নিশর্মা, পায়ে এক হাঁটু কাদা।

রামপূজন বললে, "একি মামা? কি হয়েছে?" বড়ো চোর বললে, "কিছু হয়নি, আজ তোকে যমের বাড়ী যেতে হবে, তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি।" রামপূজনের মুখের কথা মুখে রইল, হাতের কাস্তে হাতে রইল। তাকে সেই ঘাসের থলের মধ্যে পুরে চোর মামা তাকে দিলে নদীর জলে ফেলে। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে খানিক দূরে একটা গাছ তলায় গিয়ে বসে ভাবতে লাগল, "এবার কি করা যায়।"

ঘাসের বস্তা ডুবল না। রামপূজন হাতের কাস্তে দিয়ে থলি চিরে বেরিয়ে পড়ল একটু আগে গিয়েই। সাঁতরে উঠল নদীর পারে। সেখানে তার পুরোনো বন্ধু রাজার মাহুত রাজার হাতী চরাতে এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা। রামপূজন বললে, "ভাই, বড্ড ভিজে গেছি। হাতীটা একবার ধার দাও তো ওপারে গিয়ে বাড়ী থেকে শুকনো কাপড় পরে আসি।" বন্ধু মাহুত বলল, 'তুমি হাওদায় বোসো আমিই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। নদীর ধারে আমি দাঁড়াব তুমি কাপড় বদলে এস।"

হাতির পিঠে নদী পার হয়ে ডাঙায় উঠতেই রামপূজন দেখলে চোর মামা বসে আছে

এক গাছতলায়। চিৎকার করে বলল, "মামা, মামা, বড় ভুল করেছ।" মামা অবাক্! এইমাত্র যাকে জলে ফেলে দিয়েছে, সেই ভাগনে এক ঝলমলে সাজ-পরা রাজহস্তীর পিঠ থেকে নামছে। বললে, "একি! তুমি!" কাছে এসে রাজপূজন বললে, "হাঁ মামা, নদীর ধারে ফেলেছিলে ব'লে শুধু হাতী পেয়েছি, যদি মাঝ নদীতে ঐ রকম বস্তা ক'রে ফেলে দিতে, তাহলে নদীর তলায় নাগরাজের রাজভাণ্ডার পেতুম।" চোরের লোভ হ'ল, "সত্যি?" "সত্যি কিনা নিজের চোখেই তো দেখছ।" চোর বললে, "আমাকে তবে ফেলে দে ভাগনে।" রামপূজন আর কি করে! মাহুত বন্ধুর কাছ থেকে একটা বড়ো থলি চেয়ে নিয়ে দু'জনে তাতে চোরকে পুরে থলির মুখ বাঁধলে বেশ ক'রে, তারপর হাতীর পিঠে থলিটা তুলে নিয়ে গিয়ে ঠিক মাঝ-নদীতে একটা পাথর বেঁধে ফেলে দিলে। থলি ডুবল, মামা আর উঠল না নাগরাজের রাজভাণ্ডার নিয়ে!

কাজটা নিষ্ঠুর হ'ল সন্দেহ নেই, কিন্তু মামা তো ঐ ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল ভাগনের জন্য, তার আর অপরাধ কি?

মামাদের সঙ্গে ভাগনের আর এরপর দেখা হয়নি। ভাগনে এখন সুখেই আছে।

ভারত-প্রতিভা

শ্রীসলিল বাগচী

বঙ্গনয়ন হে মহান্ কবি
　　ভারতের তুমি প্রতিভা,
তোমার জ্যোতিতে বঙ্গবাণীতে
　　পেয়েছে বিচিত্র শোভা।
চির অক্ষয় স্বর্গ সুষমা
　　ধরণীরে তুমি দিয়েছ ঢেলে,
বাণীর দেউলে তোমার প্রেমের
　　কনক-দীপ রেখেছ জ্বেলে।

বীণা ঝংকারে দীর্ঘকালের
　　দৃঢ় অর্গল করেছ দূর,
জড় প্রকৃতির কণ্ঠে দিয়েছ
　　কত মধুময় অমিয় সুর।
স্নিগ্ধ মধুর সুরের প্রবাহে
　　পাষাণেও তুমি দেনেছ প্রাণ,
কালের স্রোতে সেও যে অমর
　　পুণ্য প্রভায় দীপ্যমান।

রেশনের দোকানের বিষ্ণু দাসই অসীমকে কাজটি ঠিক করে দিলেন। হাউসিং ষ্টেটে এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে কাজ করতে হবে। রেশন ধরা, বাজার করা, ঘর দোর ঝাড়-পোঁছ করা, গৃহস্থ বাড়িতে যা যা দরকার হয় সবই করতে হবে, অসীমকে।

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'জল তোলা বাসন মাজা? সে সবও তো আছে বিষ্ণুকাকা?'

বিষ্ণুবাবু হেসে বললেন, 'আরে না না। ও সবের জন্যে মিসেস চৌধুরী আলাদা ঠিকে ঝি রেখেছেন। তোকে ও সব করতে হবে না। বেটা ছেলে যা করে তুই সেই সব কাজই করবি। জানিস বাড়িতে একটিও ছেলে নেই। ভদ্রলোক দুটি নাবালিকা মেয়ে, স্ত্রী আর বুড়ো মা রেখে গেছেন। মিসেস চৌধুরী আমাকে কিছুদিন ধরে বলছিলেন, কাজকর্মের জন্যে একটি বিশ্বাসী ছেলে দিতে পারেন? তোর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তুইও তো কাজ কাজ করছিলি।'

অসীম একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'কিন্তু বিষ্ণুকাকা আমি ভেবেছিলাম কোন দোকান-টোকানে আপনি আমাকে একটা কাজ ঠিক করে দেবেন। কোন অফিস-টফিসে বেয়ারার কাজও যদি একটা পেতাম।'…

দোকানের সামনে খদ্দেরদের কিউ ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। বহু রেশন কার্ড জমা পড়েছে। কর্মব্যস্ত বিষ্ণুবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার দোকানে কোন কাজ খালি নেই তোকে তো আগেই বলেছি। আর অফিসে বেয়ারা-গিরি পাওয়া আজকাল ভারি কঠিন। আমার যতটুকু সাধ্য করেছি। তোর যদি পছন্দ না হয় নিসনে।'

মনটা একটু খুঁতখুত করছিল অসীমের। শত হলেও বাড়ির চাকরের কাজ। সেও বামুনের ছেলে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। অসীম ভেবেছিল যা লোকের কাছে বলা যায় এমন একটা কাজই বিষ্ণুকাকা তাকে জুটিয়ে দেবেন। বাবা তো ওঁর বন্ধু ছিলেন।

শহীদ কলোনীর বস্তির ঘরে মায়ের কাছে ফিরে এল অসীম। সব বৃত্তান্ত বলল।

কমলা বললেন, 'কী আর করবি বাবা। যা পাচ্ছিস তাই নিয়ে নে। আমার শরীরটা যদি ভালো থাকত আমিই দিনরাত কাজ করতাম। তোকে কিছু করতে হ'ত না। কিন্তু দেখছিস তো অবস্থা? মাসের মধ্যে পনের দিন বিছানায় পড়ে থাকি। বসিয়ে বসিয়ে আমাদের কে খাওয়াবে বল? হ্যাঁ রে, মাইনে কত দেবে রে তোকে?'

অসীম একটু অভিমানের স্বরে বলল, 'আমি জিজ্ঞেস করিনি মা। বিষ্ণুকাকা যা ঠিক করে দেবেন তাই হবে। পনের-বিশ টাকার মত হবে আর কি!

অসীমের অভিমানের কারণ ছিল। ও ভেবেছিল সমবয়সী ছেলেদের মত অসীমও স্কুলে পড়তে যাবে। কিন্তু সেভেন থেকে এইটে কিছুতেই উঠতে পারল না অসীম। ফেল করে বসল। স্কুলের হাফ-ফ্রিশীপটি কাটা গেল। দু'তিন বাড়িতে কাজ করেন মা। কোন রকমে দিন চলছিল। এখন শক্ত অসুখে ধরেছে, তিনি আর তেমন করে খাটতে পারেন না।

তাই বাধ্য হয়ে কাজই নিতে হ'ল অসীমকে।

বি. টি. রোড সরকারী হাউসিং ষ্টেটের তিনতালার ফ্ল্যাটে থাকেন মিসেস চৌধুরী। দত্তবাগান থেকে মাইল দেড়েকের মত রাস্তা। পথটুকু অসীম হেঁটেই গেল। এর চেয়েও কত বেশী রাস্তা সে হাঁটে।

মিসেস চৌধুরী তাকে দেখে খুশি হলেন। বললেন, 'ও বিষ্ণুবাবু পাঠিয়েছেন তোমাকে? বেশ। থাকো এখানে। মন দিয়ে কাজকর্ম কর। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের এখানে যে থাকে তাকে আমরা বাড়ির ছেলের মতই রাখি।'

মাইনের কথা তিনি নিজেই বললেন. 'বিষ্ণুবাবু কত বলেছেন তোমাকে?'

অসীম বলল, 'কিছু বলেন কি। আপনিই বলুন।'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'আপাতত পনের টাকা করে দেব। থাকবে, খাবে। জামা কাপড় সব পাবে। যদি ভালভাবে কাজকর্ম কর পরে বাড়িয়ে দেব। ভালো কথা তোমার নামটা তো শোনা হয়নি। কী নাম তোমার ?'

'অসীম চক্রবর্তী।'

ভদ্রমহিলা একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন।

আর একজন বৃদ্ধা পাশেই বসেছিলেন। তিনি কাঁদো কাঁদো ভাবে বললেন, 'না বাবা ও নাম তুমি বলো না। ও নাম যার ছিল সে আমার বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। ও নামে তোমাকে আমরা ডাকতে পারব না।'

মিসেস চৌধুরী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, 'এ বাড়ির যিনি কর্তা ছিলেন তাঁর ছিল এই নাম। তিনি তিন মাস আগে মারা গেছেন। বাড়িতে তোমার ডাকনাম-টাম কিছু নেই ?'

অসীম বলল, 'না, আমার এই একটাই নাম, বাবা রেখেছিলেন।'

গরীব বাবা। অকালে মারা গেছেন। কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি। শুধু এই একটি নামই দিয়ে গেছেন।

মিসেস চৌধুরী তাঁর শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন তো মা, কী নাম রাখা যায় ওর।'

শাশুড়ী বললেন, 'রাখতে হলে ঠাকুর-দেবতার নামই রাখো না। রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ। আর কতকাল এখানে ফেলে রাখবে ঠাকুর।'

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়লেন।

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'তাহলে তোমার গোবিন্দ নামই থাক, কী বলো ?'

ঠাকুর-দেবতার নাম হলেও অসীমের ও নামটা পছন্দ নয়। কেমন যেন সেকেলে বুড়োটে ধরনের নাম। তবু রাজি হয়ে গেল নাম বদলাতে। চাকরি করতে এসেছে। না রাজি হয়ে উপায় কি। এ বাড়ির আচার-ব্যবহার সবই ভালো। কাজকর্ম যা তার বরাদ্দ আছে তা অবশ্য করতে হয়। ভুলচুক হলে মিসেস চৌধুরী তেমন বকেন না। হেসেই তা শুধরে দেন।

দুটি মেয়ে মিশনারি স্কুলে পড়ে। তাদের নেওয়ার জন্যে গাড়ি আসে স্কুলের। ভারি সুশ্রী মেয়ে দুটি। একটি সেভেনে পড়ে আর একটি ফাইভে। স্কুল থেকে ফিরে এসে নিজেরা গল্প করে, কোনদিন বা পার্কে খেলতে যায়। সপ্তাহে দু'দিন করে গানের মাষ্টার

এসে ওদের গান শেখায়। অসীম দূর থেকে দেখে। তবে কাছে গেলে ওরা কথা বলে। তুই বলে না তুমি বলেই ডাকে। খুবই ভদ্র ব্যবহার।

মিসেস চৌধুরী বাড়িতে থাকেন না। সাড়ে ন'টার আগেই অফিসে বেরিয়ে পড়েন। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা হয়ে যায়।

অসীম ওঁদের ঘর-সংসার আগলায়। যে টুকু যা কাজ থাকে করে।

বৃদ্ধা ছোট ঠাকুর ঘরটিতে বসে জপতপ করেন, ধর্মগ্রন্থ পড়েন। মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে ঘুমিয়েও পড়েন। অবশ্য সংসারের দিকেও তাঁর লক্ষ্য আছে। অসীম কী করছে না করছে সে দিকে চোখ রাখেন, নাতনীদের যত্নটত্ন হচ্ছে কিনা খোঁজ-খবর নেন।

অবসর সময় অসীম এ-ঘরে ও-ঘরে জিনিসপত্র দেখে। আলমারি ভরা কত বই। সব বাঁধানো। সোনার জলে নাম লেখা। ইংরেজী বইগুলিতে লেখা ইংরেজী অক্ষরে এ. কে. চৌধুরী। বাংলা বইগুলিতে অসীমকুমার চৌধুরী। এছাড়া তাঁর ছোট বড় ফটো দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো। গ্রুপ ফটো আছে, অফিসে ফেয়ারওয়েলের ফটো আছে। ভদ্রলোকের আরো কত রকমের কত জিনিসপত্র। সেতার বাজাতেন। রঙীন ঢাকনীতে ঢাকা সেই সেতারটি আছে। শিকারের সখ ছিল। নিজের হাতে মারা হরিণের শিং আছে। অভিনয় করতে পারতেন। রাজার পোষাক পরা ছবি আছে অ্যালবামে। ওঁর মেয়েরা সেদিন দেখাচ্ছিল।

অসীমের নামে নাম এই ভদ্রলোকের কত গুণ ছিল, কত জিনিসপত্র রেখে গেছেন।

অসীম অবাক হয়ে ভাবে তার জীবনটা কি রকম হবে কে জানে। কোনদিন কি তার উন্নতি হবে? দশজনের একজন সে হতে পারবে, নাকি এই ভাবে লোকের বাড়িতে কাজ করে করেই দিন যাবে?

পড়াশুনোর তার অগ্রহের কথা শুনে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'একটা নাইট স্কুলে তার পড়বার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

অসীম জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কবে দেবেন মা? দিন তো চলে যাচ্ছে!'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'যাক কিছুদিন। এই তো সবে চাকরিতে ঢুকলে।'

সেদিন মিসেস চৌধুরীর অফিস ছুটি।

বিকাল বেলায় একজন ভদ্রলোক আর মহিলা এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ ডাকলেন, 'গোবিন্দ গোবিন্দ!'

অসীম ওঁদের জন্তেই চা আর খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল, সাড়া দিতে ভুলে গেল।

মাঝে মাঝে কেমন যেন সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

মিসেস চৌধুরীর কাছে এসে বললেন, 'তোকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস নে! প্রায়ই দেখি ডাকলে সাড়া দিসনে। এ কী অসভ্যতা?'

অসীম বলল, 'খেয়াল থাকে না মা। এটা তো আমার আসল নাম নয়, বানানো নাম। সব সময় মনে রাখতে পারিনে।

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'ভারি স্পর্ধা তো। মুখে মুখে জবাব দিতে শিখেছিস!'

যিনি বকেন না তাঁর বকুনিতে বড় দুঃখ হয়।

অসীম কাজকর্ম করল, কিন্তু সারাক্ষণ মুখভার করে রইল। রাত্রে সবার খাওয়া হলে নিজে সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুরে নীপা-দীপাদের ঠাকুরমা বললেন, 'হ্যাঁ রে অমন মুখ ভার করে আছিস কেন রে? তোকে তো কেউ কিছু বলে না। না হয় বউমা একদিন একটু বকেইছে। তাই বলে অমন করবি নাকি?'

অসীম চুপ করে রইল।

মেয়েরা স্কুলে গেছে, মিসেস চৌধুরী অফিসে বেরিয়েছেন সারা বাড়িতে আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

বুড়ী ঠাকুরমার অসীমের সঙ্গে বোধ হয় একটু গল্প করতে ইচ্ছা হ'ল।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ রে গোবিন্দ, একদিন দু'দিন অন্তর অন্তর কোথায় যাস বলতো? পাড়ার ওই ছেলেটার সাইকেল নিয়ে একেবারে উধাও হয়ে যাস আর তোর সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না!'

অসীম বলল, 'মার করছে যাই ঠাকুরমা, একবার করে দেখে আসি। আর—'

'আর কি?'

অসীম বলল, 'আর মা বার বার আমাকে নাম ধরে ডাকেন, আমি শুনি।'

বৃদ্ধা চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আচ্ছা তুই আর আমি যখন একা একা থাকব, আমিও তোকে ঐ নাম ধরেই ডাকব। ও নাম যে আমার বুকের মধ্যে সব সময় আছে রে, শুধু মুখেই আনতে পারিনে।'

তাঁর দুই চোখ ছলছল করে উঠল।

অসীম কোন কথা বলল না। শুধু তাঁর দিকে আরো একটু এগিয়ে বসল।

মেঠুডে

জাতীয় হকি

এবার জাতীয় হকি ফাইনালে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব ও রানার্স রেলওয়ে দল। কিন্তু দু'দিনের ফাইনালে মোট একশ পঁচাশী মিনিট খেলার মধ্যেও কোনো গোল না হওয়ায় দু'দলকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এবার নিয়ে দু' দলই পেয়েছে এগারো বার করে জাতীয় হকি জয়ের সম্মান। এর মধ্যে রেলের যুগ্ম জয় তিন বার, পাঞ্জাবের এই প্রথম।

তুলনামূলক বিচারে পাঞ্জাব ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। তাদের দলে ছিলেন বিনোদকুমার, হরনেক্ সিং, অজিত পাল সিং ও বলবীর প্রমুখ চারজন অলিম্পিক খেলোয়াড় আর রেল দলে অলিম্পিক খেলোয়াড় ছিলেন দু'জন হরবিন্দার সিং ও ইন্দার সিং।

গ্রুপ লীগে বাংলা ২-০ গোলে ভূপালকে, ২-১ গোলে বিদর্ভকে, ৪-০ গোলে গুজরাটকে এবং ৪-০ গোলে কেরলকে পরাজিত করে। গ্রুপ লীগে বাংলাকে হার স্বীকার করতে হয় শক্তিশালী সার্ভিসেস দলের কাছে ১-৪ গোলে। কোয়ার্টার ফাইনালে রেল দলের কাছে বাংলার পরাজয়কে অপ্রত্যাশিত বলব না।

সার্ভিসেস দল সেমি ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তর প্রদেশের কাছে হার স্বীকার করলেও এবারের জাতীয় হকিতে সার্ভিসেস দলই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দল।

ডেভিস কাপ

পাটনায় ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের কাছে পাকিস্তান হেরে গেছে। প্রথম দুটো সিঙ্গলস এবং ডাবলসে ভারত বিজয়ী হয়ে পূর্বাঞ্চলের বি গ্রুপের ফাইনালে উঠেছে। পাকিস্তানের তরুণ খেলোয়াড়রা যেভাবে প্রথম দিন ভারতের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে জয়দীপ মুখার্জির সঙ্গে হারুন রহিমের

প্রথম সিঙ্গলস খেলাটি। হারুন রহিমই প্রথম দুটি সেট পান ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে। তৃতীয় সেটেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ১০-৮ গেমে জয়দীপের জয়। চতুর্থ সেটে জয়দীপ যখন ৫-২ গেমে এগিয়ে তখন হারুন রহিম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন। জয়দীপ জয়ী হন।

দ্বিতীয় সিঙ্গলসে পাকিস্তানের মুনাওয়ার ইকবালও প্রেমজিত লালের বিরুদ্ধে কম দৃঢ়তার পরিচয় দেননি। ১৩-১১ গেমে প্রেমজিতের প্রথম সেট দখল থেকেই এর প্রমাণ মেলে। ৬-৪ গেমে প্রেমজিতের দ্বিতীয় সেট লাভের ক্ষেত্রেও মুনাওয়ারের দৃঢ়তাপূর্ণ সংগ্রাম অনস্বীকার্য। তৃতীয় সেটে মুনাওয়ার যখন ৩-২ গেমে এগিয়ে, তখন প্রথম দিনের খেলা শেষ। দ্বিতীয় দিন মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে ৬-৪ গেমে প্রেমজিতের তৃতীয় সেট লাভ এবং ডাবলসে প্রেমজিত-জয়দীপ জুটি হারুন-মুনাওয়ার জুটির বিরুদ্ধে ৬-১, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমের বিজয়ে হয় খেলায় জয়ী।

হারুন রহিমের বিরুদ্ধে জয়দীপ প্রথমে ভালো খেলতে না পারলেও, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের এই জয়ের মূলে জয়দীপের কৃতিত্ব অনেকখানি। ভারত পূর্বাঞ্চলের বি গ্রুপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সিংহলের সঙ্গে। দেখা যাক ওই খেলায় কী ফলাফল হয়।

স্পোর্টস স্কলারশিপ

জাতীয় ও রাজ্য স্তরে যে-সব স্কুলের ছাত্র খেলাধুলোয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন, ভারত সরকার তাঁদের স্কলারশিপ প্রদানের পরিকল্পনা করেছেন। ১৯৭০-৭১ সালে ক্রীড়াদক্ষতার বিচারে জাতীয় স্তরে দু'শ ছাত্রকে এবং রাজ্য স্তরে চারশ ছাত্রকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

জাতীয় স্তরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের মধ্যে দেওয়া হবে বছরে ৬০০ টাকা, অর্থাৎ মাসে ৫০ টাকা। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা এই বৃত্তি পাবেন, যদি তাঁরা বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ক্রীড়াযোগ্যতা বজায় রাখেন। চোদ্দ থেকে আঠারো বছরের মধ্যে যাঁদের বয়েস, তাঁরাই এই বৃত্তির অধিকারী।

রাজ্যস্তরে খেলাধুলোয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যেও বৃত্তি প্রদানের একই নিয়ম। তবে বৃত্তির পরিমাণ মাসে ২৫ টাকা হিসাবে বছরে ৩০০ টাকা হবে।

খেলাধুলোয় উৎসাহ দানের জন্যে ভারত সরকারের এই বৃত্তি পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় উদ্যম।

সবজান্তা
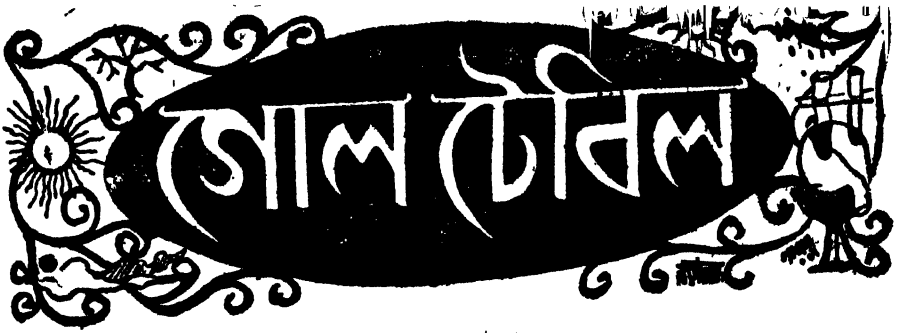
বস্তুর স্বাদ-নিয়ন্ত্রণে শব্দ

জামা কাপড় পরিষ্কার করতে শব্দ ব্যবহার করা হয়, একথা আজকাল অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু বস্তুর স্বাদ-নিয়ন্ত্রণে শব্দ ব্যবহার করা হয়—একথা যেমন নতুন, তেমনি আশ্চর্যজনক।

তোমরা হয়ত অবাক হচ্ছ স্বাদের সঙ্গে শব্দের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে? হ্যাঁ, স্বাদের সঙ্গে শব্দের একটা সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা আছে। একথা জানিয়েছেন ডেনমার্কের একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান হোল্ট হ্যানসেন। ধরো, তুমি চা খাচ্ছ। তোমার সামনে এক ধরনের শব্দের সৃষ্টি করা হয়েছে। এবারে যদি শব্দের কম্পাঙ্ক আস্তে আস্তে পাল্টান হয়, তবে তোমার চায়ের স্বাদও আস্তে আস্তে পাল্টিয়ে যাবে। শব্দের বিভিন্ন কম্পাঙ্কে চায়ের স্বাদও বিভিন্ন মনে হবে। প্রত্যেক পানীয়ের উপর, প্রত্যেক খাবারের উপর, শব্দের এমনি প্রভাব রয়েছে। এখন ঠিক করা হচ্ছে কোন খাবার, কোন পানীয় শব্দের কোন কোন কম্পাঙ্কে সবচাইতে বেশী স্বাদযুক্ত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, কোন লোকের কাছে কোন পানীয় শব্দের যে কম্পাঙ্ক সবচাইতে বেশী স্বাদযুক্ত মনে হয়, অন্যান্য অধিকাংশ লোকের কাছেও সেই পানীয় শব্দের সেই কম্পাঙ্কেই সবচাইতে বেশী স্বাদযুক্ত মনে হবে।

কলেরার নতুন টীকা

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষা করে দেখেছেন, আগে যে কলেরার প্রতিষেধক ছিল তাতে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ জন লোকের কলেরা হ'ত না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাই কলেরার একটা ভাল প্রতিষেধক বার করার জন্য একটা প্রকল্প তৈরী করেছিলেন। আনন্দের খবর, সম্প্রতি কলিকাতার কলেরা রিসার্চ সেণ্টারের ডিরেক্টর ডক্টর শচীমোহন মুখার্জির নেতৃত্বে কলেরার একটা খুব ভাল প্রতিষেধক তৈরী হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এটা শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জন লোকের ক্ষেত্রে সফল প্রতিষেধকের কাজ করে। এই প্রতিষেধক এক ধরনের খাবার বড়ি। উল্লেখযোগ্য, ডক্টর শচীমোহন মুখার্জি এই প্রতিষেধক বার করার জন্য গবেষণা চালিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনে।

১। তিন অক্ষরে নাম
মাটির নীচে ধাম ;
প্রথমটিতে হেঁটে এলাম
শেষ দুটিতে ফল পেলাম।
গাছের শোভা শেষটি গেলে
বলো দেখি কি নাম পেলে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার (বরুইপুর)

২। তিন অক্ষরে নাম তার
সবাই তারে খায়
শেষেরটি ছেড়ে দিলে
ধোপার বাড়ি যায়।
প্রথমটি দিলে বাদ বাড়ির কাজে লাগে,
দুই তিন কাটো যদি পাবে অঙ্গ ভাগে।

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য (ভাটপাড়া)

৩। লাগ বললে লাগে না
বেলাগ বললে লাগে,
কলা-টলা লাগে না
ওল-টোল লাগে।

শ্রীমিহির ভট্টচার্য (বরাহনগর)

৪। কোন জিনিস কিনে এনে
তুলে রাখে ঘরে,
খায়নাকো রান্না ক'রে
ফেলে দেয় পরে।

শ্রীচৈতালী গুপ্ত (কলিকাতা)

৫। বৌবাজার স্ট্রীটে কোন এক দোকানে হঠাৎ একদিন রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেল। দোকানের মালিক পরদিন দোকানে এসে দেখল যে, তার যে জিনিসের দোকান সে জিনিস-গুলি সবই ডাকাতরা নিয়ে গেছে। নিচের ইংরেজী অক্ষরগুলি ঠিক মত সাজালেই জিনিসের নাম বেরিয়ে যাবে। অক্ষরগুলি হচ্ছে : AELSPR. শ্রীভাস্কর জ্যোতি ঘোষ (করঞ্জলী)

উত্তর আগামী মাসে বেরুবে

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। আকবর ২। প্রিয় গৌরীশঙ্কর, তোমার প্রেরিত গত বৎসরের মৌচাকগুলি তোমার কথামত বরদার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। কাল বৈকালে নদীতে বেড়াইবার সময় আমাদের নৌকা বালীর চড়াতে আটকে গিয়াছিল। পরে নদীতে স্নান করাতে কাশী হইয়াছে। বোধ হয় শুনে সুখী হবে যে, আগামী ভাদ্র মাসে ভূপাল আমেরিকা হইতে আসিবে। এই বৎসরের মৌচাকগুলিও পাঠাইও। ইতি তোমার স্নেহের, হরিহর। ৩। বালক কাঁটাল গাছে কাঁটা দিতেছে। পিতা ধান চাষ করিতেছেন। বোন জাঁতায় ডাল ভাঙিতেছে। মাতা ভাত রাঁধিবার সময় একটি ভাত টিপিয়া অপরগুলি সিদ্ধ হইয়াছে কিনা দেখিতেছেন।

মধুচক্র

দেখা হলো নববর্ষে—১৩৭৭ সালে পৌছে গেছি আমরা। এখন জানাই এই ১৩৭৭ এর শুভকামনা, স্নেহ-প্রীতি। অস্তকের দিনে শুভহোক ও আনন্দে থাকো একথা প্রাণের সঙ্গে বলতে পারলে ভাল লাগে—কিন্তু…সে কিন্তুই থাক—প্রার্থনাই যেন সফল হয়।

তোমাদের অনেকেরই পরীক্ষা ছিল—স্কুল-ফাইনাল, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং অন্যান্য। অনেক ক্ষেত্রেই যেসব বিঘ্ন-বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তোমরা অনেকেই হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই সব ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েছ, তবু জেনো মানুষের সৎ চেষ্টা, সৎ ইচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে সহায় হয়। আশা করি অসুবিধার মধ্যে যে আন্তরিক চেষ্টা তোমদের ছিল—তা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

যাঁদের জন্য আমরা আকুল হয়ে ভাবছিলাম, অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম, প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম তাদের যাত্রা বদল যেন নির্বিঘ্ন হয়। অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, বহু সাহস ও আত্মশক্তির পরিচয়ে গর্বিত হয়ে—চন্দ্রলোক-যাত্রী সেই তিনজন বিজয়ী বীর, মহাকাশ মহাকাব্যের তিন নায়ক—জেমস এ, লোভেল, ফ্রেড হেইস, জন সুয়াইগার্ট নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন পৃথিবীর বুকে। সর্বকালের সর্বদেশের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর আর বিপজ্জনক অভিযান শেষ করে এলেন। যদিও এ যাত্রায় তাঁরা চাঁদের কাছে পৌঁছতে পারলেন না, কিন্তু তাঁরা বীরত্বের ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। সার্থক নির্ভীক শক্তির পরিচয় দিলেন। চিরঞ্জীবী হোন তাঁরা।

মানুষকে শোকতাপ জরা মৃত্যু বার্ধক্য থেকে মুক্তি দেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, রাজ-ঐশ্বর্য, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে সত্যের সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন—তারপর দীর্ঘকালের কৃচ্ছ্রসাধনের পর তিনি পেলেন সত্যের সন্ধান। সেই ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করবার দিনটি আবার ফিরে এসেছে বৈশাখী পূর্ণিমায়। তিনি বলতেন, "সংসারে যাঁরা বৈরী, তাঁদের মধ্যে বৈরহীন হয়ে আমরা সুখে জীবনযাপন করবো। যারা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাদের মধ্যে আমরা বিদ্বেষ-বর্জিত হয়ে বিচরণ করবো। আসক্তিপরায়ণ মানুষের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হৃদয়ে জীবনের দুস্তর পথ অতিক্রম করবো।"

আজও পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে অগণিত নরনারীর কণ্ঠে তাই গভীর শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

পৃথিবী জুড়ে যাঁদের নাম, যুগ যুগ ধরে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকেন যাঁরা, তাঁরা আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। প্রতি বছরে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁদের আবির্ভাবের দিনটিকে কেন্দ্র করে রচনা করি উৎসবমুখর পরিবেশ। তাঁরা নমস্য। কিন্তু এই নমস্য

মনীষীদের ক'জনকে আমরা কাছের মানুষ বলে ভাবতে পারি? তাঁদের পারিচয়—কেউ জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক, কেউ মহাকবি, কেউ জাতির জনক, কেউ ধর্মসংস্কারক ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের আটপৌরে ব্যক্তিগত জীবনের কতটুকু পরিচয় জানা আছে আমাদের? জানতে কুতূহল হয় বই কি? কিন্তু সে আগ্রহ মেটাবার উপায় আমাদের করায়ত্ত নয়! বিশ্বজনীন খ্যাতির আড়ালে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়টিকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু দুটি একটি ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ।

প্রতি বছরের মত এবারও আমরা তাঁর জন্মদিনটিকে সাজিয়ে তুলবো উৎসবের সজ্জায়—অন্তরের প্রণাম নিবেদন করবো তাঁর কীর্তির উদ্দেশ্যে। সেদিন বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাববো তাঁর বিরাট অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা, মনে পড়বে তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য, সাহিত্যের সকল স্তরে তাঁর সার্থক বিচরণ, ভিড় করে আসবে তাঁর বহুমুখী সৃষ্টির শোভাযাত্রা—কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সংগঠক, দেশপ্রেমী, পল্লীদরদী নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক, অধ্যাত্মবাদী, বিশ্বমৈত্রীর প্রবক্তা, অপরিমেয় প্রতিভা আর কর্মশক্তির অধিকারী এই মহামানবের কথা—যাঁর কণ্ঠে আর লেখনীতে উৎসারিত হয়েছিল ভারত-আত্মার শাশ্বতবাণী। সেই মহামানবকে আজ আমরা প্রণাম জানাই আমাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

ছেলেবেলায় তিনি লিখেছেন—"অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠে কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে সিরসির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াতো। দালান ঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে চাপ দিয়ে বসেনি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত। খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এরই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তি র চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মন সর্ষের তেল ঢেলে জমি তৈরী হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাথামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকাল বেলায় এত করে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগতো না মায়ের, তাঁর ভয় হতো ছেলের গায়ের রং মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে।"...

ক'টি মাত্র লাইন, ছোট একটি ছবি, কিন্তু কি প্রচণ্ড ভাবেই না দোলা দেয় মনকে—কে জানতো কুস্তির আখড়ায় শিক্ষানবিশীর ছবিটিকে একদিন আড়াল করে ঘটবে অসামান্য কবি-প্রতিভার বিচ্ছ্যুরণ?

তোমাদের সকলকে আবার স্নেহ-প্রীতি জানাচ্ছি।

তোমাদের—মধুদি'

সম্পাদক: শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ০·৬০ পয়সা

কামড়ের নয়—খিঁদের হাঁ

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্র *

৫১শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৭ [২য় সংখ্যা

কোলকাতার চিঠি

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ

মনে খুশি, মুখে হাসি দেখি কোলকাতা,
স্বপ্নের শহর! পথে মাথা আর মাথা।
মনে হয়, আজ বুঝি গাজনের মেলা,
কত ভিড়! চলে লোক দেয়নাকো ঠেলা।
ট্রাম চলে, বাস চলে, কী মজাই লাগে,
এমন মজার ছবি দেখিনি তো আগে।
একতলা, পাঁচতলা, দশতলা বাড়ী,
সেজেগুজে আছে যেন সব সারি সারি।
যতদূর চোখ যায় পীচ-ঢালা পথ,
দুই-তলা বাস যেন ইন্দ্রের রথ।
রাস্তায় পুলিশ নাই, লাল আলো জ্বলে,
থামে গাড়ী;—সাদা দাগে পারাপার চলে।

ফুটপাথে চলে লোক ধরি বাম দিক,
অলস নয়কো কেউ, কাজ করে ঠিক।
খুব ভোরে লোক চলে, রাত বারোটায়
থামেনাকো চলাচল বড় রাস্তায়।
শুধু আলো ঝলমল, শুধু রোশনাই,
এতটুকু কালোছায়া যেন কোথা নাই।
যাদুঘর, পশুশালা, কালীঘাট আর,
হাওড়ার পুলে লোক হাজার হাজার।
কোথাও জলসা, সভা, সিনেমা কোথাও,
কোথাও মিছিল চলে, ক্লান্তি উধাও।
মহাজাতি-রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্র-স্মৃতি,
গোলদীঘি, লালদীঘি ছড়াইছে প্রীতি।
গড়ের মাঠটি যেন আনন্দের মেলা,
ফুচকা, বাদাম খাই, বসে দেখি খেলা।
বেড়াই যেখানে খুশি, কোন বাধা নাই,
সবুজ ঘাসেতে বসা—কী মজাটাই।
সামনেই মনুমেন্ট, হাইকোর্ট আর,
দল বেঁধে চলে লোক গঙ্গার পার।
নৌকা ও জাহাজ কত নোঙর করা,
সুন্দরী কোলকাতা যেন অপ্সরা!
এমন শহর ছেড়ে যেতে চায় মন?
আনন্দ, উল্লাস শুধু, নেই ক্রন্দন।
রাবড়ি মালাই কত আপেল ও আতা
আমার সাধের পুরী এই কোলকাতা।*

---

* বর্তমানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নিশ্চয়ই নয়।—মৌ. স.

জাদু আংটি

শ্রীরবিদাস সাহারায়

রাজার মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে পেল অগাধ সম্পত্তি। কিন্তু ছোট ছেলে রজতকুমার ভারী বেহিসেবী; অল্পদিনের মধ্যেই সব কিছু দিল উড়িয়ে। ফতুর হয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। তখন তার হাতে আছে মাত্র তিনটি মোহর।

পথে যেতে যেতে রজতকুমার দেখল একজন লোক যাচ্ছে একটি বেড়াল নিয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করল—বেড়ালটি কি করবে?

লোকটি বলল—বিক্রী করবো।

রজতকুমার তখনই একটি মোহর দিয়ে কিনে নিল বেড়ালটি।

তারপর চলতে চলতে দেখতে পেল একজন লোক চলেছে একটি পায়রা নিয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করল—পায়রাটি বেচবে আমার কাছে?

লোকটি জবাব দিল—বেচতে পারি একটি মোহর পেলে।

রজতকুমার তাই দিয়ে পায়রাটি কিনে নিলে। কিছুক্ষণ পথ চলার পর এবার দেখা হ'ল এক সাপুড়ের সঙ্গে। সাপুড়ের কাছে ছিল একটি সাপ। রজতকুমার জিজ্ঞেস করল—সাপটি বেচবে আমার কাছে? সাপুড়ে বলল—একটি মোহর পেলেই বেচতে পারি।

রজতকুমার তার শেষ সম্বল মোহরটি দিয়ে কিনে নিল সাপটি। কিন্তু তারপরেই ভাবলো এটা দিয়ে করবো কি? সাপটিকে ছেড়ে দিতেই সে মানুষের মত ভাষায় বলে উঠল—রজতকুমার, তুমি আমার খুব উপকার করলে। যদি ভয় না পাও তা হলে এসো আমার সঙ্গে।

রজতকুমার সাপের কথায় বিশ্বাস করে তার সঙ্গে গেল। একটি বনের মধ্যে সাপের রাজ্য। সাপের রাজা তাকে একটি আংটি দিয়ে বলল—মাথায় তিনবার ঘ'ষে এটার কাছে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু সাবধান, দরকার ছাড়া কিছু চাইবে না।

রজতকুমার তাতেই রাজী হ'ল। সাপকে বিদায় জানিয়ে সে বেরিয়ে এল বন থেকে।

মনের আনন্দে পথ চলতে লাগল রজতকুমার। বেশ কিছুদূর যেতেই সে ভয়ানক ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। কোথায় খাবার মিলবে? তখন আংটিটি তিনবার মাথায় ঘ'ষে সে খাবার চাইল। দেখতে দেখতে এক থালা উপাদেয় খাবার এসে হাজির হ'ল তার সামনে।

পেট ভরে খাবার খেয়ে রজতকুমার পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চলার পর সে এসে পৌছল এক নগরীর সামনে। নগরীর ভেতর যেই ঢুকতে যাবে, আপনি সে শুনতে পেল রাজার প্রহরী ঘোষণা করে বলেছে—যে এক রাত্রের মধ্যে সমুদ্রের মাঝখানে সোনার প্রাসাদ

তৈরি করে দিতে পারবে, সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে আর পাবে রাজকন্যা। কিন্তু যে রাজী হয়েও না করে দিতে পারবে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে।

রজতকুমার সে কথা শুনে গিয়ে হাজির হ'ল রাজদরবারে। রাজার কাছে বলল—মহারাজ, আমি পারবো।

রাজা রজতকুমারকে সোনার প্রাসাদ তৈরী করবার আদেশ দিলেন। কয়েকজন প্রহরী রাখা হ'ল যাতে সে পালিয়ে না যায়।

এদিকে সন্ধ্যা হতে না হতেই রজতকুমার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রহরীরা ভাবল লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। নইলে এমন কাজের ভার নিয়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

রাত যখন দুপুর হয়ে এল তখন প্রহরীরাই পড়ল ঘুমে কাবু হয়ে। ঠিক সেই সময়ে জেগে উঠল রজতকুমার। আংটিটাকে মাথায় তিনবার ঘষে বলল---সমুদ্রের মাঝখানে একটি সোনার প্রাসাদ চাই।

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই প্রহরীরা অবাক হয়ে দেখল সমুদ্রের মাঝখানে ঝকঝক করছে সোনার প্রাসাদ। তারা ছুটে রাজাকে খবর দিতে গেল। রাজা প্রহরীদের কথা মোটেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু যখন এসে স্বচক্ষে দেখলেন, তখন আর অবিশ্বাস করার উপায় রইল না।

রাজাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে হ'ল। রাজকন্যা মধুমতীর বিয়ে দিলেন রজতকুমারের সঙ্গে আর সেই সঙ্গে তাকে উহার দিলেন অর্ধেক রাজত্ব।

রজতকুমার মধুমতীকে নিয়ে সেই সোনার প্রাসাদে বাস করতে লাগল। বেশ সুখেই কাটতে লাগল তাদের দিনগুলি।

একদিন রজতকুমার দেখল মধুমতী মুখভার করে বসে আছে। রজতকুমার শুধাল—কি হয়েছে তোমার? মধুমতী বলল—আমার মাথার চুলগুলিকে যদি সোনার করে দিতে পার, তবেই আমার মুখে হাসি ফুটবে—নইলে নয়।

রজতকুমার বলল--এই কথা? বেশ।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে মধুমতী দেখল সত্যি তার মাথার চুল সোনার হয়ে গেছে। তখন তার কি আনন্দ!

একদিন হ'ল কি, মধুমতী চুল আঁচড়াচ্ছে, হঠাৎ দুটি চুল ছিঁড়ে চিরুনিতে আটকে গেল। এমন সুন্দর চুল ফেলে দেবে? একটি পাতার নৌকা তৈরি করে চুল দুটি ভাসিয়ে দিল সমুদ্রের জলে।

পাতার নৌকা ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌছল অন্য এক রাজ্যে। রাজবাড়ির ধোপা

কাপড় কাচছিল, তার চোখে পড়ল সেই জিনিস। তাড়াতাড়ি তা নিয়ে সে চলল রাজার কাছে। রাজাও অবাক হয়ে গেলেন সেই চুল দেখে।

রাজার ছেলে মোহনলাল পণ করে বসল—এই সোনার চুল যার মাথায়, সেই মেয়েকে সে বিয়ে করবে।

রাজা সে কথা শুনে চিন্তায় আকুল হলেন। কোথায় তিনি খুঁজে পাবেন সোনার চুল-ওয়ালা কন্যাকে? মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন, দেশের বড় বড় পণ্ডিতদের ডাকলেন। সবাই পরামর্শ দিলেন—ডাইনীবুড়ীকে ডাকুন, সে-ই খুঁজে দিতে পারবে সেই কন্যাকে।

ডাইনীবুড়ী এল। সব কথা শুনে সে বলল—মহারাজ আমি সেই কন্যাকে খুঁজে দিতে পারি। তবে আমার সঙ্গে দিতে হবে ময়ুরপঙ্খি নাও, আর তাতে চারজন পাকা মাঝি।

রাজা তাই দিলেন। ডাইনীবুড়ী ময়ুরপঙ্খি নাও চালিয়ে দিল সেদিকে—যেদিক থেকে ভেসে এসেছিল সেই চুল।

ময়ূরপঙ্খি চলল ভাসতে ভাসতে। অনেক দূরে গিয়ে তারা দেখতে পেল সোনার রাজপ্রাসাদ। ডাইনীবুড়ীর বুঝতে বাকী রইল না, ওখানেই আছে সোনার চুলের রাজকন্যা।

রাজপ্রসাদের পেছন দিকে নৌকা ভিড়ল। ডাইনীবুড়ী একাই চুপি চুপি ভিতরে গিয়ে দেখল, চুপ করে বসে আছে মধুমতী তার মাথায় সোনার চুল। ডাইনীবুড়ী তার গালে আদরের চুমো খেয়ে বলল—আমাকে চিনতে পারছো না, আমি যে তোমার মাসী হই।

মধুমতী বলল—তোমাকে কোনদিন তো দেখিনি।

ডাইনীবুড়ী বলল—কি করে দেখবে, আমি যে থাকতাম বিদেশে। তোমাকে সেই ছোটবেলায় দেখেছি, তুমি ছিলে আমার কত আদরের।

মধুমতী ডাইনীবুড়ীর কথায় বিশ্বাস করল। রজতকুমার তখন রাজপুরীতে ছিল না। গিয়েছিল নৌকো নিয়ে শিকার করতে। ডাইনীবুড়ী মধুমতীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। রজতকুমারের হাতের জাদু আংটির কথাও জেনে নিল সে। তারপর খুব দরদ দেখিয়ে বলল—আহা মধুমতী, তুমি একা এই সমুদ্রের মাঝখানে থাকো, যদি কোন বিপদ-আপদ হয়, তখন কি হবে? তোমার স্বামীর কাছে থেকে আংটিটি চেয়ে নিয়ে তুমি বরং নিজের কাছে রেখে দিও। সাবধান, আমার কথা যেন বলো না।

মধুমতী ভেবে দেখল কথাটি মন্দ নয়। তাই পরের দিন ভোরেই সে রজতকুমারকে

বলল, আমি সারাদিন একা থাকি, যদি কোন বিপদ হয় তখন কি হবে? তুমি আমাকে আংটিটা দিয়ে যাও।

রজতকুমার আংটিটা মধুমতীর হাতে পরিয়ে দিয়ে শিকারে চলে গেল। ডাইনীবুড়ী ভাবল এই সুযোগ। দুপুরবেলা মধুমতীকে সে বলল—রাজকন্যা, তুমি ঘরের ভেতর বসে থাকো কিছুই তো দেখতে পাও না। আমার আছে ময়ূরপঙ্খি নৌকা, চলো সেই নৌকায় চড়ে বেড়িয়ে আসি।

বেড়াবার কথা শুনে মধুমতী আহ্লাদে আটখানা। সে তখনই ডাইনীবুড়ীর সঙ্গে চলল ময়ূরপঙ্খি নৌকায় চড়তে। বাড়ির পেছনে বাঁধা ছিল নৌকাটি; রজতকুমারের চোখে তা পড়েনি। মধুমতী ময়ূরপঙ্খিতে চড়তেই মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দিল···সোঁ সোঁ করে নৌকা ছুটে চলল পবনের বেগে।

মধুমতী বুঝতে পারল সে কতবড় ভুল করেছে। কিন্তু তখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই। কান্নাই শুধু তার সার হ'ল। ময়ূরপঙ্খি গিয়ে পৌঁছল সেই রাজার দেশে।

রাজার ছেলে মোহনলালের সঙ্গে মধুমতীর বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন মধুমতীকে রাখা হ'ল ডাইনীবুড়ীর পাহারায়।

* * *

এদিকে রজতকুমার শিকার থেকে ফিরে এসে দেখল—রাজপুরী শূন্য। মধুমতীর নাম ধরে ডেকেও কোন সাড়া পেল না।

পায়রাটি উড়ে এসে বলল—প্রভু, রাজকন্যার মাসী এসেছিল এখানে, ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়িয়ে তাকে নিয়ে চলে গেছে।

সে কথা শুনে রজতকুমার গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। পায়রাটি বলল—দুঃখ করো না, দেখি আমি রাজকন্যার কোন খবর আনতে পারি কিনা।

বেড়াল বলল—আমিও যাব তোমার সঙ্গে। দেখি যদি তোমার কোন সাহায্য করতে পারি।

বেড়ালকে কাঁধের উপর তুলে পায়রাটি উড়ে চলল।

উড়তে উড়তে তারা এল সেই রাজ্যে, যেখানে মধুমতীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। পায়রাটি জানলা দিয়ে ঢুকে মধুমতীর কাছে গিয়ে বসল। মধুমতী তাকে দেখতে পেয়েই চিনতে পারল। কেঁদে কেঁদে নিজের দুঃখের কাহিনী সব কিছু বলল পায়রাটিকে।

পায়রাটি জিজ্ঞেস করল—জাদু আংটিটি কোথায়?

মধুমতী বলল—ওটা ডাইনীবুড়ী সব সময় নিজের মুখের মধ্যে রাখে।

তা হলে উপায়? বিড়ালের সঙ্গে পায়রা অনেক কিছু পরামর্শ করল। তারপর বলল মধুমতীকে—রাজকন্যা, তোমাকে রাত্রে যখন ভাত খেতে দেবে সেই ভাত তুমি সব খাবে না। কিছুটা ছড়িয়ে দেবে ইঁদুরের গর্তের মুখে।

মধুমতী তাই করল। রাত্রের ভাত কিছুটা ইঁদুরের গর্তের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ডাইনী-বুড়ীও ঘুমিয়ে পড়ল মধুমতীর পাশে।

সে তখনই ডাইনীবুড়ীর সঙ্গে চলল ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়ে।

রাত একটু গভীর হতেই ইঁদুরেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল খাবারের লোভে। বিড়াল একটি লম্বা লেজওয়ালা ইঁদুরকে ধরে এনে তার লেজটি ঢুকিয়ে দিল ডাইনীবুড়ীর নাকের ভিতর। সুড়সুড়ি লাগাতেই ডাইনীর নাক থেকে বেরিয়ে এল বিরাট হাঁচি—হ্যাচ্ছো।

অমনি মুখের ভিতর থেকে আংটিটা ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। পায়রাটি ছোঁ মেরে সেটি ঠোঁটে তুলে নিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

তার পরের ঘটনা অতি বিচিত্র। রজতকুমার আংটিটি পেয়ে যেন হারানো জীবন ফিরে পেল। সেটি মাথায় তিনবার ঘ'ষে বলল—মধুমতীকে এনে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রজতকুমার ফিরে পেল মধুমতীকে। এবার তারা দু'জনে পরম সুখে বাস করতে লাগল।*
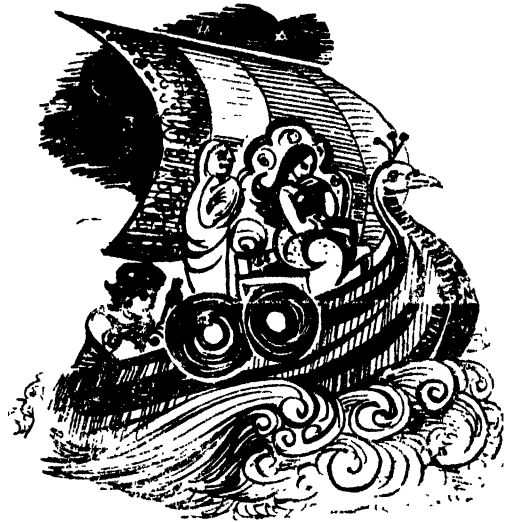
*একটি ভারতীয় উপকথার ছায়া নিয়ে লেখা

সাপের কথা

শ্রীআশীষ রায়চৌধুরী

সাপ এই শব্দটি শোনা মাত্র আমাদের মনে ভয় আর মুখ আতঙ্কে ভরে যায়। পৃথিবীর সব মানুষই এই সরীসৃপটিকে ভয় করে। প্রকৃতি এই সরীসৃপটিকে হাতির মত শক্তি বা বন্য পশুদের মত তীক্ষ্ণ দাঁত দেয়নি বটে, তবুও এই প্রাণীটির নাম শুনলে আজও আমরা ভয় করি। কিন্তু সাপদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকটিই বিষাক্ত আর বাকী অন্যগুলির বিষ নাই। ইহারা বাঘ বা সিংহের মত মানুষের গন্ধ পেলেই ছুটে আসে না, বরং মানুষকে এড়িয়ে চলে।

বিষাক্ত সাপ অতি ভয়নক প্রাণী। কোন প্রকারে তাহারা যদি একবার দেহে দাঁত বসাইতে পারে, তবে আর রক্ষা করিবার উপায় থাকে না। বিষাক্ত সাপদের মধ্যে কেউটে, শঙ্খচূড়, গোখরো, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি সাপ খুবই বিষাক্ত এবং ইহারা যদি একবার মানুষের দেহে বা অন্য কোন প্রাণীর দেহে কামড়ায়, তাহা হইলে সেই প্রাণী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ইহাদের বিষ-দাঁত আছে আর কামড়াইবার সময় দাঁতের আগায় বিষ আসিয়া হাজির হয়। সাপের এই বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রাণীকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে সাপের কামড়ে প্রতি বছরে গড়ে দশ থেকে বারো হাজারের মত লোক মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এইখান থেকেই বলা যায়, প্রতি বৎসরেই অন্যান্য সরীসৃপদের মধ্যে সাপরাই আমাদের বেশি অনিষ্ট করে। পৃথিবীতে যত জাতের সাপ আছে, তাদের মধ্যে প্রায় অনেককেই এই ভারতবর্ষে দেখা যায়।

সাপদের দেহের গঠন এক অদ্ভুত ভাবে রচিত। হস্তপদহীন হইলেও সাপ কিন্তু নিকৃষ্ট জাতের প্রাণী নয়। এদের দেহের গঠন আমাদের মতই উন্নত ও জটিল, কিন্তু এরা বধির জগতের অধিবাসী। আমাদের মত সাপদের কান নেই, তাই তারা শব্দহীন ভাবে জীবন কাটায়। এছাড়া এরা অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন আর মাটিতে সামান্য কম্পন সৃষ্টি হলেই সাপেরা সচেতন হয়ে উঠে। সাপেরা মাটির উপর বুক দিয়ে চলে, আর বুকের সাদা অংশই সাড়া জাগায়। আমাদের মত এদের দেহে ফুসফুস, হার্ট, লিভার ও গলব্লাডার সবই আছে। কুকুর বিড়ালের মত সাপেরাও রাত্রিতে সব দেখতে পারে। এই কারণে দিনে সাপেদের বেশী দেখা যায় না। রাত্রের অন্ধকারেই ওরা বেশি বাহির হয়; কারণ রাত্রিতেই এদের শিকার করা সহজ হয়। তাই ব'লে এরা যে দিনের বেলায় শিকার করে না তা নয়। সাপদের দেখলেই ইহার লকলকে জিভকে প্রায় দেখা যায়। এদের জিভ আমাদের মত নয়, অনেক লম্বা। তবে আদৌ চওড়া নয়, আবার ইহা দুই ভাগে চেরা থাকে। সাপদের মুখে ফাঁক থাকে আর সেই ফাঁক দিয়ে সাপেরা সর্বদাই জিভ বাহির করে। এই জিভের সাহায্যে সাপেরা বাহিরের আবহাওয়া আর বাহিরের সকল অবস্থা বুঝিতে পারে, এবং এই জন্যেই সাপদের ঘন ঘন জিভ বাহির করিতে হয়।

পাখীদের যেমন পালক থাকে, বিড়াল কুকুরের যেমন লোম থাকে, সাপদের শরীর সেইরূপ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। ইহাদের শরীরের আঁশগুলি খোলার বাড়ীর ছাদের মত একটার উপর একটা সাজান থাকে। এই আঁশ সাজানোর ভাব দেখিয়া সাপদের জাতি ঠিক করা যায়। সাপদের গায়ে আঁশের উপর পাত্‌লা অনেকটা নাইলনের মত চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। সাপদের এই চামড়া মাঝে মাঝে খোলসের আকারে পড়িয়া যায়। ইহাকে সাপদের খোলস ত্যাগ বলে।

সাপদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে, সাপেরা স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বুঝতে পারে একে অপরের দেহ ঘর্ষণ করে। আবার অনেকে বলেন, ঘ্রাণের দ্বারাই এরা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। সাপদের মধ্যে বেশীর ভাগই ডিম পাড়ে, আবার কিছু আছে যারা সন্তান প্রসব করে। একা অজগর এক-একবারে ৮ থেকে ১০টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি দেখতে হয় হাঁসের ডিমের মত, আর স্ত্রী-অজগররা ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া ডিমে তা দেয়। চন্দ্রবোড়া সাপেরা ডিম পাড়ে না বটে, কিন্তু এক এক করে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি বাচ্চা প্রসব করে। গোখুর প্রভৃতি সাপেরা এক একবারে ১০।২৫টি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শিশু-সাপ পিতা-মাতার মত সকল বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী হয়। বিষধর সাপদের মতই শিশু-সাপেরা বিষ দাঁত নিয়েই জন্ম নেয়। এই শিশু-সাপদের বিষ পিতামাতার মতই মারাত্মক হয়, আবার তারা নিজেদের বংশের ধারা অনুসারে দংশন করতে পারে জন্মের কয়েক মিনিট পরেই। জন্মের এক দুই মিনিটের মধ্যে র‍্যাটেল সাপের বাচ্চারা বয়স্ক সাপের মত যথাযথভাবে দংশন করতে পারে।

সাপদের প্রধান খাদ্য ব্যাঙ, ইঁদুর, পাখীর ডিম ও ছানা। আবার কোন কোন সাপের প্রধান খাদ্য সাপ। যেমন শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়া এরা সাপ খেতেই বেশি ভালবাসে। সাপেরা একবারে অনেক খাদ্য খেতে পারে, এতে সাপদের কোন অসুবিধে হয় না। অতিরিক্ত শিকার পাইলে তাহা সবই খাইয়া দেহের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে, তারপর কয়েক দিন শিকার না করেই দিন কাটায়। সাপেরা প্রয়োজন বোধে হাড়ের মত শক্ত জিনিসকেও হজম করতে সক্ষম।

যে কারণে আমরা সাপকে ভয় করি, তাহা হইল সাপের দংশনে। সাপ যদি আমাদের দেহে দংশন করে, তাহা হইলে তাড়াতাড়ি কয়েকটি বাঁধন দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসাই প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। সাপের দংশন করা রোগীকে সব সময় বসিয়ে রাখতে হয়—যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। ধূমপান বা উত্তেজক কিছু কখনও খেতে দিতে নেই। এছাড়া লেবু, তেঁতুল, তেল বা পান্তাভাতের জল খাওয়ানো নিষেধ।

আজকের বিজ্ঞানীরা সাংঘাতিক বিষধর সাপের থেকে মূল্যবান সব ওষুধ বাহির করিতেছেন। এই সমস্ত ওষুধের সাহায্যে ডাক্তারেরা মরণাপন্ন রোগীদেরও বাঁচিয়ে দেন। কেউটে

সাপের বিষ থেকে এক প্রকার ঔষধ হয়, যাহা পচনশীল ক্ষত সারাতে পারে। শঙ্খচূড় সাপের বিষ থেকে কোরামিন হয়, আরো কত ঔষধ হয় নানা সাপের বিষ থেকে !

সাংঘাতিক বিষধর গোখরো সাপেরা কুকুর বিড়ালের মত খুব পোষ মানে। কিন্তু এই পোষা সাপেরা তাদের মালিক বা পরিবারের কাউকে কখনো ভুলেও দংশন করে না। বম্বেতে সিরালা নামক স্থানের অধিবাসীরা বিষধর গোখরো সাপকে খুব পোষ মানায়, আবার সেই সঙ্গে খেলা শেখায়। এই কথা শুনতে সকলের কাছেই খুব আশ্চর্য লাগবে যে, সাপরাও মানুষের কাছে পোষ মানে। এখান থেকেই প্রমাণ হয়, সাপেরা কেবল দংশনই করে না, মানুষের পোষ মানে, আবার মানুষকে ভালোও বাসে।

ফাঁকি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ঝিক ঝিক ঝিক চলছে গাড়ি
যাবে যদি ·তাড়াতাড়ি।···
কে কে যাবে ভাবছ তাকি ?
মুন্না যাবে, রিংকু, লাকি।

রাজা যাবে, রাজার খুড়ো,
সেপাই-পুলিশ মন্ত্রী-বুড়ো।
বাঘ-ভাল্লুক হাতী-ঘোড়া
ময়ূর, হরিণ, বলদ-জোড়া।

ঝিক ঝিক ঝিক চলছে গাড়ি
টিকিট কাটো তাড়াতাড়ি।··
একি ! তুমি যাচ্ছ নাকি ?
ভাবছ বুঝি সবই ফাঁকি।

খেলাঘরের পুতুল আছে,
গাড়ি আছে আমার কাছে।
কোথায় ফাঁকি দেখছ তবে ?
মুগজ তোমার ঢিলাই হবে।

প্রবাসী মাকড়সা

শ্রীসলিল মিত্র

প্রবাসী মাকড়সা কথাটা একটু কেমন যেন মনে হয়, তাই নয় কি? ভাবছো বুঝি এরা হিল্লী-দিল্লীতে গিয়ে বাস করে নাকি বাংলা ছেড়ে? সে তো ওরা বাস করেই, কিন্তু সেরকম প্রবাসে বাস করার কথা হচ্ছে না। তোমরা জানো, ডাঙাতেই ঐ মাকড়সারা বাস করে, জাল বোনে, শিকার ধরে। কিন্তু ডাঙা থেকে যখনই তারা জলে গিয়ে বাস করে, তখন তাদের কি বলবে? নিশ্চয়ই প্রবাসী বলবে! হয় তো বলবে, জলে বাস করে এমন মাকড়সাও আছে নাকি? আছে। কয়েক রকমের মাকড়সাই জলে বাস করে প্রবাসী হয়ে গেছে।

এবার তোমাদের জানতে ইচ্ছে হবে, কি ভাবে জলে থাকে ওরা? অক্সিজেন না নিয়ে যে প্রাণী বাঁচতে পারে না, তারা জলের তলায় তাহলে কি ভাবে বেঁচে থাকে? অক্সিজেন কি তারা নেয় না? হ্যাঁ, অক্সিজেন তারা নেয় বইকী। কি ভাবে নেয় পরে সোনাবো, তার আগে ওদের জলের তলায় বাসা তৈরী করার কথাটা শোন।

দর্জিদের চেনো? যারা তোমার গায়ের জামাটি সেলাই মেসিনে সেলাই করে দিয়েছেন তারাই দর্জি। তারা সেলাই করার সময় আঙুলে খুব ছোট্ট একটা টুপির মত পরে নেন, দেখেছ তো? সেই ছোট্ট টুপির মতই জলের মাকড়সাদের বাসা। জলের তলায় যেসব ছোট ছোট গাছ কিংবা ঘাস হয়, সেখানেই ওরা থাকার জন্যে নিজেদের দেহের রস দিয়ে একরকম তাঁবু তৈরী করে নেয়, ঐ তাঁবু এমন করেই ওরা গড়ে তোলে, যার ভেতর থেকে এতোটুকু বাতাসও বেরিয়ে যেতে পারে না। এই হলো ওদের বাসার কথা। এবার ওরা কি ভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করে শোন।

জলের তলায় বাসা হলেও ওদের বাসাটিতে ওরা অক্সিজেন দিয়ে ভরিয়ে রাখে সব সময়েই। জলের উপর থেকে যে ভাবে ওরা বাসার মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে যায়, সেটা ভারী মজার! সামান্য প্রাণী হলে কি হবে, আশ্চর্য রকম বুদ্ধি ওদের। বাসা তৈরী শেষ হয়ে গেলে ওরা করে কি—জলের উপুর ওরা চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে, আর আটটা পা রাখে জলের উপর তুলে। পাগুলো তো ছোট ছোট রোমে ভর্তি। যখনই জলের উপর পা তুললো অমনি পায়ের রোমে গেল বাতাস আটকে। আর রোমে আটকানো বাতাস নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মাকড়সারা চলে গেল নিজেদের বাসার তাঁবুতে। তারপর? তারপর, ঘরের ভেতর রোমে আটকানো বাতাসকে ছেড়ে দিল। ঘর ভরে উঠলো বাতাস আর অক্সিজেনে। এই পদ্ধতিতেই ওরা ওদের ছোট্ট টুপির মত তাঁবুকে বাতাস আর অক্সিজেনে ভরিয়ে তোলে। জলের মাকড়সাদের এই অক্সিজেন নিয়ে খাওয়ার পদ্ধতিটি তোমরা কল্পনাই করতে পারো না!

ফক্কড়

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় প্রত্যেক দিন শুনতে শুনতে লালটুর নিজেই কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, ও খারাপ ছেলে। পাড়ার লোকে বলে, বলুক, এমন কিছু যায় আসে না তাতে। কিন্তু বাড়ীতেও যে কেউ ভালো বলে না, সেইটেই আসলে ভাবনার কথা।

এটা অবশ্য ঠিক যে, ভাল ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই ওর। তা লেখাপড়াটা যে ওর দু'চক্ষের বিষ আর তাই ভালো ছেলেদের যদি ও পছন্দ নাই করতে পারে, তবে কি সেটা ওর দোষ বলে ধরতে হবে?

দোষ যারই হোক, দিনরাত্তির টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে আর মারপিট করলে, তাকে কি রকম ছেলেই বা বলা চলতে পারে! তাই, ছেলে বিগড়েছে ব'লে লালটুর মা যদি ও পাড়ার 'দিদি'র কাছে তাঁর গভীর দুঃখ প্রকাশ করেই বসেন—তাহলেই বা কি এমন দোষ দেওয়া যায় তাঁকে?

সত্যি কথা বলতে কি, লালটুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই হাল ছেড়ে দিয়েছেন সবাই। বাবা, মা, দিদিমা, দিদি—এমনকি বুড়ো রামলালটা পর্যন্ত। কিন্তু তাতে বয়েই গেছে লালটুর। ও জানে, মহাপুরুষরা ছোট বেলায় এই রকম দুষ্টুই ছিলেন। এতে চরিত্রের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধেই স্থির নিশ্চিন্ত হয় ও; আর যতই তা হয়—ততই বাবা-মাদের সম্বন্ধে বিস্ময় বাড়ে ওর।

তাই, সেদিন বাতাবী লেবু গাছটার তলায় গিয়ে ভাবতে বসল লালটু। অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে চিন্তা করল ও; ভুরু কোঁচকাল, ঠোঁট কামড়াল—তারপর নেহাতই নিরাশ হয়ে উঠে পড়ল।

নাঃ, বড় হতে না পারলে আর সুখ নেই জীবনে। বড় হতে হবে—খুব বড়ো। বাবার চেয়েও বড়ো—বুড়ো রামলালটার চেয়েও আরও অনেক—অনেক বড়ো। যখন টাকা হবে এই এ্যাত্তো—কত কিছু কেনা যাবে—গুলি, ঘুড়ি, মাঞ্জা দেওয়া সুতো, আর—আর সেই পায়ে ঘুঙুর বাঁধা আচারওয়ালাটার টকমিষ্টি আচার!

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোট দুটোকে একবার চেটে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল লালটু! হাঁটতে হাঁটতে মণ্টুদের বাড়ীর সামনে এসে পড়ল লালটু। বয়সে ছোট হ'লেও মণ্টু ওর বন্ধু।

তখন মিণ্টু রেয়াকের ওপর বসে গঁদের শিশি থেকে আঠা বার করছিল আর একটা শতছিন্ন ঘুড়িতে তালি মারছিল!

লালটু কাছে এসে প্যাণ্টের পকেটে একখানা হাত ঢুকিয়ে বলল,—কি করছিস্ রে?

এর আগে একদিন মণ্টুর খুব মারামারি হয়েছিল লালটুর সঙ্গে। তাই গলায় কিছুটা ঝাঁঝ ঢেলে মণ্টু বললে,—আহা, দেখতে পাচ্ছেন না যেন—

এটা কিন্তু গায়েই মাখল না লালটু। রোয়াকের ওপর একটা পা তুলে, পায়ের ওপর কনুইটা রাখল। তারপর মুখখানার ভার হাতের ওপর রেখে বলল,--ঘুড়ি জুড়ছিস্ বুঝি?

আরো খানিকটা আঠা বের করে ছোট্ট এক টুকরো নীল কাগজে লাগাতে লাগাতে ও বলল,—জান, এ ঘুড়িটা দাদা আমায় একেবারে দিয়ে দিয়েছে—আর কখনো চাইবে না, প্যাচ খেলে ঘুড়ি কেটে গেলেও না।

ঠোঁট উল্টে লালটু বললে,—যাঃ, ভারী তো ঘুড়ি ও দেখিস উড়বেই না—হুঁ, উড়বে না বইকি,—মুখ ভেঙচে উঠল মণ্টু,—কত দাম যান এটার?—খুব জানি,—অবজ্ঞায় চোখ বুজল লালটু,—ওরকম ঘুড়ি আমি ঢের ধরি—

ওদিকটায় এঁটে উঠতে না পেরে চটপট প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল মণ্টু,—তোমার তো আর লাটাই নেই—কিসে ঘুড়ি উড়োও শুনি?

লাটাই অবশ্য সত্যই ছিল না লালটুর। কিন্তু তাও কি স্বীকার করতে হবে এই বাচ্চা এতরত্তি ছেলেটার সামনে?

মুখটা একটু গম্ভীর ক'রে লালটু বললে,—নেই, হুঁ—তাই তো, ভারী জানিস কিনা।

ঘুড়িটার লেজে একটা কাগজ জুড়ে মণ্টু বললে,—আহা, দেখিনি যেন—কাঠের এই বেলুনটায় সুতো জড়িয়ে—

সহ্যের একটা সীমা আছে তো মানুষের? আর লালটুরও নিশ্চয়ই আছে তা? সুতরাং কতই বা আর সহ্য করা যায়। একটা ধমক দিয়ে উঠল ও,—চুপ কর্ বলছি, নইলে কেড়ে নোব ঘুড়ি—

ঘুড়িখানাকে একটা হাত দিয়ে আড়াল ক'রে মণ্টু বললে,—উঁঃ, নিলেই হ'ল কিনা—বলে দোব না দাদাকে—

—বল গে যানা—

—বলবোই তো। আর তখন যা পিটুনী দেবে না তোমাকে—

—দেখবি?- রেগে-মেগে দু'এক পা এগুতেই এমন চীৎকার জুড়ে দিল মণ্টু! আর, ওর দাদাটাও যেন তৈরী হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বারান্দা পেরিয়ে রোয়াকে এসে হাজির।—কী হয়েছে রে?

—এই দেখোনা দাদা,—মণ্টু গাঁইগুঁই করতে আরম্ভ করল,—লালটুদা'টা আমার ঘুড়ি কেড়ে নেবে বলছে—

মণ্টুর দাদা এবার লালটুর দিকে ফিরে বলল,—এই—কি হচ্ছে, গুণ্ডামী করার আর জায়গা পাওনি ?

লালটু আমতা আমতা ক'রে বলল,—বারে আমি তো শুধু—

মণ্টু মাঝখানে চিঁ চিঁ ক'রে বলে উঠল,—হুঁ, এখন দাদাকে দেখেছো কিনা—

—কি তুমি ?—ওর দাদা চীৎকার ক'রে উঠলেন।

একটা ঢোঁক গিলে লালটু বললে,—আমি তো কেবল বললাম, আমারও একটা লাটাই আছে—

মণ্টু বললে,—না গো দাদা, ওটা একটা মিথ্যুক ; আমি নিজে দেখেছি একটা বেলুনে সুতো জড়িয়ে ঘুড়ি উড়োয় ও।

—হ্যাঁ, তুই দেখেছিস্—উড়োই আমি ঘুড়ি ?

এবার ওর দাদা বললে,—বেশ তো, তাতে হয়েছে কি ?

মণ্টু খ্যানখেনিয়ে বলে উঠল,—ওর নেই, ও আছে বলবে কেন ?

লালটুও পাল্টা জবাব দিয়ে বলল,—ইস্, নেই বললেই হ'ল অমনি—মণ্টুর দাদা বললে,—আচ্ছা, আছে তো এক কাজ করো দিকি—দৌড়ে বাড়ী থেকে লাটাইটা নিয়ে এসো তো ?

মণ্টু চেঁচিয়ে উঠল,—যদি না আনতে পারে ?

মণ্টুর দাদা ভেতরে যেতে যেতে বললে,—না পারে তো সবাইকে বলে বেড়াবি যে ওটা একটা মিথ্যুক।

উত্তরে মণ্টুর চীৎকারটা না শুনেই বেরিয়ে এল লালটু। মাথার ভেতরটা কি রকম টন টন করছে। বুকটা ভয়ে কাঁপছে। মানে, সত্যিই তো আর ওর লাটাই-ফাটাই কিছু নেই—সেই জন্যই হয়ত।

কিন্তু লাটাই এক্ষুনিই কিনতে হবে একটা। নইলে ঠাট্টা যা সহ্য করতে হবে—উঃ ভাবাও যায় না !

একছুটে মার কাছে চলে এল লালটু। জড়িয়ে ধরল গলাটা। কুটনো কুটছিলেন উনি। বাঁ হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে দিয়ে বললেন,—আদিখ্যেতা দেখোনা বুড়ো ছেলের—সরে যা—

গলাটা ছেড়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে মিষ্টি ক'রে লালটু বললে,—আটআনা পয়সা দেবে মা ?

—আহা হা, পয়সা দেবো—পাবো কোথায় শুনি পয়সা ?

লালটু বুঝলো—মা এখন রেগে আছেন, তাই কথা বাড়াল না। আস্তে আস্তে দিদির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ওর দিদি তখন চান ক'রে সবে চুল আঁচড়াচ্ছিল। কাছে গিয়ে লালটু বললে,—পয়সা দিবি দিদি ?

কানের ওপর দিয়ে চুলগুলো ঘুরিয়ে নিতে নিতে ওর দিদি বললে,—পয়সা নেই যে, কি করবি কি ?

—একটা লাটাই কিনবো ; দেনা রে দিদি—

—পয়সা পাবো কোথায় রে, নেই সত্যি—

—হুঁ নেই, যখন কলেজ যাস্ তখন মানিব্যাগটা একেবারে ঝনঝন করে—

—ও যখন করে তখন করে; এখন নেই রে—

—দিবি না তো ?—লালটুর মুখটা কেমন যেন হ'য়ে গেল।

—বাবার কাছে চা না।

—হুঃ, দেবে যেন—দেনা রে দিদি—

—হাজার বার বলছি নেই নেই—ফের জ্বালাচ্ছিস্, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি ?

চোখে জল এসে গেল লালটুর। ওরা সবাই আঙুল দেখিয়ে হাসবে, ঠাট্টা করবে মিথ্যুক বলে—না, না এ হতে পারে না !

খাটের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল লালটু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

না, না, কেউ ওকে ভালবাসে না—কেউ না। মা, বাবা, দিদিমা—এমনকি দিদিটা-সুদ্ধ নয়। নইলে কত তো পয়সা ওদের, আটআনা পয়সা আর দেওয়া যায় না ?

উঃ, এতদিন কি ভুলটাই না ক'রে এসেছে ও। ওই দিদির জন্যেই ও একমাইল হেঁটে বই এনে দিয়েছে গল্পের ; ওরই জন্যে জ্বরের সময় লুকিয়ে লুকিয়ে আচার দিয়ে এসেছে ও।

না না—আজ ওর সব ভুল ভেঙে গেল। এ বাড়ীর সব কটা লোকই নির্দয়, পাষাণ। দয়া-মায়া ওদের নেই, কিচ্ছু নেই।

একটু পরেই লালটুর মা ঘরে ঢুকে বললেন,—এই, চান করে খাবি চ'—

সব রাগ এবার মার ওপর গিয়ে পড়ল লালটুর। চীৎকার ক'রে উঠল ও,—আমি কিচ্ছু খাবনা যাও—কিচ্ছু না। তোমরা সব খাও গাদা গাদা করে—আমি চানও করবো না, ভাতও খাবো না—তোমরা কেউ আমাকে দেখতে পারো না—

প্রথমটা একটু থমকে গেলেও সেটা সামলে নিয়ে লালটুর বললেন,—বেশ তো, না খেলি নাই খেলি—আমার আর ভাত হজম হবে না—লালটুও মুখ না তুলে গোঁজ হয়ে পড়ে রইল, আর অবাধ্য ফোঁপানিগুলোকে নিঃশব্দে হজম করতে লাগল।

এরকম করে কখন একসময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে—তা টেরই পায়নি লালটু।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন আড়-চোখে চেয়ে দেখল, বাতাবী নেবু গাছের ঠিক পায়ের কাছে, এসে পড়েছে রদ্দুরটা। মানে বিকেল হয়েছে।

উঃ, পেটটা কেমন যেন মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে। আচ্ছা, একেই কি ক্ষিধে বলে? তাহলে তো না খেয়ে বড্ড ভুল হয়ে গেছে! কিন্তু মা কি আর আসবে না—আর একবারও খেতে বলবে না? অন্ততঃ একবার?

মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল লালটু। উঃ, একটিবার বলুক না কেউ—একটিবার। চোখ বন্ধ ক'রে উথলে আসা কান্না চাপতে লাগল লালটু।

'আমি কি পয়সা রোজগার করি?'—পৃঃ ৮৫

কারো পায়ের শব্দ এগিয়ে এল না? আসছে—সত্যি?

কাঠ হয়ে পড়ে রইল লালটু। ওর মা সত্যিই এলেন। মুখের সামনে দুটো সিকি ফেলে দিয়ে বললেন,—ধন্যি ছেলে বাবা—কি গোঁ রে—নে বাবা নে, ধর পয়সা; হলো তো?

ওই তো, ওই তো! চোখের মণি দুটো চকচক ক'রে উঠল লালটুর। এক লাফে উঠে পড়ে সিকি দুটো তুলে নিল ও। তার পরই দৌড়। ওর মা চেঁচিয়ে উঠলেন,—আরে শোন্, শোন—খেয়ে যা—শোন—

আর শোন্, লালটু তখন অর্ধেক পথ। পৌছতেও দেরি হ'ল না। ওই তো কত রক-মারী সব লাটাই ঝুলছে। আঃ, কী সুন্দর! মুটোয় ক'রে পয়সা নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল ও।

—কিছু ভিক্ষে দেবে গো খোকাবাবু?

ভিখারী একটা। আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে গেল লালটু।—কিছু দাও গো খোকাবাবু?

কটমট ক'রে একবার তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল ও,—আমি কি পয়সা রোজকার করি—তবে পাবো কোথায় শুনি?

—তিনদিন কিছু খাইনি গো—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—আর আমি বাঁচবো না, খোকাবাবু!

—তিন দিন!—সবিস্ময়ে তাকিয়ে আর নিজের এক বেলার উপোসটার সঙ্গে তুলনা করে ওর মাথা ঘুরে গেল। তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ও বলল,—ছেলেমানুষ পেয়ে খুব মজা না? যাও যাও, আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না—

উঃ, খোকাবাবু—বড় ক্ষিধে—আর আমি বাঁচবো না খোকাবাবু—

সামনেই লাটাইগুলো ঝুলছে। দুলছে হাওয়ায়। কি সুন্দর! আর হাতের মুঠোয় ঘামছে দুটো সিকি! বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠল লালটুর। দোকানীকে পয়সাটা দিতে গিয়েও নেমে এল ও। আর তারপর হঠাৎ—হ্যাঁ, প্রায় হঠাৎই সিকি দুটো গুঁজে দিল ও ভিখারীটার হাতের মধ্যে।

কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল লালটু। দিদি আসছে। এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীর আঁচলটা ও চেপে ধরল দিদির। তারপর টেনে টেনে বললে,—লক্ষ্মীটি দিদি মাকে বলিস্ না রে—পয়সাটা না আমি ওই ভিখিরীটাকে দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা বল্, ওর বুঝি আর ক্ষিধে পায় না? তিনদিন ও না খেয়ে রয়েছে রে—কিচ্ছুটি না—আবেগে গলার স্বর বুজে এল লালটুর।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল লালটুর দিদি। বলে দেবার কথা ও ভাবছিল না, ভাবছিল ওই সিকি দুটোর কথা। ওর জন্য আজ কত কান্নাকাটি করেছে—খায়নি ও সারাটা বেলা, আর তাই দিয়ে কিনা—

তবু কোন রকম করে বলে ফেলল ও,—লাটাই কিনবি না?

—না রে দিদি, থাক। না হয় ওদের ঠাট্টাই শুনব রে একটু! না হয় ওরা আমাকে মিথ্যুকই বলবে—বলুক; সে আমি খুব সহ্য করতে পারব। কিন্তু পয়সাটা না পেলে হয়ত ও আর বাঁচতোই না রে দিদি!—চোখের জল আর সামলাতে পারল না লালটু। লালটুর দিদির চোখেও কিন্তু তখন টলটল করছে দু'ফোঁটা অশ্রু।

সে সব দেখে কেমন যেন হয়ে গেল লালটু। কোন রকমে দিদির কোলে মাথাটা গুঁজে দিয়ে ব'লে ফেলল,—ওকে কিছু বলিস্ না রে দিদি—লক্ষ্মীটি, কিচ্ছু বলিস্ না রে—

তবু মস্তান বলে!

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা তরুণ মিলে বিদ্বেষ ভুলে,
প্রত্যেক পুজোতেই মোটা চাঁদা তুলে,
পথ ঘিরে, মাঠ নিয়ে ক'রে বারোয়ারি
দেখাই যে বিজলীর খেল্ রকমারি!
ভাসানে মিছিল ট্রাম বাস রুখে চলে।
লোকে আমাদের তবু মস্তান বলে!

ঢাকে ঢোলে চীৎকারে সারা পাড়া জমে।
লাউড-স্পীকারে গান গায় পুরো দমে।
জলসায় যাত্রায় সিনেমা ম্যাজিকে
আনন্দ হুল্লোড় চলে দিকে দিকে।
আজো বেঁচে আছে পুজো বারোয়ারি তলে।
লোকে আমাদের তবু মস্তান বলে!

কতো মেহনতী জন খাটে এর তরে!
গাইয়ে বাজিয়ে আনি ধরে চড়া দরে!
লরি, ব্যাণ্ড, মাইকের কতো ঠিকেদার
ঘরামী, বেকারদলও করে রোজগার।
করছি তো জনসেবা বারোয়ারি ছলে।
লোকে আমাদের তবু মস্তান বলে!

আমরা পাড়ার বল কাজেতে দেখাই
বোতলে বোমায় ইটে শত্রু ঠেকাই।
পথে ব্যাট, ফুটবল খেলে করি দম।
কারো বা শার্সি ভাঙি, পথিক জখম।
নামী খেলোয়াড় হোতে পারি তারি ফলে।
লোকে আমাদের তবু মস্তান বলে!

হ্যানিবল

শ্রীশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো গোঁফের রেখা দেখা দেয়নি—গোঁফ গজাবার স্থানটাও কালচে হয়ে ওঠেনি—গলার আওয়াজও বোধহয় তেমন পুরুষালি হয়ে ওঠেনি। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এই ছেলেটির বয়স বড়জোর বারো হলেও, নেই তার আচরণে বালকোচিত ভাব বা ছেলেমানুষি। তার হাত ধরে মাঝবয়সী একজন প্রৌঢ় লোক, এনে দাঁড় করালেন এক মন্দিরের মধ্যে যুদ্ধ-দেবতার মূর্তির সামনে। তারপর অতি গম্ভীর স্বরে তাকে বললেন প্রতিজ্ঞা করতে,—যে, সে যেন কোনদিন কোন কারণে কার্থেজের মহাশত্রু রোমকে না ক্ষমা করে তার দেহে প্রাণ থাকতে।

ছেলেটির নাম হ্যানিবল ও প্রৌঢ় লোকটির নাম হ্যামিলকার বার্কা—তার বাবা। এই সময় চলেছিল রোম ও কার্থেজের মধ্যে এক জীবন-মরণ যুদ্ধ। কয়েক বছরের ব্যবধানে সবশুদ্ধ তিনটি যুদ্ধ হয় এবং যার ফলে কার্থেজ হয় একদম বিধ্বস্ত। তৃতীয় যুদ্ধের পর রোমানরা কার্থেজ শহরটিকে এমন ভাবে ভেঙেচুরে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় যে, তার আর কিছুই থাকেনি, আর সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর তারা লাঙল চালিয়ে, নদী থেকে খাল কেটে জল এনে তাকে প্লাবিত করে তার ওপর বুনো ঘাসের বীজ এনে ছড়িয়ে দেয়, যাতে রোমান সিনেটর কেটোর (Cato) বচন 'কার্থেজ ধ্বংস হোক' সফল হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী বীর বলে যাঁরা খ্যাত, তাঁদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার, সিজার,

তৈমুর, চেঙ্গিস বা নেপোলিয়ানের মতই হ্যানিবল ছিলেন একজন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর বিষয় অনেক কিছুই আজও অজ্ঞাত। যা জানা যায়, তার থেকে তাঁকে একজন কাটগোঁয়ার যুদ্ধ-কঠিন মানুষ বলেই মনে হয়। মাটির টালিতে খোদাই করা তাঁর যুদ্ধকালীন আদেশ-নির্দেশ যা পাওয়া গেছে, ও তাঁর সম্বন্ধে যেসব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার থেকে ঐতিহাসিক, লেখক বা গ্রন্থকারদের হ্যানিবল সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে তাই সম্বল করতে হয়। তাঁর পক্ষে সেরকম হওয়াটাও বিচিত্র নয়, কারণ তাঁর সারা জীবনই প্রায় কেটে যায় রোমের সঙ্গে যুদ্ধ করে। বলতে গেলে তিনি ছিলেন প্রায় আজীবন যুদ্ধক্ষেত্রবাসী-যোদ্ধা। কেবল মার-মার, কাটকাট, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত ও যুদ্ধের ভয়াবহতাই তিনি দেখেছেন চিরকাল।

রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কার্থেজের সিনেটর হ্যমিলকার বার্কা বোঝেন যে, ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে রোমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বৃথা—চাই রোমানদের মত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা, যারা স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দেবে। অন্যান্য সিনেটরদের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ার ফলে, তিনি আফ্রিকার অন্তর্গত কার্থেজ ত্যাগ করে চলে যান দক্ষিণ স্পেনের উপকূলে, ফ্রান্স্ ও স্পেনের সীমানার কাছে পিরেনিস্ পর্বতের পাদদেশে নোভা কার্থেগো (নতুন কার্থেজ) নগর ও বন্দর প্রতিষ্ঠা করতে। অতি অল্পকালের মধ্যে এই বন্দর একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-নগরী হয়ে উঠলো—লক্ষ্মীর কৃপালাভ করে হলো সমৃদ্ধ।

তখন হ্যানিবল নবীন যুবক—হঠাৎ তাঁর বাবা মারা গেলেন। ফলে তাঁর বাবার হাতে গড়া সৈন্যদলের নেতা হলেন তিনি। সুশিক্ষিত রণদক্ষ রোমের সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তিনি সেই সেনাবাহিনীকে গড়ে তুললেন। তারপর সেই বিশাল সুশিক্ষিত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন রোমের বিরুদ্ধে।

ইউরোপের হিমালয় হলো আল্পস্ পর্বত, যা তখন পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করেনি। করাটা এক অসম্ভব ব্যাপার বলেই সকলে জানতো। তাকেই অতিক্রম করে সসৈন্যে তিনি উত্তর ইটালি থেকে গিয়ে পড়বেন রোমে ও রোম জয় করবেন। এটাই হলো তাঁর এক মারাত্মক ভুল, আর তার ওপর শীতকালে তা করা আরও বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তাঁর বিশাল বাহিনীর অর্ধেক ধ্বংস হয়, তাঁর নিজের একটা চোখ কানা হয়ে যায়; আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় তাঁর ছত্রিশটি শিক্ষিত রণহস্তির মাত্র ছয়টি ছাড়া বাকী সব-ক'টি মারা যায়। এই শিক্ষিত হস্তি-বাহিনী ব্যবহার করা ছিল রোমানদের ধ্বংস করার এক প্রধান উপায়। রোমান সেনাপতি রেগুলাসকে পরাস্ত ও বন্দী করেন সেনাপতি জ্যানথিপাস্ অতি অল্প সৈন্যক্ষয় করে এক হস্তি-বাহিনীর সহায়তায়।

এক একটি হাতির পিঠ ছিল এক একটি সচল দুর্গবিশেষ, যার ওপর থেকে সৈন্যরা তীর ও বর্শা শত্রু বাহিনীর ওপর অজস্রধারায় বর্ষণ করতে পারতো। এদের রোমান্‌রা যমের মত ভয় করতো। কে জানে কেন হ্যানিবল এই মস্ত ভুল করলেন।

এইবার আসা যাক্ দ্বিতীয় ভাগে—যুদ্ধের ব্যাপারে। সব সমেত রোমের সঙ্গে বড় রকমের প্রায় পাঁচটা যুদ্ধ হয়। তবে এ ছাড়া ছোটখাটো সংঘর্ষ আরও হয়েছিল। সর্বপ্রথম দুই পক্ষে যুদ্ধ হয় ট্রিবিয়ায়—যে যুদ্ধে তাঁরই জয় হয়, রোমান্‌রা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এর পর বিপুল সংখ্যায় রোমানরা আবার দ্বিতীয় বার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় টিকিনাসে। কিন্তু এবারও তাদের ভাগ্যবিপর্যয় হয়। দুই দলই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নিজের দেশের মান রক্ষার জন্য সুরু করে প্রচণ্ড এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সারাদিন হাতির পিঠে বসে বসে হ্যানিবল যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করছেন—বেলার শেষে রোমানরা ক্লান্তি প্রকাশ করতে ও অসতর্ক হতেই তিনি নতুন একদল সৈন্য নিয়ে রোমান ব্যূহ আক্রমণ করতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল—অনেকে বন্দী হলো, আবার অনেকে যুদ্ধে প্রাণ দিলো।

এর পর যুদ্ধ হয় ট্রেসিমিন হ্রদের তীরে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় যুদ্ধের মধ্যে বেশ কিছুকালের ব্যবধান ছিল, কারণ এবারকার রোমান সেনাপতি এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি সম্মুখযুদ্ধ ত্যাগ করে হঠাৎ অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করে, তাদের যতজনকে সম্ভব হত্যা করে, শত্রু-সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে ও তাদের রসদ-সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করে তাদের দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। এর ফলে তাঁর নামই হয়ে যায় The cunctator বা The delayer.

এই সময় রোমের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। হ্যানিবলের সামনে এই সময় রোমের রাজধানী রোম নগরীর দ্বার একদম্ খোলাছিল, যা তিনি সহজেই দখল করতে পারতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তা তিনি কেন করেন নি—তা বোঝা শক্ত। জানা যায় যে, তাঁর সেনাদলের প্রধান সেনাপতি মহারবল এক সময় রোম নগর দখল করবার জন্যে প্রায় পেড়াপীড়ি করেন, কিন্তু হ্যানিবল্ তাতে রাজী হননি—তিনি বলেছিলেন যে, তিনি যদি হ্যানিবল না হয়ে মহারবল্ হতেন, তা হলে তিনি তাই করতেন। রোম দখল না করে সেটা সম্পূর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও কেন তিনি তা ছেড়ে দেন, তার কারণ সঠিক জানা যায় না।

এর পর আসে হ্যানিবলের শেষ বড় যুদ্ধ। যে যুদ্ধ তিনি জয় করেন অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে। এতকাল তিনি স্বদেশের কাছে কোন সাহায্য না পেয়ে একাই

সব যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক কমে গেছে, তাও কেনিতে তাঁর চেয়ে অনেক বড় এক রোমান সৈন্যদলের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন। এই সময় তাঁর হাতির সংখ্যা মাত্র তিনটিতে দাঁড়িয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, কেনির যুদ্ধ হলো 'A battle of vast encirclement.' তাই বোধহয় ছিল কিনিতে হ্যানিবলের যুদ্ধ-কৌশল। খুব সকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও সারাদিন চলে। বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে রোমানরা চেয়েছিল হ্যানিবল-বাহিনীকে একদম চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে, কিন্তু তা আর তারা করতে পারলো না, তারা শেষ পর্যন্ত নিজেরাই দলে দলে হ'ত হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত হ্যানিবলই জয়লাভ করেন ও রোম পূর্বেকার মতই আবার অতি শোচনীয়-ভাবেই পরাস্ত হয়। কিন্তু এই তাদের শেষ পরাজয় আর অন্য দিকে হ্যানিবলের শেষ জয়। ঐতিহাসিকরা তাই বলেছেন, 'This was the high water-mark of his success.'

কেনির যুদ্ধের পর হ্যানিবল জয়ী হওয়া সত্ত্বেও খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন, আর সৈন্যদের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হতে দেখা যায় তাঁকে। বার বার যুদ্ধ করে তাঁর বহু সৈন্যক্ষয় হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের শূন্যস্থান আর পূরণ হয়নি। এর জন্য তিনি শত্রুভাবাপন্ন বা তাঁর প্রতি বিরূপ খোদ কার্থেজেও সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠান। বলা বাহুল্য, তাঁর দূত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তখন তিনি চেষ্টা করলেন রোমের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রাজ্য-গুলিকে রোমের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে। কিন্তু তাও সফল হলো না। একটিমাত্র পদানত রাজ্য রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু রোমানরা এই বিদ্রোহ এমন নিষ্ঠুরভাবে দমন করে যে আর কেউ পরবর্তীকালে রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেনি।

এসব যখন ব্যর্থ হলো, তখন তিনি স্পেনে নিজের রাজ্যে তাঁর খুড়ো হাসড্রু-বলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এক দূত পাঠান। কিন্তু হায়! অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। মেটোরাসের যুদ্ধে রোমান সেনাপতি সিপিয়ো অ্যাফ্রিকেনাস্ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নিহত করেন। হ্যানিবলের সাহায্যেই তিনি আসছিলেন সেনাদল নিয়ে। সুতরাং হ্যানিবলের বাইরে থেকে সাহায্যলাভের আর কোন উপায়ই রইলো না।

এইবার আসে এই মহাবীরের জীবননাট্যের শেষ অংশ। কার্থেজ অবরুদ্ধ রোমানদের দ্বারা। কার্থেজের অবরুদ্ধ হওয়ায় তার অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, রোমের সঙ্গে সে সন্ধি বা শান্তিস্থাপন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রোম কার্থেজকে একটি সর্তে শান্তিস্থাপন করতে বলে। যার মধ্যে প্রধান সর্ত হলো যে, তাকে রোমের হাতে হ্যানিবলকে সমর্পণ করতে হবে। হ্যানিবলের এর ফলে আরও বিপদ বাড়লো, কারণ কার্থেজ এতে সম্মত হয় ও সে হ্যনিবলকে রোমের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যে লোক লাগায়।

হ্যানিবল এখন জামায়। রোমানরা তাঁর দুর্বলতা বা অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পেরে নতুন করে আবার এলো তাঁকে আক্রমণ করতে। মেটোরাসের যুদ্ধের খবর তখনও তিনি জানেন না—তাঁর শিবিরের প্রাঙ্গণে তিনি পায়চারি করছেন—এমন সময় রোমানরাই সে খবর তাঁকে জানিয়ে দিলে এক বিচিত্র উপায়ে। হঠাৎ তার শিবিরে তাঁর এক খুড়ো হ্যাস্‌ড্রুবলের কাটা মুণ্ড দেখে তিনি বুঝলেন যে সাহায্যের আর কোন আশা নেই। এরপর শেষ যুদ্ধ হলো জামায়তে, আর বহুচেষ্টা করেও এবার আর হ্যানিবল জয়লাভ করতে পারলেন না। তাঁর সৈন্যদল হলো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।

এর পর আর বেশী দিন হ্যানিবল বাঁচেন নি। জীবন তাঁর হয়ে ওঠে অতি দুর্বিষহ—যেদিকেই যান সেদিকেই শত্রু—তাঁকে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তখন অনেকে। এই ভাবে প্রাণের ভয়ে তখন এই মহাবীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শেষে একদিন পাছে তিনি শত্রু হস্তে ধরা পড়েন, সেই ভয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এইভাবে শেষ হয় এক দিগ্বিজয়ী মহাবীরের জীবন!

সুশীল ও নিরুবালা বিশেষ প্রতিযোগিতা

১ম পুরস্কার ১৫·০০, ২য় পুরস্কার ১০·০০, ৩য় পুরস্কার ৫·০০

ভারতের বিশিষ্ট দশজন ব্যক্তির নাম

বর্তমান ভারতের ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে খ্যাত এমন প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট দশজন ব্যক্তির নাম পর পর একটি কাগজে লিখে পাঠাতে হবে আমাদের অফিসের ঠিকানায়, আগামী শ্রাবণ (১৩৭৭) মাসের শেষ তারিখের মধ্যে। মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে আগামী তিন মাসের (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ) মৌচাকের কভারের মধ্যে থেকে 'সুধীরচন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত' ছাপা লেখাটি কেটে পাঠাতে হবে প্রত্যেক প্রতিযোগিতার সঙ্গে। যাদের নামগুলি আমাদের স্থির করা নামের সঙ্গে মিলে যাবে, অথবা কাছাকাছি হবে, তাদেরই ক্রমানুসারে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার প্রাপ্তদের নামগুলি ঘোষণা করা হবে আশ্বিন মাসের মৌচাকে। খামের উপরে 'প্রতিযোগিতা' কথাটি অবশ্যই লিখে দেওয়া চাই।

আত্মমুখী মাছ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কাঁকড়া সব সময়েই বোধহয় মনে করে, চারদিকেই তার শত্রু! সেই জন্য চলবার সময় সে তার সাঁড়াশীর মত হাত দুটি উঁচু করে চলে। ভাবখানা, দেখছ তো ধারালো সাঁড়াশী,—গায়ে হাত দিতে এলেই কেটে দু'খানা করে দেবো।

কাঁকড়-মাছ কচ্ছপের মত উভচর। এরা জলে বা ডাঙায় বাস করতে পারে। এদের দুটো মুখ, কোন কোন কাঁকড়ার তিনটে মুখও আছে। কাঁকড়ার উভয় পাশে পাঁচখানি করে দশখানি পা। তার মধ্যে দুখানিকে পা না ব'লে হাত বলাই ভালো। এর সাহায্যে এরা চলে না—শত্রুকে আক্রমণ, খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি এই মোটা এবং সাঁড়াশীর মত হাত দুখানি দিয়ে করে।

দৌড়িয়ে পালাবার সময় এরা এই হাত দু'খানি সামনের দিকে উঁচু করে রাখে। সঁড়াশীর মত হাতের মাথায় ধারালো কাঁটাও আছে এদের। কেউ ধরতে এলে এই সাঁড়াশী দিয়ে এমন ভাবে চিমটে ধরে যে, কিছুতেই ছাড়ানো যায় না; এমন কি হাত দুটি ভেঙে দিলেও তার মোক্ষম কামড় শিথিল হয় না!

জেলেরা ঝাঁকায় করে যখন এদের বিক্রী করতে আনে, তখন এরা দুড়দাড় পালাতে চেষ্টা করে। চিমটে বা সঁড়াশী দিয়ে তখন এদের ধরা হয়। হাত দিয়ে ধরতে গেলে রক্তপাত করে দিতে পারে।

কাঁকড়া একটা কিছু হাতের কাছে পেলেই যে তার সাঁড়াশীর মত হাত দিয়ে চিমটে ধরে—এখবর ধূর্ত্ত শেয়াল কিন্তু বেশ রাখে। নদী, পুকুর বা খালের ধারে কাঁকড়া উঁচু করে মাটি তুলে গর্ত্ত ক'রে নিয়ে তার মধ্যে অনেক সময় বাস করে। শেয়াল সেখানে গিয়ে তার লম্বা লোমওয়ালা লেজের ডগাটা ঢুকিয়ে দেয় সেই গর্ত্তের মধ্যে। কাঁকড়া অমনি মোক্ষমভাবে চিমটে ধরে শেয়ালের লেজের সেই লোমগুলি। এতে শেয়ালের ব্যথা লাগে না কিছু। তারপর ধীরে ধীরে শেয়াল তার লেজটি টেনে নেয় উপরে। সঙ্গে সঙ্গে অতি সাবধানী, সদা উদ্যত খড়্গ কাঁকড়াও ধরা পড়ে যায় শেয়ালের কাছে। এইজন্য কাঁকড়ার গর্ত্তের আশেপাশে প্রায়ই তাদের খোলা দেখতে পাওয়া যায়। শেয়াল, কাঁকড়া খেতে খুব ভালোবাসে।

মানুষেও কম ভালোবাসে না কাঁকড়া খেতে। সুন্দরবনের 'হোবো' কাঁকড়া বেশ বড় হয়। তার দেহও বেশ মাংসল এবং সুস্বাদু। সুন্দরবন নদীবহুল জায়গা। জোয়ার আসলে এইসব নদী কানায় কানায় ভরে যায়। আবার ভাঁটার সময় অনেক নদীতে একেবারেই জল থাকে না। তখন কাঁকড়া প্রভৃতি মাছের হয় বিপদ। কাদার মধ্যে যখন তারা ছুটাছুটি করতে থাকে তখন ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাদের চিমটে দিয়ে ধ'রে মাটির কলসীর মধ্যে ফেলে রাখে। অনেক পাখীতেও এই সময় কাঁকড়া ও অন্যান্য মাছ ধরে খায়।

কাঁকড়ার দেহের আবরণটা একটা সাঁজোয়া গাড়ীর মত দুর্গবিশেষ। মাথা বলতে যা বুঝায় তা এদের একেবারেই নেই।

কোন কোন সমুদ্র-উপকূলে আর এক রকম কাঁকড়া দেখা যায়। এদের masked-crab বা মুখোস-পরা কাঁকড়া বলা হয়। পাথরের উপর মানুষের মুখ খোদাই করলে যেমন হয়, এদেরও খোলের উপর ঠিক তেমনি মানুষের মুখের মত আকৃতি দেখা যায়। এদের স্ত্রী-জাতীয় কাকড়া আকারে হয় ছোট এবং পুরুষ জাতীয়দের আকৃতি ও হাত দুটি হয় বড়।

পুরী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে অন্যান্য কাকড়ার সঙ্গে সন্ন্যাসী কাকড়ারও (hermit-crab) আমদানী খুব। অন্যান্য কাকড়ার সঙ্গে এদের বিশেষ পার্থক্য এই যে, এদের দেহটাকে সুরক্ষিত করবার শক্ত আবরণ নেই। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য এদের কৌশল গ্রহণ করতে হয়। সে বুদ্ধিও এদের আছে। সমুদ্র উপকূলে নানারকম শামুকের খোলের অভাব নেই। যার দেহে যেমনটি ফিট করে, এমন শামুকের খোল বেছে নিয়ে দেহের পেছন দিকটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। চলবার সময় ওরা ঐ দুর্গের ভিতর থেকে হাত-পা বের করে মাটি আঁকড়ে চলে, আর দুর্গটাও চলে সেই সঙ্গে সঙ্গে! কিন্তু দেহটা তো বাড়বে। তখন? হাঁ, সে ব্যবস্থাও ওরা জানে। ঐ ছোট খোল থেকে বেরিয়ে আর একটা বড় খোলের মধ্যে ওরা দেহটাতে ঢুকিয়ে নেয় তখন

বিভিন্ন ধরণের আর এক রকমের কাঁকড়া দেখতে পাওয়া যায়। এরা জাপান উত্তর আমেরিকা এবং ভূমধ্য সাগরের তীর-ভূমিতে বাস করে। এদের মোটা ধারালো হাত দু'খানির একখানি বেশ বড় এবং আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট। জোয়ার আসবার আগে এরা তা টের পায় এবং উল্লাসে যেন নৃত্য করতে থাকে। তখন একখানি হাত আর একখানির সঙ্গে ধরে এবং এমন ভাবে নাড়তে আরম্ভ করে যেন মনে হয় সে বেহালা বাজাচ্ছে! জোয়ারের আগমনে এদের উল্লাসিত হওয়ার কারণ, খুব ছোট ছোট সামুদ্রিক জীব আসে জোয়ারের সঙ্গে! বেহালা বাদক কাঁকড়া ঐগুলি ধরে ধরে খায়।

এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য—বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এদের গায়ের রংয়েরও পরিবর্তন হয়। বারোটার সময় আস্তে আস্তে এরা একেবারে কালো হয়ে যায়। আবার সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে যাওয়ার সঙ্গে এদের বর্ণটাও ক্রমে উজ্জল হয়ে পড়ে। আকাশে সূর্য না উঠলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে এদের রং বদলানোর কোনও ব্যতিক্রম হয় না!

কি ক'রে এরা ঘড়ির সঙ্গে মিল রেখে ঠিক ঠিক সময় জানতে পারে, বিজ্ঞানীরা তা বহু অনুসন্ধান করেও কিছু বুঝতে পারছেন না।

পুতুল নিয়ে

বিশ্বপ্রিয়

পুতুল নিয়ে তুতুল সোনার নিত্য বাড়া বাড়ি—
চাই পুতুলের জামা, জুতো, নতুন শীতের সাড়ী।
শীত পড়েছে হাড়-কাঁপুনী ঃ
কাশ্মীরি শাল চাই এখুনি,
তিব্বতী এক কম্বলও চাই—দাম ওজনে ভারী।।

মা শুনে তাঁর মেয়ের কথা, বলেন সোজাসুজি—
"তুতুল তোমার বায়নাকার পাইনে মানে খুঁজি।
শীত-পোষাকে, কোথায় বা কে,
পুতুল-টুতুল যত্নে ঢাকে—?"
তুতুল শুধায়,—"পুতুল হলে শীত লাগেনা বুঝি ?"

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রায় তিন-চার মাস নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। মধ্যে মধ্যে সিংহ শিকার করা ও দু'একটা দাঁতালো হাতী মারা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি।

লাইন বসাবার কাজ বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলছিল। ইতিমধ্যে রজতদের তাঁবু কয়েকস্থানে সরাতে হয়েছে। তারা ক্রমশঃ দেশের গভীরতর অঞ্চলে উপনীত হ'ল।

স্থানে স্থানে কাফ্রীদের বাস। তারা আগন্তুকদের কার্যকলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। বন কেটে লাইন বসাবার কাজকে তারা ভাল চোখে দেখে না। নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বহুপুরুষ ধরে তারা বাস করে আসছে। তার উচ্ছেদকে তারা অমঙ্গলের সূচনা বলে মনে করে। কিন্তু প্রকাশ্যে সাহস করে কিছু বলতে পারে না। তারা এদের বন্দুককে ভয় করে। আগুনের ঝিলিক দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজের মত আওয়াজ হয়, আর দূরের জানোয়ারটা ছটফট করতে করতে মারা যায়। কি করে যে এটা সম্ভব হয় তা তারা বুঝতে পারে না। ফলে তাদের মনে এদের প্রতি একটা ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় বিরাজ করতে থাকে।

এই সময়ে একদিন অপরাহ্নে রজতকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে লিলি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে নানা স্থানে খোঁজ করলো, অনেককে জিজ্ঞাসাও করলো। কিন্তু কেউই তার সন্ধান দিতে না পারলে সে তার বাবাকে জানালো।

মিঃ পিয়ার্স´ন তৎক্ষণাৎ নানা দিকে রজতের খোঁজে লোক পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে একজন এসে খবর দিলে যে, বনের মধ্যে এক জায়গায় রজতের রাইফেল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রজতের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। একথা শুনে অনেকেই মনে করলো যে, তাকে সিংহ ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কয়েক জন লোক সঙ্গে নিয়ে মিঃ পিয়ার্স´ন সে স্থানে গমন করে রজতের বন্দুকটিকে পড়ে থাকতে দেখলেন। কিন্তু আশপাশে সিংহের পদচিহ্ন দেখতে না পেয়ে তাঁরা বিস্মিত হলেন। বন্দুক ফেলে রেখে আফ্রিকার বনের মধ্যে রজত যে কোথাও যেতে পারে সে-কথা তাঁরা ভাবতেই পারলেন না। তবে সে কোথায় গেল ?

একজন কাফ্রী হঠাৎ নীচু হয়ে মাটিতে কি দেখে অস্ফুট চীৎকার করে অন্য কাফ্রীদের কি বললে। মিঃ পিয়ার্স´ন উৎসুক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাতে একজন বলে উঠলো, 'সাহেব, বাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

মিঃ পিয়ার্স´ন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রজতকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ? সে কি ? কারা ধরে নিয়ে গেল ? তারা ক'জন ছিল বলতে পার ?'

কাফ্রীরা সাধারণতঃ পদচিহ্ন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের এসব শিখতে হয়। জন্তু ও মানুষের পদচিহ্ন দেখে তাদের সংখ্যা, কোন্ শ্রেণীর প্রাণী, বলিষ্ঠ কি দুর্বল, কতক্ষণ আগে সে পথ দিয়ে গিয়েছে—এ সব কথা তারা বলে দিতে পারে। এ কাফ্রীটিও এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ। সে পদচিহ্ন-গুলিকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর বলে উঠলো, 'সাহেব, এখানে চার জোড়া খালি পায়ের সঙ্গে তিন জোড়া জুতোর ছাপ রয়েছে। রজতবাবুকে এরা চারজনে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার হুজুর! যে দু'জন রজতবাবুর সঙ্গে এসেছিল তারা এখান থেকে ফিরে গিয়েছে।

তার কথা শুনে মিঃ পিয়ার্স´নও কম বিস্মিত হননি। তিনিও পদচিহ্ন লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে, যারা রজতের সাথী হয়ে এসেছিল, তারা রজতের বিপদের সময়ে কোন সাহায্য তো করেই নি, অধিকন্তু তারা যে রকম স্বচ্ছন্দ গতিতে ফিরে গিয়েছে তাতে স্বভাবতই মনে হয় যে, তারা রজতকে ধরিয়ে দেবার জন্যই এখানে এনেছিল।

মিঃ পিয়ার্স´ন চিন্তা করতে লাগলেন। দলের মধ্যে এমন কারা আছে যারা রজতকে বিপদে ফেলে সুখী হবে। জাহাজের ঘটনার কথাও তাঁর মনে পড়ে গেল। যারা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল, তারাই যে তাকে মেরে ফেলার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করেছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, তারা তাঁর দলের মধ্যেই আছে। সমস্ত সময়েই সঙ্গে সঙ্গে থেকে তারা রজতের সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

এমন সময়ে একজন ভারতীয় কুলি জানালো যে, ষ্টোর বাবুর ঘরে গত কাল দুপুরে একজন অপরিচিত কাফ্রীর অনেকক্ষণ ধরে কি কথাবার্তা হচ্ছিল। তার মুখে কয়েকবার রজতবাবুর নামও শোনা গিয়েছিল।

সাহেবের আদেশে তখনই একজন গিয়ে ষ্টোরবাবুকে ডেকে নিয়ে এল।

ষ্টোরবাবুর নাম কৈলাসচন্দ্র মান্না। রজতকে খুঁজে না পাওয়ায় সে যে খুব দুঃখিত হয়েছে, সে কথা প্রকাশ করতে লাগলো।

সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রজতকে সঙ্গে নিয়ে এখানে তুমি কখন এসেছিলে?'

কৈলাস বললে, 'আমার নিজের কাজই শেষ করে উঠতে পারি না স্যার, আমি আবার বেড়াতে বেরোব? আর এ তো শহর নয়! এ হচ্ছে সিংহের আড্ডা। এখানে কে সখ্ করে সিংহের খাদ্য হতে যাবে বলুন, স্যার। স্যার এই তো রজতবাবু, আহা তার মত ছেলে হয় না। তার কি হ'ল কে জানে?'

মিঃ পিয়ার্সন কৈলাসের চালাকীতে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'এদিকে এস কৈলাস। তোমার পায়ের সঙ্গে এই পায়ের ছাপ মেলাও।'

কৈলাস ভীতস্বরে বললে, 'আমার পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে কি হবে, স্যার?'

সাহেব তার একটা হাত ধরে টেনে এনে একটা ছাপের ওপর তার পা রাখতেই সেটা হুবহু মিলে গেল।

মিঃ পিয়ার্সন তখন কৈলাসের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, 'শীঘ্‌গির বল্ শয়তান, তোর সঙ্গে আর কে ছিল? আর যে চারজন কাফ্রী দিয়ে রজতকে ধরিয়ে দিয়েছিস্ তারা তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে?

কৈলাস যখন বুঝতে পারলে যে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখন আর গোপন করা বৃথা বুঝে সে বললে,—তার সহকারী হচ্ছে হাজরে বাবু মদন।'

মদনচন্দ্র পাত্র কুলিদের হাজরে বাবু হয়ে এসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে সব কথা বলে দিলে। সে বলতে লাগলো, 'রজতবাবুর এক আত্মীয়ের নাম হরনাথ দত্ত। জায়গা-জমি নিয়ে তাদের কি একটা গোলমাল বাঁধে। তাতে অনেক টাকার বিষয় হরনাথের হাতছাড়া হওয়ায় সে রজতকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। সে জানায়,—রজতের আর কোন নিকট আত্মীয় না থাকায় তার মৃত্যুর পর হরনাথই সব সম্পত্তির মালিক হবে। সে আমাদের আগাম পাঁচশো টাকা দিয়েছে। কাজ শেষে করার পর আরও পাঁচশো টাকা দেবে বলেছে আমরা জাহাজে রজতকে মেরে ফেলার একবার চেষ্টা করেছিলুম। এবার এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় পাঁচ মাইল দূরের কাফ্রীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি।

(ক্রমশঃ)
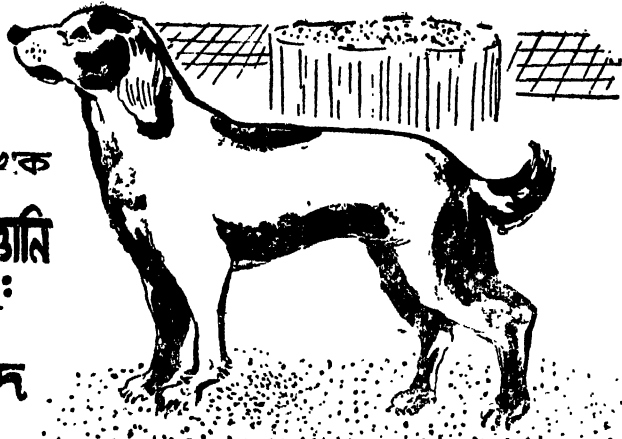
॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

বিদায় ডায়না

গাড়ীতে বসেই একটা সচিত্র কাগজে মন দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু নাঃ, কোনই উৎসাহ হ'ল না। চোখ বন্ধ করি। গাড়ীর ছন্দময় গতির আওয়াজে ঘুমিয়ে পড়ি। ল্যাম্পোও গাড়ীতে চলতে এই ছন্দময় গতি ভালবাসত। এই গতি ওকে গভীর ঘুমে মগ্ন করে দিত। ল্যাম্পো! আবার ল্যাম্পো! আমি শুধু ওর কথাই ভাবি।

বাড়ী পৌছেই দেখি মির্ণা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওর সেই অপরিবর্তনীয় প্রশ্ন, "বাপি, ল্যাম্পো এখনও ফেরেনি?"

আমাকে সেই এক জবাবের পুনরুক্তি করতে হয়, "না, মির্ণা, এখনও আসেনি, এখনও নয়। তবে নিশ্চিন্ত থাকো ও আসবে একদিন ঠিকই..."

আমি মিথ্যে কথা বলতাম। জেনেশুনেই বলতাম। আমি ভাল করেই জানতাম সে আর কখনও আসবে না। কিন্তু কতদিন ওকে মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে রাখব? একদিন আমার মির্ণাকে সত্যি কথা জানাতেই হবে। কিন্তু সে সাহস আমার ছিল না। জানতুম একথায় মির্ণা খুবই দুঃখ পাবে, আর সেই চিন্তাই আমাকে বিমর্ষ করে তুলত। যদিও আমি কুকুর খুব ভালবাসতাম, কিন্তু একটা কথা স্বীকার করব যে, যারাই আমার স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, তারা সবাই কোন না কোন হতাশার কারণ হয়েছে।

ডায়নার বেলাতেও ঠিক তাই। মাকে অনেক করে ভজিয়ে ডায়নাকে আমাদের বাড়ীতে রাখতে পেরে আমি খুব খুশি ছিলাম। প্রথম কিছুদিন বেশ কাটল। অবশ্য ওকে বাড়ীতে রাখাতে অনেক রকম সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমি সব দিক দিয়ে চেষ্টা করতাম যাতে মায়ের অভিযোগের কোন কারণ না ঘটে, তবুও সব সময় কৃতকার্য হতাম না।

শীগগিরি বাড়ীতে বিভিন্ন মতের আলোচনা শুরু হয়ে গেল ডায়নাকে নিয়ে। শুধু মা নয়, বাড়ীর অন্য ভাড়াটেদেরও অভিযোগ ছিল। স্বীকার করি ডায়না আদরের আতিশয্যে একটু মাথা-খাওয়ার দলে হয়েছিল। ওর দোষও ছিল কিছু। সবচেয়ে প্রধান দোষ ছিল ও মাদী-কুকুর হয়ে জন্মেছিল। যাই হোক, পারিবারিক ও বাড়ীর অন্যান্যদের শান্তি রক্ষা করতে আমি নিজেকে একদিন ডায়নার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করলাম। যে ফার্মের কাছে ওকে পেয়েছিলাম, সেই ফার্মের কাছে ওকে নিয়ে গেলাম এবং তাদের জানালাম ওকে কী ভাবে পেয়েছিলাম। ওরা খুব খুশি হ'ল ডায়নাকে পেয়ে। কারণ ও হ'ল ওদেরই মাদী-কুকুরের—যে রোমাতে মরে গিয়েছিল, তারই মেয়ে। আমার সেদিন বড় দুঃখের দিন ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে গিয়ে ডায়নাকে দেখে এসে আমি খুশি থাকতাম। সেই জন্য প্রায়ই আমি যেতাম ওকে দেখতে।

কত বছর কেটে গেল। আমি বিয়ে করলাম। এখন আমার একটা বাড়ী, বাগান ও একটা টাইগার নামে বড় এ্যালসেশিয়ান কুকুর হয়েছে। কিন্তু এখনও আমি ডায়নাকে দেখতে যাই।

ও আমার গাড়ীর হর্ণ চেনে। আওয়াজ পেয়েই ছুটে আসে জলপাই বাগানের মধ্যে দিয়ে আমাকে সম্বর্ধনা জানাতে।

একদিন গরমকালে ডায়নার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেক ডাকাডাকি করলাম কিন্তু কেউ এল না আমার কাছে। মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ হ'ল, লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এলাম। দেখলাম, কুকুরের মালিক একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে পাইপ ফুঁকছে।

"ডায়না কোথায়?" উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করি। কৃষকটা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে প্রথমে থুতু ফেলল, তারপর হাতের তালু উল্টে পেছন দিক দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিলো। হাতের পাইপ তুলে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বল্লে—"ঐ পাহাড়ের বেড়ার নীচে আমরা ওকে কবর দিয়েছি।"

সর্বদেহে তীব্র আঘাত! বুকের কাছে একটা ব্যথায় মনে হ'ল যেন গলায় কী আটকে গেছে আমার। একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওপরে

ওঠে গেলাম। জায়গাটা চিনতে পারলাম। কারণ ঘন বেড়া সরিয়ে সেখানে সন্থ মাটি খোঁড়া হয়েছে। নীচু হয়ে মাটিটা ছুঁলাম।—যে মাটি ওকে আচ্ছাদন করে আছে।

গভীর চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেলাম। একটু পরে একে একে দিনগুলি সব মনের মধ্যে ভেসে উঠল। যে দিনগুলি ওর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম।' ওকে কেন নিজের কাছে রাখিনি বলে নিজেকে দোষ দিলাম।

উঠে দাঁড়াই। একটু মৃদু হাওয়ার ঢেউ পাকা ফসলের ওপর দিয়ে হেলেদুলে চলে গেল, মৃদু গুঞ্জন তুলে। সূর্য তখন সোজা জলপাই বাগানের মাথার ওপরে, প্রথম যেখানে ওকে পেয়েছিলাম সেই জায়গাটার দিকে তাকালাম। এখনও সেখানে বোমা পড়বার দরুন একটা গোলাকার গর্ত মত হয়ে আছে। বোমা পড়বার দাগ এখনও কয়েক জায়গায় চিরস্থায়ী ছাপ এঁকে রেখেছে, যা' এত বছর বাদেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে তবু সান্ত্বনা যে, যা হোক ওকে বাঁচিয়েছিলাম—ওকে দশ বছরের জীবন দান করেছিলাম। বুড়ো চাষীটির কর্কশ আওয়াজে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম।—"সেদিন রাত্রে যে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঝড় বইছিল, সেই এ জন্য দায়ী!" বল্ল সে।

একটা কাঠের খুরপিকে ছুরি দিয়ে চেঁচে চেঁচে ছুঁচলো করতে করতেও বল্ল, "ডায়না যেখানে ঘুমচ্ছিল, সেখানে খড়ের ঝোলা থাকত। একগাদা ভারী বোঝা ঝড়ে ওর ওপরে হুড়মুড় করে পড়েছিল, পরদিন সকালে আমরা ওকে ঠাণ্ডা ও শক্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম।" লোকটা যেতে যেতে শেষে আপন মনেই বলে চল্ল—"বড় অলুক্ষণে ঝড়···বড় অলুক্ষণে ঝড়!"

আমি একমুঠো বুনো ফুল তুলে নিয়ে যেখানে ওকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল সেখানে ছড়িয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, "বিদায় ডায়না। বিদায়, আমাকে ক্ষমা কোরো তোমাকে আমার কাছে রাখিনি বলে!"

"পিওম্বিনো,—পিওম্বিনো জংশন। যাত্রীরা সব নেমে পড়ুন।" গার্ডের ঘোষণা।

আমি নেমে পড়ি। ষ্টেশনের বাইরে পেঁছিতে পেঁছিতে, মির্ণা এসে দাঁড়ায়—"ল্যাম্পো কী এখনও ফিরে আসেনি?"

"দেখ মির্ণা, তুমি যখন আমার কাছে আসাব, প্রথমে আমাকে অভিবাদন করবে। তারপর অন্য কথা বলবে।" একটু কড়াভাবেই বলি। "ল্যাম্পোর কথা ভুলে যাও। সে আর কখনও ফিরবে না। কোনদিনও নয়।"

তারপর লক্ষ্য করলুম আমার কর্কশ কঠিন কথায় ও খুবই আহত হয়েছে। জলে চোখ ভরে গেল। একথা বলতে আমার খুব খারাপ লেগেছে। তবুও বলতে হ'ত একদিন। ল্যাম্পোকে ওকে ভুলে যেতেই হবে, চিরকালের মত —

(ক্রমশঃ)

ভগবান মরলেন !

শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য

এক যে ছিল পেঁচা। রং তার সাদা। চোখ দুটো ঠিক ভাঁটার মত। সে দিনের বেলায় থাকত গাছের কোটরে, রাত্রে বেড়াত ঘুরে।

সে এক ভীষণ কালো রাত্তির। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই—নেই একটাও তারা। পেঁচাটা বসেছিল গাছের মাথায়। হঠাৎ দেখল গাছের তলায় দুটো ছুঁচো। ছুঁচলো তাদের মুখ, ইয়া এক জোড়া গোঁফ। ওরা গর্ত খুঁজছে ঘুমোবার জন্য।

কে রে ওখানে? ধমকে উঠল পেঁচা। চমকে ওঠে ছুঁচো দুটো। ভয় পেয়ে বলে, আমরা।

আবার বলে পেঁচা—কি করছিস কি, ওখানে? ভয়ে আর ভাবনায় কাঁপছে ওরা। গলা একেবারে কাঠ। কথা বেরোয় না একটাও। তবু তারা বলে—ভেবেছিলাম শোবো। আর তারপরই ছুট।

ছুট-ছুট-আর ছুট। সে কী ছুট! ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়ে ওরা। তবু ছোটে। শেষে বলে বনের যত পশুদের—রাজা এসেছেন। তিনি সবার চেয়ে জ্ঞানী, অন্ধকারেও পান দেখতে। আর উত্তর দেন সব কথার। গলায় তাদের ভয় আর ভক্তি।

'ফিঙে এলো পেঁচার কাছে।'

বনের যত পশু, এসে জড়ো হয় সেখানে। ভিড় করে শোনে ছুঁচো দুটোর কথা—অবাক-অবাক চোখে।

ডালিম গাছের ডালে দুলছিল এক ফিঙে। বলল এগিয়ে এসে, দেখছি আমি গিয়ে।

ফিঙে এলো পেঁচার কাছে। হেঁকে বলে—বলত, তুলেছি ক'টা থাবা। পেঁচা বলে—দুটো। আবার বলে ফিঙে—'বলতে চাই কী' বা

'উদাহরণস্বরূপ' এর বদলে আর কী বলতে পারি? 'যথা'—বলে পেঁচা। উড়ে যায় ফিঙে।

তখনও বনের কোণে রয়েছে যতরাজ্যের পশু আর পাখী। ফিঙে বলে—নেইকো কোন সন্দেহ, তিনি রাজাই বটে। জবাব দেন সব কথায় আর রাতেও পান দেখতে।

ঝোঁপের মধ্যে ছিল নিন্দুক। বুদ্ধিমন্ত খেঁকশিয়াল। ফ্যাঁচ করে বলে—তিনি কী দিনেও পান দেখতে?

হেসে ওঠে জোরে বনের যত পশুপাখী। কথার ধরণ দেখ! কুচুটে একটা! যিনি রাতেও দেখেন, দিনে তো দেখবেনই।

তারপরই উড়লো ফিঙে। বলল পেঁচাকে—আপনাকেই হতে হবে আমাদের রাজা। পেঁচা ভারী খুশি।

তখন ভর-দুপুর বেলা। সূর্য ঠিক মাথার উপর। তা থেকে যেন ঝরে পড়ছে গলা গলা রুপো। পেঁচা আসছে। চোখে তার অন্ধকার। তাই হাঁটছে খুব আস্তে আস্তে। ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো যত পশুপাখী—হ্যাঁ রাজাই বটেন, চলন দেখ। পেঁচা তখন তাকিয়ে দেখে চারধার, তার বড় বড় গোল চোখ পাকিয়ে। আবার বলে ওরা—চাউনি দেখ, রাজাই বটেন।

রাজা নন, উনি ভগবান—হলদে চুড়ো বনমোরগের গলা। সবাই বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বটে, উনি ভগবান।

আর তাই পেঁচা যেখানে যেত ওরাও যেত সেখানে। সে যা করত ওরাও করত তাই। যদি পেঁচা হাঁটত পেছন পায়ে ওরাও হাঁটত। হঠাৎই যদি পেঁচা কোথায় খেত ধাক্কা, ওরাও খেত।

শেষে একদিন। পেঁচা চলছে আগে আগে। পেছনে যত পশুপাখী। সে এক লম্বা সারি। দূর থেকে যারা দেখল, ভাবল কাউকে বুঝি 'ঘেরাও' করতে চলেছে ওরা।

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যেন শেষ নেই এ যাওয়ার। বন পেরিয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে উঠলো পাকা রাস্তায়। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে পেঁচা—আর সবাই।

হঠাৎ দেখল এক বাজ, দূরে আসছে একটা গাড়ী। ছুটে আসছে জোরে—ভীষণ জোরে। বাজ বলল ফিঙেকে, ফিঙে বলল পেঁচাকে—বিপদ আসছে সামনেই। গম্ভীর গলা পেঁচার—'যথা?' ফিঙে বলল সব। ভয় করছে না আপনার?—ফিঙের প্রশ্ন। পেঁচা তখনও গাড়ীটাকে পায়নি দেখতে। তাই বলল ঠাণ্ডা গলায়—কাকে?

চীৎকার করে উঠলো সবাই। ও উনি ভগবান সত্যিকারের ভগবান। আর গাড়ীটা যখন এসে পড়লো তাদের ওপর তখনও তারা চেঁচাচ্ছে—ভগবান রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

হুস্ করে বেরিয়ে গেল গাড়ীটা, দু'একটা জানোয়ার গেল বেঁচে। যদিও তাদের পা ভাঙল, মাথা ফাটল। আর বাকী সবাই পড়ল মারা—এমন কী পেঁচাটাও।

আড়াল থেকে হেঁকে উঠলো বুদ্ধিমন্ত খেঁকশিয়াল—ভগবান মরলেন!*

*একটি বিদেশী রূপকথার ছায়ায়।

আচ্ছা ফ্যাচাং

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

এই দেশে দেখি যত দোষ থাকে গোড়াতে
মারা গেলে তারপরে নিয়ে যায় পোড়াতে।
ব্যাধি হলে পরে হয় এখানে চিকিচ্ছে
আগে থেকে সারাবার নেই কোন ইচ্ছে।

মারা গেলে পরে হয় এই দেশে শ্রাদ্ধ
কোনো কাজ আগে করা কারো নেই সাধ্য!
তাই 'লেট' মিটিং-এতে লেটে সব কার্য
যতোই কর না তুমি দিন ক্ষণ ধার্য।

বহুদিন বাস করে বিলেতে ও বিদেশে
ভাবি হায়! কোথা ছিনু আর আছি কি দেশে!
সময়েতে কাজ করা অভ্যেস চিরকাল
আচ্ছা ফ্যাচাং-এ পড়ে হতেছি যে নাজেহাল।

মেঠুড়ে

ডেভিস কাপ

কলকাতার দুই ছেলে প্রেমজিতলাল ও জয়দীপ মুখার্জি বাঙ্গালোরে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চল ফাইনাল জয় করে ভারতকে সর্বপ্রথম টেনিসের সর্বাগ্রগণ্য দেশ অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ীর সম্মান দান করেছেন। সত্যি বাইশ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রথম জয় ভারতীয় টেনিস ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

ভারত দীর্ঘ উনপঞ্চাশ বছর ধরে ডেভিস কাপে খেলছে। একবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের গৌরব এতদিন অনায়ত্ত ছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এবার যাঁরা খেলতে এসেছিলেন আন্তর্জাতিক টেনিসে তাঁদের খ্যাতি কম নয়। রে রাফেলস, ডি ক্রিলি, অ্যালান স্টোন, জন আলেকজাণ্ডার অ্যামেচার টেনিসে এঁদের প্রত্যেকেরই খুব নাম, কিন্তু তবুও অষ্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে হার স্বীকার করেছে ৩-১ ম্যাচে। সময়ের অভাবে শেষ সিঙ্গলসের ফলাফল মীমাংসা হয়নি।

ডাবলসের একটা খেলায় ভারতকে হার স্বীকার করতে হলেও, সিঙ্গলসের প্রতি খেলাতেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনমনীয় দৃঢ়তা এবং মনোবল নিয়ে খেলেছেন। প্রথম সিঙ্গলসের কথা ধরা যাক। দু'জনে দুটো করে সেট পাবার পর পঞ্চম সেটে রে রাফেলসের বিরুদ্ধে প্রেমজিত-লালের ১৪-১২ গেমে জয় এই দৃঢ়তার প্রমাণ। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে পর্যায়ক্রমে সেট দখলের পর পঞ্চম সেটে ডিক ক্রিলির বিরুদ্ধে জয়দীপের জয়েও এই দৃঢ়তা দেখা যায়। আবার শেষ দিন প্রেমজিতের পক্ষে ক্রিলিকে পরাজিত করা বা শেষ সিঙ্গলসের মীমাংসামূলক পঞ্চম সেটে জয়দীপ-রাফেলসের খেলা ৬-৬ গেমে সমান সমান রাখা অনমনীয় মনোবলেরই উদাহরণ।

বাঙ্গালোরে খেলার পর মাদ্রাজ, জামসেদপুর এবং কলকাতায় যে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা হয়, তাদের কোনো খেলাতেই প্রেমজিত জয়ী হতে পারেন নি। মাদ্রাজ ও কলকাতায় প্রেমজিত

হেরেছেন এলান স্টোনের কাছে, জামসেদপুরে রে রাফেলের কাছে, কিন্তু বাঙ্গালোর আসল খেলায় প্রেমজিতকে কেউ হারাতে পারেন নি।

এশিয়ান টেবল টেনিস :

বিশ্ব টেবল টেনিসে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ জাপান এশিয়ান টেবল টেনিসেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। দলগত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে এবং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় সাতটা বিভাগের ভেতর পাঁচটা বিভাগে তারা বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। তবে দলগত প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়ার কৃতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। মহিলা বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়া গতবারের চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান এবারও বজায় রেখেছে, তাছাড়া জয় করেছে বালক ও বালিকা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ এতদিন যা জাপানেরই দখলে ছিল। বালিকাদের ব্যক্তিগত বিভাগেও দক্ষিণ কোরিয়ার মেয়ে লী আইলেসা বিজয়িনী হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার ছেলে বালিয়াণ্টোর হাতে গিয়েছে শুধু বালক বিভাগে ব্যক্তিগত বিজয়ীর পুরস্কার।

এবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার চোই জাংস্থকের কাছে জাপানের বিশ্ববিজয়িনী তোশিকো কোয়াদার পরাজয়। চোই-এর কৃতিত্বেই দক্ষিণ কোরিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। শুধু কোয়াদারই পরাজয় নয়, ১৯৬৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাপানের শিগেও ইটোকেও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে তোকিও তাশাকার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। তাশাকাকে আবার ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে নবুহিকো হাসেগাও পেয়েছেন পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। পুরুষদের সিঙ্গলস্, ডাবলস্ এবং মিক্সড ডাবলসে ত্রি-মুকুটের অধিকারী হাসেগাওয়াকে অনায়াসেই আগামী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ক্রিকেট :

রণজি ট্রফি বা জাতীয় ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের একটানা বারো বার এবং প্রতিযোগিতায় পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসে মোট একুশবার রণজি ট্রফি জয় এক অনন্য নজির। কোনো দেশের ক্রিকেট খেলায় কোনো একটা দলের এমন পর্যাপ্ত প্রাধান্যের নজির আছে কিনা সন্দেহ।

১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র একবার রণজি ফাইনালে বোম্বাইকে সি. কে. নাইডুর হোলকার দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। বাকী একুশ বারের ফাইনালের মধ্যে দু'একবার ছাড়া প্রতিবারই তারা জিতেছে অতি সহজে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে পাঁচ দিনের ফাইনাল খেলা পুরো চার দিনের কিছু আগেই শেষ হয়ে যায়, এবং বোম্বাই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ৫৯ রানে হারিয়ে বিজয়ী হয়।

গত বারো বছরের মধ্যে সাত বারের রণজি ফাইনালিস্ট রাজস্থানকে ক্রিকেটের এক শক্তিশালী দল হিসেবে অভিহিত করা যায়। বোম্বাই দলে খেলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এমন দু'তিনজন খেলোয়াড় ছিলেন রাজস্থান দলে। তা ছাড়া দু'জন টেস্ট খেলোয়াড় এবং কয়েকজন উঠতি খেলোয়াড়ের সমাবেশেও দলটি সমৃদ্ধ। রণজির নক আউটে কোয়ার্টার ফাইনালে রেলওয়েকে এবং সেমি ফাইনালে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধেও তারা এবার সহজে বিজয়ী হয়, কিন্তু ফাইনালে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও রাজস্থান সুবিধে করতে পারেনি। ২১৭ রানে রাজস্থানের প্রথম ইনিংস শেষ হয় এবং বোম্বাই প্রথম ইনিংসে ৫৩১ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে রাজস্থানের ২৫৫ রান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ হয়ে যায়।

রাজস্থানের কোনো খেলোয়াড়রই ফাইনালে সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। বোম্বাইয়ের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার এবং অশোক মানকড় সেঞ্চুরি তো করেছেনই উপরন্তু প্রথম জুটিতেও তাঁরা করেছেন রণজি ক্রিকেটে এক নতুন রেকর্ড; যে রেকর্ড দীর্ঘ উনত্রিশ বছর অটুট ছিল। ১৯৪১ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিরুদ্ধে উত্তর ভারত দলের নজর মহম্মদ ও জগদীশলাল প্রথম উইকেট জুটিতে ২৭৩ রান করে এই রেকর্ড করেছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে বাংলার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং সুধাকর অধিকারী মাত্র চার রানের অভাবে ওই রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি, কিন্তু এবার দুই তরুণ গাভাসকার ও মানকড় সে-রেকর্ড ২৭৯ রান তুলে ম্লান করে দিয়েছেন। গাভাসকর ও মানকড় যথাক্রমে করেছেন ১১৪ ও ১৬৫ রান। জাতীয় ক্রিকেটের দ্বিতীয় খেলাতেই গাভাসকর সেঞ্চুরি করলেন আর জাতীয় ক্রিকেটে মানকড়ের এটা তৃতীয় সেঞ্চুরী।

হকি ঃ

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবার নিয়ে মোট দশবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগ জয় করল। একমাত্র কাস্টমস দল ছাড়া আর কোনো দল এত বছর হকি লীগ জয় করতে পারেনি। কাস্টমস লীগ বিজয়ী হয়েছে আঠারোবার।

মোহনবাগান গতবার হকি লীগে অপরাজিত ছিল। এবারও প্রথম ডিভিসনের উনিশটা দলের ভেতর একমাত্র দল হিসেবেই অপরাজিত থেকেছে। গতবার উনিশটা খেলার ভেতর উনিশটাতেই বিজয়ী হয়ে ৩৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। এবার অবশ্য মোহনবাগানকে কাস্টমস ও ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের কাছে একটা করে পয়েন্ট হারাতে হয়েছে এবং ইস্টার্ন রেল এস. সি-র কাছে একটা গোলও খেয়েছে। যাই হোক, মোহনবাগানের প্রথম ডিভিসন লীগ জয়, যোগ্যের যোগ্য সম্মান। দল হিসেবে সত্যিই এবার মোহনবাগান সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে।

গতবারের লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গলও এবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগে রানার্সের সম্মান পেয়েছে। আলেকজাণ্ডার রেঞ্জার্স ও কাস্টমসের কাছে একটা করে পয়েন্ট নষ্ট এবং মোহনবাগানের কাছে হারার ফলেই ইস্টবেঙ্গলকে মোহনবাগানের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে হয়।

শ্রীবিনয় বাগচী

ক		ভ		জো	না	
					ট	
		ক				
শ		ক		বি		ল
	র্ক					
কি				বি		

১। পাশের এই ছকটির যে ঘরগুলিতে কোন অক্ষর নেই, সেগুলিতে পাশাপাশি, মানে বাঁদিক থেকে ডানদিকের ফাঁকগুলিতে এমন সব অক্ষর বসাতে হবে, যাতে সাতটি প্রাণীবাচক শব্দ হয়। আর খাড়া-খাড়ি অর্থাৎ উপর থেকে নীচের ফাঁকগুলিতে এমন শব্দ বসাতে হবে যাতে সাতটি বস্তুবাচক শব্দকে বোঝায়।

——

২। তিন বর্ণ নাম রাজ্য ধরণীর মাঝে,
আদি বাদে তাহা আদি সাহিত্যেই আছে।
মধ্য বাদে ফল হয় সুমধুর অতি,
আগমন বোঝাবে তা শেষ ছাড়ো যদি।

——

৩। তিন বর্ণে শস্য এক রয়
রেঁধে আর কাঁচাও হয় খাওয়া,
ঐ নাম গাড়িরও এক হয়,
সবখানে চড়ে যায় যাওয়া।

——

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

।। গত মাসের ধাঁধার উত্তর ।।

১। পাতাল (পা, তাল, পাতা) ২। পাটালি ৩। ঠোঁট ৪। তেজপাতা ৫। Pearls

নজরুল-স্মরণে

জয় জয় বীর বিদ্রোহী কবি
নজরুল ইসলাম,
চলে যাবে তুমি তবুও থাকিবে
ধরাধামে তব নাম।
তুমি যে কাব্য করেছ রচনা,
তুলনা তাহার নাই,
সে কাব্যে তুমি সবারে জাগালে,
জাগালে মোদের ভাই।
হায় কবি! আর কেই বা লিখিবে
তব সম এত করি,
কে আর বাঁচাবে নিপীড়িত জনে
শত ক্লেশ নিয়ে বরি।
জয় জয় তব বিদ্রোহী কবি
নজরুল ইসলাম,
তোমায় আজিকে ভক্তির সাথে
জানাই শত প্রণাম।

শ্রীজয় ভট্টাচার্য

পলাশবনের ধারে

পলাশ বনের ধারে
ভাইনী দুটো আসে,
ফিশফিশিয়ে কথা বলে
মাঝে মাঝে হাসে।

শ্রীঅরূপরতন ঘোষ

নীল আকাশের পাখী

ওগো পাখি,
নীল আকাশের পাখি!
নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে পরম শান্তিতে
তুমি উড়ছ
দূর আকাশের গায়।

আর আমি?
পড়ে রয়েছি দুঃখ-ভরা
মাটির এ পৃথিবীতে
তুমি কি পারনা আমায়
সাথী করে নিতে,
তোমার নিজে সীমানায়?

ওগো পাখি,
নীল আকাশের পাখি!
কত আনন্দে ঘুরছ তুমি
আকাশের আঙিনায়,
ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে!
মুক্ত করে
এ পৃথিবীর দুঃখ থেকে
ভুলিয়ে দিয়ে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা
ওগো নীল আকাশের পাখি,
চলে যাও তুমি
আমি পড়ে থাকি
জ্বালাময় এ বসুন্ধরায়
মুদে আমার আঁখি!

শ্রীঅভিজিৎ বাগচী

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)
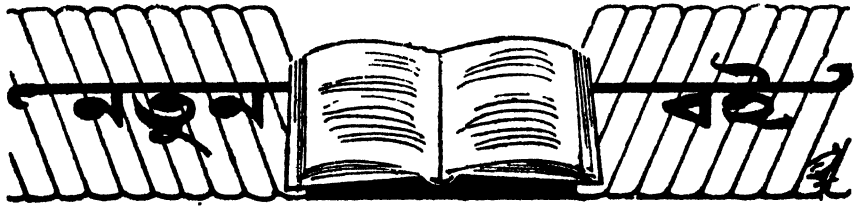
১। **ষ্টীম হাউস** (জুল ভের্ন) ২। **গডফ্রে মরগান (জুল ভের্ন)**—শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাস লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীবিভাসচন্দ্র বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মূল্য প্রতিটি ৫.০০

সর্বযুগের ও সর্বদেশের কিশোর সাহিত্যের একছত্র অধিপতি জুল ভের্নের রচনার ইন্দ্রজালে আকৃষ্ট হয়নি পড়ুয়াদের মধ্যে এমন লোক নেই বললেই চলে। সে কারণ দেশে দেশে তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রগতির বিষয় কিশোর-সাহিত্যে তিনিই প্রথম এনেছেন অভিনব উপায়ে।

তাঁর রচিত প্রথম 'ষ্টীম হাউস' বইটির কাহিনী ভারী চিত্তাকর্ষক। সংক্ষেপে কাহিনীটি হচ্ছে : ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস্-এর তৈরি চলমান বাড়িতে চড়ে ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছেন মঁসিয় মোক্লের, কর্ণেল মনরো প্রভৃতি। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে এই ভ্রমণে তাঁরা যে সব বিচিত্র স্থান, ঘটনা ও মানুষের পরিচয় পেয়েছেন, তারই রোমাঞ্চকর বর্ণনা যেমন আছে বইখানিতে, তেমনি এর সঙ্গে মিশে আছে ভারত-ইতিহাসের বিখ্যাত নানা সাহেবের কথা। বইটি তোমরা পড়তে শুরু করলে, শেষ না করে ছাড়তে পারবে না।

দ্বিতীয় 'গডফ্রে মরগান' বইটির কাহিনীও অনুরূপ আকর্ষণীয়। কোটিপতি কোল্ডরুপের ভাগনে গডফ্রে মরগান তার বিয়ের আগে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল, কলম্বাস, ক্রুশো বা ক্যাপটেন কুকের মত অভিজ্ঞতার অধিকারী হবার। হঠাৎ জাহাজ ডুবি হওয়ায় যেন তার অভিলাস পূর্ণ হ'ল। সে আর তার নৃত্য-শিক্ষক টার্টলেট দৈবক্রমে বেঁচে গিয়ে উঠলো এক জনমানবহীন দ্বীপে। সেই দ্বীপে থাকার সময় তারা একের পর এক যে সকল রোমহর্ষক ও রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই বইখানিও আগেরটির মতই উপভোগ্য। বইখানি এত উপভোগ্য হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ এর সহজ, স্বচ্ছন্দ অনুবাদও। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় জুল ভের্ন-এর ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে এক অপরূপ অনুবাদের নমুনা-তুলে ধরেছেন তোমাদের কাছে। বই দু'খানি তোমরা পড়ো সময় মত। ছাপা বাঁধাই এবং কাগজ চমৎকার।

———

প্রখর দাবদাহনে দীর্ঘদিন আমরা তৃষ্ণাকাতর হয়ে উঠেছিলাম। চৈত্র-বৈশাখ শুষ্ক পায়ে চলে গেল একটু কালবৈশাখী বা ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টির কোনো চিহ্ন ছিল না। খরায় কত লোকের মৃত্যু ঘটলো, জলের অভাবে কত গৃহস্থের ঘরে হাহাকার পড়লো, এইসব সংবাদ প্রতিদিনই সংবাদপত্রে দেখতে দেখতে দুঃখ-কষ্টে মন ও শরীর রুক্ষতায় ভরে উঠতো—এই সময় অনেক দেরি করে—বর্ষণ সুরু হলো, মনে হলো ভগবানের করুণাধারায় মাটি ও মানুষ দুই-ই সিক্ত হলো।

বৈশাখের দিনগুলির উৎসব সবই রবীন্দ্র-উৎসবে চিহ্নিত হয়ে থাকে—এইসব উৎসব জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলে। কবিকে তাঁর গানে, গাথায়, কবিতায় স্মরণ করে আমরা ধন্য হই। এই জ্যৈষ্ঠে মনে পড়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। এই নামের সঙ্গে, এঁর লেখার সঙ্গে তোমরা পরিচিত। কবি ১৮৯৯ সালে জন্মেছিলেন চুরুলিয়া নামক এক গ্রামে। গ্রামের ছেলে গ্রাম্য পরিবেশে বড় হলেন। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে অমিত তেজ ছিল তার একদিন বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেঙ্গলী রেজেমেণ্টে হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে গেলেন সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে।

এই বিশ্বমহাযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কবি কলম ধরলেন। সে কলম দিয়ে বেরুলো অজস্র গান, গাথা, কবিতা এবং রক্ত উষ্ণ করা বিদ্রোহী-কবিতা—

তোমরা পড়েছ নিশ্চয়—

"বলো বীর—বলো উন্নত মম শির

শির-নেহারি আমারি, নত—শির ঐ শিখর হিমাদ্রির!

বলো—মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছে চির বিস্ময় আজি বিশ্ব বিধাত্রীর···!"

কবি ফিরে এলেন যুদ্ধ থেকে—অসি ছাড়লেন—ধরলেন মসি। কবিগুরু তাঁর কবিতা পড়লেন—প্রশংসা করলেন। কিন্তু রহস্য করে বললেন, "তুই কি তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কাটতে শিখেছিস।"

এরপর চললো স্রোতের মত লেখা। সর্বশ্রেণীর মানুষকে অনুভব করে লেখা। আবার প্রীতি-মধুর লেখাও আত্মপ্রকাশ করলো তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে। খুব ছোটদের জন্যে যে মজাদার কবিতা লিখেছেন—

"কাঠবেড়ালী! কাঠবেড়ালী! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধভাত খাও?
বাতাবী লেবু, লাউ?
বেড়াল বাচ্চা? কুকুর ছানা তাও?"···

আবার :

"অ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা, নাক-ড্যাঙ্গা-ডাং ডাং।"

আবার :

"এক যে ছিল রাজা এক যে ছিল রাণী
হ্যাঁ মা মণি গল্প আমি জানি।···
একদিন না রাজা ফড়িং শিকার করতে গেলেন,
খেয়ে পাঁপর ভাজা
রাণী গেলেন তুলতে কলমী শাক···
···রাজা এলেন ঘরে ফিরে—
হাতীর মত একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার করে
রাজবাড়ীতে তালা দেওয়া কেউ কোথায় নাই
পান্তভাত কে দেবে বেড়ে
প্রাণ করে আইঢাই··।"

রাজা তখন পান্তাভাতের কথা ভাবতে থাকুন। এদিকে তখন কবির তেজোদীপ্ত লেখনি ছোটদের জন্য লিখেছে—

"তুমি হতে পারো কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর,
প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যাহা সাধ তুমি তাই হতে পারো
ক্ষুদ্রের সাথে থাকো তুমি তাই বৃহতের সাথে হারো।

…তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ মহীয়ান
জাগো দুর্বার বিপুল বিরাট অমৃতের সন্তান।"

শুধু স্বাদেশিকতাই নয়, কবির মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণাও ছিল। তাই তাঁর লেখা ভক্তি-সংগীত, শ্যামাসংগীতগুলি শুনলে কবির এই ধর্মপ্রাণকে অনুভব করা যায়। তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ মানুষ—তাই তাঁর কাছে মন্দির-মসজিদের প্রভেদ ছিল না। আমাদের দেশ যখন খণ্ডিত হলো, ভাগাভাগির অন্ত রইল না। তখন কবি লিখলেন—

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
সব কিছু হায় ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি নজরুল।"

আবার কৌতুক-প্রিয়তাই কি কম ছিল তাঁর। কবি পুত্রদ্বয় (কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ) তখন ছোট, তাদের ডাকের নাম সানি ও নিনি। কবি-স্ত্রী প্রমীলা দেবীকে লিখলেন—

"তোমার সানি যুদ্ধে যাবে মুখটি করে চাঁদপানা।
কোল-ন্যাওটা তোমার নিনি বোমার ভয়ে আধখানা!"

কিন্তু মুখর কবি মূক হয়ে গেলেন ১৩৪২ সাল থেকে। আর অসুস্থতা তাঁর স্মৃতি, তার ভাষা, সব কেড়ে নিলো। কবি আজো আছেন নির্বাক হয়ে,—শুধু শরীর নিয়ে বেঁচে আছেন।

তাঁর জন্মদিন হলো ২৫শে মে—। এখনও এই দিনটি তাঁর ক্রীষ্টোফার রোডের বাড়ীটি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কবি-গৃহে তাঁরই রচিত সংগীতাঞ্জলি দেন তাঁরই মন্ত্রশিষ্য-শিষ্যারা। অগণিত বন্ধু, ভক্তের দল তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়—সকলের মনে ও দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়—কবির সুস্থতা, কবির নিরাময় প্রার্থনা।

এ প্রার্থনা সফল হোক, আজকের দিনে আমাদের একই প্রার্থনা যুক্ত হোক। কবি নিরাময় হোন, দীর্ঘজীবী হোন।

তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি।

অশেষ স্নেহ-প্রীতি ও শুভকামনা সহ—

তোমাদের-মধুদি

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
শ্রীহর্প্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০·৬০ পয়সা

তোতাপাখি কথা কয়

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্ব্বপুরাতন মাসিকপত্র *
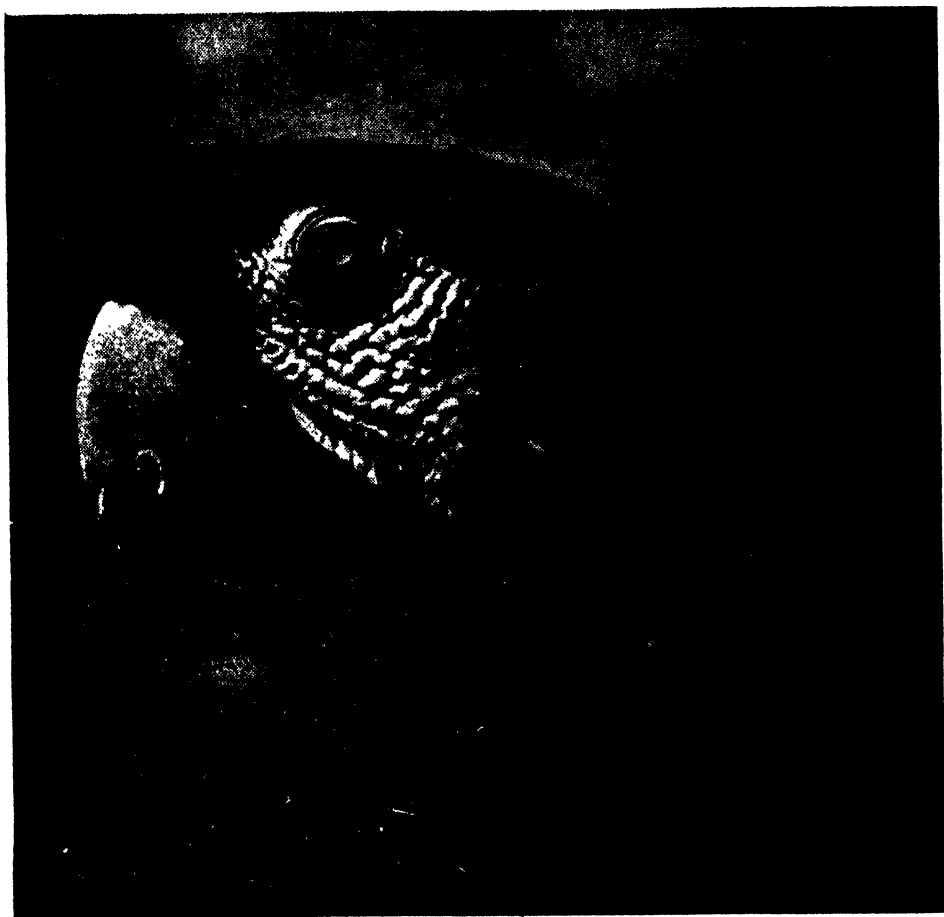
৫১শ বর্ষ] আষাঢ় : ১৩৭৭ [৩য় সংখ্যা

'অগ্নিবীণা'র কবি-কে

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাই কি মৌন হয়ে গেলে তুমি
'অগ্নিবীণা'র কবি।
না দেখে স্বাধীন ভারতে তোমার
মানস-প্রতিচ্ছবি ॥
জাতির বিবাদ ঠেলে দিতে দূরে
তুমি যে গাহিলে উদাত্ত সুরে
বিদ্রোহে মাথা তুলিলে তোমার
হে বীর দৃপ্ত বলে।
চাহিলে সবারে একত্রে তুমি
একটি পতাকা তলে ॥

শিখালে কেমনে দুর্গম গিরি
কান্তার মরু পারে।
যাত্রীরা যাবে রাত্রি নীশিথে
লঙ্ঘি অন্ধকারে॥
জাগালে হিন্দু-মুসলমানেরে
মার সন্তান জেনে সবায়েরে
একটি তরীতে দুর্যোগে পার
করা চাই অনায়াসে।
হেলায় ঘুচাতে দুঃখ-দৈন্য-
লজ্জার সব ত্রাসে॥

হায় স্বাধীনতা এলো, তবু সে যে
এলো না তোমার পথে।
খণ্ড ছিন্ন হলো এ ভারত
প্রবল ভেদের মতে॥
সেই দুঃসহ বেদনা তোমারে
ভুললো কি সব গান একেবারে
স্তব্ধ আবেগে রুদ্ধ যাতনে
সকল সাধনা ফেলে।
ব্যর্থতা ভরে জড় হয়ে হায়
আছ শুধু আঁখি মেলে॥

প্রার্থনা

শ্রীদুর্গাপদ বর্মণ

জীবনে মরণে
তোমারি চরণে
নিজেরে করিতে নিঃস্ব;
তোমারি চরণ
করিয়া স্মরণ
বরণ করিব বিশ্ব।

ভক্তি পুষ্পে
তোমারে পূজিব,
জীবন ফাগুন বরষায়;
ভাসাব জীবন
তরণী আমার
তোমার চরণ ভরসায়।

হরতন

শ্রীনির্মল সরকার

স্যার হরিবিলাসের বাড়ী আজ পার্টি। খবরের কাগজ থেকে শুরু করে অনেকেরই মুখে তার কথা শোনা যাচ্ছে। স্যার হরিবিলাস সম্বন্ধে কেউ কিছু না জানলে কি হবে, এই পার্টিকে লক্ষ্য করে অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন।

দক্ষিণ কলকাতার শেষ প্রান্তে তিনি বাড়ী নিয়েছেন। এর আগে তিনি কোথায় থাকতেন কিংবা কোন প্রদেশের লোক তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। ধনী লোকের বাড়ী পার্টি। বিরাট জাঁকজমকের ব্যাপার, সুতরাং এসব বাজে কথা ভাববার অবসর কোথায়!

উঁচু পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ী। চারপাশে ফলের বাগান। গোটা বাড়ীটা উজ্জ্বল আলোতে সুসজ্জিত। পোর্টিকোর তলায় একের পর এক বড় বড় গাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে আর উর্দী-পরা দরোয়ান সেলাম জানাচ্ছে অভ্যাগতদের। স্যার হরিবিলাস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অভ্যর্থনা করছেন তিনি অতিথিদের। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন লেডী সুপ্রভা, স্যার হরিবিলাসের স্ত্রী। সুসজ্জিতা হয়ে তিনি স্মিত হাস্যে আলাপ করছেন অতিথিদের সঙ্গে। তাঁর গলার নেকলেসটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে সেটা। হলঘর প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। অতিথিরা কিন্তু বিপদে পড়েছেন। স্যার হরিবিলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ-

নেই। কার্ড পেয়েই সকলে জমায়েত হয়েছেন মাত্র। পরিচয়ের প্রয়োজনই-বা কি! প্রকাণ্ড ধনী লোক বলে যখন শোনা গেছে, আর বিরাট ভোজের যখন আয়োজন রয়েছে, তখন আর চিন্তা কি! সকলেই উৎসবের আনন্দে মশগুল।

ঠিক এই সময় হঠাৎ আলোগুলো নিবে গেল এক সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্ত্রী-কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। চতুর্দিকে গাড় অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখতে পারছে না। আলো জ্বলে উঠল কয়েক সেকেণ্ড পরে। সব ব্যাপারটা যেন ভোজবাজীর মত মনে হ'ল সকলের। সবার দৃষ্টি পড়ল লেডী সুপ্রভার দিকে।

—আমার নেকলেস! খালি গলার ওপর হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

—কিছু বুঝতে পারনি? স্যার হরিবিলাস ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—না, মাথা নাড়লেন তিনি; তারপর একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লেন।

অরিন্দম মুখার্জির বয়স অল্প হলেও পুলিশ লাইনে বেশ সুনাম করেছে, তার পদ্ধতি-গুলো একটু অন্য রকমের, ঠিক গতানুগতিক নয়। থানা অফিসার নরেনবাবুর সঙ্গে প্রায়ই তার এই নিয়ে ঝামেলা বাধে। নরেনবাবু সিনিয়ার লোক, বয়স হয়েছে, সুতরাং অরিন্দম তাঁর সঙ্গে একমত না হলেও অপমান করে না। অপরপক্ষে নরেনবাবুও তাকে স্নেহ করে থাকেন। অরিন্দম আজ সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীতে ছিল। সম্প্রতি একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতের দলকে ধরে সে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে; কিন্তু এখনও তার অনেক কাজ বাকী রয়েছে। ছোকরা চাকর পরেশ আর কাকাতুয়া নিয়ে অরিন্দমের সংসার।

একটু পরেই পরেশ তার চা নিয়ে টেবিলে রাখল। অরিন্দম তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। কি হয়েছে? গোমড়া মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

—কাকাতুয়াটা আজ সকাল থেকে কিছু খাচ্ছে না। বিমর্ষ মুখে উত্তর দিল পরেশ।

—ঠিক বলেছিস, আমিও ওর চীৎকার এতক্ষণ শুনতে পাইনি একবারও।

—তা'হলে কি হবে বাবু? পরেশের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। ঠিক সেই সময়ে ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

—হ্যালো অরিন্দম, কি করছ? জিজ্ঞেস করলেন থানা অফিসার নরেনবাবু।

—চা খাচ্ছি, উত্তর দিল অরিন্দম।

—আর চা খেতে হবে না, চট করে চলে এস। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন নরেনবাবু।

—কেন কি হ'ল? বিরক্ত হয় অরিন্দম নরেনবাবুর ব্যস্ততা লক্ষ্য করে।

[illegible]

—হরিবিলাস আবার কে ?

—কি আশ্চর্য, অরিন্দম তুমি কি খবরের কাগজও পড় না ? বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন নরেনবাবু। বললেন, স্যার হরিবিলাস একজন বিখ্যাত লোক।

—আগে কখনও নাম শুনিনি। উত্তর দিল অরিন্দম।

—উনি তো ভারতের বাইরেই থাকেন বেশীরভাগ। সে যাক, তুমি আর দেরি কর না। স্যার হরিবিলাসের বাড়ীতে চুরি, সাংঘাতিক ব্যাপার।

—ব্যাস্ত হবার কি আছে ? চায়ের কাপে চুমুক দেয় অরিন্দম।

—কি চুরি হয়েছে জান ? লেডী সুপ্রভার হীরের নেকলেস। বলে চললেন নরেনবাবু।

—আর একটা কিনে নিতে বলুন, হাসল অরিন্দম, তাতে ওদের অসুবিধে হবে না।

—টেবিলে একটা কার্ড পাওয়া গেছে অরিন্দম। নরেনবাবুর স্বরটা অন্য ধরনের।

—কার কার্ড ? উৎসুক হ'ল অরিন্দম এবার।

—তুমি যার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছ, সেই হরতনের।

—আবার হরতন! চেয়ার ছেড়ে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল অরিন্দম। হরতন একটা দলের নাম। অরিন্দমের সঙ্গে অনেকবারই এদের দলের সঙ্গে মোকাবিলা হয়ে গিয়েছে। হরতনের নাম শুনলে পুলিশের লোকেরাও ভয় পায়। শুধু বাংলায় নয়, সব দেশ জুড়ে এদের জাল ছড়ান আছে। কিছুদিন আগেই অরিন্দম এদের দলের কয়েক-জনকে অসীম সাহসের সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছে। তার ইতিহাস অনেকেই জানে। হরতনের নাম শুনে আর দেরি করলে না অরিন্দম।

অরিন্দম যখন নরেনবাবুর সঙ্গে স্যার হরিবিলাসের বাড়ী পৌঁছুল, তখনও কিন্তু অতিথিরা সবাই রয়েছেন। পুলিশ না এলে কেউ যাবার কথা চিন্তা করেন নি। অহেতুক সন্দেহভাজন হয়ে লাভ কি ? অরিন্দম চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখল। চারিদিকে এক তলার সমান উঁচু পাঁচিল। না, কোন হদিস পেল না সে। খোঁজ নিয়ে অরিন্দম কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করল। আলোগুলো সব এক সঙ্গেই বন্ধ হয়েছিল। মাত্র দশ-পনরো সেকেণ্ডের মত। তার মধ্যেই কাজ হাসিল। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে চোর নিশ্চয় বাইরে যেতে পারেনি। তারপরেই আলো জ্বলে উঠেছিল। অতিথিরা আসার পরই গেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা'হলে চোর কি অতিথিদের মধ্যেই আছে ? তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হ'ল। সেদিক দিয়েও বিফল হ'ল অরিন্দম। কিন্তু কে এই স্যার হরিবিলাস ? স্যার হরিবিলাসের বাড়ীটায় একটা অফিস ছিল বলে জানত অরিন্দম।

কোন সন্ধান পেলেন ? আমিই স্যার হরিবিলাস। বললেন একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক এগিয়ে এসে।

—না এখনও পাইনি, তবে পাব। উত্তর দিল অরিন্দম।

—হরতনকে চেনেন? তার কার্ডই বা এল কেন? স্যার হরিবিলাস তার দিকে তাকালেন।

—হরতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি এখনও, তবে তার দলের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। কথাটা বলে স্যার হরিবিলাসকে একবার লক্ষ্য করে দেখল অরিন্দম। স্যার হরিবিলাসের দৃষ্টিটা কেমন যেন চেনা বলে মনে হ'ল তাঁর। ঠিক সেই সময়ে একজন বেয়ারা দৌড়ে এল। তার মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে।

—কি হ'ল? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন স্যার হরিবিলাস।

—সায়েব, লাইব্রেরী ঘরে কে আবদুলকে বেঁধে রেখেছে, লোকটা হাঁপাচ্ছে। সকলে হন্তদন্ত হয়ে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। একটা লোক চিৎ হয়ে মেঝের উপর শুয়ে রয়েছে। তার হাত এবং পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাকে বন্ধন-মুক্ত করার পর সে বলল যে, যখন সে সরবতের ট্রে নিয়ে হলঘরের দিকে যাচ্ছিল, তখন লাইব্রেরী ঘর থেকে কে তাকে ডাকল। ঘরে ঢুকতেই একজন লোক তাকে বেঁধে তার উর্দি পরে চলে গেল।

—তুমি চীৎকার করলে না কেন? প্রশ্ন করল অরিন্দম।

—লোকটার হাতে রিভলভার ছিল। ভয়ে ভয়ে বলল আবদুল।

—রিভলভার কোথায় রাখল সে?

কোমরের বেল্টে রেখেছিল হুজুর। বলল আবদুল। অরিন্দম নরেনবাবুকে চুপি চুপি কি যেন বলল। নরেনবাবু অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে। তারপর মাথা নাড়লেন সজোরে। অরিন্দমের মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। ঘর থেকে বাইরে যাবার সময় নরেনবাবু অরিন্দমকে আলাদা ডেকে বললেন, তুমি আবদুলকে এ্যারেস্ট করতে বলছ কেন? আবদুলের পোশাক পরে চোরটা হলঘরে ঢুকেছিল। ও বেচারার দোষ কোথায়? নরেনবাবু স্যার হরিবিলাসকে প্রচুর আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন। গেটের কাছে রিপোর্টাররা ঘিরে ধরল তাঁকে।

—কোন খোঁজ পেলেন? প্রশ্ন করল একজন।

—না এখনও পাইনি তবে পাব নিশ্চয়। উত্তর দিলেন নরেনবাবু।

—আমাদের একটা বিপদ হয়েছে, যদি সাহায্য করেন একটু।

—আপনাদের আবার বিপদ কিসের? হাসলেন নরেনবাবু।

—স্যার হরিবিলাসের একটাও ফটো পাচ্ছি না। উনি ছবি তোলাতে ভীষণ আপত্তি করছেন।

—এসময় কার আর ছবি তোলাতে ভাল লাগে বলুন? বাড়ী থেকে অত দামী একটা জিনিস

খোয়া গেল, স্যার হরিবিলাসের মেজাজ খারাপ হবারই কথা। নরেনবাবুর কৈফিয়ৎ অরিন্দমকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। সিনিয়ার অফিসার এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে অরিন্দম নরেনবাবুকে সম্মান দিয়ে থাকে, কিন্তু সব জিনিসটাই যে ভুল হচ্ছে সেটা বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেও অরিন্দম হতাশ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। নরেনবাবু যেন চোখ বন্ধ করে আছেন। ক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ী ফিরিল অরিন্দম।

পরের দিন ভোর না হইতেই ফোনটা বেজে উঠল অরিন্দমের। নরেনবাবু জরুরী তলব দিয়েছেন, এখুনি যেতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অরিন্দম থানায় গিয়ে দেখলে নরেনবাবু ম্রিয়মাণ হয়ে বসে রয়েছেন।

—কি হ'ল নরেনবাবু? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

—বলছি, তার আগে তুমি বল গতকাল আবদুলকে তুমি এ্যারেস্ট করতে বলেছিলে কেন?

—লাইব্রেরী ঘরে আবদুল বাঁধা অবস্থায় ছিল। চোর তাকে বেঁধে চুরি করতে গেছল কেমন? আবদুলের পোশাক চুরি করল চোরটা, কিন্তু খালি হাতে হলঘরে গেল কেন?

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ, সরবত-সুদ্ধ ট্রে পাশের টেবিলেই রাখা ছিল, মনে পড়ল নরেনবাবুর।

—শুধু তাই নয়, আবদুলের সঙ্গে চোরটার ধস্তাধস্তি হ'ল অথচ একটা গেলাসও ভাঙ্গল না কিংবা এক ফোঁটা সরবতও পড়ল না। কথাটা বলে মিটিমিটি হাসতে লাগল অরিন্দম।

—আরে তাই তো। হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙল নরেনবাবুর।

—বেয়ারারা পোশাকের ওপরে বেল্ট পরে থাকে জানেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। উত্তর দেন নরেনবাবু।

—তা'হলে আবদুলের কথামত চোর রিভলভারটা কোমরের বেল্টে রেখেছিল, এটাও সম্ভব নয়; তা'হলে সকলেই সেটা দেখতে পেত। আর স্যার হরিবিলাস ফটো তোলাতে আপত্তি করেন কেন?

—অনেকেই আপত্তি করে। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন নরেনবাবু।

—যিনি অতবড় পার্টি দিচ্ছেন, স্যার উপাধি পেয়েছেন, তার পক্ষে কাগজে ফটো দিতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

—হ্যাঁ, কথাটা এখন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। উত্তর দিলেন নরেনবাবু।

—কিন্তু তখন হয়নি। হাসল অরিন্দম।

—স্যার হরিবিলাস? প্রশ্ন করলেন নরেনবাবু।

—ও নামে ভারতে কেউ নেই। উত্তর দিল অরিন্দম।

—তা'হলে জাল?

—হ্যাঁ তাই। স্যার হরিবিলাস নিজেই হরতন, কিংবা তার দলের লোক। সব জিনিসটাই সাজান। অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন, উদ্দেশ্য ?

—গত রাত্রে পাশের আগরওয়ালার বাড়ীতে ওই সময়েই কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে। এটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্যেই স্যার হরিবিলাসের বাড়ী চুরির অভিনয় করা হয়েছে।

—এবার সব জিনিসটা বুঝতে পারছি। বললেন নরেনবাবু।

—চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। নিম্নস্বরে কথাটা উচ্চারণ করল অরিন্দম।

ভোরের নদী

সতীন্দ্রনাথ লাহা

নীল জল ঘাস ছেড়ে কুয়াশা তখন,
পেতে গেছে নদী মাঠে ওড়না রেশম।
আলোর আভাসটুকু আকাশে ভাসে,
নদী-বুকে ছোট ঢেউ করে ছম্‌ছম্‌।

নদী যেন আয়না সে নীল আকাশের
শুকতারা ছায়া ফেলে চুম্‌কি দোলা।
বক্‌গুলো সার বেঁধে দিচ্ছে পাড়ি
এখনো ভোরের আলো কুয়াশা ঘোলা।

কালো ছেলে লগি হাতে সকালে উঠেই
খাড়া পাড়ে দেখছে কি ঘূর্ণি জলে ?
এখনি তো ক'টি মেয়ে কলসী কাঁখে
ধীরে ধীরে বালিতেই পা-টিপে চলে

কাজ থাক্‌, নাই থাক্‌, ভোরের হাওয়ায়
ছুতো করে নদী পাড়ে ছুটে যাওয়া বেশ,
খোলা হাওয়া, বালুচর, ভিজে প্রান্তর
মোহময় করেনি কি এই পরিবেশ ?

শ্রীসুখেন্দু দত্ত

গ্রীষ্মের দুপুরে। মাথার উপরের নির্মেঘ আকাশ থেকে ঝরছে আগুনের মতো রোদ। পায়ের তলার ধুলো গরম। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। চারিদিক নিঃঝুম।

বুড়ো বেলুনওয়ালা সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই সে রাস্তার কলে জল খেয়ে গলির মুখের বটগাছটার ছায়াতে একটু জিরোতে বসেছে।

একটু পরে বাঁশী বাজাতে বাজাতে একটি জোয়ান বাঁশীওয়লা এসে দাঁড়ালো বেলুন-ওয়ালার সামনে। সেও ক্লান্ত।

বাঁশীওয়ালা বেলুনওয়ালার পরিচিত।

বেলুনওয়ালা মুখ তুলে বাঁশীওয়ালার দিকে চেয়ে বললো, আজ রদ্দুরটা বড়ো কড়া, একটু বসো, জিরিয়ে নাও ভাই।

—হ্যাঁ, একটু জিরিয়ে না নিলে আর হাঁটতে পারবো না। বলে বাঁশীওয়ালা বসলো।

সামনেই গলি। খরিদ্দার পাওয়া যেতে পারে, এই আশায় বাঁশীওয়ালা বাঁশী বাজাতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা একটা করে কয়েকটা বাড়ীর বন্ধ জানালা খুলে গেলো। আর সে জানালাগুলোতে দেখা গেলো কচি কচি মুখ।

একটু পরেই দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে এসে বাঁশীওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়ালো। কিন্তু সবাই বাঁশী কিনতে পারলো না। যে দু'জনের কাছে দশ পয়সা ক'রে ছিলো, সে দু'জনই বাঁশী কিনতে পারলো। বাকী তিনজন তিন পয়সা দামের বেলুন কিনে খুশী হয়ে চলে গেলো।

বাঁশীওয়ালা বেলুনওয়ালাকে জিগ্যেস্ করলো, দাদুর আজ কেমন লাভ-টাভ হলো?

বেলুনওয়ালা তার পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে একটু হেসে বললো, তোমার চেয়ে বেশীই হবে ভাই। দেখলে না এখুনি, তুমি পেলে দুটো খদ্দের আর আমি পেলাম তিনটে।

বাঁশীওয়ালা অবাক হয়ে বললো, আমার চেয়ে বেশী? তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি দাদু? আমি একটা বাঁশী বেচে যা লাভ করতে পারি, তিনটে বেলুন বেচলে তোমার তা লাভ হবে? তোমার খদ্দের বেশী হলেও লাভ কম, আর আমার খদ্দের কম হলেও লাভ

বেলুনওয়ালা আর একটু হেসে বললো, শোন ভাই, খুশি জিনিসটা পয়সা দিয়ে কিনতে

পাওয়া যায় না। আর সে জিনিসটা তোমার চেয়ে আমার কাছেই আছে। তুমি এই মাত্তর দুটো বাচ্চাকে খুশি করতে পেরেছো, আর আমি করতে পেরেছি তিনটেকে। তা হলে লাভটা কার বেশী হলো ভাই?

'বাঁশীওয়ালা অবাক হয়ে চেয়ে রইল'।

বেলুনওয়ালার কথা শুনে বাঁশীওয়ালা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো বেলুনওয়ালার মুখের দিকে। তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না।

বেলুনওয়ালার মুখে খুশির ছাপ।

কীটপতঙ্গের জগতে রাসায়নিক যুদ্ধ

কীটপতঙ্গেরা কতভাবে আত্মরক্ষা করে, কেউ দুর্গন্ধ ছড়ায়, কারুর হুলে তীব্র বিষ থাকে। হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রেকিনাইডস নামে একরকম গুবরেপোকার লড়াইয়ের কৌশল গবেষণা কোরে দেখা গেছে যে, এরা এদের তলপেটে বিষাক্ত হাইড্রো সিনোন ও হাইড্রোজেন প্রোক্সাইড তৈরি করতে পারে ও দুটিকে একত্র মিশিয়ে একরকম এনজাইমের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এই কটুগন্ধ বিষের আক্রমণে শত্রু একেবারে ঘায়েল হয়ে যায়। এক দফায় মোট বারো বার সে এভাবে বিষবাষ্প ছুঁড়তে পারে। এক ঘণ্টার মধ্যেই এই নিঃশেষিত বিষের ভাঁড়ার আবার ভরে যায়। আত্মরক্ষায় কীটপতঙ্গের রাসায়নিক-যুদ্ধের আরও অনেক কলাকৌশল এই গবেষণার সময় আবিষ্কার করা হয়েছে।

শিশুর জ্ঞান-ভূষা

শ্রীসুনির্মল রায়

গ্রন্থাগার হচ্ছে শিশুর মনোবিকাশের একটা প্রধান স্থল। শিশুর মন চায় অজানাকে জানতে, চায় বিভিন্ন বৈচিত্র্য আহরণ করতে। এক জায়গা থেকে এই বৈচিত্র্য আহরণ শিশুদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাগারই এই অভাব মেটাতে পারে। গ্রন্থাগারেই শিশুরা খুঁজে পেতে পারে বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে—বিভিন্ন বই-এর পাতায় পাতায় নানারঙের রঙীন ছবির মধ্যে, কথা ও গানে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ ধরণের শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাগারের একান্ত অভাব। আমাদের দেশের শিশুদের জ্ঞান-তৃষা তাই আজও অতৃপ্ত। ওরা জানতে চায় জানতে পারে না, ফুটতে চায়, ফুটতে পারে না। এর চাইতে দুঃখের আর কি থাকতে পারে?

ফেডারেল রিপাব্লিক অফ্ জার্মানির কিন্তু বিভিন্ন শহরে শিশুদের জ্ঞান-তৃষা মেটাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিশুদের উপযোগী সেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগার। এ ধরণেরই একটা গ্রন্থাগার হচ্ছে 'ডুজেলডরফ্ সিটি লাইব্রেরী'। ওখানে গেলে ছোটদের দেখা যাবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তে। গণ্ডগোলময় পরিবেশও খুব কম সময়ের জন্যে তাদের বই পড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। অল্পবয়স্ক শিশুদের জন্য লাইব্রেরীয়ানরা কাজ করে আনন্দ পান ও তাঁদের গল্প বলেও নানাভাবে সাহায্য করেন।

ওখানকার গ্রন্থাগারে পড়ার ঘরগুলি যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। ওখানের পরিবেশ এমনিভাবে তৈরী করা হয়, যাতে শিশুরা মনে করতে পারে যে তারা ঘরে বসেই পড়ছে এবং পড়বার যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পায়। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের পড়বার ঘরকে বলে 'ইয়ং পিপিল্স রিডিং রুম'। এ ঘরের চেয়ারগুলো যে তাদের জন্যেই—একথা ভেবে তারা গর্ব অনুভব করে। কিছু কিছু শিশুকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় 'পাপেট থিয়েটার', 'চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা' ও 'কুইজের' মাধ্যমে। এভাবে আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে তারা সত্যিকার এক-একজন ক্ষুদে পাঠক হয়ে ওঠে। বইয়ের কার্ডের তালিকা-সূচীর উপর চোখ বোলাতে তারা কৌতুক অনুভব করে; কারণ তখন তারা অনেক নতুন বিষয়বস্তুর নামের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। তারা নিজেরাই শেল্ফ থেকে বই খুঁজে নেয়। কেউ সেখানে বসেই পড়ে, কেউ আবার বই বাড়ীতেও নিয়ে যায়। দেখা গিয়েছে সাদা মলাটয়ালো বই-এর চাইতেও রঙীন প্রচ্ছদ-পটওয়ালা বইয়ের আকর্ষণ অনেক বেশী। প্রায়ই শিশুরা 'স্কুলের গল্প', 'গোয়েন্দা গল্প' ইত্যাদি বই-এর জন্য লেখককে অনুরোধ করে। জার্মানিতে অ্যাসট্রিড লিন্ডগ্রেন লিখিত 'পিপ্পি ল্যাংসট্রাম্প্ফ্' সম্প্রতি সকল বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অ্যাসট্রিড্ লিন্ডগ্রেন ছাড়া এরিক কাস্টনার এবং অট্‌ফ্রায়েড প্রিউস্লার হচ্ছেন সেখানকার শিশুদের আর দু'জন প্রিয় লেখক। ফেডারেল রিপাব্লিক অফ্ জার্মানিতে, পোল্যাণ্ড ও চেকো-স্লোভাকিয়া থেকে আসা শিশু ও যুবকদের জন্য লেখা বইগুলোও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং সেখানকার ভাষায় ভালভাবে অনূদিতও হচ্ছে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে প্রাগের জান প্রোকাজকার অল্পবয়স্কদের জন্য অপূর্ব রচনা 'লঙ্ লিভ্ দি রিপাব্লিক' বইখানা জার্মানিতে

শিঙ্গি মাছের চাষ

শ্রীঅনিল সোম

মাছের যোগান কমে গেছে বলেই না মাছ আজকাল এত আক্রা। যোগান কি করে বাড়ান যায়? দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং মৎস্য চাষ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, দিনের আলো বাড়ালে মাছের যোগানও বাড়বে। যদি তা না সম্ভব হয়, তো কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোতেও কাজ চলবে। এঁর নাম ডাঃ সুন্দররাজ।

শিঙ্গি মাছ বছরে একবার মাত্র ডিম পাড়ে, তাও শুধু বর্ষাকালেই; জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। শিঙ্গি মাছ কেন মাত্র একবার ডিম পাড়ে এই নিয়ে ঐ প্রাণীবিজ্ঞানী পাঁচ বছর আগে এক গবেষণায় হাত দেন। এর উত্তর তিনি এখন খুঁজে পেয়েছেন।

সাধারণতঃ মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত সূর্যের আলো দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে শিঙ্গি মাছের ডিম্বাশয় পরিপুষ্টি লাভ করে, ডিম দেবার উপযুক্ত হয়।

সূর্যের আলোর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক্ আলো প্রয়োগ করে গবেষক দেখলেন যে, মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে শিঙ্গি মাছ পাঁচবার ডিম দিয়েছে। সাধারণতঃ জুন মাসে শিঙ্গি মাছ একবারই ডিম ছাড়ে। মাদী শিঙ্গি মাছকে কৃত্রিম হরমোন ইনজেকশন দিয়ে গবেষক শিঙ্গি মাছকে বার বার ডিম দিইয়েছেন। প্রতিবারই ঐ ডিম থেকে প্রায় ১০,০০০ বাচ্চা পাওয়া গেছে। ডিম ছাড়া ঋতুর তুঙ্গিতেও শিঙ্গির ডিম থেকে ঐ একই সংখ্যক বাচ্চা পাওয়া যায়।

গবেষক মনে করেন যে রুই মাছের ক্ষেত্রেও এই আলো প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাবে। রুই মাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। একমাত্র স্রোতস্বিনী নদীতেই রুই মাছ ডিম ছাড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্য নিলে বদ্ধ জলাশয়েও রুই মাছকে দিয়ে ডিম পাড়ানো যায়।

ডাঃ সুন্দররাজের পরবর্তী কাজ হচ্ছে শিঙ্গি মাছকে দিয়ে পাঁচ বারেরও বেশী ডিম পাড়ানো যায় কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এ গবেষণার ফল হবে সুদূর-প্রসারী।

নির্ভাবনায় রাস্তা পার

পৃথিবীর বড় বড় শহরে এখন সাদা ডোরাকাটা জায়গা দিয়ে পথ পার হবার নিয়ম; কিন্তু মানে ক'জন? আর সেজন্যেই পথ-দুর্ঘটনাও কমে না। পশ্চিম জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ব্রেমেনে এখন পথচারীদের পথ পেরুবার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার মাঠে এসে ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা তাদের শেখায় কিভাবে পথ পেরুলে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। শিক্ষা শেষে হৃষ্টমনে কফি খেয়ে যে-যার বাড়ি যায়। বৃদ্ধ ও পঙ্গুদের সাধারণতঃ স্বেচ্ছা-সেবকরা পথ পেরুতে সাহায্য করে। এই সেচ্ছাসেবকদের আরেক কাজ ডোরাকাটা [illegible]

ছবি

শ্রীবিশ্বনাথ দে

বালিগঞ্জের বিবেকবাবু, ডাক নাম যাঁর ববি,
মানুষ মেরে হাড় জমানো—এই আছে তাঁর হবি।
মানুষ মারার খেলায় তিনি পান না মোটে ভয়,
মরা লোকের হাড় জমানো সোজা কিন্তু নয়।
বুকের পাটা থাকলে তবেই এমনি হবি হবে,
কান দিতে নেই কারো কথায়, কিংবা জনরবে।
ভয় শুধু নয়, লজ্জা-ঘৃণাও ছাড়তে জানা চাই—
এমন হবি থাকে যাঁদের, বিবেক তাঁদের নাই।
বিবেক ছাড়া বিবেকবাবুর একটিমাত্র হবি,
এইটি বজায় রাখতে গিয়ে ছেড়েছেন আরসব-ই।
হাড় জমানোর ঘরটি যে তাঁর মিউজিয়ামের মতো,
ঘরের ভেতর হাড়ের পাহাড় জমছে ইতস্ততঃ।
সব মানুষের হাড় জমানোয় সতর্ক তাঁর চোখ
বিশেষ করে গরীব লোকের হাড়ের দিকেই ঝোঁক!
হাড়গিলে সব গরীবগুলোর হাড়ের বাহার কতো,
বিবেকবাবু প্রাণপণে তা বোঝান অবিরত!
মিউজিয়ামে হাড়গুলিতে রাখেন টিকিট মেরে,
পৃথক করে সাজিয়ে রেখে দেখেন নেড়েচেড়ে।
দেখে দেখে আপন মনে অট্টহাসি হাসেন—
হাড় জমাতে বিবেকবাবু বড্ড ভালবাসেন।
মানুষ মেরে হাড় জমানো—সে হাড় মানে টাকা,
মিউজিয়ামে রাখা মানে সিন্দুকেতে ঢাকা।
হাড়ের গায়ে টিকিট মানে পৃথক টাকার তোড়া—
আজব হবির আজব মানে, বুঝবি না কেউ তোরা!

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল — উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিঃ পিয়ার্সন আর রাগ সামলাতে পারলেন না। তিনি তাঁর বেত দিয়ে তাদের প্রহার করে আধমরা করে ফেললেন। তারপর তাদের একটা ঘরে বন্ধ করে রাখার আদেশ করলেন। আর তখনই কাজ থেকে তাদের বরখাস্ত করে অন্য লোকের ওপর তাদের কাজের ভার দিলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় সেদিন আর কিছু করা সম্ভব হ'ল না। সে রাতটা নানা দুর্ভাবনায় কেটে গেল। পরদিন প্রাতে তাঁরা সদলবলে রজতের খোঁজে যাত্রা করলেন।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে রজতের জ্ঞান ফিরে এল। তার মাথাটা ভয়ানক ভার বোধ হচ্ছিল। উঠে বসতে গিয়ে সে দেখলে যে, তার হাত ও পা বুনো লতা দিয়ে বাঁধা।

চারিদিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলে যে, তাকে একটা ছোট চালা ঘরে রাখা হয়েছে। ঘরে একটি মাত্র দরজা ছাড়া বাইরের সঙ্গে আর কোন যোগ নেই। মাটির দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে ফাটল তারই মধ্য দিয়ে অপরাহ্নের ক্ষীণ রশ্মি ঘরে ঢুকে একটা আলো-আঁধারির স্পৃষ্টি করেছিল।

চকিতের মধ্যে পূর্ব-কথা তার সব মনে পড়ে গেল। দুপুর বেলায় মদন আর

সে কাকেও না ব'লে তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। বনের মধ্য দিয়ে নদীতে যাবার পথ।• তারপর বনের মধ্যে উপস্থিত হতেই হঠাৎ মাথায় একটা আঘাত পেয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মনে হ'ল, তাকে যেন কারা বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের কথাবার্তায় সে বুঝেছিল যে কাফ্রীরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কাফ্রীরা তাদের শান্ত নির্জন বনভূমির মধ্যে দিয়ে রে[illegible]বার' কাজকে ভাল চোখে যে দেখেনি, রজত তা জানতো। কাজ বন্ধ করায় [illegible] তারা ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু রেলপথ তৈরীর কাজে তার দায়িত্ব কতটুকু। তাকে শাস্তি দিয়ে বা মেরে ফেলে রেলপথ বসাবার কাজ বন্ধ করতে পারবে? তবে তাকেই বা ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

কৈলাস ও মদনকে তার সঙ্গে না দেখে সে মনে করলে যে, তারা নিশ্চয়ই ধরা পড়েনি। তা'হলে সে তাদেরও সেই ঘরের মধ্যে দেখতে পেত। তার মনে আশা হ'ল,—মিঃ পিয়ার্সন নিশ্চয়ই তাদের কাছ হতে তাকে ধরে নিয়ে যাবার খবর পেয়ে এখনই তার সন্ধানে আসবেন। পরক্ষণেই তার মনে সন্দেহ হ'ল,—তারা তাকে শিকারের লোভ দেখিয়ে কাফ্রীদের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে করে আনেনি তো? তা না হলে সে-ই বা একা বন্দী কেন? কাফ্রীরা তার সঙ্গে তাদেরও ধরে আনতে পারতো? জাহাজে যারা তাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, তারা ছিল দু'জন। এরা তাকে অনেকবার অযাচিতভাবে সাহায্য করতে চেয়েছিল। তবে কি এরাই তাকে পৃথিবী থেকে সরাতে চায়? কিন্তু কেন?—এই রকম নানা চিন্তা তার মনে এসে ভিড় করতে লাগলো।

অল্প পরে তার কোমরের দিকে তাকিয়ে রজত লক্ষ্য করলো,—তার বেল্টে ছুরি, টর্চ আর লিলির মায়ের দেওয়া রিভলবারটা এখনও রয়েছে। এগুলোকে কেন যে তারা কেড়ে নেয়নি, তা সে বুঝে উঠতে পারলো না। বোধ হয় তার হাত-পা বাঁধা আছে ব'লে ওগুলোকে নেবার প্রয়োজন তারা বোধ করেনি।

ঘরের বাইরে কিছু দূরে কতকগুলো লোক বসে জটলা করছিল। তাদের দু'একটা কথা বন্ধ দরজার ভেতর থেকে কিছু কিছু হতে শোনা যাচ্ছিল। কাফ্রীদের ভাষা যেটুকু সে শিখেছিল, তাতে সে বুঝতে পারলে যে, তাকে নিয়ে কি করা যায়—এই তাদের আলোচ্য বিষয়।

রজত বুঝেছিল যে তাকে যখন ধরে নিয়ে এসেছে,• তখন নিশ্চয়ই তারা তাকে জামাই আদরে রাখবে না। এরা নরখাদক হয়, তা'হলে তার মাংসে ওদের উদর পূর্তি হবে। সে শুনেছিল,—নরখাদকরা মানুষকে আগুনে ফেলে ঝলসে নিয়ে আধ-পোড়া মাংস খেতে

খেতে আগুনের চারিদিকে নেচে বেড়ায়। এরকম ভাবে মরতে সে চায় না। কিন্তু উপায় কি? সুদূর বাংলা দেশ থেকে সে কি নিয়তির তাড়নায় আফ্রিকায় এসে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করে নেবে?

লিলির কথা, মিঃ পিয়ার্সনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তারা তাকে ভালবাসে, তারা কি তার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করবে না? কিন্তু সে তো পরের কথা। ইতিমধ্যে সে যদি কাফ্রীদের পেটের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়, তা'হলে মিঃ পিয়ার্সন এসেই বা কি করবেন? তাই সে ঠিক করলে যে, বাঁচবার চেষ্টা তাকে এখনই করতে হবে। নিদ্রিত সিংহের মুখে যে আহার প্রবেশ করে না, তা সে জানে। তাই সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সচেষ্ট হ'ল।

সে হাত বাঁধা অবস্থাতেই বহু কষ্টে তার বেল্ট থেকে ছুরিখানা বার করে আনলো। তারপর সেখানা দু'হাতে ধরে পায়ের বাঁধন কেটে ফেলল। এইবার সে দু'পায়ের মাঝে ছুরির বাঁটখানা চেপে ধরে হাতের বাঁধন কাটতে সুরু করলো। বনজ শক্ত লতা দিয়ে কাফ্রারা তাকে বেঁধেছিল। ছুরিখানা ঠিকভাবে পায়ে ধরা যায় না, বার বার এক পাশে হেলে পড়ে। ফলে বাঁধন কাটতে বিলম্ব হতে থাকে। যা হ'ক, অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তার হাতের বাঁধনও কাটা পড়লো।

এবার সে মুক্ত। দু'একবার আড়মোড়া ভেঙ্গে সে তার দেহের জড়তা দূর করলো। এমন সময় মাথাটা চিনচিন করে উঠতেই মাথায় হাত দিয়ে সে দেখলে যে, মাথার এক পাশটা বেশ ফুলে গিয়েছে। মাথা যে ফেটে যায়নি তার জন্য সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালো। তারপর তার রিভলবারটা পরীক্ষা করে তার বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। পরে যে দিক থেকে লোকগুলোর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল তার বিপরীত দিকের দেওয়ালে ছুরি দিয়ে একটা গর্ত করে সে রাত্রির অপেক্ষায় বসে রইল।

ইতিমধ্যে তাদের কথাবার্তা কিছু কিছু তার কানে এসেছিল। একজন রঞ্জতকে ধরে আনার বিপক্ষে মত ঘোষণা করে বললে, 'বাবুকে এখনই সেখানে পৌঁছে দিয়ে আয়। তাতে হয়তো তোরা বকশিশও পেতে পারিস্।'

তার উত্তরে বলতে শোনা গেল, 'ধরে যখন এনেছি তখন ছাড়া হবে না। যে বাবুরা একে ধরিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে জেনেছি,—এ বাবুকে সাহেব খুব ভালবাসে। কাজেই একে ছেড়ে দেবার বদলে সাহেবের কাছ হতে প্রচুর জিনিস আদায় করে নিতে হবে।'

তার কথায় রঞ্জত বুঝতে পারলে, যারা তাকে ধরে এনেছে এ লোকটা তাদেরই একজন।

এবার আর একজন বললে, 'কালই যদি সাহেব দলবল নিয়ে আসে আর বাবুকে এখানে দেখতে পায়, তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে বল্ দেখি?'

অন্য একজন বললে, 'সাহেব আমাদের খবর পাবে কি করে? এ বাবুকে যারা সরিয়ে দিয়েছে তারা তো আর আমাদের কথা বলতে যাবে না। কাজেই সাহেব এখানে আসছে না।'

এই রকম কথাবার্তা চলতে চলতে অন্ধকার হতেই লোকগুলো আগুন জেলে হৈ-হল্লা করতে লাগলো।

রজত বুঝতে পারলে যে তার সন্দেহ সত্য। কৈলাস আর মদন তাকে কাফ্রীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতে তাদের কি স্বার্থ তা সে বুঝতে পারলে না। তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'ল যে, এরা নরখাদক নয়। তা'হলে এদের আলোচনার মধ্যে সে কথা জানা যেত। যা হ'ক এখানে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে অন্ধকার হতেই সে ঘরের বাইরে এসে গুঁড়ি মেরে একদিক লক্ষ্য করে চলতে লাগলো।

আফ্রিকার বনভূমি। নির্জন, রহস্যময় বনপ্রান্তর। প্রতি মুহূর্তেই যে কোন দিক হতে বিপদ আসতে পারে। কাফ্রীদের কবল হতে মুক্ত হবার জন্যই রজত পালাচ্ছিল। কাফ্রী ছাড়া আর কারও কাছ থেকে যে বিপদ আসতে পারে, সে কথা রজতের প্রথমে মনেই আসেনি। তাই সে রাত্রে কাফ্রীদের গ্রাম থেকে পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকার বনভূমিতে শুধু কাফ্রী থাকে না। রাত্রে যারা শিকারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায় তারাও নরখাদক কাফ্রীদের চেয়ে কম নিষ্ঠুর নয়। যেন কোন দৈব প্রেরণায় তার মন আফ্রিকার বনভূমির ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। সে যে এখন নিরাপদ নয় এ কথাটা তার মনে হতেই সামনে যে বড় গাছটা পেল, তাতেই সে চড়ে বসলো।

অল্প পরেই রজত দেখলে যে, পশুরাজ সিংহ মন্থরগতিতে নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের গন্ধ তার নাকে যেতে সে গর্জন করে উঠলো।

নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে রজত সে রাত্রি জেগে কাটালো। (ক্রমশঃ)

সুকৃতির স্বীকৃতি

দাস

রূপের পসরা মিথ্যা তাহার
হৃদয় যাহার কালো,
তেলচিটে মাখা মাটির প্রদীপ
বিতরে স্নিগ্ধ আলো।

বিশ্রী হলেও সুন্দর সেই
ভালো কাজ যেবা করে,
তাই শিমুলের বদলে বকুলে
পূজারী মালিকা গড়ে।

খুনী কে?

শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী

*

সিংভূমের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কোলাহর্ন। এখানে থাকে কোল, মুণ্ডা ও আরও নানান উপজাতি। মাটির নিচে আছে নানা রকম খনিজ পদার্থ। চারিদিকে ছোটবড় পাহাড় আর বনজঙ্গল। কোলাহনের জঙ্গলে দিনের বেলায় বাঘ বেরোয়, হাতীতে ধানের ক্ষেত নষ্ট করে। সিংভূমের মুরুম মাটি কেটে খরবেগে বয়ে চলে পাহাড়ী নদী। পাহাড়ে পাহাড়ে ঝির্‌ঝির করে ব'য়ে চলে রুপালী ঝরনা।

কোলাহনের গ্রামের রূপ দেখবার বড়ই ইচ্ছা ছিল বহু দিন থেকেই। একদিন সুযোগ এলো, মামা কি একটা কাজে যাবেন কোলাহানে। আমিও সঙ্গী হলাম তাঁর।

গ্রামের গা ঘেঁষে বিরাট কালো ঢালু পাহাড়। এই পাহাড়ে নাকি ভালুক থাকে। পাহাড়ের উপর গাছ-পালার চিহ্ন নেই, শুধু বিরাট কালো কালো পাথর। আর পাহাড়ের নীচে সারি সারি মহুয়া গাছ।

ক্রমে আমরা পৌছিলাম কোলাহানের ভূমিখণ্ডে। আমাদের গাড়ী দাঁড়ালো [illegible]

ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। তাদের চোখে কৌতূহল, মুখে সরলতা মাখানো। গায়েও কিছু নেই। একটি মেয়ে কিন্তু ছলছল চোখে গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল, কাছে আসেনি। খুব বিষণ্ণ মুখ। ওকে কাছে ডাকলাম। ওখানকার ভাষা অন্যরকম। তাই ওদের ভাষায় ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিকন্ হুতুম ?' অর্থাৎ তোমার নাম কি ? মেয়েটি বলল, 'আয়া হুতুম তিরসি।' অর্থাৎ আমার নাম তিরসি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন ? তার উত্তরে সে একটা অদ্ভুত কাহিনী বলল। সেই কাহিনীটিই এখানে তোমাদের কাছে বলছি : ওদের গ্রামে কিছুদিন থেকে নাকি খুব ডাইনীর উৎপাত হচ্ছিল—গোরু, মোষ, ছাগল প্রায়ই মারা পড়ছিল। সেই সঙ্গে চলছিল ঘরে ঘরে রোগ। ওদের দেবতা বোঙ্গার পুজা দিয়েও কিছু হ'ল না। ওঝা এসে বলল, গ্রামে ডাইনীর উৎপাত হচ্ছে এবং ডাইনী যে কে তাও বলল।

তিরসির এক দূর সম্পর্কের বোন যমুনাই নাকি ডাইনী। পঞ্চায়েতে ঠিক হ'ল, ডাইনীকে মারতে হবে। তিরসির বাবা গ্রামের প্রধান, তাই তারই উপর ভার পড়ল ডাইনীকে মারার।

সেইদিন অমাবস্যা। তিরসির বাবা সারাদিন উপোস করে বোঙ্গা পূজো করছে; রাত জেগে পাহারা দিতে হবে, সঙ্গে থাকবে তাদের কুকুর।

বাবার সঙ্গে তিরসিও জেগে বসে রইল। বাবার হাতে তীর-ধনুক। হঠাৎ দেখা গেল একটা কালো ভালুক ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে তিরসির বাবাও। কুকুরটা একবার চিৎকার করেই চুপ হয়ে গেল। তিরসির বাবা সেই সঙ্গে তীর ছুঁড়লো। বীভৎস একটা আওয়াজ করে ভালুকটা পড়ে গেল। লোকজন জমা হ'ল। দেখা গেল যমুনা পড়ে আছে। সারা শরীর তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওর হাতে আর মুখেও রক্ত। আর কিছু দূরে কুকুরটা ঘাড় মুড়ে পড়ে আছে।

পরের দিন যমুনাকে হত্যা করার অপরাধে পুলিশ ওর বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। তিরসি বলল, তোমরাও একটু দেখো ভাই আমার বাবার যেন কোনও সাজা না হয়। আমার বাবা তো দোষী নয়।

তিরসি ঠিকই বলেছে, আসল খুনী তো ওর বাবা নয়। আসল খুনী মানুষের অন্ধ বিশ্বাস!
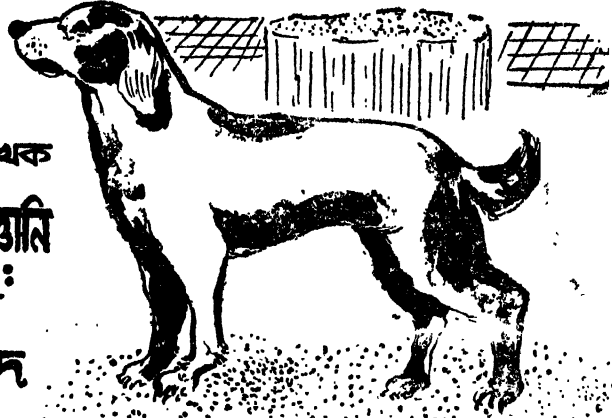
॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

শীত চলে গেছে। ষ্টেশনের চারিদিকের মাঠগুলিতে বাদাম ও আড়ু* (পীচ) গাছগুলি পুষ্পভারে সমৃদ্ধ। প্রথম ঝাঁকের সোয়ালো পাখীরা আকাশ-পথে নেমে এসে বসন্তের গান জুড়েছে। অপর্যাপ্ত শ্যামল শস্যে ক্ষেত ভরেছে।

যদি মধুর ঋতু চারদিকে আনন্দের হিল্লোল এনেছে, তবুও আমাদের ষ্টেশনে কেমন একটা শূন্যতার ভাব। মনে হচ্ছে, 'রোদন ভরা এ বসন্ত, কখনও আসেনি বুঝি আগে।' আজ পাঁচ মাসের ওপর ল্যাম্পো, আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু এখনও আমরা তার কথা ভাবি। যদিও আমরা কেউই তার কথা আলোচনা করি না। কী হবে ব্যথার স্মৃতি আলোড়ন করে। তবুও এমন কিছু নতুন নতুন ঘটনা ঘটে যার জন্য তাকে আমাদের মনে পড়েই। হয়ত কোন যাত্রী, যে আগে ল্যাম্পোকে জানত, এই ষ্টেশনে নেমেছে গাড়ী বদল করতে, ল্যাম্পোর কথা জিজ্ঞাস করে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমরা অস্বস্তির সঙ্গে বলি : 'সে আর এখানে নেই পালিয়ে গেছে।'

*বাংলাদেশে পীচ হয় না। তাই বাংলায় ওর কোন প্রতিশব্দ নেই। হিন্দীতে পীচকে 'আড়ু' বলে। শব্দটি বাংলা নাহলেও ভারতীয় তো বটে।

প্রায়ই ডাইনিং-কারের রাঁধুনীরা জানলা দিয়ে ল্যাম্পোকে ডাকবে। ওরা তো জানে না কুকুটার কি হয়েছে।

আমরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলি, 'খামকা চেঁচিয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করছ কেন? সে এখন আমাদের কাছে নেই। কেথায় চলে গেছে।'

মনের মধ্যে একটা অপরাধী ভাব আমাদের ভেতরে ভেতরে পীড়ন করত। আমরা তখন তীব্র অনুশোচনায় জ্বলছি, ওকে ওভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম বলে। এমন কী আমাদের ষ্টেশনমাষ্টার যিনি নিজে এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন, তিনিও যে এ জন্য অনুতপ্ত সেটা পরিষ্কার বোঝা যেতো। যখনই কোন কুকুরের আলোচনা হ'ত, উনি সন্তর্পণে সে আলোচনায় যোগ না দিয়ে, পালিয়ে যেতেন। ওঁর বিরুদ্ধে আমার রীতিমত অভিযোগ ছিল। যদিও জানতাম কুকুরটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না, এবং উনিও কর্তব্যের দায়ে এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মির্ণা এখন একটি নিজস্ব ছোট্ট কুকুরের আশায় বেশ খুশিতে আছে। আমি ওকে কথা দিয়েছি যে, একদিন আমরা দু'জনে রোমে গিয়ে কুকুরের আস্তানায় যাবো। সেখানে অনেক রকম কুকুর আছে। যেটা ইচ্ছে একটা পছন্দ করে নেওয়া যাবে। মির্ণার যেটি সব চেয়ে পছন্দ হবে, আমরা তাকে নিয়ে আসব, আর তার নাম রাখব 'ল্যাম্পো।'

আমি বড় খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন কাজের বেশ চাপ পড়েছিল। একগাদা টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছিলাম। এমন সময় একটা খুব হই-চই সোরগোলের আওয়াজ পেলাম। আমার এমন ফুরসৎ ছিল না যে উঠে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী। অকস্মাৎ সশব্দে আমার ঘরের দরজা ঠেলে বেগে এসে ঢুকল আমারই এক সহকর্মী। চীৎকার করে বললে, 'শীগ্‌গির বাইরে এসে দেখ।'

ব্যাপার কী! কৌতুহল হ'ল। কালমাত্র বিলম্ব না করে, চটপট বেরিয়ে এলাম। বাইরে আসতেই যা দেখলাম তাতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা কুকুর—নিশ্চল। অত্যন্ত রোগা। উজ্জ্বল, কিন্তু ক্লান্ত দুটি চোখ। দেখেই বোঝা যায় অনেক কষ্ট পেয়েছে সে। শুধু লেজটি মৃদু মৃদু নাড়ছে। চিন্‌তে দেরি হ'ল না। যদিও বদলে গেছে খুব। আমি নিজেকে দমন করতে পারলাম না, জড়িয়ে বুকে তুলে নিলাম তাকে। চেপে ধরলাম বুকের ওপরে। মনে হচ্ছিল আমার বুকে যেন একটা গরম লোহা আমি চেপে ধরেছি। অনেক কষ্টে অস্পষ্টভাবে বললাম, 'ল্যাম্পো, মানিক আমার, আর আমি কখনও তোমাকে দূরে সরিয়ে দেব না; তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!' ও নিশ্চয় আমার ভাষা বুঝতে পেরেছিল। কারণ, বারকয়েক ওর জিভ দিয়ে আমার

মুখ চেটে দিলো। ওকে কোল থেকে নামিয়ে, ওর পিঠের ওপরে আমার চোখের জল—যেটা বৃথাই সংবরণের চেষ্টা করছিলাম, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে দিলাম।

এবারে আমাদের 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। সমস্ত ষ্টেশন উত্তেজনা ও আনন্দে ভরে উঠল। একঘেয়েমি ভঙ্গ করে আজ নতুনের ও আনন্দের সাড়া জেগেছে আমাদের ভেতরে। কিছুক্ষণের জন্য নিজের নিজের কাজ ফেলে সবাই ছুটল ল্যাম্পোর সঙ্গে দেখা করতে। সমস্ত ষ্টেশনময় আনন্দের রব উঠল। ল্যাম্পো ফিরে এসেছে। সর্বত্র ঐ এক কথার প্রতিধ্বনি। ল্যাম্পোর চারিদিকে রীতিমত ভিড় জমে গেল। সকলেই ওকে ডাকছে, ওকে ছুঁতে চায়, ওকে আদর করতে চায়, আর জানতে চায় কীভাবে, কেমন করে ও ফিরে আসতে পারল?

মনে হ'ল এই সংবর্ধনায় ল্যাম্পো খুশি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ষ্টেশন মাষ্টারকে ভেতরে ঢুকতে পথ করে দেওয়া হ'ল। তিনি এসেই নীচু হয়ে ল্যাম্পোর পিঠ চাপড়ালেন। ওকে আবার দেখে খুশি হয়েছেন বোঝা গেল। নিজের মনের দুর্বলতা চেপে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে ভাল করে দেখা-শোনা করুন, ও যেন ওর হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পায়। আর ও আমাদের কাছেই এবার থেকে থাকবে।' আমি সোৎসাহে উত্তর দিই, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার।'

সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করি, 'ও কেমন করে ফিরল?'

সমস্বরে উত্তর, 'ও রোম এক্সপ্রেস থেকে নেমে এল।' একজন ইঞ্জিনের লোক বলে, 'প্রথমে হঠাৎ দেখে ঠিক চিনতে পারিনি, তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখি নাঃ, ল্যাম্পোই বটে।'

আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। দেখলাম, ওর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ওর পায়ের তলাটা ফেটে ফুলে গিয়েছিল, এবং তাতে রক্তের দাগ। ওর আগের সেই সাদা পুরু নরম লোম ময়লা এবং ধূসর বরণ হয়ে গিয়েছিল। শরীরের জায়গায় জায়গায় খাবলা মেরে যেন লোম কে তুলে নিয়েছে এবং সেখানকার চামড়ায় লালচে রং-এর দাগ ও ক্ষত।

আগেকার সুষ্ঠু নধর দেহ একেবারে কঙ্কালসার। পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত বীভৎসভাবে বেরিয়ে এসেছিল। গলায় একটা তারের কলার। কলার থেকে দোমড়ানো তারের টুকরো ঝুলে আছে। আমি যখন ওর গলা থেকে তারের কলারটি কেটে দিলাম, লক্ষ্য করলাম ওর ঘাড়টি ক্ষতবিক্ষত। চামড়ার ওপরে অনেক জায়গায় রক্ত জমে ঘাড় ফুলে গেছে। আমি ওকে কোলে করে আমার আপিসে নিয়ে এলাম। অন্যরা একটা

আমাদের সেই 'ল্যাম্পো'

বাটিতে করে ওর জন্য গরম দুধ নিয়ে এলো। আগ্রহ করে খেলো বটে, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওর গিলতে কষ্ট হচ্ছে। বার বার থেমে থেমে খাচ্ছিল আর আপিস ঘরটা ভাল করে দেখছিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে লেজ নেড়ে যেন বলতে চাইছিল, 'এ সবই যেন স্বপ্ন।'

দুধ শেষ হতেই বোঝা গেল বাইরে যেতে চায়। আমি দরজা খুলে দিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সমস্ত আপিসগুলো ও দেখতে লাগল। কত মধুর স্মৃতি জড়ানো আছে ওর এই আপিসগুলোর সঙ্গে। প্রত্যেকটি পুরানো বন্ধুকে ও লেজ নেড়ে অভিবাদন জানালো। এর পর খুব কষ্ট করে আমার আপিস ঘরে ফিরে এসে সেই পুরোনো কোণটিতে গিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি আবার কাজে মন দিলাম। মাঝে মাঝে দেখছিলাম ঘুমন্ত ল্যাম্পোকে। দেখলাম, ওর ঘুমটা খুব নিশ্চিন্ত নয়। সমস্ত শরীর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, 'ল্যাম্পো, জানি কত কষ্টেই তোর দিন কেটেছে, যার জন্য আজ তোর এই হাল! যদি তুই কথা বলতে পারতিস, হয়ত অনেক কিছুই জানাতিস্। তবুও তোর জীর্ণ শীর্ণ শরীর দেখে বুঝতেই পারি, কত কষ্টই তুই পেয়েছিস!'

হঠাৎ ওর তারের কলার যেটা আমি কেটে ফেলেছি একটু আগে, সেটার কথা মনে পড়াতে, মনে হয়ে গেল আমার সেই স্বপ্নগুলি—যেগুলি ও চলে যাবার পরে আমি দেখতাম। সে সব: ভাবতেই মনটা কেমন যেন নিরাশা ও বিষণ্নতায় ভরে গেল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে মনকে প্রবোধ দিই—কিছুই কিছু না, সব কাকতালীয়, নেহাৎ আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। (ক্রমশ:)

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অনূদিত

[ঘর ছেড়ে যারা বাইরে যাবার সুযোগ পায়, তারা নিশ্চিত সৌভাগ্যবান। জীবনে কত যে জানবার আছে, দেখবার আছে, তা পথের বুকে পা ফেললে তবেই জানা যায়, দেখা যায়। কিন্তু যারা ভ্রমণের সুযোগ পায়নি, পায়নি কোন অজানাকে আবিষ্কারের সুযোগ, তারা কি করবে? এর উত্তর দিয়েছেন আমাদের স্বর্গতঃ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর লেখায়। সেই লেখা থেকেই জানতে পারবে জীবনটাকে যদি সুন্দর করতে হয়, তবে আমাদের একমাত্র সঙ্গী হওয়া চাই বই। বই, ভালো বই শুধু আমাদের মন ভরায় না, আমাদের জীবনের রহস্য বুঝতে সাহায্য করে। ঘরের মধ্যেই আমরা পাই গোটা পৃথিবীটাকে।]

'বন্ধুরা আমাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করে, তুমি কখন বই পড়? এ প্রশ্নটা সত্যিই আমি নিজেকেই করি। কত আমার কাজ, কোনটা কাজের কোনটা বা অকাজের, রাজনীতি করতে করতেই আমার দিন কেটে যায়। আর এই একঘেয়ে ক্লান্তিকর কাজের মধ্যে রাত্রিবেলা আমি সময় করে নিই বই পড়ার। কিন্তু সব সময় তাও হয়ে ওঠে না। আমি তাই বেশীর ভাগ বই পড়ি রেল চড়ে যখন আমার বিশাল দেশের এমোড় থেকে ওমোড় ঘুরে বেড়াই।

রেলে চড়ে আগে লেখাপত্রের কাজ করতাম, কিন্তু ট্রেনটা এত দোলে যে লিখতে বসলে বিরক্ত হয়ে যেতে হয়। পড়বার পক্ষে তৃতীয় শ্রেণী বা ইন্টার কামরা তেমন সুবিধাজনক নয়, তাই দ্বিতীয় শ্রেণীটাই আমার বই পড়বার পক্ষে বেশ নিরিবিলি বলে দ্বিতীয় শ্রেণী কামরাই আমায় বেছে নিতে হয়, টিকিটের দামে বেশ ফারাক্ সত্ত্বেও।

যখনই ট্রেনে চাপি আমি সঙ্গে নিই প্রায় এক বাক্স বই, যতগুলো পড়ে উঠতে পারা যায়, তার চেয়েও বেশী। পড়ি আর না পড়ি আমার কাছে পড়বার মত অনেকগুলো বই আছে এটা ভাবতেই আমার আনন্দ হয়।

সবে মাত্র বিমানে করে অর্ধেক ইউরোপে ঘুরে এসেছি। এবারে যাচ্ছি করাচী।

মনে হচ্ছে যেন অনেকটা পথ, এ তো আর বিমানযাত্রা নয়। আমার বইয়ের বাক্সে নানা ধরণের বই বোঝাই। ইনটার ক্লাস কামরায় উঠেও পথে দারুণ গরম আর ধুলোর জন্য আরামদায়ক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বদল করি। সবে লাহোর ছেড়েছে গাড়ী। সিন্ধু মরুভূমি দিয়ে ট্রেন চলবে এবার। ট্রেনের জানলা দরজা সব বন্ধ, কিন্তু সামান্য ফাঁক-ফোঁক দিয়ে এত ধুলো এসে জমছে কামরার ভেতর যে দমবন্ধ হবার যোগাড়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরার অবস্থার কথা ভাবতেই কাঁপুনি ধরে আমার। উত্তাপ আমার সহ্য হয়, সহ্য হয় না ধুলো।

পড়ছিলাম আমার এক বিদেশী বন্ধুর পাঠানো অ্যান্টার্টিক অভিযানের অন্যতম বীর অভিযাত্রীর জীবনী। ট্রেন আমাদের নির্দয় মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলেছে, আর আমি পড়ছি দুঃসাহসী অভিযাত্রী এডওয়ার্ড উইলসনের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনী। মানুষের ত্যাগ বরণের অপরিসীম ক্ষমতা, সঙ্গী বন্ধুদের প্রতি মহান্ ভালবাসা, শত বিপদের মুখেও হাসিমুখ, এ কাহিনী পড়ে মরু অতিক্রমের কষ্ট আমার মনে দাগ কাটছে না। এই মানুষ যে এত কষ্ট করেছে, এ তো তার নিজের ভালোর জন্য নয়, সব মানুষের ভালোর জন্য। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার জন্য চিরদিনই মানুষ দমে না, বাধার পর বাধা অতিক্রম করে ক্রমাগতঃ ওপরে উঠতে চায়, সুদূর তারকালোকের হাতছানি তাকে অস্থির চঞ্চল করে তোলে।

এমনি এক মানুষ ছিলেন এডওয়ার্ড উইলসন, দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে বন্ধুদের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন বরফের আক্রমণে, কিন্তু পিছু হাটেন নি।

মেরু জয় হয়েছে, মরুভূমি মেপে দেখা হয়েছে, উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অভিযাত্রীদের কাছে মাথা নীচু করেছে। পৃথিবী আজ ছোট হয়ে গেছে, আর বুঝি কোন রহস্যই আবিষ্কৃত হতে বাকী নেই।

কিন্তু সত্যিই তা নয়, এখনও এই পৃথিবীতে অনন্ত বিস্ময় অপেক্ষা করছে তাদের জন্য যাদের বুকে সাহস আছে, মনে আছে উৎসাহ, আজ মহাকাশ আহ্বান পাঠাচ্ছে তাদের। শুধু কি তাই, মেরুতেই কি শুধু আছে অ্যাডভেঞ্চার, আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজকে পালটানোর কাজ কি মেরু বিজয়ের অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে কিছু কম? যদি আমরা আমাদের সাধ্যমত এই দরিদ্র সমাজের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করি, আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে যত্নবান হই, সেটাও একটা বড় অ্যাডভেঞ্চার বৈকি!

আজকের এই মরুভূমিতে অন্ধকার, ট্রেন এই অন্ধকার পেরিয়ে আমাদের লক্ষ্যে

পেঁাছে দেবার জন্তে এগিয়ে চলেছে। আমরা মানুষরাও অন্ধকার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি, লক্ষ্য আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রয়েছে। দিন আসবে, আর শুধু অভাবের ধুধু মরুভূমি নয়, আমাদের জীবন সুখে-শান্তিতে-সার্থকতায় নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সারা দেশকে মাতিয়ে তুলবে!'…পণ্ডিতজীর এ স্বপ্ন এখনও সার্থক হয়নি।

কিন্তু এই সার্থকতা এমনি আসবে না, আমাদের তার জন্ত প্রস্তুত হতে হবে। এই অন্ধকারকে দূর করবে যে জ্ঞান, সে জ্ঞান দেশ-বিদেশের বইয়ের পাতায় জমিয়ে রাখা হয়েছে—তোমার আমার সকলের জন্ত।

মহা-কপি

আবু কায়সার

লোকটা লেখে যা-খুশি-তা আবোলতাবোল পদ্য,
নিজের লেখা নিজে পড়েই চেঁচায় ঃ অনবদ্য!
গুঁতো মেলায় জুতোর সাথে মামার সাথে গামা,
গর্দানে তার মাথা তো নয়, ভাবে বোঝাই ধামা।

টিকটিকিরা কড়িকাঠে ডেকে যখন উঠে,
কবি তখন লম্ফ দিয়ে চুরুট লাগায় ঠোঁটে।
চমকে উঠে গিন্নী বলে ঃ হচ্ছে এসব কি গো,
বাবরি নেড়ে কবি জানায় ছন্দ পেয়েছি গো।

টিকটিকিটার টিকি কেটে লাগিয়ে দাও দাড়ি
ছন্দ হবে গাড়ির চাকা ঘুরবে তাড়াতাড়ি।
মরণ লিখে ভয় কি ওরে বরণ জুড়ে দিলে
এই বড়জোর দেড় মিনিটে পদ্যটা যায় মিলে।

লোকটা হাঁটে লম্ফ দিয়ে কম্প দিয়ে হাসে,
দেশছেড়ে সব কবি পালায় মহা-কপির ত্রাসে।

কৃষ্ণ সাগরের তীরে

শ্রীরুণু চট্টোপাধ্যায়

স্কুলের সবে ছুটি হয়েছে। এখনো তিনটি মাস ছুটি। জুন, জুলাই, আগষ্ট। গরমকালে মস্কো একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। সবাই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। আমাদের নাকি কোথাও যাওয়া হবে না এবার। মস্কোতে আর মস্কোর কাছাকাছি কোথাও গিয়ে মাঝে মাঝে পিকনিক করা হবে। মন খারাপ করে জুলু আর আমি সারা সকালটা বাড়ির উঠনে বসে কাটিয়ে দিলাম। তারপর ঠিক করলাম, আজ আমরা আর কিছু খাবো না। শুধু তরমুজ খেয়েই কাটাবো। শুধু যখন তরমুজ খেয়েই কাটাবো তখন ছোট তরমুজ হলে তো চলবে না। বেশ বড় দেখে একটা তরমুজ কিনে কোনো রকমে দু'জনে ধরাধরি করে সেটাকে নিয়ে এলাম বাড়িতে।

বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, বাবা, সমরবাবু স্থলেখা মাসী, মা তারস্বরে 'সোচী, গাগরা' বলে চেঁচামেচি করেছেন আর ম্যাপ দেখছেন। কি হলো রে বাবা! এতো চেঁচামেচি কেন?

'আমাদের জন্যে রান্না কোরো না। আজ আমরা খাবো না।' আমরা বললাম।

মা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বেশ। পরশু দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের ধারে যাওয়া হবে। তোমরা যেও না।'

'সত্যি যাওয়া হচ্ছে? বীথি, খুকুকা জানে?' আমি বললাম।

মা বললেন, 'ওরা তো আর্ট স্কুলে গেছে। এক্ষুনি ঠিক হয়েছে। আমরা দক্ষিণের পাঁচটা জায়গায় গিয়ে থাকবো। আমাদের আপিস্ থেকে ঠিক করে দিয়েছে। একটা বিরাট দলের সঙ্গে যাবো। টুরিষ্ট হয়ে।'

'কি মজা, পাঁচটা জায়গায় যাবো!' খুশিতে ঝলমল করে জুলু বলে উঠলো।

আর তারপর তরমুজটা সবাইকে ভাগ করে দিলাম। এমনকি বীথি, খুক্‌কার জন্যেও। আমরা তো জানতাম ওদের আর্টস্কুল নেই আজ, ওরা নিশ্চয়ই গেছে সিনেমায়। আর আমাদের বাদ দিয়ে গেছে। অন্য সময় হলে বলে দিতাম সবাইকে। কিন্তু আজ, আজ অন্য কথা। ওরা দু'জন বাড়ি আসতে আমরা শুধু বললাম, 'কই কাগজ নিয়ে যাওনি? ছবি আঁকলে কিসে?'

কিন্তু আমাদের সে কথা শোনার কারো উৎসাহ ছিলো না তখন। কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কি কি নেওয়া হবে এই সব আলোচনা হচ্ছিল।

বীথি খুব গম্ভীর ভাবে বললো, 'সমুদ্রে স্নান করবো কি প'রে?'

আমি বললাম, 'কি পরে আবার, সুইমিং কস্ট্যুম পরে।'

'মোটেই না।' মা আর সুলেখা মাসী বললেন, 'কালো হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে।'

বীথি, খুক্‌কা সমস্বরে বললো, 'সে কি রকম দেখাবে?'

গম্ভীর মুখে মা'রা বললেন, 'সেই ভাল দেখাবে।' মায়েদের ওপর তো আর কথা চলে না।—'ঠিক আছে, যাওয়া হলেই হলো।' আমরা বললাম।

পরের দিন সারাদিন ঘুরে আটটা কালো হাফপ্যাণ্ট এলো আর ছ'টা গেঞ্জি। মা'র আর সুলেখা মাসীর গেঞ্জি পাওয়া গেল না। ওঁদের মাপ মতো কাল পাওয়া যাবে শুনলাম।

পরের দিন স্টেশনে যাবার আগে মা'রা দু'জনে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন দুটো মস্ত বড় কলারওলা গেঞ্জি নিয়ে। সুলেখা মাসী বললেন, 'যাক, তিনদিন ধরে ট্রেনে যাওয়া যাবে। হাতে একটা কাজ থাকা ভালো। গেঞ্জিগুলো মাপ মতো কেটে হাতে সেলাই করে নিলেই চলবে। সময়ও কাটবে আবার জামাগুলোও সেলাই হবে।'

দুপুর একটার সময় ট্রেন ছাড়লো। বেশ সুন্দর ট্রেনটা। আর চারজন-চারজন করে একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা। সারাদিন তো আমরা অনেকের সঙ্গে আলাপ করে বেড়ালাম। মা আর সুলেখা মাসী তাঁদের জামা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বীথি, খুক্‌কা জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগলো। বাবা আর সমরবাবু দু'কোণে দু'জনে বসে দুটো মোটা মোটা খাতা নিয়ে বোধহয় কবিতা লিখছিলেন। দু'জনেই কবি তো। পরে মা'র কাছে শুনেছিলাম হিসেব লিখছিলেন ওঁরা।

সন্ধ্যাবেলা তাড়াতাড়ি রেষ্টুরেণ্ট কারে গিয়ে খেয়ে নিয়ে, নিজেদের ব্যাঙ্কে শুয়ে রেডিয়ো শুনছিলাম। ট্রেনের প্রত্যেক কামরাতেই রেডিয়ো থাকে। পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো শুনলাম রেডিয়োতে জর্জিয়ান গান হচ্ছে। কথাবার্তাও জর্জিয়ান ভাষায়। সকালে কামরাতেই 'পেরস্কি' (এক রকম পিঠে) আর চা দিয়ে গেল। তারপর যখন বড় একটা স্টেশনে থামলো গাড়িটা, আমরা অমনি আইসক্রীম খাবার জন্যে বায়না ধরলাম। যাক, বড়দেরও বোধহয় খাবার ইচ্ছে ছিলো। তাই বেশী কিছু না বলে আইসক্রীম কেনা হলো সবার জন্যে।

দুপুরে রেষ্টুরেণ্ট কারে খেতে গেলাম আমরা। খুক্‌কা, বীথি, জুলু আমি একটা টেবিলে আর বড়রা চারজন আর একটা টেবিলে বসলেন।

তখন রেডিয়োতে একটা গান হচ্ছিল। গানটা জর্জিয়ান সিনেমার, কিন্তু রুশি ভাষায়। গানটা তখন খুব পপুলার। রেডিয়োর গানটা থামতেই আমাদের সামনের টেবিলে যে দু'জন জর্জিয়ান ছেলে বসেছিলো, তাদেরই একজন গেয়ে উঠলো গানটা। গানটার কথাগুলো হচ্ছে, 'ইয়ে স্রেচিল দেভুস্কু, পলুমি সেরৎসা ভ্রোভ…' ইত্যাদি। মানে হচ্ছে, 'আমি এক মেয়েকে দেখেছি, সে আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে, তার গালে একটা তিল আছে, আমায় সে পাগল করে দিয়েছে।' চেয়ে দেখি মাসী মানে খুক্‌কা গালে হাত দিয়ে মুখ লাল করে বসে আছে। খুক্‌কার গালে একটা তিল ছিলো। আর জুলু বেশ আপন মনে খাচ্ছিল। হঠাৎ খুক্‌কার দিকে তাকিয়ে ওরও গালের তিলের কথা মনে হয়ে যাওয়ায় দু'হাতে গাল ঢাকা দিয়ে খাওয়া ফেলে বসে রইলো। আর তারপর কি হলো জানো! আমাদের টেবিলে, বড়দের টেবিলে তারা মস্তো মস্তো মুরগির রোষ্ট, ক্রামনে ভিলো আর আমাদের জন্যে বড় বড় চকোলেট পাঠাতে লাগলো। বাবার আপত্তি করায় তারা বললো, 'জর্জিয়ানদের দেশে তোমরা যাচ্ছো। আমাদের অতিথি তোমরা, আমাদের এই সামান্য উপহারটুকু তোমরা নেবে না?'

আমার গালে তিল নেই বলে একটু দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু সেটা চকোলেট পেয়ে কেটে গেলো।

পরের দিন ভোর তখন চারটে হবে, শুনলাম 'আজভ' সমুদ্র দেখা যাবে এক্ষুনি। সমুদ্র ভাবতে পুরীর সমুদ্র মনে হলো। এক্ষুনি আবার সেই রকম সমুদ্র দেখবো! মনে আছে পুরী থেকে আসবার সময় সমুদ্রকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে সারা রিক্সা কেঁদেছিলাম। আবার সমুদ্র দেখবো! উদগ্রীব হয়ে জানলার কাছে বসলাম। একটা ঘোলা লাল্‌চে জলের পাশ দিয়ে ট্রেন চলেছে। কই, আজভ সাগর আসবে কখন? কে একজন বললো, 'এই তো আজভ সাগর।' 'ওমা এটা তো একটা ঘোলা জলওয়ালা নদী না কি যেন! এই তা'হলে আজভ সাগর!'

সকালে ১১টা নাগাদ সোচী পৌঁছলাম। ছোট্ট স্টেশন। চারিদিকে পাহাড়। কৃষ্ণসাগর কই? শুনলাম পাহাড় ঘিরে ঘিরে সমুদ্র গেছে। চললাম গাড়ি করে 'তুরবাসা'র দিকে। তুরবাসা মানে যেখানে টুরিষ্টদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। গাড়ি তো দার্জিলিঙে যাবার মতো ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। আর তারপর একসময় তুরবাসার আপিসের কাছে এসে থামলো।

সেখানে বড়রা কি কাজ করেন, কোথায় থাকেন, এইসব লিখতে হয়। নিজেদের বাক্স চিনে নিতে হয়। আর এইখানে সমরবাবু এক কাণ্ড করলেন। সেই আপিসের লোকেরা বললো, সুলেখা মাসী কী করেন লিখে দিতে। সমরবাবু রুশি ভাষায় 'দোম খাজাইকার' জায়গায় লিখলেন, 'দোম-র‍্যাবৎনিৎসা'। 'দোম-খাজাইকা' মানে বাড়ির গিন্নী আর 'দোম-

রাবৎনিৎসা' মানে বাড়ির ঝি। মা আর সুলেখা মাসী তো ওখানেই চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। যাই হোক সমরবাবু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি লেখাটা ঠিক করে দিলেন।

এইবার ভারী ভারী বাক্স নিয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ওপরে আমাদের ক্যাম্পে যেতে হবে। বাবা, সমরবাবু দুটো বড় বাক্স নিয়ে চললেন এগিয়ে। আমরা ছোটরা চারজন চারটে সুটকেশ নিয়ে আর মা আর সুলেখা মাসী দুটো বড় বাক্স নিয়ে। বেশ খানিকটা উঠে গেছি, হঠাৎ মনে হলো মাদের কি অবস্থা দেখি একবার।

ওমা! দেখি দু'জন রুশি ভদ্রলোক মাদের বাক্স দুটি নিয়ে উঠছেন। আর মা আর সুলেখা মাসী কখনো নীচু হয়ে রাস্তার ধার থেকে ফুল কুড়িয়ে খোঁপায় পরছেন, কখনে ওপাশে পাহাড়ের গা থেকে ফার্ণ পাতা তুলছেন।

পাহাড়ের ওপরে দুটো তাঁবুতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। চারিদিকে বড় বড় ফার আর পাইন গাছ। আর তার মধ্যে আমাদের তাঁবুগুলো। ভেতরটা চমৎকার সাজানো।

চা খাওয়ার পর সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়া হবে ঠিক হলো। এখনো সমুদ্র দেখিনি।

একটা বাসে করে সমুদ্রের ধারে যাওয়া হবে। আমাদের সেই পোশাক নেওয়া হলো। ওখানে গিয়ে পরে নেওয়া হবে।

কিছুক্ষণ পরে বাসে করে রওনা হলাম আমরা। সমুদ্রের আওয়াজ নেই। চুপচাপ। তারপর সমুদ্রের ধারে আমরা স্নানের ঘরে পোশাক বদলে চললাম স্নানের জন্যে। সমুদ্রের তীরে বালি নেই পুরীর মতো। শুধু বড় বড় পাথর, নুড়ি। আর সমুদ্রে কোনো ঢেউ নেই। যেন পুকুর। এই তা'হলে কৃষ্ণসাগর। সেই পাথরের তীরে রদ্দুর পোয়াচ্ছে লোকজনেরা।

আমাদের আটজনকে কালো হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে আসতে দেখে সবাই হাঁ করে করে তাকিয়ে রইলো। মা আর সুলেখা মাসী আগে, আমরা চারজন মাঝে, আর শেষে বাবা ও সমরবাবু কালো হাফপ্যান্ট আর তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে। যখন একটা বড় দলের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, শুনলাম তারা ঠাট্টা করে বলছে, 'এই ফুটবল টিমটি কোথা থেকে এসেছে? এরা কি এখানে ফুটবল খেলতে এসেছে!'

ওরা ভেবেছিলো আমরা রুশি বুঝি না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমি ওদের দিকে স্পষ্ট রুশি ভাষাতে বললাম, 'আমরা ভারতবর্ষ থেকে ডিনামোর হয়ে খেলতে এসেছি। এবার স্পার্তাকের কাছে ওরা বড্ড হেরে গেছে কিনা!'

শুনে ওরা হেসে উঠে বললো, 'দুষ্টু মেয়ে।'

আর আমরা ঝুপ ঝুপ করে কৃষ্ণসাগরের জলে লাফিয়ে পড়লাম

মেঠুড়ে

বেটন কাপের প্লাটিনাম জয়ন্তী বছরে বেটন কাপ জয়ী হয়েছে বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ণ রেল দল। মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গলের তুলনায় দলটি সত্যই সংহতিপূর্ণ। তাই সেমি ফাইনালে মোহনবাগানকে ২-১ গোলে এবং ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে দলটি বেটন কাপ নিয়ে বোম্বাই ফিরেছেন। ওয়েস্টার্ণ রেলের কয়েকজন খেলোয়াড় খুবই ভালো খেলেন। গোলকিপার সতীন্দ্র পাল সিং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অতীত দিনের অলিম্পিক খেলোয়াড় এন্টিক এখনো নির্ভরযোগ্য সেণ্টার হাফ। দুই ইন গুরুবক্স সিং এবং পুরন সিং সুকুশলী খেলোয়াড়।

বেটনের এ বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের লেফট ব্যাক মমতাজ হোসেন মমতাজ তাঁর দলের হয়ে প্রত্যেকটা খেলাতেই ভালো খেলেছেন। বিশেষ করে কোয়ার্টার ফাইনালে গতবার যুগ্মবিজয়ী জলন্ধরের কোর অব সিগন্যালের বিরুদ্ধে মমতাজের খেলা ছিল অনবদ্য। ইস্টবেঙ্গলের অপর খেলোয়াড়দের মধ্যে রাইট আউট কামার আলী এবং লেফট ইন গোবিন্দরনাম করতে হয় যাঁরা দর্শকদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করেন। তবে পুরোভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে কলাচাতুর্যে এবং আঁকাবাঁকা গতিতে বল নিয়ে এগিয়ে যাবার কৃতিত্বে মোহনবাগানের লেফট আউট সহিদ নূরকে আর কোনো খেলোয়াড় ছাপিয়ে যেতে পারেন নি।

ওয়েস্টার্ণ রেলের মতোই জলন্ধরের কোর অব সিগন্যাল ছিল আর একটা শক্তিশালী দল। দুঃখের বিষয় ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে তিনদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর গতবারের যুগ্মবিজয়ী সিগন্যাল দলকে টসে হেরে বেটন থেকে বিদায় নিতে হয়।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা হিসাবে বেটন কাপের কী রমরমা ছিল। কয়েক বছর আগেও সেমি ফাইনাল অথবা ফাইনাল খেলার দিন মাঠের আসনগুলো দর্শকে ভরা থাকত। এ বছর জনপ্রিয় দলগুলো অংশ গ্রহণ করা সত্বেও সেমি ফাইনাল ও ফাইনালে

মাঠের বহু দর্শক-আসন খালি পড়েছিল। তা'হলে হকি কী এখন তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে ?

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। ওয়েস্টার্ণ দল তৃতীয়বার বেটন ফাইনালে খেলে দ্বিতীয়বার বেটন জয় করল। ১৯৫৪ সালে ফাইনালে তারা হেরে যায় বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। পরের বছর উত্তর প্রদেশের সঙ্গে ফাইনাল খেলে যুগ্মজয়ের সম্মান পায়। এবার একক জয়ের কৃতিত্ব। অপর দিকে একবার যুগ্মজয়ের হিসেব সমেত চারবারের বেটন বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলের এটা ছিল ষষ্ঠ ফাইনাল। ফাইনালে বোম্বাইয়ের দুটো রেল দলের কাছে ইস্টবেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হ'ল। ১৯৬৩ সালে পরাজিত হয়েছিল সেনট্রাল রেলের কাছে, এবার ওয়েস্টার্ণ রেল দলের কাছে।

[২]

গোল্ড কাপ বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বোম্বাইয়ে সদ্য সমাপ্ত রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফি জয় করে হকি ডাবলসের অধিকারী হয়েছে। রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফির খেলাকে অনেকে ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ দল নির্ণয়ের খেলা বলে মনে করেন। কারণ, বিভিন্ন রাজ্যের চ্যাম্পিয়ান এবং শক্তিশালী দলগুলিকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়।

ভারতের শক্তিশালী আটটা হকি দলকে নিয়ে আয়োজিত এবারের এই প্রতিযোগিতায় জয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কোর অব সিগন্যাল গতবারের রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফি বিজয়ী হয়। এবার গোল্ড কাপের খেলায় কোর অব সিগন্যালকে সেমি ফাইনালে ডাবল লেগের খেলায় বর্ডার সিকিউরিটির কাছে হার স্বীকার করতে হয়। তাই এবার গোল্ড কাপ বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি না বেটন বিজয়ী ওয়েস্টার্ণ রেল অথবা গতবারের বিজয়ী কোর অব সিগন্যাল রেনে ফ্রাঙ্ক জিতবে এনিয়ে ছিল হকি ক্রীড়া-রসিকদের কাছে একটা প্রশ্ন। বর্ডার সিকিউরিটিই শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে সেমি ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী কোর অব সিগন্যালকে এবং ফাইনালে কলকাতার ইস্টার্ন রেলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। কলকাতার ইস্টার্ন রেলের পক্ষে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বিশ্ব ফুটবল

৩১ মে থেকে মেক্সিকোর বিশ্ব কাপ বা জুলে রিমে কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হয়েছে। চারটে গ্রুপে বিভক্ত ষোলটা দলের মধ্যে প্রথমে লীগ প্রথার খেলা। পরে গ্রুপ উইনার্স ও গ্রুপ রানার্স আটটা দলকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নক-আউট প্রথার খেলা।

এক নম্বর গ্রুপে আছে রাশিয়া, বেলজিয়াম, মেক্সিকো এবং এল. স্যালভাডোর। এদের ভেতর রাশিয়াকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় গ্রুপে রয়েছে উরুগুয়ে, সুইডেন, ইতালি ও ইজরাইল। এদের ভেতর উরুগুয়ে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ বিজয়ী। ইতালিও বিশ্ব কাপ জয় করেছে ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে। সুইডেন ১৯৫৮-র রানার্স। যদিও গতবারের বিশ্ব কাপের ফাইনাল পর্যায়ে ইতালিকে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তর কোরিয়ার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল, তবুও বিশ্বের সব নামডাকের খেলোয়াড় নিয়ে ইতালি সমৃদ্ধ। ইতালি বা উরুগুয়ে যদি এবার বিশ্ব কাপ জিততে পারে, তবে কাপটা চিরকালের জন্যে তাদের হয়ে যাবে।

তৃতীয় গ্রুপে আছে রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইংলণ্ড এবং ব্রাজিল। ১৯৫৮ ও ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ বিজয়ী ব্রাজিলের গতবার ইংলণ্ডে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছতে না পারার ব্যর্থতা এবার পুরোপুরি পষিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। অন্য দিকে গতবারের বিশ্বকাপ বিজয়ী ইংলণ্ড চাইবে আবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে। চেকোশ্লোভাকিয়ারও বিশ্ব কাপ রেকর্ড ভালো।

চতুর্থ গ্রুপে রয়েছে পেরু, মরোক্কো, বুলগেরিয়া এবং পশ্চিম জার্মানী। অনেকের ধারণা, ১৯৫৪ সালের বিশ্ব কাপ বিজয়ী এবং গতবারের রানার্স পশ্চিম জার্মানীর বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু সকল সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে ব্রাজিলই এবার ইতালিকে সর্বশেষ খেলার ফাইনালে ৪-১ গোলে পরাজিত করে বিশ্ব কাপ জয়ী হয়েছে।

একটি স্কেচ শিল্পী : শ্রীগোপীনাথ দাস

স্পোর্টস কুইজ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

১। পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার নাম 'অল্-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশীপস', উদ্বোধন ১৮৯৯ সালে। পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস—এই পাঁচটি বিভাগের খেলা নিয়ে প্রতিযোগিতার বাৎসরিক আসর বসে। এই পাঁচটির যে-কোন একটি বিভাগের খেতাব জয়ীকে বে-সরকারীভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্ব খেতাব বিজয়ী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এখন বলতো এই অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায়—

(ক) এশিয়া মহাদেশের পক্ষে কোন্ দু'জন খেলোয়াড় সর্বপ্রথম পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলেছিলেন?

(খ) এশিয়া মহাদেশের পক্ষে কোন্ দু'জন খেলোয়াড় সর্বপ্রথম পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন?

(গ) প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬০ বছরের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ খেলোয়াড় হিসাবে এশিয়া মহাদেশের কোন স্কুল-ছাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন?

(ঘ) প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কোন্ খেলোয়াড় সর্বাধিক সংখ্যক খেতাব জয়ী হন?

(ঙ) প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কোন্ খেলোয়াড়রা সর্বাধিকবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব এবং সর্বাধিকবার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছেন?

(চ) এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কোন্ খেলোয়াড়রা সর্বাধিকবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব এবং সর্বাধিকবার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন?

(ছ) এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রতিযোগিতায় কোন্ খেলোয়াড়রা সর্বাধিকবার উপর্যুপরি পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন?

২। পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯০০ সালে। ডেভিস কাপ জয়ের সম্মান—পুরুষদের দলগত বিভাগের টেনিস খেলায় বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়।

এখন বলতো এই ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায়—

(ক) কোন দেশ সর্বাধিকবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলেছে এবং কোন্ দেশ সর্বাধিকবার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে?

(খ) এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে?

(গ) এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ দেশ ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলেছে?

৩। বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন ১৯০০ সালে। এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে যে-দল বিজয়ী হয়, তাদের 'জুল রিমে কাপ' দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

এখন বল দেখি এই বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায়—

(ক) কোন্ দেশ সর্বপ্রথম 'জুল রিমে কাপ' জয়ী হয়েছিল ?

(খ) প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার কাপ জয়ের রেকর্ড কোন দেশের ?

(গ) প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কোন্ দেশ ফাইনাল খেলায় সর্বাধিক গোল দেয় ?

৪। মহিলাদের দলগত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৫৭ সালে। দু'বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার 'উবের কাপ'।

এখন বল দেখি এই প্রতিযোগিতায়—

(ক) এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ দেশ 'উবের কাপ' জয়ী হয়েছে ?

৫। পুরুষদের দলগত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৪৮-৪৯ সালে। দু'বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসে। বিজয়ী দলকে 'টমাস কাপ' দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

এখন বল দেখি—

(ক) এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ দেশ 'টমাস কাপ' জয়ী হয়েছে ?

৬। ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে নিম্নলিখিত তারিখগুলি কি কারণে 'চিরস্মরণীয়' হয়ে থাকবে ?

(ক) ১৯২৮ সালের ২৬শে মে।

(খ) ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন।

(গ) ১৯৫২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

(ঘ) ১৯৫৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর।

(ঙ) ১৯৭০ সালের ৫ই মে।

৭। ১৮৯৬ সালের ১৬ই জুলাই তারিখটি ভারতবাসীর কাছে কি কারণে বিশেষ স্মরণীয় ?

॥ উত্তর ॥

১। (ক) পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে সর্বপ্রথম খেলেছিলেন ভারতবর্ষের প্রকাশ নাথ ১৯৪৭ সালে এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে সর্বপ্রথম খেলার গৌরব লাভ করেন জাপানের কুমারী নোরিকা তাকাগি ১৯৬৭ সালে।

(খ) সর্বপ্রথম পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পান মালয়েশিয়ার ওয়াং পেং সুন ১৯৫০ সালে এবং প্রথম মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন জাপানের কুমারী ইরো জুকি ১৯৬৯ সালে। (গ) ১৯৬৮ সালে পূর্ব জাভার স্কুলের ছাত্র রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) তার ১৮ বছর বয়সে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে এই রেকর্ড করেন। (ঘ) ইংল্যাণ্ডের স্যার জর্জ টমাস বার্ট মোট ২১ টি খেতাব জয়ের সূত্রে এই রেকর্ড করেন (সিঙ্গলস ৪টি, ডাবলস ৯টি এবং মিক্সড ৮টি)। (ঙ) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব সর্বাধিক (৭টি) পান ডেনমার্কের আরল্যাণ্ড কপস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব সর্বাধিক (১০টি) পান আমেরিকার শ্রীমতী জি. সি. কে. হ্যাসম্যান (কুমারী জীবনে জুডি ডেভলিন)। (চ) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব সর্বাধিক (৪টি) পান ওয়াং পেং সুন (মালয়েশিয়া) এবং এডি চুং (মালায়েশিয়া) এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব সর্বাধিক (মাত্র ১টি করে) পান কুমারী ইরো জুকি (জাপান) এবং ইতসুকো তাকে-নাকা (জাপান)। (ছ) উপর্যপরি ৩বার করে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন মলায়েশিয়ার ওয়াং পেং সুন (১৯৫০-৫২) এবং ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো (১৯৬৮-৭০)।

২। (ক) আমেরিকার সর্বাধিক বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলেছে (৪৫বার) এবং অষ্ট্রেলিয়া সর্বাধিক বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে (২২ বার)। (খ) মাত্র এই চারিটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—অষ্ট্রেলিয়া ২২ বার, আমেরিকা ২১ বার, গ্রেট বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার ; (গ) ১৯২১ সালে জাপান এবং ১৯৬৬ সালে ভারতবর্ষ। ১৯২১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকার কাছে জাপান ০-৫ খেলায় এবং ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতবর্ষ ১-৪ খেলায় পরাজিত হয়ে রানার্স-আপ হয়েছে।

৩। (ক) ১৯৩০ সালের ফাইনালে উরুগুয়ে ৪-২ গোলে আর্জেণ্টিনাকে পরাজিত করে প্রথম জুল রিমে কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। (খ) মোট দু'বার করে কাপ জয়ী হয়েছে—উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০), ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) এবং ব্রেজিল (১৯৫৮ ও ১৯৬২)। (গ) ব্রেজিল—১৯৫৮ সালের ফাইনালে তারা সুইডেনকে ৫-২ গোলে পরাজিত করে।

৪। (ক) একমাত্র জাপান দু'বার জয়ী হয়েছে (১৯৬৬ ও ১৯৬৯)

৫। (ক) এ পর্যন্ত মাত্র এই দুটি দেশ টমাস কাপ জয়ী হয়েছে—মালয়েশিয়া ৪ বার এবং ইন্দোনেশিয়া ৩ বার।

৬। (ক) ১৯২৮ সালের ২৬শে মে তারিখে অলিম্পিক হকি খেলার ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩-০ গোলে হল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে অলিম্পিক হকিতে সর্বপ্রথম স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করে। (খ) ১৯৩২ সালের ২৫ শে জুন তারিখে লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে

ভারতবর্ষ প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট আসরে ভারতবর্ষের এই প্রথম আবির্ভাব। (গ) ১৯৫২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ মাদ্রাজের ৫ম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডকে এক ইনিংস ও ৮ রানে পরাজিত করে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়। (ঘ) ১৯৫৯ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষ কানপুরের ২য় টেস্টে অষ্ট্রেলিয়াকে ১১৯ রানে পরাজিত করে—অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়। (ঙ) ১৯৭০ সালের ৫ই মে তারিখে বাঙ্গালোরে আয়োজিত ডেভিস কাপের এশিয়ান জোন ফাইনালে ২২ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়াকে ৩-১ খেলায় ভারতবর্ষ পরাজিত করে—ডেভিস কাপের খেলায় শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়।

৭। ১৮৯৬ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে ম্যাঞ্চেস্টারে আয়োজিত ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় রঞ্জিৎ সিংজী ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৬২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নট-আউট ১৫৪ রান করেন—ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে রঞ্জিৎ সিংজীই সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার গৌরব লাভ করেন এবং আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে বিদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি এই প্রথম।

নতুন ছড়া

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

(রোজ) রাত্রি দুপুর
জাগ্‌ত খুকুর
—তিনটি কুকুর।

(একদিন) ছুট্‌লো জোর
সওদাগর···
সাতটি চোর।

(কিন্তু) ঘুষ যে চাই,
তুল্‌ল' হাই—
পুলিশ ভাই।

(তারপর?) দেখল রাজার
লোকরা—হাজার
···বছর সাজার॥

১। তিন অক্ষরে নামটি তাহার
বলতে কি ভাই পার ?
কামড়াতে সে চায়
যদি শেষের অক্ষর ছাড়ো।

কুমারী ভারতী দাস (বেহালা)

২। তিন অক্ষরে নাম মোর
ব্যাকরণে পাবে,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে
পক্ষী বংশে রবে।
শেষেরটি যদি ছাড়ো
ইংরেজীতে গাড়ি
মাথাটি ঘামিয়ে নাম
বলো তাড়াতাড়ি।

শ্রীতরুণকুমার বিশ্বাস (বসিরহাট)

৩। দশ শির মাথে তার নহেক বারণ
রমণীর হাতে তার হয় যে মরণ।

রাকা, রাতুল, রুণ্কী (কলিকাতা-৫)

৪। ৪০ কে.জি. ওজনের এমন একটি পাথরকে চারটি খণ্ড করো, যে চারটি খণ্ডের সাহায্যে এক থেকে চল্লিশ কে.জি. পর্যন্ত সমস্ত ওজনই ঐ খণ্ডগুলির দ্বারা করা যায়।

শ্রীপুলককুমার গাঙ্গুলি (পাইকপাড়া)

৫। লেখাপড়া সামান্যই তবু মহাজ্ঞানী,
স্ত্রীকে করে থাকেন পূজা
তাও সবে জানি,
চার অক্ষরে নাম তাঁর
পুরুষ মহান্
ভেবেচিন্তে বার কর নামের সন্ধান।

শ্রীবাণীকুমার দেব (কলিকাতা-১৫)

৬। তিন অক্ষরে নাম তার
সবাই তারে খায়,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
শীতে দেয় গায়।
মাঝের অক্ষর দিলে বাদ
যে জিনিস রয়
চলতি কথাতে বলি ভাই
তারেই তা কয়।

মঃ আসাদু জামান (পাটুলী)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। পাশাপাশি : করভ, জোনাকি, মশক, শশক, বিড়াল, কিরাত, বিহঙ্গ। খাড়াখাড়ি : কলম, জোয়াল, নাটক, শরকি, শর্করা, করাত, লবঙ্গ। ২। আসাম ৩। মটর
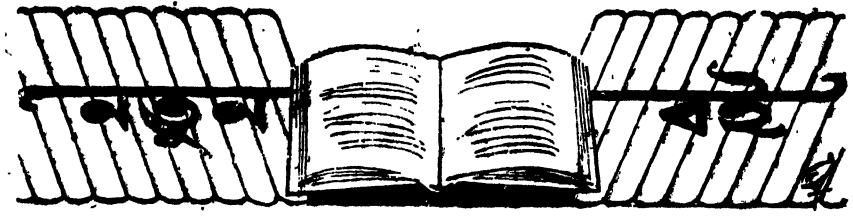
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

শিবনাথ—শ্রীসুনীতি দেবী। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ২১১ বিধান সরণি, কলি-৬ হইতে শ্রীদেবীপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১'০০

শিবনাথ শাস্ত্রী আমাদের দেশের প্রাতঃ-স্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের একজন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত এই জন্যে যে, তা থেকে আমরা আমাদের জীবনে অনেক কিছুই জ্ঞান আহরণ করতে পারব। এই সুন্দর ও সহজ করে লেখা বই-খানির মধ্যে তাঁর বংশ পরিচয়, শৈশব ও বাল্যকাল, বাল্য ও যৌবন ও শেষ পর্যন্ত কর্মজীবনের সবকিছু হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লেখা আছে। এ বই তোমাদের সকলেরই পড়া উচিত। ছাপা ও কাগজ সুন্দর এবং প্রচ্ছদপটটিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মনোরম ছবি আছে।

সবার উপরে—শ্রীঅতীন মজুমদার। সাহিত্য সদন, ৬৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীসুবোধবিকাশ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২'০০

অতীন মজুমদার তোমাদের জন্যে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন। সেই গল্পগুলি থেকে পনরটি ছোট গল্প এই সুন্দর বই-খানির মধ্যে ছবিসহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই গল্পগুলি ঠিক সাধারণ গল্প নয়, এর মধ্যে বিশেষ কতকগুলি বিশেষত্ব আছে এবং এগুলির প্রত্যেকটি থেকে তোমরা উচ্চ আদর্শের সন্ধান পাবে। এ ছাড়া গল্পগুলির লেখার ধরন এত সুন্দর যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়তে পারবে না। বইখানির ছাপা ও ছবিগুলিও খুব সুন্দর। বিশেষ করে রঙচঙে প্রচ্ছদ-পটটি দেখলে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে হয়।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৬০ পয়সা

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৫১শ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৭৭ [৪র্থ সংখ্যা

দত্যি

শ্রীরবি গুপ্ত

ওই আসে ওই অতি বিভীষণ দত্যি

সত্যি !

মিশকালো রং তার—দশফুট লম্বা

হতে পারে ভুলচুক তিলটুক কম বা ;

বেঢপ ফানুস হেন ?

সচল পাহাড় যেন,

ওই আসে ওই বুঝি ওই অতি লম্বা,

শ' তিনেক লুচি আর—জলযোগ—বিশ কুড়ি রম্ভা !

পেটখানি থাকে সদা কোলাটে

চোখ দুটি ক্ষুদ্র ও ঘোলাটে

হিংস্র মাতাল যেন হেলে দুলে চলছে,

টলছে !

নরনারী সাবধান—বাগে পেলে—নাই অনুকম্পা।
ঠোঁট দুটি থাকে সদা রক্তেই রাঙানো
জিবখানি শানানো,
হ'ল বুঝি চঞ্চল মাংসের গন্ধে
ছেলেবুড়ো দেয় দোর না হতেই সন্ধে!
বরাদ্দে দৈবাৎ হলে কিছু কোমতি
কেড়ে নিয়ে খন্তি—
ত্রিসীমায় ঘেঁষবে যে
দেবেটা কে প্রাণ যেচে?
একদা ছেলের দল পড়ে গেল মুখোমুখি—গ্রহবৈগুণ্য,
কেউ বলে: 'ভয় নেই'—'ভরসাটা পৈতৃক পুণ্য।'
ছিল কিছু অস্ত্র যে পণ্টুর পকেটে
নির্ঘাৎ কুপোকাত মোক্ষম রকেটে।
লাগ লাগ লাগ ভেল···
শর্মার গুল্‌তিটা কক্ষনো হয় ফেল?
ভূত-ছাড়া মন্তরে দেয় দেখো লম্বা,
পালায় সবেগে ওই—ওই অতি লম্বা।

"নিষ্ঠুর কার্যের পরিণাম যে কী ভীষণ তা ইতিহাসে মসীরঞ্জিত হয়ে রয়েছে, সংছাত্র শৈশব হতে নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে বিশ্বহিতৈষণার অনুশীলনে যত্নবান হবে।"

'বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি'
শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

হিমালয়ের বিভীষিকা

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

দৈত্যটা অনেকক্ষণ ধরে মুঠো মুঠো বরফ কুচি ছুঁড়ে মারছে তাঁবুটার দিকে। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই রবার্টের। চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চ শৈল-শিখরের তাঁবুতে বসে নিশ্চিন্ত মনে সে সামনে একখানা ম্যাপ মেলে ধরে কতকগুলি জরুরী ভৌগলিক অবস্থান দেখছিল। বাইরে দৈত্যের মাতামাতি যেন আরো বেড়ে উঠেছে। নতুন তাঁবু। এতটুকু ঠাণ্ডা প্রবেশ করবার সুযোগ নেই। হোক বাইরে ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি, তাতে কি আসে-যায়। রবার্ট গভীর একাগ্রতা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রঙিন ম্যাপটার উপর।

আরো হাজার দুয়েক ফুট। তারপরই শুধু বরফ আর বরফ। এই চির-তুষার রাজ্যেই প্রবেশ করিতে হবে রবার্টকে।

নরওয়ের দামাল ছেলে রবার্ট কারুর নিষেধ শোনেনি। শোনেনি ওর মা-বাবার কথা। বেরিয়ে পড়েছে দুর্জয় সাহসে ভর করে হিমালয়ের বুকে তুষার-মানবের সন্ধানে। কিন্তু এত দূর এসেও তো সে তুষার-মানবের কোন হদিস পায়নি। তাহলে সবই কি কল্পনার তুলিতে গড়া? রবার্ট পেনসিল হাতে ভাবতে থাকে।

তুষার-ঝড় থেমে যাবার পর ছোট্ট তাঁবুখানা গুটিয়ে নিয়ে বীর বাহাদুর শেরপার সঙ্গে রবার্ট উঠতে থাকে আরো উঁচুতে, যেখানে কয়েকজন শেরপা নাকি ইতিপূবে তুষার মানবের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছিল শুভ্র তুষারের বুকে।

রবার্ট এগিয়ে চলে অতি সন্তর্পণে। পেছনে বীর বাহাদুর শেরপা।

খড়াই পাহাড় বেয়ে ওরা দু'জন এগিয়ে চলেছে।

হাতে পাথর-কাটা গাঁইতি। মাঝে মাঝে বরফ কেটে পথ পরিষ্কার করে নেয় ওরা। তারপর আবার চলতে থাকে।

চলার যেন আর বিরাম নেই। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে ওদের চোখে-মুখে।

থামলে চলবে না। ক্লান্তিকে আমল না দিয়ে ওরা আরো কয়েক পা এগিয়ে যায়।

এইভাবে দুই অভিযাত্রী ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে তুষারের বাধা ঠেলে। যে কোন সময়ে তুষারের ভিতর পথ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রবার্ট মোটেই নিরুৎসাহ হয় না। ওর ডান হাতে বাঁধা কম্পাসটা একবার দেখে নেয়। নাঃ ঠিকই আছে, দিক ভুল হয়নি। বেশ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর আবার ওরা তাঁবু ফেলে খানিকটা সমতল জায়গা দেখে। মাটির চিহ্ন নেই কোথাও। শুধু চাই চাই বরফ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ভগবান যেন

পৃথিবীর সব বরফ এখানে এনে ঢেলে দিয়েছেন। এত বরফ এক সঙ্গে রবার্ট এর আগে আর কখনো দেখেনি। আবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ও সুদূর বিস্তৃত বরফের দিকে।

এতক্ষণ গুল্মজাতীয় যে গাছগুলো চোখে পড়ছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে। এখানে গাছপালা, লতা-পাতা বলতে কোন কিছু নেই। শুধু মাঝে মাঝে আকাশের বুকে সাইবেরিয়া অভিমুখে উড়ে যাওয়া হাঁসের ঝাঁক চোখে পড়ে। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সমতলভূমি ছেড়ে উড়ে যায় সদূর সাইবেরিয়া অঞ্চলে।

রবার্ট মুহূর্ত কয়েক মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সারিবদ্ধভাবে ইংরেজী ভিয়ের আকারে উড়ে চলেছে ওরা।

রবার্ট একাই আরো খানিকটা এগিয়ে যায় বরফের উপর দিয়ে। বীর বাহাদুর আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। হঠাৎ একজায়গায় এসে রবার্ট থমকে দাঁড়ায়। চারদিকে একবার গভীর ভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

শুধু তুষার আর তুষার! সূর্যের রশ্মি পড়ে বরফের গা দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। রবার্ট ঝুঁকে পড়ে বরফের উপর। কে যেন এখানকার কঠিন বরফ হাতুড়ির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে রেখে গেছে। অবাক হয়ে সে ভাবতে থাকে ব্যাপারটা। কিন্তু কোন কুলকিনারা খুঁজে পায় না।

পাশেই পুঞ্জীভূত বরফের স্তূপের মধ্যে কয়েক জোড়া পদচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আকৃতিতে সাধারণ মানুষের পায়ের দ্বিগুণ।

পায়ের পাতা অসম্ভব চ্যাপটা—আঙ্গুলগুলি দীর্ঘাকৃতি।

কোন সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপ নয়। স্তম্ভিত রবার্ট থমকে দাঁড়িয়ে থাকে পথের মাঝে। এতক্ষণ তা'হলে তুষার-মানব এখানেই ছিল। ওরই ভারী পায়ের চাপে জমাট বাঁধা তুষার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আরো কয়েক পা অগ্রসর হয় রবার্ট। তারপরই ঝুঁকে প'ড়ে বরফের উপর থেকে কয়েকটা দীর্ঘ ধূসর লোম তুলে নেয় হাতে। লোমগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে থাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। কিন্তু এরকম লোম কোন জন্তুর হতে পারে বলে রবার্টের বিশ্বাস হয় না।

চারিদিকে গভীর নীরবতা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ তাকিয়ে নেয় রবার্ট। একটি জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না। তবু সে সাহস হারায় না মোটেই। উপরন্তু এক অজানা আনন্দে ওর মন দুলে ওঠে।

এবার হয়তো তুষার-মানবের দেখা পেলেও পেতে পারে। কিন্তু একা আর বেশী

দূর অগ্রসর হতে সাহস পায় না রবার্ট। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসে তাঁবুতে আবার।

বীর বাহাদুর ওর জন্য তাঁবুতে অপেক্ষা করছিল মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন করে।

রবার্ট খেতে খেতে বীর বাহাদুরকে তুষারের বুকে তুষার-মানবের পদচিহ্নের কথা বলে। বীর বাহাদুর চমকে ওঠে কথাটা শুনে।

এক অজানা ভয়ে ওর সর্বশরীর কেঁপে ওঠে।

—ই-য়া-তি। কথাটা থেমে থেমে উচ্চারণ করে বীর বাহাদুর শের পা—হিমালয় অঞ্চলের দুঃসাহসী মানুষ।

'পর পর তিনটে গুলি ওর পিস্তল খালি করে বেরিয়ে আসে।—পৃঃ ১০৮

রবার্ট কিন্তু খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এবার সে এক অজানা রহস্যের সমাধান করতে পারবে। পৃথিবীর মানুষ চিনবে রবার্টকে। সে মনে মনে কথাগুলো চিন্তা করে হেসে ওঠে। কিন্তু বীর বাহাদুরের মুখে কোন কথা নেই। সারা হিমালয়ের মৌনতা তাকে যেন ঘিরে ধরেছে।

রবার্ট হাত দিয়ে ঠেলা দেয় বীর বাহাদুরকে—ভয় পাচ্ছ কেন?

—ভয়? তুমি কিছু জান না, তাই এই কথা বলছ রবার্ট। ওরা দেবতা; ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে আর কোন রেহাই নেই। তার চেয়ে পালাই চল।

রবার্ট বীর বাহাদুরের কথাগুলো মেনে নিতে পারে না। মনে মনে ভাবে, কুসংস্কার এখনো ওদের মনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

—না, আমি এর শেষ না দেখে যাব না। ইচ্ছে হয়, ফিরে যেতে পার। বাধা দেব না কোন। রবার্ট কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকে।

বীর বাহাদুর আর কোন কথা বাড়ায় না। অবশেষে একরকম বাধ্য হয়েই রবার্টের কথায় সম্মতি জানায়।

পরদিন আবার ওরা যাত্রা শুরু করে তুষার-মানবের সন্ধানে। হয়তো এবার দেখা পেলেও পেতে পারে। দু'জনেই বরফের উপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে থাকে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। শুধু বরফের বুকে লাঠির ঠকঠক শব্দ কানে ভেসে আসে। ওয়াটার প্রুফ জুতোটা একেবারে ভিজে উঠেছে। বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি। নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তবু ওরা উদ্যম হারায় না। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলে।

বেশ কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ রবার্ট দেখতে পায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ একটি প্রাণী কতকটা মানুষের মত দেখতে, ওদের কাছে থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

হাত দুটো পা অবধি লম্বা। একবার যেন নড়ে ওঠে দৈত্যটা। তারপরই হেলে-দুলে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। রবার্ট পিস্তলটা ডান হাতে চেপে ধরে শক্ত করে। বীর বাহাদুর কাঁপতে থাকে ভয়ে।

এগিয়ে আসছে ইয়াতিটা ওদের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে। সারা অঙ্গ ওর ধূসর ঘন লোমে ঢাকা। মুখটা হুবহু মানুষের মত। তবে দাতগুলো বিশ্রী ভাবে বেরিয়ে আছে। আর বেশী অগ্রসর হতে দেওয়া ঠিক হবে না।

গর্জে উঠল রবার্টের হাতের পিস্তলটা। একবার-দু'বার তিনবার। পর পর তিনটে গুলি ওর পিস্তল খালি করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ইয়াতি অর্থাৎ তুষার-মানবের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

পিস্তলের গুলি ওর কোনই ক্ষতি করতে পারেনি। ও এগিয়ে আসছে আরো। রবার্ট ও বীর বাহাদুর আর অপেক্ষা না করে প্রাণপণে পিছন দিকে ছুটতে থাকে। কোনদিকে খেয়াল নেই ওদের। ছুটছে তো ছুটছেই। পথ আর শেষ হয় না। তুষার-মানবও সামনে ছুটে আসছে ওদের ধরার জন্য। হঠাৎ বরফে পা পিছলে রবার্ট পাশের একটা খাদে পড়ে যায়। খাদের ভিতরটা নিঃসীম অন্ধকারে ঢাকা। রবার্ট একধারে পড়ে থাকে নির্জীবের মত। কতক্ষণ এইভাবে পড়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা আর্ত-চিৎকারে ও চমকে ওঠে। বীর বাহাদুর নয় তো?

রবার্ট খাদ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু বারংবার পা পিছলে যায়। অবশেষে পকেট থেকে লম্বা ছোরাখানা বের করে খাদের দেওয়ালে জমাট বাঁধা বরফে খানিকটা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তারই সাহায্যে অতিকষ্টে উপরে উঠে আসে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। সূর্যের শেষ রশ্মি যেন বরফের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। বরফের দিকে আর তাকানো যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। রবার্ট খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলে ওদের তাঁবুর দিকে। বীর বাহাদুর এতক্ষণে হয়ত নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই রবার্ট চমকে ওঠে! বীর বাহাদুরের রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে তাঁবুর একপাশে। আর তাঁবুটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় এক জায়গায় তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন খানিক আগে প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে ওদের তাঁবুর উপর দিয়ে। রবার্ট বীর বাহাদুরের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে যায়। তার চোখ দুটো বিশ্রী ভাবে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো শত ছিন্ন হয়ে বরফের উপর ইতস্তত: পড়ে রয়েছে। চারদিকে থোকা থোকা রক্ত।

বীর বাহাদুর তাহলে তুষার-মানবের কোপানল থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারেনি। রবার্ট চোখ বন্ধ করে নেয় ভয়ে।

তারপর টলতে টলতে কোন রকমে একা নীচের দিকে নামতে থাকে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

তুষার-মানবের আক্রোশ হয়তো এখনো মেটেনি। পুনর্বার প্রতিশোধ নিতে পারে রাত্রের অন্ধকারে। রবার্ট ফিরে চলে নীচে—মাটির পৃথিবীর দিকে।

খোকার কথা

শ্রীআশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যি মাগো, দেখে এলাম
মিত্তিরদের 'বুদি'
আস্ত বইয়ের পাতা খেলো
চক্ষু দুটি মুদি' ॥
আচ্ছা, ভাবো সবাই বলে
'বুদ্ধি গরুর মতো'
যখন খুশি এর প্রতিবাদ
করতে পারে ও তো ॥

ওর পেটে তো রইল মাগো
'কিশলয়ের' পাতা
আমার থেকেও বাংলায় কি
ভালো মা ওর মাথা ॥
আজ থেকে ঠিক পুরোদমে
করবো পড়াশুনা
'লক্ষ্মীছেলে' বলে আমায়
দাও মা এবার চুমা ॥

আগুনের কথা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আগুন কি বস্তু তা তোমরা সকলেই জান। নিত্য বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখছ। আগুনের সাহায্যে দু'বেলা তোমাদের খাবার রান্না করা হচ্ছে; রাত্রে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালানো হচ্ছে। সুতরাং আগুনের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই বিশেষ পরিচয় আছে। কী জানো, আগুন না হলে মানুষের চলে না। কিন্তু, তোমরা হয়ত কখনো ভেবে দেখনি কবে, কি করে পৃথিবীতে আগুনের সৃষ্টি হ'ল?

কে, কবে, কোথায় প্রথম আগুন আবিষ্কার করেছিল তার সঠিক ইতিহাস অবশ্য জানা যায় না। তবে অতি পুরাকাল থেকেই নিশ্চয় পৃথিবীতে আগুনের ব্যবহার চলে আসছে।

আদিম যুগে মানুষ ছিল অসভ্য। বাস করত গুহায়। আগুনের ব্যবহার জানত না তারা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো দেখে তারা ভয় পেত। বনে-জঙ্গলে গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন জ্বলতে দেখেছে, যাকে বলা হয় দাবানল; আগ্নেয়গিরির মুখ থেকেও আগুন বের হতে দেখতে পেত; প্রাকৃতিক জগতে নানাভাবেই আদিকালের মানুষ পরিচয় পেয়েছিল আগুনের।

সে যুগের অসভ্য মানুষ একদা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল জন্তু-জানোয়ার তাড়া করে—সেই পাথর জন্তুর গায়ে না লেগে লাগল এক শিলাখণ্ডে, তাতে করে ঝলসে ওঠে আগুন। তাই দেখে তার কৌতূহল হ'ল এবং একদা পাথরে পাথরে ঘষে জ্বালল আগুন।

গুহাবাসী আদিম মানুষ জন্তু-জানোয়ার শিকার করে মাংস কাঁচাই খেত। আগুন জ্বালানো শিখে তারা মাংস পুড়িয়ে খেতে লাগল। তারপরে কোনো এক যুগে মানুষ কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালতে শিখল এবং ক্রমশঃ শিখল রান্না করতেও।

আগুনের এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই, আগুনের ব্যবহার শিখবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে সভ্যতার আমদানী হ'ল, এইরকম অনেকের অনুমান।

এই যুগে আগুন জ্বালাতে কেউ ব্যবহার করছে কাঠ, কিংবা কয়লা, কেউ বা গ্যাস আবার কোথাও হয়ত বিদ্যুৎ শক্তিকেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

পৃথিবীতে কবে সভ্য জাতির মধ্যে আগুনের ব্যবহার শুরু হ'ল তারও কোনো ইতিহাস নেই। প্রায় সকল দেশের লোকের মনেই এই ধারণা ছিল যে, আদিযুগে আগুন ছিল স্বর্গে; পরে এক সময়ে কেনো মহাপুরুষ তাকে নিয়ে আসেন পৃথিবীতে। সেই কারণেই প্রাচীন কালে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা আগুনকে দেবতা মনে করে পূজা করত। আজকালও জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী পার্শী সম্প্রদায় আগুনের পূজা করে থাকে; তাদের বলা হয় অগ্নি উপাসক।

দেখে থাকবে, আমাদের বিবাহ উৎসব ইত্যাদি শুভ কাজকর্মেও আগুন না হলে চলে না।

দেশ-বিদেশের শাস্ত্রে বা পুরাণে আগুনের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কাহিনীর উল্লেখ আছে। আমাদের শাস্ত্র বেদ-এ আছে অরণির উদর থেকে আগুনের জন্ম হয়েছিল। অরণি শব্দের অর্থ কাঠ। এ থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে লোকে কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালাত।

গ্রীস দেশের পুরাণের কাহিনীটা হ'ল এই যে, সে দেশে এক সময়ে প্রমিথিউস নামে খুব বলশালী একজন লোক ছিলেন। সেকালে পৃথিবীতে আগুন ছিল না। ও জিনিসটা ছিল স্বর্গে। প্রমিথিউস নাকি স্বর্গ থেকে লুকিয়ে আগুন নিয়ে এসেছিলেন। এজন্যে স্বর্গের দেবতারা বিষম রেগে গিয়ে ওঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

ফরাসী ভাষার একখানি বইয়ে দেখা যায়, বিখ্যাত বাব হুসেন একদা এক দানবকে লক্ষ্য করে সজোরে এক খণ্ড পাথর ছুড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু পাথরটা ঐ দানবের গায়ে না লেগে লেগেছিল এক পাহাড়ের গায়ে; এবং আশ্চর্য, ঐ পাথর আর পাহাড়ের ঠোকাঠুকিতে আগুন ছিটকে বের হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীতে ঐ নাকি প্রথম আগুনের সৃষ্টি।

যা হোক, শাস্ত্র-পুরাণের কাহিনী সত্য হোক বা নিছক কল্পনাই হোক, এটা ঠিক যে, প্রথম পাথর কিংবা চকমকির ঠোকাঠোকিতে এবং কাঠে কাঠে ঘষা লেগে [illegible] সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তা থেকেই আদি যুগের মানুষ আগুন জ্বালার কৌশলটা [illegible]য়। প্রথম প্রথম ওরা ভয়ই পেত; পরে ক্রমশঃ ভয় দূর হ'ল, আগুনকে ওরা কাজে লা[illegible]।

তোমরা হয়ত জান, শীতের দেশে ঘর গরম রাখবার জন্যে আগুন [illegible] রাখতে [illegible]। আমাদের দেশেও পাড়াগাঁয়ে শীতকালে লোকেরা শুকনো খড়খুটো জ্বালিয়ে [illegible]নের চারিপাশে বসে থেকে শরীর গরম করে নেয়; এ দৃশ্য মাঝে মাঝে শহরেও চোখে পড়ে।

আগুন যেমন মানুষের কাজে লাগে, সুখ-সুবিধা আরাম দেয়, তেমন আবার অনেক সময় ক্ষতি করে। অসাবধান হলে ঘরবাড়ী আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু পুড়ে মরে। ভয়াবহ ব্যাপার।

হঠাৎ আগুন লাগলে তা নেবানোর জন্যে দমকলের ব্যবস্থা রয়েছে, তা তোমরা জান।

পরিশেষে একটি কাহিনী বলে আগুনের কথা শেষ করছি। অনেককাল আগেকার কথা। কমোডোর উইলকিনস্ নামে একজন আমেরিকান একবার দেশ-ভ্রমণে বের হয়ে বোডিক দ্বীপে গিয়েছিলেন। তাঁর চুরুটের ধোঁয়া দেখে ঐ দ্বীপের অধিবাসীরা নাকি ভয় পেয়েছিল। তখনও তারা আগুনের ব্যবহার জানত না। পৃথিবীতে এমনতর দেশ আজকাল আছে কিনা জানি না।

কোন এক দেশের রাজা মহা চিন্তায় পড়েছেন। রাজ্যশাসন করতে হলে রাজাকে অনেক বিষয় চিন্তা করতে হয়। কিন্তু এ চিন্তা সে চিন্তা নয়—এ এক বিশেষ চিন্তা। অনেক দিন ধরে একটা প্রশ্ন তাঁর মনে আনাগোনা করছে—কি যে তা'র উত্তর তা আর ভেবে পাচ্ছেন না।

প্রশ্নটা কি জান? সন্ন্যাসী বড় না গৃহী বড়? কেউ বলেন, গৃহীর চেয়ে সন্ন্যাসীর ধর্ম বড়, আবার কেউবা গৃহীকেই বড় বলে মনে করেন। প্রশ্নের উত্তর অনেকেই দিলেন, কিন্তু প্রমাণ কেউ দিতে পারলেন না। অথচ রাজা প্রমাণ ছাড়া কোন কথাই বিশ্বাস করতে চান না। কে যে এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান করবে!—রাতদিন তাঁর শুধু এই চিন্তা—মনে একটুকুও শান্তি নাই! এমন সময় এক যুবক সন্ন্যাসী রাজার কাছে উপস্থিত হলো। এসেই বল্‌লে—মহারাজ, আপনার প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারি। এর জন্যে আপনাকে আমার সঙ্গে আমি যে ভাবে থাকি সেইভাবে কিছুদিন থাকতে হবে। তবেই এর উত্তর যে কি তা জানতে পারবেন। রাজা সন্ন্যাসীর কথায় রাজী হলেন। প্রশ্নের উত্তর তাঁর চাই-ই—তার জন্য যত কষ্টই হোক না কেন তিনি সহ্য করবেন?

রাজা চলেছেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। অনেক রাজ্য অনেক বন-বাদাড় পার হয়ে রাজা ও সন্ন্যাসী উপস্থিত হলেন এমন এক রাজ্যে—যেখানে তখন চলেছে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন। রাজ্যের প্রজারা কি যেন এক ঘোষণা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। রাজপথগুলি নানা মানুষের নানা কথায়, নানা জল্পনা-কল্পনায় মুখর। কি যে সে ঘোষণা তা জানবার জন্য রাজা ও যুবক সন্ন্যাসী দু'জনেরই মনে খুব কৌতূহল জাগল—তাই তাঁরাও পথে একটু দাঁড়ালেন। ঠিক এই সময় একজন ঢাকী ঢেঁড়া পিটিয়ে বলছে—সবাই শুনুন, সবাই শুনুন। রাজা তাঁর পরমা-সুন্দরী কন্যার জন্য এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করছেন। এই সভায় বহু রাজপুত্র, বহু বীর, জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত থাকবেন। রাজকন্যা পছন্দ মত একজনের গলায় মালা দেবেন।

যথাসময়ে স্বয়ংবর সভা আরম্ভ হ'ল। জাঁকজমকের কোন ত্রুটি নাই। রাজকন্যার প্রণয়-প্রার্থীও অনেক। চলেছেন রাজকন্যা—হাতে তাঁর মালা। পছন্দ বুঝি আর কাউকে হয় না। এই অপছন্দের জন্যই পূর্বে বহুবারই স্বয়ংবর সভা নিষ্ফল হয়েছে—এবারও বুঝি বিফলে যায়! এমন সময় কোথা থেকে যেন এক অতুলনীয় সুদর্শন যুবক সন্ন্যাসী সভায় এসে উপস্থিত হ'ল। সকলেরই দৃষ্টি পড়লো তার উপর। রাজকন্যা মুগ্ধ হলেন—গেলেন তার সামনে—দিলেন তার গলায় মালা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুবক সন্ন্যাসী মালাটি ঘৃণার সঙ্গে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে বল্‌লে, "আমি সাধু মানুষ, আমার কাছে এ সবের কি দাম আছে? আমার আবার বিবাহের

কি প্রয়োজন ?" রাজা ভাবলেন, এই মানুষটি গরীব, তাই হয়তো সে আমার মেয়েকে বিবাহ করতে সাহস পাচ্ছে না। তাই তিনি তাকে বললেন, "দেখ, তুমি যদি আমার মেয়েকে বিবাহ কর, তাহলে তুমি অর্ধেক রাজত্ব পাবে। তাছাড়া, আমার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্যের মালিক তুমিই হবে। তোমার তো এ-বিবাহে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।" রাজকন্যা আবার সন্ন্যাসীর গলায় মালা দিলেন। এবারও ঠিক সে একই ভাবে মালাটি ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে বল্‌লে, "এ মাল্যদানের কি প্রয়োজন ? আমি তো বিবাহ করতে চাই না।" এই কথা বলেই সে দ্রুতপদে সভা থেকে চলে গেল– একবারও ফিরে তাকাল না।

এদিকে রাজকন্যা আবার মনে মনে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন—'ঐ যুবক সন্ন্যাসীকেই বিবাহ করব,—নতুবা এ জীবন আর রাখব না। তাই রাজকন্যা চল্‌লেন ঐ যুবকটির পিছু পিছু।

গল্পের গোড়ায় যে যুবক সন্ন্যাসী ও রাজার কথা তোমাদের বলেছি, তারা দু'জনেই এই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে যুবক সন্ন্যাসী এবং তারপর রাজকন্যা দু'জনকেই পর পর বেরিয়ে যেতে দেখে, প্রথমোক্ত যুবক সন্ন্যাসী রাজাকে বল্‌ল, "মহারাজ, চলুন, আমরাও এদের পিছু পিছু যাই।" বেশ কিছুটা পিছনে থেকে দু'জনে চলেছেন। যে যুবক সন্ন্যাসী প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সভা ত্যাগ করেছিল, সে অনেক পথ হাঁটবার পর এক গভীরর বনের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই বনে পিছু পিছু রাজকন্যাও প্রবেশ করলেন। গভীর বনের মধ্যে পথ-ঘাট সবই

'এই বলেই পাখীটি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিল।'—পৃঃ ১৬৪

যুবক সন্ন্যাসীর ভালভাবেই জানা ছিল। বনের মধ্যে কোন্ পথে কোথায় যে সেই যুবক সন্ন্যাসী চলে গেল, রাজকন্যা অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পেলেন না। এমন কি বন থেকে বেরিয়ে যাবার পথও তিনি হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে মনের দুঃখে এক গাছের তলায় বসে রাজকুমারী কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় সেই রাজা ও যুবক সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত। তাঁরা রাজকন্যাকে বললেন, "তুমি কেঁদ না, এখন এত অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল সকালে তোমাকে আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। এখন এই রাত্রিকালে এই গাছের তলায় সকলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।"

এই গাছের উপর বাস করত একটি ছোট পাখী তার তিনটি শিশুকে নিয়ে। মনুষের মতই এ যেন এক ক্ষুদ্র পরিবার। এই ক্ষুদ্র পাখী-পরিবারের কাছেও মানুষের অনেক শিখ্বার আছে। গাছের তলায় তিনটি মানুষকে আশ্রয় নিতে দেখে পাখীটি তার স্ত্রীকে বলল,—"দেখ, আমাদের গৃহে তিনজন অতিথি উপস্থিত। এখন শীতকাল, আগুন তো নেই। এই ভীষণ শীতে মানুষ তিনটি খুবই কষ্ট পাবে। এখন কি করা যায়, বলতো?"

এই বলেই পাখীটি উড়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠোঁটে করে এক টুকরা জ্বালানি কাঠ নিয়ে এলো। কাঠটি তাদের সামনে ফেলে দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনের সামনে বসে অতিথি তিনজন বেশ আরাম বোধ করতে লাগলেন। এ দেখেও পাখীটি মনে তৃপ্তি পেল না। তার আর এক চিন্তা—অতিথিদের খাওয়াবে কি? স্ত্রীকে আবার বল্ল, "আমাদের গৃহে যাঁরা অতিথি হয়েছেন তাঁরা ক্ষুধিত। অথচ ঘরে কিছু নেই। অন্য কোন ব্যবস্থা এখন করা সম্ভব নয়। অতএব, আমি অতিথি-সেবায় আমার দেহটাই দেবো।"

এই বলেই পাখীটি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিল এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেল। স্বামীর আত্মত্যাগের পর স্ত্রী ভাবল—অতিথি আছেন তিনজন, একজনের দেহ তাঁদের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম। তাই স্ত্রীও একই ভাবে অতিথি-সেবায় আত্মদান করল। বাকি রইল শিশু তিনটি। তারাও ভাবল—অতিথিদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বাবা-মা'র দেহও যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বাবা-মা'র মহান্ কর্মকে সার্থক করে তোলাই সন্তানের কর্তব্য। তাই সবশেষে তারা তিনজনেও পর পর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিল।

সামান্য পাখীর পক্ষে এত বড় আত্মত্যাগ দেখে অতিথিরা স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হলেন। খাওয়ার কথা তাঁরা একেবারেই ভুলে গেলেন। অনাহারে রাতটা কাটিয়ে সকালবেলা রাজা

ও যুবক সন্ন্যাসী রাজকন্যাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। রাজকন্যা ফিরে গেলেন পিতার কাছে।

এই সময় ঐ সন্ন্যাসী রাজাকে বলল, "মহারাজ, এখন আপনি নিশ্চয় আপনার কঠিন প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। আপনি যদি গৃহী হতে চান, তাহলে আপনাকে ঐ ক্ষুদ্র পাখী-পরিবারের মত অপরের জন্য আত্মত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আর সন্ন্যাসীর জীবনই যদি আপনার কাম্য হয়, তাহলে ঐ যুবক-সন্ন্যাসীর মত পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ও রাজত্বের লোভ ত্যাগ করতে হবে। গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড়? এ প্রশ্ন ঠিক নয়। নিজ নিজ কর্মেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে।"

গাঁয়ের ছবি

শ্রীকার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য

মাচায় দোলে ঝিঙে
(আর) গাছে নাচে ফিঙে,
বহুরূপী ভোঁপর-ভোঁপর বাজাচ্ছে রামশিঙে॥
তেঁতুল গাছে বক্
(শোনো) করছে খকং-খক্,
উঠনেতে পায়রাগুলি ডাকছে বকম্-বক্॥
মানকচুটার পাতা
(যেন) রাবণ রাজার ছাতা,
তার তলাতে পাঁশের গাদায় বেরাল লেখে খাতা॥
পুকুর ভরা পানা
(তার) ফাঁকে হাঁসের ছানা—
ডুব-সাঁতারে কেমন চলে, দেখলে যাবে জানা॥
গাঁয়ের এসব ছবি,
(দেখে) হয়েছি এর কবি,
সকাল হলেই দেখ্‌তে ছুটি, রক্ত-রাঙা রবি॥

সারনাথ

*

শ্রীশান্তিপ্রসন্ন
বন্দ্যোপাধ্যায়

*

যূথপতি বললেন, "আজ তোমার পালা।" নির্দেশ শুনে ডাগর আঁখি মেলে হরিণী করুণভাবে একবার তাকাল যূথপতির দিকে। যূথপতিও নির্বাক নিস্পন্দ। অতি ধীরে সসম্মানে গাত্রোত্থান করে উঠে দাঁড়ালো হরিণী। গর্ভভারে ক্লান্ত। পথ চলবার মত সামর্থ্যটুকুও তার আর নেই। তবুও অতি ধীর পদক্ষেপে পথ চলতে থাকে হরিণী। গন্তব্যস্থল রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃগয়া-গৃহ এবং শেষ যাত্রা।

প্রত্যহ এমনিভাবে যূথপতির নির্দেশে একটি করে মৃগ এসে উপস্থিত হয় রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃগয়া-গৃহের রন্ধনশালায়। সে মৃগ-মাংসে তৈরী হয় রাজা ও পরিষদবর্গের জন্য নানাপ্রকার সুস্বাদু ভোজ্য-সামগ্রী। রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে মৃগপতি ন্যগ্রোধের। রাজা ব্রহ্মদত্ত অহেতুক মৃগ-হত্যা করবেন না; পরিবর্তে চাই প্রত্যহ একটি করে মৃগ। আজ তাই এই হরিণীর পালা।

অতিকষ্টে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হরিণী এসে উপস্থিত হয় রাজার মৃগয়া-গৃহের প্রান্তে। পথ চলতে গিয়ে একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছে তার। এদিকে রাজার পাচক মহলে গুঞ্জন উঠেছে। প্রধান পাচক একটু উত্তেজিত হয়েই বলছে, আজ এত বিলম্ব কেন? চুক্তির সর্ত লঙ্ঘন করলে ইসিপতনের মৃগকুল সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃগরাজ সে কথা বিস্মৃত হলেন নাকি?

এমনি সময়ে অতি ধীরে হরিণীকে অঙ্গনে প্রবেশ করতে দেখে প্রধান পাচকের ক্রুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। না তাহলে এসে গেছে। মৃগরাজ আর যাই হোন না কেন, বুদ্ধিমান তো বটেই।

হরিণীকে নিয়ে পাচক যূপকাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হতেই দেখে একি! অবাক কাণ্ড! তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি তো? দু'চোখ রগড়ে পুনরায় যূপকাষ্ঠের প্রতি ভাল করে দৃষ্টিনিক্ষেপ

করে নেয় সে। নাঃ, ভুল তার হয়নি মোটেই। কিন্তু এ কি কাণ্ড! স্বয়ং মৃগরাজ ন্যগ্রোধ যূপকাষ্ঠের মধ্যে নিজের মস্তক ন্যস্ত করে দিয়ে রয়েছেন।

পাচক দৌড়ে এসে উপস্থিত হোলো মৃগয়া গৃহে। রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন দ্যূত-ক্রীড়ায় মগ্ন। রাজাকে যথারীতি অভিবাদন করে পাচক জানালো এই অদ্ভুত কাহিনী। ভীত-সন্ত্রস্ত সপরিষদ রাজা ছুটে এসে অবলোকন করলেন অপূর্ব, অদ্ভুত সেই দৃশ্য। করজোড়ে নতজানু হয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত সুধালেন যূথপতি ন্যগ্রোধকে এর কারণ। যূথপতি তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে রাজা ব্রহ্মদত্তকে অনুরোধ জানালেন গর্ভবতী হরিণীর বদলে তাকে গ্রহণ করবার জন্য।

দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো রাজা ব্রহ্মদত্তের। ন্যগ্রোধের নিকট ক্ষমা চাইলেন নিজের কৃতকর্মের জন্য। প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে আর কখনো জীবহিংসা করবেন না তিনি। সেই সঙ্গে ইসিপতনের মৃগকুলকে রক্ষার দায়িত্বও স্বয়ং গ্রহণ করলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত।

সেই থেকে ইসিপতনের নামের সঙ্গে যুক্ত হ'ল 'মৃগদায়' কথাটি। অর্থাৎ মৃগ যেখানে দায়াবদ্ধ হয়েছিল।

ইসিপতন নামের আবার অন্য রকমের ইতিহাসও রয়েছে। প্রবাদ, এখানে প্রাচীন-কালে মুনিঋষিরা আকাশ-পথে কাশীতে আগমন কালে এখানেই অবতীর্ণ হতেন এবং তাই ঋষিপতন থেকে ইসিপতন কথাটির সৃষ্টি হয়েছিল। আবার অন্য প্রবাদও আছে যে, এখানে নাকি একজন ঋষির পতন ঘটেছিল, সেই থেকেই ইসিপতন নামের উৎপত্তি।

সে যাই হোক, দু'শ বছর আগেও জায়গাটি 'ইসিপতন' নামেই পরিচিত হোত। কিন্তু আজ সাধারণ লোকে ইসিপতন বললে জায়গাটি চেনে না। আজ জায়গাটির নাম 'সারনাথ'।

গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব লাভ করবার পর পাঁচজন অনুগত শিষ্যকে সঙ্গে করে উরুবেলা (বুদ্ধের সাধনস্থান বর্তমান বুদ্ধ-গয়া) থেকে এখানে আগমন করেন, এবং এখানেই শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সর্বপ্রথম তাঁর পাঁচজন শিষ্যকে মুক্তিপথের সন্ধান নির্দেশ করেন। মুক্তিপথের সন্ধান লাভ করবার পর তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ এখানেই মহানন্দে উচ্চারণ করেছিলেন ত্রিশরণ সঙ্কল্প বাক্য—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" এখানেই তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুকদের সধর্ম প্রচারের জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন।

বৌদ্ধদের চারটি তীর্থের অন্যতম প্রধানতীর্থ এই সারনাথ পালি গ্রন্থাদিতে এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। সারনাথ আজ আবার নূতন করে তার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ মর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকেই যেন পুনরায় সারনাথকে টেনে তুলবার চেষ্টা চলছে।

বারাণসী থেকে সারনাথ প্রায় ছয় মাইলের পথ। সারনাথে প্রবেশ-পথের নিকটে সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে চৌখণ্ডী স্তূপ। এর নাম কি করে চৌখণ্ডী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পারা যায় না। ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথমে যেখানে ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, মহারাজ অশোক সেই জায়গাটিতেই এই স্তূপটি নির্মাণ করেছিলেন। এই স্তূপটির উপর মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তার পিতা হুমায়ুনের স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে অষ্টকোণ সমন্বিত এক বুরুজ নির্মাণ করেন।

এই চৌখণ্ডী স্তূপ ছাড়িয়ে গেলে পরে বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাধীন ইসিপতনে প্রবেশ করতে হয়। ইসিপতন বর্তমানে নূতন ও পুরাতনের এক অপূর্ব সমন্বয়ক্ষেত্র। একদিকে যেমন প্রাচীন অশোকস্তম্ভ, ধর্মরাজিক স্তম্ভ, ধামেক স্তূপ এবং সংঘারাম ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, তেমনি আবার তারই পাশে পাশে গড়ে উঠেছে নূতন করে—মূলগন্ধকুঠী, চীনা মন্দির, বর্মা মন্দির, জৈন মন্দির, মহাবোধি বিদ্যালয়, আর্য ধর্মসংঘ, ধর্মশালা প্রভৃতি, এবং একপাশে গড়ে উঠেছে এখানকার বিখ্যাত সংগ্রহশালা।

বুদ্ধ যেখানে তাঁর শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন এবং যেখানে তাঁর শিষ্যগণ ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সেই স্থানটি সম্রাট অশোক চিহ্নিত করে এক স্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। স্তম্ভটি আড়াই হাজার বছর পরে আজও কোনক্রমে টিকে আছে। স্তম্ভটির উপর অত্যাচার বড় কম হয়নি, বিশেষ করে বিদেশীদের দ্বারা। যারাই এখানে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখানকার কারুকার্যখচিত প্রস্তর সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করতো।

বুদ্ধের এবং প্রিয় পাঁচজন শিষ্যের আসন চিহ্নিত করেও মহারাজ অশোক শিলান্যাস করে দিয়ে গেছেন। আজও তা প্রায় অটুট অবস্থাতেই আছে। ভক্ত বৌদ্ধগণ আজও নাকি বুদ্ধের ঐ আসনের নিকট দাঁড়িয়ে অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করে থাকেন।

আজ সারা ভারতের প্রতীক-চিহ্ন হিসেবে যে অশোক-চক্র গ্রহণ করা হয়েছে, সেই অশোক-চক্র এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংগ্রহশালার এটি একটি মহামূল্যবান সম্ভার।

এই সিংহগুলোর চক্ষু বহুমূল্য প্রস্তর দিয়ে তৈরী ছিল। অশোকস্তম্ভ যার শীর্ষে সিংহমূর্তিটি শোভা পেত, সেই স্তম্ভটি এবং তার চারিদিকের ধূসর বর্ণের বেলে পাথরের তৈরী বেষ্টনী আজ আড়াই হাজার বছর পরেও যে রকমের মসৃণ ও উজ্জ্বল রয়েছে, তা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়।

অশোকস্তম্ভের নিকটে খনন করে, একটি সাংঘারাম (monastery) আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সংঘারামটি একটি সুবৃহৎ চকমিলান অট্টালিকার আকারের। এটির আগাগোড়া সমস্তটাই ইটের তৈরী। সম্রাট অশোকের অনেক পরিবর্তীকালে এটি নির্মিত হয়েছিল। এই সংঘারামটির নিকটেই আর একটি সংঘারামের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, এই সব সংঘারামে পনর শতেরও অধিক ভিক্ষু বাস করতেন।

সংঘারামটির নিকটেই যে স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সেই স্তূপটিই ধর্মরাজিক স্তূপ। এই স্তূপটিও মহারাজ অশোক কর্তৃক খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে নির্মিত হয়। এই স্তূপটির মধ্যে ভগবান তথাগতের দেহাবশেষের কিয়দংশ একটি স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত ছিল। কাশীরাজ চেৎসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ এই স্তূপটি থেকে মূল্যবান প্রস্তর সকল সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার ফলে, স্তূপটি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষটুকুও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে এই একই ভাবে আমাদের কত যে প্রাচীন কীর্তি লয়প্রাপ্ত হয়েছে, আজ কে তার হিসাব করবে? আশ্চর্যের বিষয় এই নষ্টামীর আজও বিরাম হয়নি।

ধর্মরাজিক স্তূপের অতি নিকটেই একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরটি খুব সম্ভবতঃ অশোকের আমলেই তৈরী। ১৯১৪ সালে খননকার্য চালাবার সময়ে 'মূলগন্ধকুঠী' নাম খোদিত একখানা প্রস্তরখণ্ড এখানে পাওয়া যায়। এই থেকেই অনুমান যে, এইটিই ছিল প্রাচীন 'মূল' গন্ধকুঠী। ভগবান বুদ্ধ যে মন্দিরে বাস করতেন, তাকেই বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে গন্ধকুঠী। বুদ্ধের পরবর্তিকালেও বুদ্ধভক্তগণ অনেক স্থানে মন্দির করে তাদের নামকরণ করেছিলেন গন্ধকুঠী। সুতরাং সেই সমস্ত আধুনিক গন্ধকুঠী থেকে এটিকে পৃথক রেখে এর বিশিষ্টতা বজায় রাখার জন্য সম্ভবতঃ 'মূল' কথাটির সংযোজন করা হয়েছিল। বর্তমানে মূলগন্ধকুঠীর পার্শ্বে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করে সেটির নামকরণ হয়েছে মূলগন্ধকুঠী। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন মহাবোধি সোসাইটির প্রবর্তক সিংহলের সুসন্তান স্বর্গীয় অনাগারিক দেবমিত্র ধর্মপাল। এই নূতন মূলগন্ধকুঠীর অভ্যন্তরভাগ অজন্তার অনুকরণে নানাপ্রকার চিত্রকলায় সুশোভিত করা হয়েছে। চিত্রগুলির প্রধান বিষয় ভগবান বুদ্ধের জীবন-কথা।

মূলগন্ধকুঠীর নিকটেই খননকার্যের ফলে একটি বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিহারটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গহরবাল বংশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাণী কুমার দেবী কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিল। সেখানে কুমার দেবীর স্তুতিবাচক একটি পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলকটি আজও অবিকৃত এবং স্পষ্ট রয়েছে। এই বিহারটির নির্মাণ কৌশল একটু বিশিষ্ট ধরনের। এই ধরনের বিহারের অস্তিত্ব ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি। ভিতরের অংশে একটি সুড়ঙ্গ-পথ রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে সেই প্রশস্ত সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে পৌছলাম। কি উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ-পথটি নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারা যায়নি। সুড়ঙ্গ সমেত বিহারটির আগাগোড়া সমস্তটাই ইটের তৈরী। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত এই যে, অশোকের আমলে তৈরী সবকিছুই প্রায় পাথর দিয়ে, কিন্তু তার পরবর্তীকালের সবকিছুই ইটের।

মূলগন্ধকুঠীর অদূরেই রয়েছে বোধিবৃক্ষের চারা। এই চারা গাছটি সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রার সঙ্গে সিংহলে প্রেরিত আদি বোধিবৃক্ষের শাখার অংশ। ধর্মপাল এটিকে সিংহল হতে আনিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন।

মূলগন্ধকুঠী থেকে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে ধামেক স্তূপ। এটিও মহারাজ অশোকেরই কীর্তি। বুদ্ধ যেখানে তাঁর শিষ্যবর্গকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, এই স্তূপটি সেই স্থানটিকেই চিহ্নিত করে রাখার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। স্তূপটি গোলাকার এবং ঘণ্টাকৃতি। এই ঘণ্টাকৃতি রূপটি উদ্দেশ্যমূলক। স্তূপটির গায়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম কারুকার্য রয়েছে। স্তূপটির গা ঘেঁষে বেদিকার আকারে তৈরী প্রস্তরাসন। ভগবান তথাগত ওখানে উপবেশন করে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশে উপদেশ বিতরণ করতেন।

ছড়া

শ্রীবিমানকুমার দত্ত

ভোর না হতেই পুব আকাশে
উঠলো যখন রবি,
খোকন সোনা হাততালি দেয়
দেখেই নিজের ছবি।

হামাগুড়ি দিয়ে খোকন—
নিজের ছবি পাড়ে,
নকল খোকন দেখেই বুঝি
বেজায় রকম মারে।

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পরদিন খুব ভোরে মিঃ পিয়ার্সন কয়েকজন কাফ্রী ও একদল বন্দুকধারী সিপাহীকে নিয়ে রজতের সন্ধানে বার হলেন। লিলিও তার বাবার সঙ্গে চললো।

রজতের বন্দুকটাকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল প্রথমে সেখানে এসে তাঁরা কাফ্রীদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে চলতে লাগলেন। স্থানে স্থানে শক্ত মাটিতে কোন চিহ্ন দেখা যায় না, আবার কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর চিহ্ন পাওয়া যায়। এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও কাফ্রীরা তাদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে সকলে দূরে একটা কাফ্রী পল্লী দেখতে পেলে। পদচিহ্নগুলো সে দিকেই গিয়েছে দেখে একজন কাফ্রী বলে উঠলো, 'হুজুর, রজতবাবুকে ঐ গাঁয়েই নিয়ে গিয়েছে।'

এদিকে গ্রামের কাফ্রীরা দূর থেকে একদল সিপাহীকে তাদের দিকে আসতে দেখতে পেলে। তাদের সঙ্গে একজন সাহেবকে দেখে তারা কর্তব্য স্থির করে ফেললে। তারা বুঝতে পারলে,—সাহেবরা যখন এদিকে আসছে, তখন তারা নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছে যে রজতবাবুকে তারাই ধরে নিয়ে এসেছে। রজত যদি তাদের কাছে থাকতো তাহলে হয়তো তাকে পেয়ে সাহেব তাদের দোষ মাপ করতে পারতো। কিন্তু গত

রাত্রে খাবার দিতে এসে রজতকে ঘরের মধ্যে দেখতে না পেয়ে তাদের মধ্যে ভী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মশালের আলোতে তারা ইতস্ততঃ বুনো লতার ছিন্ন টুকরো পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়। তারপর দেওয়ালের গর্ত দেখে তারা বুঝতে পারে,— রজতবাবু সেখান দিয়ে পলায়ন করেছে। এ অবস্থায় সাহেব যে তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তি দেবে সে বিষয়ে তারা সুনিশ্চিৎ। সুতরাং পলায়ন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সকলকে নিয়ে তারা সেই মুহূর্তেই গ্রাম ত্যাগ করে গভীর বনে আত্মগোপন করতে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ পিয়ার্সন সদলে গ্রামে প্রবেশ করে কাকেও দেখতে পেলেন না। গ্রামবাসীদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে দেখে তিনি অনুমান করলেন যে, তাঁদের দূর থেকে দেখতে পেয়েই গাঁয়ের লোকেরা পলায়ন করেছে। হঠাৎ পালাতে হয়েছে বলে জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত তারা পায়নি।

মিঃ পিয়ার্সনের আদেশে দশজন সিপাহী জনশূন্য ঘরগুলোর প্রত্যেকটি ভাল করে দেখতে লাগলো। তিনিও অবশিষ্ট সিপাহী কাফ্রীদের নিয়ে খোঁজ করতে লাগলেন।

এমন সময়ে দেখা গেল যে, কয়েকজন সিপাহী একটা ঘর থেকে একজন অসুস্থ লোককে বার করে নিয়ে আসছে। সে তার দলের সঙ্গে পালাতে পারেনি। আর গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে এত ব্যস্ত ছিল যে, তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারেনি।

মিঃ পিয়ার্সন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলতে আরম্ভ করলো, 'হুজুর গত কাল একজন বাবুকে আমাদের কয়েকটা ছোকরা ধরে আনে। সর্দার অনেক করে নিষেধ করায় তারা তাকে হুজুরের কাছে আজ সকালে পৌছে দেবে ঠিক করেছিল, কিন্তু কাল রাতেই সে বাবুটি এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে। তাই হুজুরদের আসতে দেখে এরা সব গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। অসুস্থ বলে আমিই কেবল পড়ে আছি।'

কাফ্রীদের কবল থেকে রজত মুক্ত হয়েছে শুনে মিঃ পিয়ার্সন যত আনন্দিত হলেন, আবার রাত্রে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে পলায়ন করেছে, এই চিন্তা তাঁকে ততোধিক ব্যাকুল করে তুললো। তিনি সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুকে কোন্ ঘরে রেখেছিল বলতে পারিস্?'

সে উত্তরে বললো, 'হুজুর, তাকে একেবারে কোণের ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।' এই কথা বলে সে একদিকে একখানা চালা দেখিয়ে দিলে।

মিঃ পিয়ার্সন সেই ঘরে প্রবেশ করে ঘরের মেঝেতে ছিন্ন বনলতা ও দেওয়ালে গর্ত দেখে বুঝতে পারলেন যে, সেই স্থান দিয়ে রজত পলায়ন করেছে।

এমন সময়ে লিলি হঠাৎ দেওয়ালের একটা দিক নির্দেশ করে তার বাবাকে বললে, 'ড্যাডি, ঐ দেখ ; দেওয়ালে রজতের নাম রয়েছে!'

মিঃ পিয়ার্সনও সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সেখানে ছুরি দিয়ে 'রজত' নামটা ইংরেজীতে লেখা রয়েছে। তখন রজতকে যে সেই ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রইল না। এখন খুঁজে দেখতে হবে, সে কোথায় গিয়েছে। তিনি একজন কাফ্রীকে ঘরের বাইরে যেখান দিয়ে রজত পলায়ন করেছে, সেখানে তার পায়ের দাগ আছে কিনা দেখতে বললেন।

অল্প পরে তার আহ্বানে বাইরে এসে সকলে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন। তখন সেই ছাপ অনুসরণ করে তাঁরা চলতে লাগলেন। প্রায় আধ মাইল পশ্চিম দিকে যাবার পর, রজতের পায়ের দাগ বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়েছে দেখা গেল। সেইখানে একটা বড় গাছ ছিল। তার নীচে রজতের পায়ের ছাপ দেখে গাছটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে সেই কাফ্রীটা বলে উঠলো, 'হুজুর, রজতবাবু সারারাত এই গাছে কাটিয়েছেন। নীচে সিংহের পায়ের দাগ দেখে মনে হচ্ছে যে, সিংহটা এই গাছের তলায় অনেকক্ষণ ছিল।'

তার কথার যথার্থতা শীঘ্রই প্রমাণিত হ'ল। অল্প দূর যেতেই একটা গাছে 'R' অক্ষর খোদাই করা রয়েছে দেখা গেল। তার রস তখনও গড়াচ্ছে দেখে বোঝা গেল যে, সেটা অল্পক্ষণ আগে কাটা হয়েছে। তখন তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে পথ চলতে লাগলেন।

চলার পথে অনেক গাছে এরকম চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। যেখানে বড় গাছ নেই, কেবল ছোট ছোট গুল্ম অথবা তৃণ-প্রান্তর, সেখানে গাছের ডাল অথবা একগুচ্ছ তৃণ বাঁধা অবস্থায় রয়েছে দেখা গেল। মিঃ পিয়ার্সন মনে মনে রজতের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন।

লিলি বলে উঠলো, 'আমরা যে তার উদ্ধারের জন্য আসবো তা রজতদা' বিশ্বাস করতো। তাই সে যাবার পথে চিহ্ন রেখে গেছে।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'রজত যে রকমে সোজা দক্ষিণ দিকে চলেছে, তাতে আর অল্প দূর গেলেই আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি যাওয়া যাবে ; অবশ্য আমরা প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে থাকবো।'

লিলি বললে, 'কিন্তু বাবা, রজতকে অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাকে ক' মাইল দক্ষিণে যেতে হবে তা সে জানে না। হয়তো সে তাঁবু ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাবে!'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'সেও এক সমস্যা। তবে আমরা তার খুব কাছেই এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। আমরা যেমন তার চলার পথে ঘণ্টা দেড়েক পরে চলতে সুরু করেছি, তেমনই গাছে দাগ কাটতে তার অনেক সময় চলে যাচ্ছে। এইমাত্র যে দাগটা দেখে এলুম, তা দেখে বোধ হচ্ছে যে, সেটা একটু আগেই কাটা হয়েছে। আমার মনে হয়,—আমাদের পরস্পরের মধ্যে আর আধ মাইলেরও কম ব্যবধান আছে।

লিলি বললে, 'আচ্ছা, এ সময়ে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলে কি রকম হয়? সে যদি কাছে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকেও সাড়া পাওয়া যাবে।

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'বন্দুক ছোঁড়ার কথা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু রজতের কাছে বন্দুক তো নেই, রিভলবার ছিল; এখন আছে কিনা কে জানে? কাজেই আর একটু এগিয়েই বরং বন্দুক ছোঁড়া যাবে।'

এমন সময় অল্প দূরে রিভালবারের শব্দ শুনে সকলে চমকিত হলেন। তারপর যে দিক হতে শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেই দিক লক্ষ্য করে তাঁরা হেঁটে চললেন। যেতে যেতে আবার রিভলবারের শব্দ ও সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ জনতার কোলাহল শুনতে পেলেন তাঁরা।

রিভলবারের শব্দ লক্ষ্য করে মিঃ পিয়ার্সন নিকটে গিয়ে দেখলেন যে, একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে রজত দাঁড়িয়ে আছে আর দূর থেকে তাকে ঘিরে দশ-বারজন কাফ্রী চীৎকার করছে। রজতের সামনে চারজন কাফ্রী গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। তাদের অবস্থা দেখে বাকী লোকগুলো কাছে আসতে সাহস করছিল না। তাদের চীৎকার শুনে নিকটের গ্রাম থেকে একদল কাফ্রী তীর-ধনুক ও বর্শা হাতে ছুটে আসছে দেখা গেল।

মিঃ পিয়ার্সন জানতেন যে কাফ্রীদের তীরে বিষ মেশানো থাকে। ঐ বিষ এত তীব্র যে বড় বড় হাতি পর্যন্ত তীরের আঘাতে মারা পড়ে। কাজেই তিনি রজতের শঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি কারে তীর-ধনুক নিয়ে যে সব কাফ্রী ছুটে আসছিল তাদের দিকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে বললেন। একসঙ্গে কুড়িটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে কাফ্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো।

এই রকম আকস্মিকভাবে জীবনরক্ষা হওয়ায় রজত মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ পিয়ার্সনের কাছে ছুটে এল ও তার বাঁচার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। মিঃ পিয়ার্সনও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার প্রতি তাঁর ভালবাসা জানালেন।

তারপর রজত লিলির কাছে গিয়ে তাকে বাঁচতে এত দীর্ঘ পথ হেঁটে আসার জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো ও তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আন্তরিক ভাবে সেক-হ্যাণ্ড করতে লাগল। (ক্রমশঃ)

ফুল ঝরে যায়

শ্রীমিতা চক্রবর্তী

রঞ্জন মিত্র। কলিকাতার কোন এক প্রখ্যাত স্কুলের একটি মূল্যবান রত্ন। মাইকেলের "মেঘনাদ বধ" কাব্য তার কণ্ঠস্থ, পদার্থবিদ্যার জটিলতত্ত্ব ও তথ্যগুলি তার করায়ত্ব। কুঞ্চিত এক-গুচ্ছ ঘনকৃষ্ণ কেশদাম সর্বদাই তার প্রশস্ত ললাটের ওপর এসে পড়ত, সব সময়েই তাকে দেখে মনে হ'ত ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিটুকু লেগেই আছে।

সেদিন স্কুলের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। যথারীতি রঞ্জনের নাম রয়েছে সর্বাগ্রে। আনন্দে, হাসিতে, উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত রঞ্জন বাড়ীতে ফিরে আসে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এসে উপস্থিত হয়, ঠাকুর-ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে মা এলেন রঞ্জনের ঘরে। বললেন, "হ্যাঁ রে খোকা, তোর বাবা এলেন না যে, আজ তো ওঁর ছুটোয় ছুটি!" মাঠ থেকে সবে ফিরেছে রঞ্জন, জার্সিটা খুলতে খুলতে বললে, "আসবেন এখনি, কোথায় গেছেন হয়ত, তোমাকে কিছু বলে যাননি?"

—"কই না তো। কি জানি বাপু, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, কখন যে কি হয়ে যায় কিছু বলা যায় না। যাক্ গে তুই পড়তে বোস্, আমি তোর জলখাবার নিয়ে অসছি।"

কেমিষ্ট্রী বইটা খুলে বস্‌ল রঞ্জন। পাশের ঘর থেকে ছোট ছুটি ভাই তপন আর স্বপনের বর্ণ পরিচয় পাঠের শব্দ আসছে। সবার ছোট ছু'বছরের বোন মাল্যশ্রী মাটিতে বসে আপন মনে এঁকে চলেছে কত ছবি, বলে চলেছে কত কথা। রঞ্জনের কোন দিকে দৃষ্ট নেই, সে তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে।

ঘড়ির কাঁটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, রাত প্রায় সাড়ে আটটা। হঠাৎ অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায় ছোট্র গলি মাধব বাই-লেনে। পরক্ষণেই কে যেন সজোরে নাড়া দেয় তাদের বাড়ীর কড়াটায়। একটা করুণ ও ক্ষীণ আর্তনাদে চেতনা ফিরে পায় রঞ্জন, পর মুহূর্তেই তার মা অলকা দেবী পাগলের মত ঘরে ঢুকে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বলেন, "খোকা একি সর্বনাশ হ'ল রে!"

স্তম্ভিত হয়ে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, "কি হলো মা? কে এসেছে? আচ্ছা আমিই দেখছি।"

অলকা দেবী বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস তুই? হাসপাতাল লোক এসেছিল—তোর বাবা মেডিকেল কলেজে আছেন!"

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে জিজ্ঞাসা করে, "কেন, কি হয়েছিল বাবার?"

চোখের জল কোন মতে রোধ করে অলকা দেবী বলেন, "রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা বাসে…!" আর বলতে পারেন না তিনি। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জন। বিছানার ওপর ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকেন অলকা দেবী। অনেকক্ষণ পরে যেন চমক ভাঙে রঞ্জনের, জামাটা

গায়ে দিয়ে সে মাকে বলে, "মা আমি চললাম, তুমি মালাকে কোলে তুলে নাও, ও মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

দীর্ঘ দু'মাস পরে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসেন অবিনাশবাবু। কিন্তু তখনও তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নি। ডান পায়ের অর্ধাংশ কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ডান চোখে আঘাত পেয়েছিলেন, তাই দৃষ্টিশক্তি হয়েছে ক্ষীণ। পায়ের ক্ষত তখনও সমস্ত শুকিয়ে যায়নি। অর্থ-ব্যয়ের ভয়ে একরকম জোর করেই তিনি ফিরে এসেছিলেন। রঞ্জনের কোন আপত্তিতেই তিনি কর্ণপাত করেন নি। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাঁর চারটি সন্তানের ভবিষ্যৎ তিনি মুছে দিচ্ছেন। তবু তিনি তো অনেক কিছুই জানতেন না। জানতেন না যে, আর কোনদিন জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার শক্তি তিনি ফিরে পাবেন না। জানতেন না, তাঁর চাক্‌রিটি তিনি হারিয়েছেন।

সংসারে অনটন, অসুস্থ বাবা। বাধ্য হয়ে রঞ্জন সকালে-বিকালে গোটা তিনেক ছাত্র পড়াতে শুরু করল। স্কুলের মাষ্টার মশাইরা দেখলেন সেই প্রতিভাবান, উজ্জ্বল রত্নটি দিনে দিনে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সহপাঠীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, সেই সদাহাস্য-মুখ অমায়িক ছেলেটি ক্রমেই গম্ভীর আর মেজাজী হয়ে উঠছে। আর স্নেহময়ী জননী অলকা দেবী দেখলেন, তাঁর বড় আদরের খোকা যেন দিনের পর দিন অনাদরে শুকিয়ে যাচ্ছে।

মায়ের শেষ সম্বল হাতের গহনাটি বিক্রি করে যেদিন হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফি জমা দিল, সেই দিনই ও শুধু একবার হু হু করে কেঁদে উঠেছিল মায়ের শূন্য হাতের দিকে চেয়ে।

পরীক্ষার কয়েক দিন আগে থেকেই অবিনাশবাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি আবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন। তাঁর ডান পায়ের ক্ষতস্থানটা বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থের অভাবে যথাযোগ্য চিকিৎসাও হচ্ছিল না। রঞ্জনের বাংলা পরীক্ষার আগের দিন অবিনাশবাবুর সারা দেহে টিটেনাশের লক্ষণ দেখা দিল এবং তার পরদিনই রাত দু'টোয় এই ধরাধাম থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরে অসহায় তিনটি ছোট ভাইবোনের দিকে তাকিয়ে এক অব্যক্ত ব্যথায় রঞ্জনের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর পারে না যেন রঞ্জন এই ব্যথা সইতে! মায়ের কান্না শুনে দু'হাতে কান চেপে ধরে রঞ্জন ঘর থেকে পালাতে চায়। কিন্তু না, পালিয়ে সে যাবে কোথায়? তিনটি শিশু আর শোকাতুরা জননীকে ফেলে কোথায় যাবে সে? খানে এই দু'কুঠরি বাড়ীতেই তাকে আজন্ম কাল থাকতে হবে। মানুষ করতে হবে এই অবোধ ভাইবোনগুলিকে।

পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করে পথে বা'র হ'ল রঞ্জন; অর্থ উপার্জনের যে কোন একটা পথের সন্ধানে।

কিন্তু এই অনভিজ্ঞকে কে দেবে চাকরী? অবশেষে আনন্দবাবু আশ্বাস দিলেন, পরীক্ষায় পাশ করলে তিনি তাকে প্রাইমারী বিভাগে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করতে পারেন। মুহূর্তে বিদ্রোহ করে ওঠে রঞ্জনের মনটা। সে পারবে না তার উজ্জল ভবিষ্যতকে এভাবে বলি দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মানসপটে ভেসে ওঠে সত্য-বিধবা মায়ের অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যাকুল মুখখানি, ছোট ভাই-বোন তিনটির নিষ্পাপ মুখগুলি। মুহূর্তে মনস্থির করে সে বলে, "কিন্তু স্যার, রেজাল্ট বেরোতে এখনও অনেক দেরি। ততদিন যদি বেঁচে থাকি তবেই তো চাকরী দেবেন!"

'অবাক হয়ে আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করেন'—

অবাক হয়ে আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "এ কথা বলছো কেন রঞ্জন?"

—"সে আপনি বুঝবেন না স্যার, শুধু আপনি কেন, আমিই কি আগে বুঝতাম নাকি! তবে এখন অনেক কিছুই বুঝতে পারি। আপনি যদি পর পর দু'দিন উপবাস করেন তবে বোধ-হয় আপনিও বুঝতে পারবেন!"

—"সে কি কথা রঞ্জন! তুমি দু'দিন অনাহারে রয়েছো? এ কথা তো আগে বলতে হয়!" পরক্ষণেই তিনি চীৎকার করে ডাকেন, "এই কে আছিস।"—

তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে রঞ্জন বলে, "থাক স্যার। ভগবান যার অন্ন কেড়েছেন, আপনি আর কতদিন তার অন্ন যোগাবেন?"

—"আচ্ছা রঞ্জন, তোমার হাতে কি কিছুই নেই?"

—"কিছুই নেই একথা বলব না, মাসে গোটা চল্লিশ টাকা পাই—প্রাইভেট টিউশানির দরুণ। বাবার মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণও পেয়েছি কিছু, আর মায়ের সামান্য কিছু অলঙ্কারও অবশিষ্ট আছে। এরপর আসবাবপত্র আর বাসনও আছে যৎসামান্য।"· ·

বাধা দিয়ে আনন্দবাবু বলেন, "ছি ছি, এসব কি বলছো তুমি, এসব শোনাও পাপ, আমি বলছি ভগবানে বিশ্বাস রাখ সব ফিরে পাবে!"

—"সব ফিরে পাব? ফিরে পাব আমার বাবাকে? আচ্ছা সে কথা যাক। ফিরে পাব আমার মায়ের মুখে স্নিগ্ধ হাসিটুকু? ফিরে পাব আমার অতীত?—বলুন স্যার, কি দোষ করেছিলাম ঈশ্বরের কাছে যে তিনি অকালে আমাদের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন?"

—"রঞ্জন তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ছ, শান্ত হও। আচ্ছা তুমি কাল থেকেই এখানে কাজে যোগ দাও।"

তখন অনেক রাত। নীল আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে, ছোট্ট বাড়ীর ছাদে শুয়ে রঞ্জন মাকে বললে, "জানো মা, ছোট বেলায় আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমি যেন একটা বিরাট এরোপ্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছি। দূরে উৎসুক চিত্তে দাঁড়িয়ে আছ তোমরা। আমি হাসতে হাসতে তোমাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।···মা, আমি আজও অবিকল সেই স্বপ্নটাই দেখলাম; কিন্তু তার নায়ক বদ্‌লে গেছে। আমি কি দেখলাম জানো? দেখলাম, তপন নামছে এরোপ্লেন থেকে, স্বপন নাম্‌ছে জাহাজ থেকে, আর আমি দু'হাত বাড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা করছি। তুমিই বলো মা, এর চেয়ে ভাল স্বপ্ন কি আর কিছু আছে! এর চাইতেও সুন্দর ভবিষ্যৎ কি আশা করা উচিত? ও কি মা, তুমি কাঁদছ! আমিও পড়াশোনা করব বৈকি, আমিও দিনে কাজ করে রাত্রে কলেজে পড়বো। দেখো, ওরা বড় হলে আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না।"

মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে রঞ্জন। নীল আকাশের একফালি চাঁদ তার অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলো কৃপণের মত একটুখানি ছড়িয়ে দিয়েছিল রঞ্জনের ঘুমন্ত শরীরে। সেই আলোতে ওকে যেন কত ম্লান, অথচ দেখাচ্ছিল কত সুখী।

॥ ঘাত-প্রতিঘাত ॥

শ্রীসমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

মরু মেরু পারাবার হ'ক সে ভীষণ
নিশ্চয় লঙ্ঘিব আমি এই মোর পণ।

ঘাত আর প্রতিঘাত যে জীবনে নাই,
সকলের হেয় সে যে কোথা তার ঠাঁই?

মূল ইতালীয় লেখক

এলভিও বারলেত্তানি

অনুবাদ করেছেন

শ্রীপ্রণতা দে

ভবঘুরে কুকুর ল্যাম্পো

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শেষ যাত্রার পথে

ডিউটি শেষে আমি খুব সন্তর্পণে আপিস থেকে বেরিয়ে এলাম। ল্যাম্পো তখনও ঘুমচ্ছিল। যখন ট্রেনে উঠলাম, ফুর্তিতে আমি শিস্ দিতে শুরু করেছি। ভাবছিলাম, ল্যাম্পো ফিরে এসেছে শুনে মির্ণা কী খুশিই না হবে! আজ যেন ট্রেনটা অন্য দিনের চেয়ে বেশী সময় নিচ্ছে (পৌছতে) মনে হচ্ছিল। পিওম্বিনো ষ্টেশনে ঢোকবার মুখে গাড়ীটা স্লো হয়ে গেল। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, মির্ণা ষ্টেশনে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফরমে পা রাখতে না রাখতে মেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে সে বললে, "বাপি, ল্যাম্পো নাকি ফিরে এসেছে!...সত্যি?" পিওম্বিনো ষ্টেশনের লোকেরা ওকে আগেই খবরটা বলে দিয়েছে। ল্যাম্পোর অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনের সংবাদ এই লাইনের ওপর যতগুলো ষ্টেশন আছে, সবগুলোতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে মির্ণা চাইছিল কুকুরটা ফিরে আসবার সব গল্প ওর কাছে আদ্যোপান্ত বলি। আমি কিন্তু ল্যাম্পোর মর্মান্তিক স্বাস্থ্যর কথা বললাম না। জানি তা'তে মির্ণা খুবই ব্যথা পাবে। মির্ণা তো শুনে একেবারে সপ্তম স্বর্গে চড়ে গেল। তক্ষুনি আবদার ধরলে, সে ল্যাম্পোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখবে। আমি বললাম যে, আপাততঃ ক'দিন তার

ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব হবে না। ওকে ট্রেনে চড়তে দেখলে হয়ত ষ্টেশন মাষ্টার ওকে আবার নির্বাসনে দেবার হুকুম দেবে। এই ছুতো করে মির্ণাকে নিরস্ত করা গেল। পরদিন আমি যখন বেরুবার আগে সদর দরজার কাছে নেমে আসছি সিঁড়ি দিয়ে, শুনলাম মির্ণা আমাকে ডাকছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করি, "কী চাই মা?"

—"বাপি, সেই ছোট্ট কুকুরটা, যেটা তুমি দেবে বলেছিলে সে আর আমি চাই না। এখন তো আমরা ল্যাম্পোকেই আবার ফিরে পেয়েছি।"

আপিসে পৌঁছে দেখি ল্যাম্পো লম্বা টান হয়ে শুয়ে আছে, আর সমস্ত ষ্টেশনের কর্মীরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই ও উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অগত্যা শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু লেজ নাড়তে লাগল।

—"ওকে আমরা কিছুই খাওয়াতে পারিনি।" একজন সহকর্মী বললেন।

—"আপনি দেখুন তো চেষ্টা করে যদি কিছু খাওয়াতে পারেন।"

—একজন এঞ্জিন ড্রাইভার আলতোভাবে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, "বোঝাই যাচ্ছে ওর অবস্থা খুব খারাপ।"

অন্যরা সব চলে যেতেই আমি নীচু হয়ে ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর পিঠ চাপড়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলি, "ল্যাম্পো সোনা, সত্যি বলছি যা' কিছু ঘটেছে সব আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুই অনেক কষ্ট পেয়েছিস্। আমি জানি, আমিই তোকে ট্রেনে তুলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কোন দোষ ছিল না। আমি স্বেচ্ছায় নিষ্ঠুর হইনি। ওরা যে আমাকে বাধ্য করেছিল।"

ল্যাম্পো যেন হুঁ-হাঁ করে আওয়াজ করল। বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমার কথা।

—"ও সব কথা ভুলে গিয়ে এবার একটু খেতে চেষ্টা করো। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা আর কখনও তোমাকে তাড়িয়ে দেব না।" আমার কথায় যেন ল্যাম্পো উঠল, দুধের বাটির কাছে গিয়ে খেতে চেষ্টা করল। দেখলাম, ও খুব চেষ্টা করেও গিলতে পারছে না। আস্তে নিজের কোণে ফিরে গিয়ে আবার কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে বুঝি বলতে চেয়েছিল, "আমি পারছি না। বিশ্বাস কর, আমি গিলতে পারছি না।" আমি রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

লক্ষ্য করছিলাম, সেদিন যতবার ডাইনিংকার-যুক্ত এক্সপ্রেস গাড়ী আসছিল, ল্যাম্পো উঠতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। এত দুর্বল হয়েছিল যে যেখানে ছিল, সেখানেই বসে পড়ল। বুঝতে পারলাম ওকে বাঁচাবার সম্ভাবনা কমই। বেশীদিন ও থাকবে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ল্যাম্পোকে আমি নিজের সঙ্গে ট্রেনে করে পিওম্বিনোতে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলাম। আমি পণ করেছিলাম যেভাবে হোক্ ওকে ভাল করে তুলতেই হবে, ওকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। আমাদের বাড়ীর সকলকে দেখে কী করুণ আনন্দ সেদিন ল্যাম্পোর। বিশেষ করে মির্ণাকে দেখে। কিন্তু বেচারী মির্ণা ওকে চিনতে পারেনি। এমনই ওর স্বাস্থ্যের দৈন্যদশা! শেষে মির্ণা কেঁদে ফেল্ল। আমি তাকে কোলে করে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম —"মির্ণারাণী, ল্যাম্পোর এই অবস্থার জন্য আমিই অনেকটা দায়ী। এবার আমরা সবাই মিলে ওকে ভালো করে তুলব। দেখো, ও শীগগির ওর আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।"

কিন্তু আমার সব আশা নিবে গেল যখন ভেটারনারি সার্জন বললে, "কিছু আর করবার নেই। কুকুরটা খুব ভুগেছে, অনেক কষ্ট পেয়েছে। ওর পেটে ইন্‌ফেকশন্ হয়ে গেছে!"

আমি তবুও ওঁকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলাম—যা' হোক কিছু করুন, ল্যাম্পোকে বাঁচাবার জন্য।

—"কোন লাভ হবে না। মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা ওর জীবনের মেয়াদ।" ঐ পশু-চিকিৎসক হাত ধুতে ধুতে জবাব দিলেন।

আমরা এক মুহূর্তও ল্যাম্পোর কাছ-ছাড়া হচ্ছিলাম না। আমরা ওকে ঘিরে আছি দেখে ল্যাম্পোও বেশ খুশি হচ্ছিল মনে হ'ল। রাত্রি হতেই ও উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বুঝতেই পারলাম ও ষ্টেশনে যেতে চায়। সেখানে গিয়ে ওর ট্রেন ধরবে। সম্ভবতঃ সেখানেই ও শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। সেই জায়গাটা ও একবার শেষ দেখা দেখতে চায়—যে জায়গায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ওর কত সুখেই না কেটেছে। বেশ বোঝা গেল এখনও ও টানা হুইসিলের এক্সপ্রেস গাড়ীগুলোকে মনে রেখেছে। তাদের সশব্দে ভীমবেগে ষ্টেশনে ঢোকবার আওয়াজ এখনও চিনতে পারে। ও জানত এই হবে ওর শেষ যাত্রা। ও বুঝতে পেরেছে ওর চেনা গাড়ী, চেনা যাত্রী ও কর্মীবন্ধুদের পরিবেশে, তাদের মধ্যে শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যই ও এখানে আবার ফিরে এসেছে।

আমি গ্যারাজ থেকে গাড়ী বের করে ল্যাম্পোকে তাতে বসিয়ে নিলাম। মির্ণা ও তার মা দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে ওকে শেষবারের মত আদর করল। আমিও খুব ভারাক্রান্ত মনে রওনা দিলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থানে। ধীরে ধীরে ওকে এনে। আপিস ঘরে শুইয়ে দিলাম। ওর পায়ে হাত বুলিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, "বিদায় ল্যাম্পো···বিদায়··· আমাকে ক্ষমা করো!"

দরজা বন্ধ করবার আগে ওকে আর একবার শেষ দেখা দেখে নিলাম। দেখলাম, উজ্জ্বল

চোখে ও যেন আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, ওকে ওর পুরোনো জায়গায় শেষ সময় পৌঁছে দিয়েছি বলে।

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরে এলাম। ফেরবার পথে মাথার মধ্যে কেমন গুলিয়ে গিয়ে মনে হচ্ছিল, আমি যেন পিওম্বিনোর রাস্তায় সেই আগেকার ল্যাম্পোকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আপন মনেই বলি: কাল তো ল্যাম্পো থাকবে না। আমরা ওকে পুরোনো পুলটার কাছে এ্যাকাশ্যা গাছের নীচে পুঁতে দেব। ঐ গাছটির নীচে শুতে ল্যাম্পো বড় ভালবাসত। রেলওয়ে লাইন থেকে মাত্র ক'পা এগিয়েই গাছটা। ওখানে সমাধি দিলে ল্যাম্পো কখনও একা থাকবে না। ট্রেনের ঘর্ষণ ও গর্জন তখনও ওকে সঙ্গদান করবে।

যদিও আমার হেডলাইট জ্বলছিল, তবুও মনে হ'ল রাস্তাগুলো যেন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। নিজেরই চোখ বেয়ে ধারা নেমে এসেছিল। মুছে ফেললাম। গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। একটা সিগারেট ধরালাম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, তারারা আকাশে ঝলমল করছে। (ক্রমশঃ)

টুপি তৈরি করার কৌশল

শিল্পী: শ্রীরণজিৎ শর্মা

মেঠুড়ে

বিশ্ব ফুটবল

এবারের বিশ্ব ফুটবল খেলা যেন বিশ্ব অলিম্পিকের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে। ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনের খবরও এবার ফুটবলের নীচে চাপা পড়েছে। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে শুধু ফাইনাল খেলা দেখেছেন পৃথিবীর আশি কোটি মানুষ। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এ এক নতুন ইতিহাস। নতুন ইতিহাস ব্রাজিলের তিনবার ফুটবলে বিশ্ব জয়ের সম্মান। নতুন রেকর্ড পেলেরও। এবার নিয়ে তিনি চারবার বিশ্ব কাপে খেললেন, তার মধ্যে তিনবার ফাইনালে এবং তিনবারই বিজয়ীর সম্মান।

চার বছরের ব্যবধানে এক-একটা বিশ্ব ফুটবলের আসর বসলেও প্রকৃতপক্ষে এক-একটা প্রতিযোগিতার খেলা চলে দু'বছর ধরে। যেমন এবার বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হয়েছিল ১৯ মে ১৯৬৮ অস্ট্রিয়া ও সাইপ্রাসের খেলা দিয়ে, শেষ হয়েছে ২১ জুন ১৯৭০ ব্রাজিল ও ইতালির ফাইনাল খেলায়।

১৯৩০ সালে প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল তেরটা দেশ আর এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় উনসত্তরটা দেশ। এই উনসত্তরটা দেশ থেকে ফাইনাল পর্যায়ে এসেছিল চোদ্দটা দল। তা ছাড়া গতবারের বিজয়ী ইংলণ্ড এবং ফাইনাল পর্যায়ের খেলা আয়োজনের অধিকারপ্রাপ্ত দেশ মেক্সিকো প্রতিযোগিতার নিয়মেই শেষ ষোলটা দলের ভেতর থাকার অধিকার পেয়েছিল।

উনসত্তর দলের ভেতর প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা হয়েছে একশ তিয়াত্তরটা, শেষ ষোলটা দলের মধ্যে খেলা হয়েছে বত্রিশটা। ফাইনাল পর্যায় গ্রুপ লীগের খেলা গোলশূন্য বা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও নক আউটের কোনো খেলা কিন্তু অমীমাংসিত থাকেনি, যদিও অতিরিক্ত সময় খেলার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, কিন্তু ফলাফলের মীমাংসা হয়েছে এক দিনেই। শুধু এক

নম্বর গ্রুপে রাশিয়া ও মেক্সিকোর গোল সংখ্যা এবং পয়েন্ট সমান থাকায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্যে লটারী করতে হয় এবং লটারীতে রাশিয়া গ্রুপ লীগে শীর্ষস্থান পায়।

এবার খেলার মান এবং আকর্ষণ যেন ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে উঠতে শেষে চরমে উঠেছিল। গ্রুপ লীগে ব্রাজিলের কাছে গতবারের বিজয়ী ইংলণ্ডের পরাজয়, পশ্চিম জার্মানীর প্রাণবন্ত খেলা, বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে পেছিয়ে থেকে পেরুর ৩-২ গোলে জয় প্রভৃতি ঘটনা পরম আকর্ষণের। কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের বিজয়ী এবং রানার্স ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর স্মরণীয় সাক্ষাৎকার, গ্রুপ লীগের তিনটে খেলায় যে ইতালি মাত্র একটা গোল করেছিল, মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারিয়ে তাদের সেমি-ফাইনালে ওঠা, রিভা রিভেরা প্রমুখ খেলোয়াড়দের চমকপ্রদ খেলা এবং ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে পশ্চিম জার্মানীর কাছে ইংলণ্ডের ৩-২ গোলে হার স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় প্রভৃতি ঘটনা প্রতিযোগিতার আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আকর্ষণ চরমে ওঠে সেমি-ফাইনালে ইতালি ও পশ্চিম জার্মানীর খেলার পর। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলের অমীমাংসিত খেলার পর অতিরিক্ত সময়ে ইতালি আরও তিনটে এবং পশ্চিম জার্মানী আরও দুটো গোল করে। এই খেলাটাকে শতাব্দীর স্মরণীয় খেলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। খেলার উৎকর্ষ, নৈপুণ্যগত শিল্প সুষমা এবং সংগ্রামের নাটকীয়তায় এমন খেলা দেখার ভাগ্য নাকি কোনদিন কারও হয়নি। ইংলণ্ড জার্মানীর কোয়ার্টার ফাইনাল এবং পশ্চিম জার্মানী ও উরুগুয়ের মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলাটাও হয় খুব উঁচু দরের।

ফাইনাল পর্যায়ের বত্রিশটা খেলায় এবার যেখানে মোট পঁচানব্বইটা গোল হয়েছে, সেখানে ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে ১২৪ ও ১১৫টা গোল হয়েছিল। এবারের গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন পশ্চিম জার্মানীর ফরোয়ার্ড জারহার্ড মূলার একটা হ্যাটট্রিক সমেত মোট দশটা গোল করে। প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ন-টা গোল দেবার সংখ্যা ধরলে মূলারের গোল দেবার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০+৯=১৯টা। মূলার ছাড়া গোল করার দিক দিয়ে আর একজনের রেকর্ডও চমৎকার—তাঁর নাম জেয়ারজিনহো। ব্রাজিলের জেয়ারজিনহো প্রতি খেলাতেই গোল করেছেন এবং মোট সাতটা গোল করে গোলদাতাদের তালিকায় পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান।

ক্রিকেট

বিশ্ব ফুটবলে ইংলণ্ডের পরাজয়ের পর ক্রিকেটেও ইংলণ্ডকে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের কাছে এক ইনিংস ও ৮০ রানে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়। অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের সঙ্গে ইংলণ্ডের এই টেস্ট খেলার ব্যবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ইংলণ্ড সফর বাতিলের পর।

লর্ডসে আয়োজিত ইংলণ্ড ও বিশ্ব একাদশের প্রথম টেস্টের স্কোর বোর্ড থেকে বিশ্ব একাদশের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের বোলিং ও ব্যাটিং-এ দক্ষতার পরিচয় মিলেছে, সেই সঙ্গে পরিচয় মিলেছে ম্যাচটিকে বাঁচানোর জন্যে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থের অনমনীয় দৃঢ়তা। বার্লো, ইন্তিখাব আলম, ডলিভেরা প্রমুখ অনেকের ভূমিকাও ছিল বড় রকমের। এই খেলাটায় দু'দলের খেলোয়াড়দের চিত্তাকর্ষক ব্যাটিং দর্শকের আনন্দের খোরাক যোগায়।

ব্যাডমিণ্টন

কুয়ালালামপুরের টমাস কাপের ফাইনাল খেলায় মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ইন্দোনেশিয়া আবার টমাস কাপ জয় করেছে। ১৯৬৭ সালে ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে মালয়েশিয়া টমাস কাপ পেয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া এবার সে পরাজয়ের শোধ তুলল বলা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ জয়ের মূলে তিনবারের অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন মুনদাজির কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী।

টমাস কাপ জয়ের অর্থ ব্যাডমিণ্টন খেলায় বিশ্ব প্রধানের সম্মান লাভ। এতদিন টেনিসের ডেভিস কাপের প্রথায় টমাস কাপ খেলা পরিচালিত হ'ত। অর্থাৎ কাপ বিজয়ী দেশকে পরের বছর প্রাথমিক কোনো খেলায় অংশ নিতে হ'ত না। বাকী দেশগুলোর ভেতর খেলায় যারা বিজয়ী হ'ত, তাদের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলতে হ'ত আগের বারের বিজয়ীর দেশে গিয়ে। কিন্তু এবার টমাস কাপের খেলায় এ নিয়ম পালন করা হয়নি। আঞ্চলিক প্রথার খেলায় ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশকে খেলে ফাইনালে উঠতে হয়।

ফুটবল

ইডেনে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলের সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলাটাকে দুই বিগ-এর প্রথম লড়াই বলা যায়। এর আগে ইস্টবেঙ্গল উয়াড়ির সঙ্গে খেলে ড্র করে একটা পয়েণ্ট হারালেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল আরও বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের সঙ্গে জোর পাল্লা টানার ক্ষেত্র তৈরী করেছে।

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলের এবারের এই খেলাটায় খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। সারা খেলায় এমন একটা ভালো সট হয়নি যে সটে গোল হতে পারে। গোলরক্ষকও একটা অবধারিত গোল বাঁচিয়ে প্রশংসা কুড়োবার সুযোগ পাননি। এ জন্যে মাঠের অবস্থা কিছুটা দায়ী।

ইডেনে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটা বৃষ্টি সত্ত্বেও কোনরকমে শেষ হলেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলাটা যথাসময়ের পর বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে যায়, আর মোহনবাগান ও মহমেডানের খেলাটা প্রবল বর্ষণের ফলে আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

এদিকে আই. এফ. এ.-র নামকরা খেলোয়াড়রা মারডেকা ফুটবলের প্রস্তুতি হিসাবে কোচিং ক্যাম্পে যোগ দেবার জন্যে বোম্বাই গিয়েছেন। আগস্টের প্রথম হপ্তায় কুয়ালালামপুরে আরম্ভ হবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। মারডেকার খেলা থেকে খেলোয়াড়রা ফিরে না আসা পর্যন্ত লীগের গুরুত্বপূর্ণ চ্যারিটি বা প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব হবে না। লীগের খেলা অবশ্য যথারীতি চলবে, কিন্তু সে খেলাগুলোয় না থাকবে তেমন আকর্ষণ, না থাকবে উৎসাহ-উদ্দীপনা।

মেঘ গুড়গুড়

বন্দে আলী মিয়া

দীলু আর খোকা
দুইজনে বোকা।
তারা দুটি ভাই
আজ ঘরে নাই।
গেছে বহুদূর
নশিরামপুর—
দিয়ে মাঠ পাড়ি
গেছে মামা বাড়ী।

আজ সারা দিন
মাছি ভিন্ ভিন্,
কড়া রোদ্দুর
চিঁড়ে আর গুড়
খাই ভাই বোন,
ছোটো গৃহ কোণ—
বেশ আছে তারা
নেই কারো সাড়া।

দীলু গান গায়
চানাচুর খায়।
আজ হাটবার
চাই কি তোমার ?
চলো তাড়াতাড়ি
মীনু পরো শাড়ী—
রাখো কলরব
কিনে ফেলি সব।

মেঘ গুড়গুড়
চলো নশিপুর।
আমাদের নড়া
ভাজে তালবড়া।
চটপট কর
ফিরে যাই ঘর।
সাইকেল তার
চলেনাকো আর।

সবজান্তা

রন্ধনে কম্প্যুটার

আজকাল রন্ধন ব্যাপারেও কম্প্যুটারকে আনা হয়েছে। যেসব জায়গায় অনেক লোক একসঙ্গে থাকে, যেমন হোস্টেল বা মেস, সে সব জায়গায় সকালে উঠেই সমস্যা দেখা দেয় আজ কি কি রাঁধা হবে। কারণ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম রুচি। তাছাড়া দিনের বিভিন্ন তাপমাত্রায় তাদের খাদ্যের ধরনও পাল্টায়। তাই প্রতিদিন উঠেই সবার মত জিজ্ঞাসা করে তবে সেদিন কি কি রাঁধা হবে তা ঠিক হয়। এ এক দারুণ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে এখন এগিয়ে এসেছে কম্প্যুটা। এক বিশেষ ধরনের কম্প্যুটার তৈরী হয়েছে। তাতে এক জায়গায় দিনের তাপমাত্রা ধরা হয়। তাপমাত্রা অনুযায়ী সেদিন লোকে কি কি খেতে চাইবে এবং সেদিনের বাজারে কোন কোন জিনিস আনতে হবে, সেই তালিকা কম্প্যুটার হতে বেরিয়ে আসে। দেখা গিয়েছে কম্প্যুটারের তালিকা আর সব লোকের মিলিত মনোনীত খাদ্য-তালিকা মিলে গিয়েছে। তাই কাউকে আর আলাদা আলাদা মত জিজ্ঞাসা করতে হয় না। কম্প্যুটার এমনি করে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।

মনোনীত অঙ্গের অবদমন

আমাদের শরীরে এমন কিছু কিছু অংশ আছে যা কোন প্রয়োজনে লাগে না, বা যা থাকলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। জন্মমুহূর্তে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি, যার ফলে সেই অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি শরীরে প্রকাশ পাবে না; অর্থাৎ শরীর থেকে মুছে যাবে? হ্যা, আজকাল তা সম্ভব হতে চলেছে। এ বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছেন কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌সটিটিউটের বিজ্ঞানী রতনলাল ব্রহ্মচারী। তিনি এ বিষয়ে বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী নিয়ে তিনি এক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ডিম জন্মাবার সাতঘণ্টা পরে, ডিমের বিকাশের সময়, একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে তিনি কৃত্রিমভাবে সেই প্রাণীর চোখটা শরীর থেকে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীতে এটাই প্রথম নির্বাচিত অঙ্গের অবদমন। মানুষের ক্ষেত্রে এমনি নির্বাচিত অঙ্গের অবদমন হতে অবশ্য এখনও বেশ কিছু দিন দেরি আছে। তবে এমন দিন আসছে. যেদিন মানুষের আকৃতিও আমরা খুশিমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।
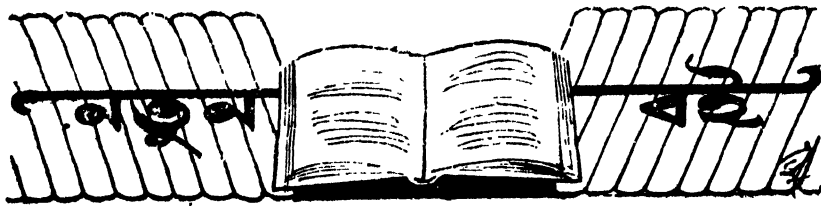
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

পড়া নিয়ে ছড়া—শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার, ৫।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীরথীন্দ্র কুমার নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১·২৫

ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা অনেকগুলি ছড়া নিয়ে, ছবি দিয়ে, এই বইটি আগাগোড়া দু'রঙে ছাপা হয়েছে। লেখক ইতিমধ্যেই ছড়া লিখে বেশ সুনাম করেছেন। এই বইখানির ছড়াগুলিও ভারী মজার ও পড়তে ছোটদের এতটুকুও আটকাবে না। বড় টাইপে ভাল ছাপা।

হাসির ঘন্ট—শ্রীযোগিন্দ্রনাথ মজুমদার। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ, ৪।৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীতরুণ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ·৫০

ছড়া পড়তে সব বয়সের লোকেরই ভাল লাগে। বিশেষ করে সে ছড়ায় যদি হাসির ভোজ বেশী থাকে তা' হলে তো কথাই নেই। 'হাসির ঘন্ট' বইটি সেদিক থেকে যেমন ছবিতে-ছবিতে ভরা দেখলে চোখ ফেরান যায় না, তেমনি ছড়াগুলিও মজাদার। বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে তোমারা ছাড়তে পারবে না। ছবিগুলি যিনি এঁকেছেন, তাঁর কৃতিত্বও এর মধ্যে কম নয়! দু'রঙে আগাগোড়া ছাপা সাইজ বড় এবং প্রচ্ছদপটটি অনেক রঙে এবং আশ্চর্যরকম আকর্ষণীয়।

আরব্য রজনী—শ্রীতারাপদ রাহা। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে মিঃ ডি. মেহ্‌রা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫·০০

আরব্য উপন্যাস চিরকালের মজাদার ও রহস্যময় গল্পের ভাণ্ডার' ছোট-বড় সকলের কাছেই এই গল্পের সমান আবেদন।

প্রবীণ লেখক তারাপদ রাহা ইতিপূর্বে এই বইয়ের দু'খানি খণ্ড প্রকাশ করেছেন এবং সেগুলি পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। বর্তমানে ৩য় খণ্ডটি প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডটির কাহিনীগুলিও আগেকার দুটি খণ্ডের মতই সুখপাঠ্য। এর মধ্যে আছে: হীরের চেয়ে দামী, জুলেখার কাহিনী, জুডার ও তার দুই ভাই, সুলতান মামুদের দুই জীবন, পায়রা-মটরওয়ালার দুই মেয়ে, আলি খাজা ও বাগদাদের বণিকের কাহিনী প্রভৃতি মনোরম গল্পগুলি।

আসলে বইখানির নয়নাভিরাম প্রচ্ছদপট, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই প্রভৃতির সঙ্গে লেখার ধরনটি এত সুন্দর যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে কেউই তোমরা এ বই ছাড়তে পারবে না।

শ্রীবিনয় বাগচী

১। নীচের ছক দুটির শূন্য ঘরগুলিতে এমন একটি করে অক্ষর বসাতে হবে, যাতে দুটি ছকেই পাশাপাশি তিনটি ও খাড়াখাড়ি তিনটি প্রাণীবাচক শব্দ হয়।

(ক)

মা		
	কু	
		দ

(খ)

	কু	
কু		
	র	×

২। নীচের ছকটি এমন ভাবে পূরণ করতে হবে, যাতে উপর থেকে নীচে তিনটি এবং বাঁ থেকে ডাইনে একটি—ভারতের মোট চারটি জায়গার নাম হয়।

		টি
নি	ও	
ভা		
	×	ড়

৩। দুই বর্ণে শব্দ এক
গাত্র মধ্যে রয়;
উল্টে দিলে মধুময়
পরিজন হয়।

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের 'ধাঁধার পাতা'র উত্তর ॥

১। মশারী ২। কারক ৩। ঝিঙে ৪। ১, ৩, ৯, ২৭ ৫। রামকৃষ্ণ ৬। চাউল

মধুচক্র

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখন রাজনৈতিক সভা-সমিতির প্রচলন ছিল প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয় দু'টি স্তরেই। একদিকে যেমন ভারতীয় মহাসভা, অন্য দিকে তেমনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স-এর অধিবেশন আহূত হতো। সেবার প্রাদেশিক কনফারেন্স-এর স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে বরিশাল। কলকাতা থেকে প্রতিনিধিরা বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করেছেন—পূর্ব বাংলার এই অঞ্চলটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ শুধু জলপথেই সম্ভব—তাই স্টীমারে অনেকখানি পাড়ি দিতে হতো।

প্রতিনিধিদের সঙ্গে রয়েছেন নেতারাও। স্টীমার এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে চলেছে—রাতের অন্ধকার ভেদ করে সার্চলাইটের তীব্র আলোকছটা পড়ছে ঘুমন্ত গ্রামগুলির উপর। প্রমত্তা পদ্মার বুকের উপর ঢেউ-এর দোলা তুলতে তুলতে এগিয়ে চলেছে স্টীমার। তখন গভীর রাত। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সবাই তখন নিদ্রামগ্ন। শুধু একটি কেবিনে দু'টি মানুষ তখনও জেগে। কিছুক্ষণ আগে তাদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল—এবার দু'জনেই বিশ্রাম-কাতর। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র শুনতে পেলেন তাঁর সহযাত্রীর কণ্ঠস্বর: "শরৎবাবু, ঘুমিয়েছেন?"

"না।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই সহযাত্রীটি বললেন: "চলুন কেবিনের বাইরে খোলা ডেক-এ।"

যতই নিদ্রাকাতর হোন না কেন, শরৎচন্দ্রের পক্ষে এ আদেশ ছিল অলঙ্ঘনীয়। সহযাত্রী আর কেউ নন—স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস—বাংলার মুকুটহীন রাজা—ভারতের প্রথম সারির রাজনৈতিক নায়ক।

দু'জনে বেরিয়ে এলেন—নির্মেঘ আকাশ, তার বুকে তারার মিটিমিটি—সার্চ-লাইটের আলোয় ফুঁসে ওঠা ঘোলাটে জল। কয়লার চুল্লি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা আগুনের ফুলকি—বাঁক ফেরার সঙ্গে সঙ্গে গাছে ঢাকা তীরভূমি। তার মাঝে মাঝে ঘুমন্ত গ্রাম,

ঘরবাড়ী ক্ষেত-খামার তুলসীমঞ্চ, তীরের বুকে আছড়ে পড়া জলের ছলছলানি, জল মাটি আর আকাশ জুড়ে বিরাটের ইঙ্গিত। দু'জনেই নির্বাক, স্তব্ধ।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর দেশবন্ধু বললেন: "শরৎবাবু, 'নদীমাতৃক' কথাটির অর্থ জানেন নিশ্চয়ই?" শরৎবাবু বললেন: "আজ নতুন করে জানছি।" তারপর মাত্র দু'টি কথা বললেন চিত্তরঞ্জন: "এদেশ আমাদের, এ আমাদের পেতেই হবে।"

সেই অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে উচ্চারিত এই দু'টি কথাই সেদিন ছিল ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইষ্টমন্ত্র—সেই মন্ত্রের উদ্গাতা চিত্তরঞ্জন নিজের অর্থবিত্ত শ্রমশক্তি সর্বস্ব দিয়েই শুধু এই আন্দোলন পরিচিত করেন নি—নিজের প্রাণকেও তিনি দান করে গেলেন দেশের সেবায়। অপূর্ব ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এই মহাজীবনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

আর কবি কাজি নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন:

"বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালে-ধূলি।
নিখিল চিত্ত-রঞ্জন তুমি, উদিলে নিখিল ছানি
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী!"

মরণের পরেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, আজও তিনি বন্দিত—কলির দধিচীরূপে—একাধারে সাহিত্যিক, কবি, ব্যবহারজীবী, সমাজসেবক, দেশব্রতে উৎসর্গীত প্রাণ—এই মানুষটি আজও আসীন রয়েছেন তাঁর অগণিত দেশবাসীর অন্তরে, পরম শ্রদ্ধার আসনে। তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। (আবির্ভাব: ১২৭৭, তিরোভাব: ১৩৩২)

দূরের চিঠি—

সুদূর দেশ থেকে যে সব চিঠিপত্র পাই, তার কিছু কিছু অংশ তোমাদের উপহার দিতে ইচ্ছা করে—অজানাকে জানার একটু আভাস। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লিখেছে—মৌচাকের ভূতপূর্ব বন্ধু:

"...এর মধ্যে অনেক জায়গা বেড়িয়ে এলাম গাড়ী চালিয়ে। যেমন Disneyland, Knatt Bay Firm, Movieland, Wax Museum—ইত্যাদি। এগুলি আমাদের বাড়ী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। Disneyland নাম তো জানোই, সর্বজনবিদিত।

মনোরেল (মাটি থেকে প্রায় একশো ফিট ওপর দিয়ে রেল লাইনের উপর রেল চলছে) Alice in Wonderland, Ghost House, জলের মধ্যে সাবমেরিনে বেড়াবার ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক মোটর, ষ্টীম বোট ইত্যাদি অপূর্ব। ছেলে-বুড়ো প্রত্যেকেরই ভাল লাগবে—যেন রূপকথার রাজ্য। Movieland, Wax Museum-এ নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি মোম দিয়ে তৈরী করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অবিকল চেহারা সব। গ্যারি কুপার, বেটি ডেভিস, গ্রেটা গার্বো, চার্লি চ্যাপলিন। জন ব্যারিমুর প্রভৃতি বিখ্যাত নায়ক-নায়িকাকে তাঁদের বিখ্যাত ভূমিকাগুলির সাজে সাজানো। এছাড়া আছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের হাতে আঁকা ছবি। র‍্যাফেল প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের প্রসিদ্ধ চিত্রগুলি সামনে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথাই বটে। Knatt Bay Firm-এ আছে গোল্ড মাইন, ষ্টীম বোট। ক্যালিফোর্নিয়া একদা সোনার জন্ম বিখ্যাত ছিল। পাহাড়ের মধ্যে কিভাবে সোনা থাকতো এবং কেমন করে সেগুলি বার করা হতো, তারই একটা মডেল করা আছে—অদ্ভুত, অপূর্ব ! আর আছে একশো ফিট উপর থেকে খাড়া জলস্রোত ধরে ইলেকট্রিকে চালানো কাঠের নৌকা সবেগে নীচে নেমে আসছে—শরীরের রক্ত মাথায় উঠে যায়—এই নৌকাতে চাপলে। কিন্তু এখানে প্রত্যেকেই চাপে—ছেলে-বুড়ো সকলেই। এখানে বুড়ো অর্থে ষাট-এর উপরে বয়স হলে। চল্লিশে পাকাপোক্ত। আমরা ওখানে চল্লিশ পার হলেই বুড়ো। তবে এদের তুলনায় আমরা সত্যই বুড়ো। চল্লিশের পুরুষ বলতে এদের average লোকেরা হলো—প্রায় ৬ ফিট ১ ইঞ্চি—বুকের ছাতি ৪২"।৪৪"—সেই রকমই হাত এবং বিশেষ করে পা। ওজন ১৭০-১৯০ পাউণ্ড। এখানে কোনো খাবারে Fat পাবেন না, এমনকি দুধেও নয়। কারণ এরা প্রত্যেকেই Fat জাতীয় বস্তু avoid করে। সব খাবারের গায়ে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে 'Non-Fat'।"—চিঠিটা কেমন লাগলো বলো ?

চিত্রা মিত্র, কোলকাতা ; কস্তুরী দাসগুপ্ত, উত্তরপাড়া ; মুকুলিকা দে, হুগলী ; রোহিণী সামন্ত, ধানবাদ ; অনির্বাণ ও অনুষ্টুপ চক্রবর্তী, কোলকাতা—সকলের চিঠি পেয়েছি। কিন্তু উত্তরের জন্য কোনো প্রশ্ন নেই। তবে হ্যাঁ, নন্দিনী ঘটক, কোলকাতা—ঠিক বলেছ, ওটা ছাপার ভুলই। "সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি নজরুল।"—এটা কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা।

সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। তোমাদের—মধুদি।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০.৬০ পয়সা

মানুষ খেকো-সাঁতারু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র

৫১শ বর্ষ] ভাদ্র : ১৩৭৭ [৫ম সংখ্যা

ক্রোধ ও ক্ষমা

সুখরঞ্জন রায়

অকারণে ক্রোধ করে যে বা মূঢ়জন,
দিবানিশি চিত্তে তার দারুণ দহন ;
প্রজ্বলন্ত কুণ্ড বহে মনে সর্বদাই,
সে অগ্নিতে হয় তার দেহ মন ছাই।

অন্যায় দেখিয়া ক্রোধ যেই জন করে
ধরাধামে বীর নাম সেই তো গো ধরে।
জ্বলন্ত পাবক সম রুদ্র তেজ তার,
খড়কুটাসম পাপী করে ভস্মসার।
ক্রোধ দেয় পাপ সাথে পাপীরে পুড়ায়ে,
ক্ষমা শুধু পাপী মন দেয় গো গলায়ে।
ক্ষমার প্রসন্ন মুখ চোখে স্নিগ্ধ হাসি
প্রবৃত্তির মূলে গিয়ে দেয় তাহা নাশি'।

ভালবাসা দিয়া ক্ষমা পাপী করে জয়,
প্রেমের পরশে গলি' হয় পাপ ক্ষয়।

ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে রাজে প্রদীপ্ত গরিমা,
ব্রাহ্মণের ক্ষমা মাঝে প্রশান্ত মহিমা।
কে বা বড় কে বা ছোট কে করে গণন,
সংসারে দু'য়েরি আছে নিত্য প্রয়োজন।

ধরণী

আহা এ ধরণীখানি কত মনোহর!
নদী গিরি তরু জীবে বিচিত্র সুন্দর!
কলকল ছলছল নদী গায় অবিরল,
সারাদিন নিয়ে জল খেলে রবিকর,
আহা এ ধরণীখানি কত মনোহর!

তরুরা তুলেছে মাথা সুনীল আকাশে,
সবুজে ও নীলে মিলি মাখামাখি হাসে;
সবুজের মাঝে মাঝে লাল সাদা ফুল রাজে
পাখী সাজি কত সাজে গাইছে উল্লাসে,
তরুরা তুলেছে মাথা সুনীল আকাশে।

আহা কিবা মনোহর এ ধরণীখানি,
কে আঁকিল চিত্র যেন তুলিকায় টানি,
উচ্চ গিরি শোভে তায় অতল সমুদ্র ভায়,
মাঠ বন রৌদ্র ছায় সবই স্বর্গ মানি,
আহা কিবা মনোহর এ ধরণীখানি!

কীর্তিমুখ
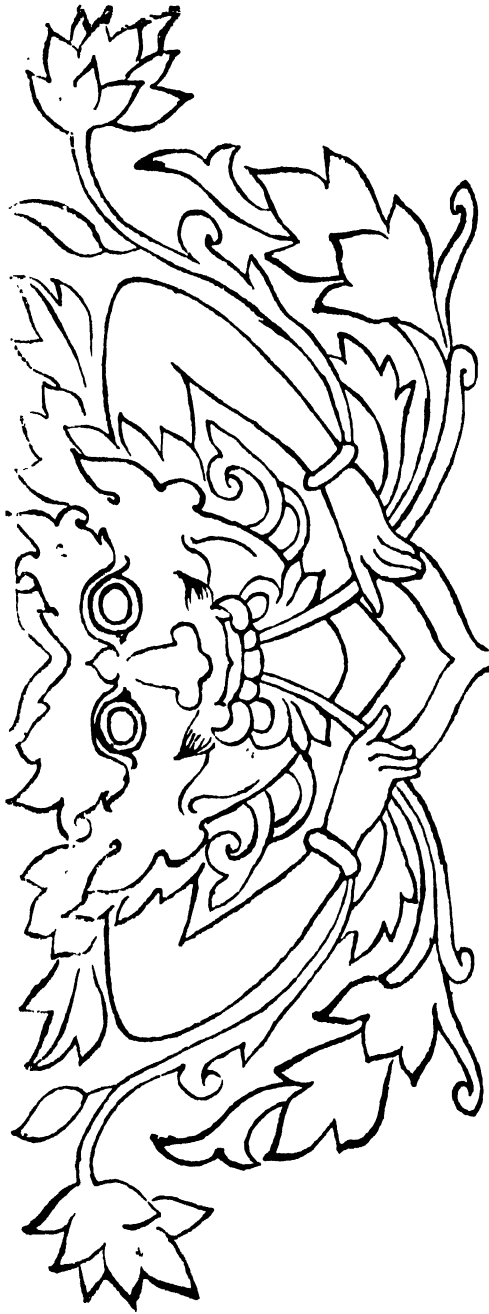
শ্রীমতী সুধা বসু

'কীর্তির্যস্য স জীবতি', যাঁর কীর্তি আছে, তিনিই চিরকাল বেঁচে থাকেন, তিনি মরেও অমর। কথাটি যেমন পুরোনো, তেমনি সুবিদিত। তারপরে ঈশ্বর যাঁকে কীর্তিমণ্ডিত করেন তার তো কথাই নেই। একটি পৌরাণিক কাহিনীতে এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। সেটি আবার প্রাচীন শিল্পের মধ্যে রূপ লাভ করে যুগ যুগ ধরে আমাদের চোখের সামনে জেগে রয়েছে।

কাহিনীটি আছে, স্কন্দপুরাণে। আর পাথরের মূর্তিতে তা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতবর্ষে। ঘটনাটি হোল—

দৈত্যকুলের রাজা জলন্ধর ত্রিভুবনের অধিকার লাভ করে রাহুকে শিবের কাছে দূত পাঠালেন। শিব তখন পার্বতীকে বিয়ে করবেন ঠিক করছেন। এমন সময় দৈত্যরাজ তাঁকে বলে পাঠালেন যে, ভিখারী শিবের চেয়ে তিনিই পার্বতীর উপযুক্ত স্বামী হতে পারবেন। সুতরাং তিনি পার্বতীকে বিয়ে করতে চান। রাহুর মুখে এই কথা শুনে, শিব তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য অংশ থেকে ভয়ংকর ও বিকট রূপের একটি দানব সৃষ্টি

করলেন। সেটির মুখ সিংহের মত, জিহ্বা ঝুলে পড়েছে, দাঁত সব বেরিয়ে আছে, চোখ দুটো জ্বলছে, মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে, বজ্রের মত গর্জন করে চলেছে সে। কিন্তু শরীরটা একেবারে কঙ্কালসার গোছের—শুধু হাড়, আর চামড়া। অথচ শক্তি যেন তার বিষ্ণুর অবতার নরসিংহের মত।

দানবটা বেরিয়েই রাহুকে আক্রমণ করলো। তখন রাহুর যেমন ভয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা, তেমনি শিবের কাছে প্রাণভিক্ষার কাতর আবেদন। শিব তখন দানবটাকে শান্ত করে রাহুর প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন।

তারপরে দানবটা বললো, তার খুব খিদে পেয়েছে। শিব কি খেতে দেবেন, কিছুই তো নেই ওর খিদে মেটানোর মত। তখন দেবতা ওকে বললেন, নিজের হাত-পায়ের মাংসগুলি ছিঁড়ে খেতে। দানব তাই-ই করলো। বাকী রইল সেই ভীষণ মুখটি মাত্র। দেবতা তাতে খুব খুসী হয়ে সেই ভয়ংকর মুখটিকে বললেন, "আজ থেকে তোমার মুখটির নাম হবে 'কীর্তিমুখ'। এখন থেকে আমার সব মন্দিরের দরজার মাথায় তোমার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হোল। তুমি চিরকাল সেখানে বেঁচে থাকবে। তোমাকে পূজা অর্ঘ্য না দিয়ে যে আমাকে পূজা করবে, সে কখনও আমার করুণা ও আশীর্বাদ লাভ করবে না।"

সেই থেকে যুগ যুগ ধরে প্রতিটি শিব-মন্দিরের দরজার মাথায় কীর্তিমুখ খোদিত হয়ে আসছে সব অঞ্চলে। ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে কীর্তিমুখের গড়ন ও ভঙ্গী হয়ত আলাদাও হয়েছে, কিন্তু সেই বড় বড় গোলাল চোখ, সিংহের মত মুখ—তা আছেই। তবে শিল্পীরা অনেক জায়গায় নিজেদের ইচ্ছামত কিছু পরিবর্তনও করেছেন। যেমন, হাত-পা তো সে নিজেই খেয়ে ফেলেছিল, কিন্তু কোথাও হয়ত দেখা যাবে কীর্তিমুখের হাত দুটি রয়েছে।

ক্রমশঃ মন্দিরের দরজা ছাড়া আরও অনেক জায়গায় কীর্তিমুখের স্থান হয়েছিল। যেমন, শিবের মুকুটে, ত্রিশূলে, মন্দিরের স্তম্ভে, খিলানে, ফলকে, দেওয়ালের নক্সায়, তাঁর হাতের পান-পাত্রে এবং আরও কত কিছুতে। যুগে যুগে বিভিন্ন শিল্পীর কল্পনায় ও বাটালিতে কীর্তিমুখের যে কত নূতন রূপ হয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

তারপরে কীর্তিমুখ বৌদ্ধধর্মের মন্দিরে স্তূপেও গিয়ে স্থান দখল করলো। বিষ্ণুমন্দিরে যেতেও বাকী রইল না। অনেক বিষ্ণুমূর্তির মাথার উপরকার খিলানেও দেখা যায় কীর্তিমুখ খোদিত রয়েছে।

অবশেষে কীর্তিমুখ চলে গেল দেশ ছেড়ে বিদেশে। প্রাচীনকালে ভারতের বাইরে যে সব দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, সেখানে সেখানে এদেশের মত মঠ-মন্দির,

স্তূপ-বিহার তৈরী হয়েছিল, সেখানেই কীর্তিমুখও সম্মানের স্থান করেছিল লাভ। সিংহল, যাভা, ক্যাম্বোডিয়া, শ্যাম, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের পুরানো হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে, দরজার শিরে আজও দেখা যায় কীর্তিমুখ চোখ পাকিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে যাভার বোরোবুদরের স্তূপের দ্বারাদেশে খোদিত কীর্তিমুখ অতি সুন্দর ও স্নিগ্ধ রূপের।

নানা রূপের কীর্তিমুখ সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, শিল্পীরা শেষ পর্যন্ত ওটিকে একটি আলঙ্কারিক নক্সায় পরিণত করেছিলেন। তার ফলেই হিন্দুমন্দির ছাড়া অন্যান্য মন্দিরেও ওর স্থান হয়েছিল। আসল মুখটির সঙ্গে আরও কত নক্সা, প্যাটার্ণ, লতা-পাতা, কত কিছু জুড়ে দিয়ে ওর ভয়ংকর ভাবটিকে শান্ত ও সুন্দর করার চেষ্টা হয়েছে। মাথায় মুকুট, কপালে তিলক, মুখে গোঁফজোড়াটি দিয়ে ওকে সুন্দর করতে চেয়েছেন শিল্পীরা, কিন্তু ভীষণ ভাবটি থেকেই গেছে। কারণ সেই আসল মুখ-চোখ তো বাদ দেয়া যায়নি। সেই ভাবটি নিয়েই ভারতের শিল্পে কীর্তিমুখ বেশ একটি চমৎকার নক্সা হয়ে যুগযুগান্তর বেঁচে আছে এবং আরও থাকবে।

মরিসাসে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী

শ্রীসুনির্মল রায়

গল্প দিয়েই শুরু করি। বেশীদিন আগের ঘটনা এটা নয়। ফ্লোরিডা রেডিও ষ্টেশনের কণ্ট্রোল রুম। পরিবেশকে আরও চাকচিক্যময় করে তুলবার জন্য ঘরে পাটল বর্ণের ফ্লুওরেসেণ্ট আলো ব্যবহার করা হ'ল। দু'মাসের মধ্যে দেখা গেল ঘোষকরা অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষের উপর অকারণে চটে যাচ্ছে।

দু'জন কর্মী হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিল। শেষকালে একজন বলল, ঘরের ঐ রং-এর বাতি সরিয়ে না ফেললে ও যা-তা কাজ করে ফেলবে। অতঃপর আবার সাদা রং-এর বাতি জ্বালান হ'ল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল।

আর একটা গল্প শোনো। কয়েক বছর আগে ডক্টর জন অট্ রিটায়ার করে ফ্লোরিডাতে গেলেন। তাঁর বাঁ পা'টা অত্যন্ত অবশ ছিল। তিনি আশা করেছিলেন ওখানকার সূর্যরশ্মিতে তার পা'টা হয়ত ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু পর্যাপ্ত সূর্যালোক লাগিয়েও পা'টাকে একটুও ভাল করতে পারলেন না। সেই সময় দৈবক্রমে একদিন তাঁর চশমাটা ভেঙ্গে গেল এবং দেখা গেল, কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর পা'টা এমনভাবে সেরে গেল যে, তিনি আর লাঠির প্রয়োজন বোধ করলেন না।

উপরে দুটো ঘটনা অপাতঃদৃষ্টিতে খাপছাড়া মনে হলেও, বৈজ্ঞানিকরা ওদের মধ্যের এক অদৃশ্য যোগাযোগ লক্ষ্য করলেন। ডক্টর অট্ পরীক্ষা করে দেখলেন যে, চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মি চোখে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু চশমা ভেঙ্গে যাওয়ায় খালি চোখে অতি সহজেই অতি-বেগুনী রশ্মি প্রবেশ করেছিল, যার জন্য তাঁর পা'টাও সেরে গেল।

বৈজ্ঞানিকরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঘোষণা করলেন—অকৃত্রিম সূর্যালোকের অভাবে প্রাণীর আয়ু কমে যেতে পারে, শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে, সন্তান প্রসবের ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে, এমনকি ক্যান্সার রোগও ডেকে আনতে পারে।

তারা বললেন, মানুষের শরীরের চামড়া যদি দীর্ঘকাল সূর্যকিরণের সংস্পর্শে না আসে, তবে মানুষের শারীরিক সাম্যতা নষ্ট হবে, স্নায়ুতন্ত্রের কাজ ব্যাহত হবে এবং শরীরে ভিটামিন 'ডি'র অভাব হবে—যার ফল হচ্ছে, মানুষ দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগবে।

পোলট্রি ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে মুরগীর ডিম প্রসবের সংখ্যা বাড়িয়েছে। দেখা গিয়েছে, গোলাপী বর্ণের ফ্লুওরেসেণ্ট আলোতে মুরগীরা কম ডিম প্রসব করে, কিন্তু সাদা ফ্লুওরেসেণ্ট আলোতে মুরগীর ডিমের সংখ্যা বেশী হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পশুজগতে পশুর বাচ্চা হওয়ার উপর এবং পরিবেশের উপর আলোকের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

পাখী ও অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আলো চোখে প্রবেশ ক'রে হাইপোথ্যালামাস নামে একটা গ্ল্যাণ্ডকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যাণ্ডও উত্তেজিত হয়।

আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে পিনিয়াল নামে একটা গ্ল্যাণ্ড আছে। এটা নার্ভের সাহায্যে চোখের সঙ্গে যুক্ত। অনুমান করা হয়, আলো চোখের মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেটা আবার শরীরের নিম্নাংশের কোন কোন গ্ল্যাণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ডক্টর অট্ অনুমান করেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের বেশী হারের জন্মের জন্যও দায়ী পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সেক্স নির্ণয়েও আলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এটাই প্রমাণিত হয়েছে নীলাভ আলো পেলে বেশীর ভাগ মেয়ে জন্মায়, আর গোলাপী বর্ণের আলোতে সাধারণতঃ ছেলেই বেশী জন্মায়। দীর্ঘ আয়ুর উপরও আলোকের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ডক্টর অট্ বলেছেন, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, সাদা ঠাণ্ডা ফ্লুওরেসেণ্ট আলোতে (১'০০০ ক্যাণ্ডেল) যে ইঁদুরগুলো জন্মায়, তারা অন্যান্য ইঁদুরের চাইতে অর্ধেক বাঁচে। এটা হতে পারে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষরা বেশী বাঁচে পর্যাপ্ত অকৃত্রিম আলোকের জন্য।

ডক্টর জে. ভি. হার্ডি বলেন, যদি কোন রকমে একটুও অকৃত্রিম আলোক থেকে কেউ বঞ্চিত হয়, তবে সেটা তার আয়ু কমিয়ে দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত কারণ হতে পারে।

পেনাং-এর মাসী

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

পেনাং এর মাসী
হঠাৎ রাজা হুকুম দেন—
ঝোলাও তারে ফাঁসি।
অবাক সবাই ভারী
অবাক, রাজা এমন কেন
আদেশ করেন জারি!

বলল সবাই—রাজা,
মুক্তি এবার দাও মাসীকে,
দিচ্ছ কেন সাজা?
রাজা বলেন, "জেনো—
তা হবে না।
মাসীর নাক বড়ির মত কেন?"

লোভী কোলাব্যাঙ

শ্রীরথীন সরকার

সারাদিন একটানা ঝমঝম্ বৃষ্টিতে মাট-ঘাট সব জলে থৈ থৈ করছে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। জলে জলময়। কোলাব্যাঙের আনন্দ আর ধরে না। সে মাঠের জলে ভুস ভুস করে ডুব দিচ্ছে, আর চার হাত পা মেলে দিয়ে সাঁতার কাটছে। কি আনন্দ! কি আনন্দ! এমন সাঁতার সে অনেক দিন কাটেনি।

হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপলো। ভাবলো আচ্ছা আজ পুকুরের জলে গিয়ে সাঁতার কাটলে কেমন হয়। পুকুরের টলটলে জলে সে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে, আবার ভালো ভালো শিকারও ধরতে পারবে। কতদিন সে মাছ খায়নি। মাছের স্বাদ সে ভুলেই গিয়েছে। যেই না ভাবা ওমনি কাজ। সে আর লোভ সামলাতে পারলো না। তড়াং করে মারলো এক লাফ।

পাশেই ছিলো একটা পুকুর। সেই পুকুরের জলে কেলোব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই জলে জাগলো প্রচণ্ড আলোড়ন। চঞ্চল হয়ে উঠলো জল-পোকার দল। ছোট ছোট মাছেরা ছোটা-ছুটি শুরু করলো। আর তাই না দেখে রুপোলী একটা মাছ চিৎকার করে উঠলো—

সাবধান সব সাবধান ভাই
যম ঢুকেছে ঘরে,
বাঁচতে যদি চাও তবে সব
লুকাও ত্বরা করে।

রুপোলী মাছের চিৎকার শুনে কোলাব্যাঙ তো রেগে টং। কি এতবড় আস্পর্ধা আমার শিকারে বাধা দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া! দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি। আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন! তোকে শেষ করে তবেই আজ অন্য

কোলাব্যাঙ তীর বেগে তেড়ে গেল রুপোলী মাছকে—

শিকার ধরবো! ব'লে কোলাব্যাঙ এবার ডুস করে ডুব দিয়ে তীর বেগে তেড়ে গেল রুপোলী মাছকে।

রুপোলী মাছ তো এবার প্রাণভয়ে ছুট দিলো। বুঝলো, ঐ যমদূতের হাত থেকে তার আজ রেহাই নেই। সে ওকে খেলে তবে শান্তি। তাই রুপোলী মাছ চিৎকার করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো—

বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও মোরে
বাঁচাও ভগবান,
একটি বারের মতো আমায়
করো জীবন দান।

বোধহয় রুপোলী মাছের প্রার্থনা ভগবানের কানে গিয়ে পৌঁছলো। কেন না সেই পুকুরের পাড়ে ছিল এক বিষধর সাপ। রুপোলী মাছের আর্তনাদ শুনে সে এবার বাইরে বেরিয়ে এলো। কে রে আমার রাজ্যে আমারই বন্ধুদের উপর অত্যাচার শুরু করে! আমি এই রাজ্যের রাজা সেখানে কিনা এতবড় অঘটন! বাইরে বেরিয়ে এসে কোলাব্যাঙের দাপাদাপি দেখে সাপ আর সহ্য করতে পারলো না। রাগে ফুসে উঠলো। কি এতবড় স্পর্ধা! আমার রাজ্যে ঢুকে আমারই বন্ধুদের উপর অত্যাচার করা। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! বলে সাপ আর কালক্ষেপ না করে, সর সর করে জলে নেমে গিয়ে কোলাব্যাঙের একেবারে টুঁটি টিপে ধরলো।

আর যাবে কোথায়। সেই আক্রমণে কোলাব্যাঙ এবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো নিজেকে বাঁচাবার। অনেক চেষ্টা করলো সাপের মুখ থেকে মুক্তি পাবার। কিন্তু না—সে কিছুতেই তা আর পারলো না। মরণ-ফাঁদে তখন সে জড়িয়ে পড়েছে—মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে সে কি বলে গেলো জানো? বলে গেলো—

একটু ভুলের তরে আমায় দিতে হলো দাম,
লোভীর দশা এমনই হয় লোভের পরিণাম।

"সকলের দোষ সহ্য করিবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাছধরা
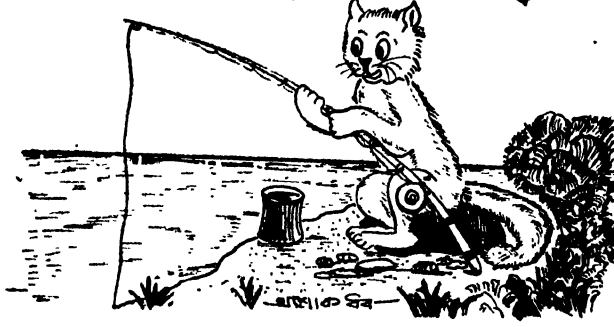
লেখা ও রেখা : শ্রীঅশোক ধর

সকাল হতেই ছিপটি নিয়ে ঘাড়ে,
বাঘের মাসী বসে জলার ধারে,
তোড়জোড়ে তার নেইকো কিছুই ফাঁকি,
ফাত্না কেবল নড়ে ওঠার বাকি !
সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে যায়,
মাসী শুধু বসেই থাকে হায় !
ভাবে বসে : মারে না আজ ঠোকর পুঁটিটি
রাজ্যে মাছের মড়ক হ'ল কি ?
বঁড়শিতে টোপ রইল গাঁথা নীচে,
শ্রমটা বেবাক হলোই যে আজ মিছে।
তখন নিজেই বঁড়শিটা তাই তুলে,
দেখলো গাঁথা হয়নি যে টোপ ভুলে !

রাখাল ছেলের রাজ্যলাভ

(বিদেশী রূপকথা)

শ্রীঅরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

সে অনেককাল আগের কথা। এক ছিল রাখাল ছেলে। অনেক দূরে ঘন এক জঙ্গলের কাছে ছিল তাদের বাড়ী। একবার সে দেশে এক ভয়ংকর মহামারী দেখা দিল। দেখতে দেখতে গাঁকে-গাঁ উজাড় হয়ে যেতে লাগল। রাখাল ছেলেটির বাবা-মাও মারা পড়ল। সে আশ্রয়ের জন্য এ-দোর ও-দোর ঘুরে বেড়াতে লাগল। কে কাকে আশ্রয় দেয়? সবাই পালাচ্ছে। রাখাল ছেলেটিও একদিন 'যা করেন ভগবান' বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

চলতে চলতে নূতন এক জায়গায় এসে পড়ল ও। ভগবানের বিধান, রাস্তায় ওর চোখে পড়ল একটি ফুটফুটে মেয়ে। কি সুন্দরই না দেখতে সে! ছেলেটি দূর থেকে দেখতে লাগল ওকে। ছেলেটিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি তার কাছে এগিয়ে এল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ ভাই, তোমাকে তো কোনদিন দেখিনি। কি নাম তোমার?

রাখাল ছেলেটি বলল, আমি জীবাই। তা আমাকে দেখবে কি করে, আমি তো আর এদেশে থাকি না।

—তাই বল। তা তুমি এলে কি করে?

—কেন, পায়ে হেঁটে।

—তোমার মা-বাবা কোথায়?

ছেলেটি আকাশের দিকে হাত তুলে বলল, ওই আকাশে।

মেয়েটি বলল, আহাঃ, তাহলে চল না আমাদের বাড়ী। দেখবে কত ভাল আমার মা, আর কি সুন্দরই না আমাদের বাড়ীটা! মেঝেগুলি টকটকে লাল, দেওয়ালগুলো ধবধবে সাদা আর সামনের পুকুরটায় ছোটবড় কত মাছ! দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করবে না। জান, আমি সারারাত মাছ দেখে বেড়াই বলে মা বলেন 'মৎস্যকন্যা'।—তাহলে যাবে তো?

ছেলেটি রাজী হয়ে যায়। দু'জনে বাড়ী পৌছলে মেয়েটির মা বলেন, হ্যাঁরে মিনু, ফুটফুটে এই ছেলেটিকে কোথায় পেলি?

—রাস্তায়। জান মা, ও কিন্তু ভিন গাঁয়ের লোক। আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। কি ভালই না হবে মা?

দেখি তোর বাবা আসুক। যা হাড়কিপ্পন লোক!

—না না তা হবে না, ওকে এখানে রাখতেই হবে। হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যায়।

মেয়ের মা আর ফিরেন, বলেন, থাম হয়েছে। দেখি কি করতে পারি ?

মেয়েটির বাবা জীবাইকে গরু চরানোয় লাগিয়ে দিলেন।

মিনুর সঙ্গে আর ওর ভাল করে দেখা হয় না। কখনও কখনও যদি বা কথা হয়—তাও ছুটো-চারটে।

জীবাই মনে মনে ভাবে—আমি যদি মিনুদের মত বড়লোক হতাম, তবে আমি একটা 'চকমিলান' বাড়ী করতাম, আর মিনুর সঙ্গে সারাদিন খেলা করতাম।

এমনই করে দিন যায়, বছর কাটে। মিনু আর জীবাইও বড় হয়ে ওঠে। মিনু আর আগের মত এগিয়ে এসে কথা বলে না। আরও সুন্দর হয়েছে ও।

জীবাই গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সারাটা দুপুর মাঠে মাঠে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক দৈত্যের সামনা-সামনি পড়ে গেল। ও ছুটে পালাতে চায়, কিন্তু ওকি ! দৈত্যটা যে ইশারা করে ডাকছে।

জীবাই ভাবল—'সাপে মারলেও মরা, বাঘে মারলেও মরা।' তাহলে, পালিয়ে গেলেও তো মরতে পারি। তার চেয়ে দৈত্যের কথাই শুনি। কপাল তো খুলেও যেতে পারে। যেই কথা সেই কাজ। রাখাল এগিয়ে যায়। দৈত্য বলে, রাখাল ভাই, আমার পা কেটে গেছে, একটু বেঁধে দেবে। সত্যিই তো দরদর করে রক্ত পড়ছে, দৈত্যের পা থেকে।

রাখাল একটু ছুটে যেয়ে কয়েকটা লতাপাতা নিয়ে আসে। তারই কয়েকটা লাগিয়ে দেয় কাটা জায়গায়। মন্ত্রের মত কাজ হয়; এক নিমিষে রক্তপাত বন্ধ।

দৈত্য সুস্থ হয়ে বলে, ভাই তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না। চলো, ভোজ খেয়ে আসবে এক জায়গা থেকে।

ও তক্‌খুনি রাজী। দৈত্য ওকে ঘাড়ে নিয়ে বনবন করে ছুটতে থাকে। ছুটছে তো ছুটছেই। শেষ পর্যন্ত ওরা একটা বিরাট থামওয়ালা বাড়ীর সামনে পৌছে যায়।

এবার দৈত্য ওকে নামিয়ে দিয়ে বলে, তুমি এই মলমটা গায়ে মেখে নাও, তাহলে কেউ আর তোমাকে দেখতে পাবে না। নাহলে ভোজের বাড়ীর লোকেরা তোমাকে দিয়ে কাবাব বানিয়ে ফেলবে।

জীবাই বলল, তাহলে আমাকে কি আর কেউ কোনদিন দেখতে পাবে না ?

—তা কেন ? তুমি নদীতে একবারটি স্নান করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে কি ভোজ ! জীবাই বেচারা চেটেপুটে প্রাণ ভ'রে খেল। তারপর পরের দিন খাবে বলে একটুকরো পাউরুটি পকেটে রেখে দিল।

বিদায় নেওয়ার আগে দৈত্য অদৃশ্য মলমটা ওকে দিয়ে গেল। বলেল, তোমার কাজে লাগবে।

তারপর দিন জীবাই যেই রুটিটা কাটতে গেছে, অমনি টিপ করে তার পায়ের কাছে একতাল সোনা পড়ল। তারপর যেই ছুরি চালিয়েছে, অমনি আর একতাল। দেখতে দেখতে সোনার পাহাড় হয়ে উঠল।

তারপর এক রাতে সেই অদৃশ্য মলম মেখে জীবাই মিনুরাণীর ঘরে পড়লো ঢুকে। সেখানে রেখে এলো ভাল ভাল সোনা। এমনই ক'দিন যাওয়ার পর, ও একদিন অদৃশ্য মলম মাখতে ভুলে গেল। আর সেইদিনই ধরা পড়ে গেল বুড়ো মনিবের কাছে। বুড়ো তো এই মারেতো সেই মারে!

অনেক কষ্টে রাখাল বুঝিয়ে বললে সব কিছু। এবার মনিব খুশি। বললে, তোমার হাতেই মেয়ে দেব বাবা। তুমি আর কিছুটা সোনা দাও না? কিছুটা কেন, মন মন সোনা দিয়ে দেয় সে বুড়োকে।

তারপর 'চকমিলান' বাড়ী হতে আর ক'দিন? এবার ধুমধাম করে বিয়ে হয় রাখালের আর মিনুর। সেকি ভোজ! সি কি মজা! বেশ ক'দিন ধরে পাড়ার কোন বাড়ীতেই আর রান্নার পাট নেই! তারপর আর কি—ওরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল। 'আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো।'

জগদীশপুর

শ্রীমতী শান্তি বসু

সাঁওতাল পরগণার
ছোট সেই গ্রামে,
সবুজ বনে জ্যোৎস্না ধারা
কেমন করে নামে।
দেখে এলাম আকাশ-গাঙে
শাদা মেঘের ভেলা,
নদীর স্রোতে ঝিকিমিকি
মণিমেলার খেলা।
পি.সি. বোসের বাগান ভরা
গোলাপের রাশ,

গ্রামখানি ঘিরে ছড়ায়
কি যে মধুর বাস!
গিরিডির ট্রেনখানি
করে আনাগোনা
মধুপুর যাবে বুঝি
বাঁশি যায় শোনা।
ফুলঝুরি ও কদম পাহাড়
শাল মহুয়ার বন,
হাতছানি যে দেয় পথিকে
উদাস করে মন।

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিঃ পিয়ার্সন আহত কাফ্রীগুলোর দিকে মন দিলেন। তাদের আঘাত সামান্য হলেও চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সুতরাং তিনি সেই গ্রামের সর্দারকে ডেকে পাঠালেন।

সর্দার প্রথমে আসতে সম্মত হয়নি। পরে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই জেনে সেখানে উপস্থিত হলে মিঃ পিয়ার্সন দো-ভাষীর মারফত তাকে জানালেন যে, যারা আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন। তাঁবুতে ওষুধপত্র আছে, এদের সেখানে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে দু'চার দিন থেকে সেরে উঠে তারা চলে আসবে। এজন্য তিনি সর্দারের অনুমতি চাইছেন।

সর্দার যখন বুঝতে পারলো যে, সাহেব তার লোকদের চিকিৎসা করাবে, তখন সে সানন্দে সম্মত হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে সকলে তাঁবুতে ফিরে এলেন। দশ-বার মাইল হাঁটার ফলে সকলেরই খুব খিদে পেয়েছিল। রজতের গত রাত্রি থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তার পেটের নাড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবার যোগাড়। তারা পৌঁছতেই মিসেস পিয়ার্সনের আদেশে তাদের সকলকে উপযুক্ত খাদ্য পরিবেশন করা হ'ল।

খেতে বসে রজত তার কাহিনী শোনাতে লাগলো। সে মৃদু হেসে বললে, 'আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে,—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?' তা না হলে কাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটলো সে সব কথা মনে হলে এ রকম নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যে আবার মিলতে পারবো সে কথা ভাবতে পারা যায় না।'

লিলির মা জানতে চাইলেন, 'আফ্রিকার বনের মধ্য দিয়ে রাত্রে পালাবার সময় তোমার ভয় করেনি রজত ?'

রজত বলতে লাগলো, 'কাফ্রীদের কবল থেকে পালিয়ে, তাদের কাছ হতে দূরে চলে যাবার কথাই প্রথমে মনে হয়েছিল। আফ্রিকার হিংস্র প্রাণীদের কথা একবারও মনে আসেনি। প্রায় সিকি মাইল পথ চলার পর সিংহের কথা মনে পড়ে গেল। তখন একটুও দেরি না করে একটা বড় গাছে চড়ে বসলুম। আর যদি দু'মিনিট বিলম্ব হ'ত, তাহলে আমার বাঁচবার আর উপায় থাকতো না। গাছের একটা উঁচু ডালে সবে বাগিয়ে বসেছি, এমন সময়ে পশুরাজ সিংহ সেই গাছের নীচে এসে উপস্থিত। আমার গায়ের গন্ধ পেয়ে সিংহের আর নড়বার নাম নেই। সুতরাং সারা রাত্রি জেগে গাছের উপর বসে কাটিয়ে দিলুম। তারপর সকাল হলে গাছ থেকে নেমে চারিদিকে নজর রাখতে রাখতে চলতে লাগলুম।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'তুমি বুদ্ধি করে গাছে গাছে 'R' অক্ষর খোদাই করেছিলে বলে তোমাকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল।'

রজত বললে, 'আপনারা যে আমার সন্ধানে আসবেন তা আমি জানতুম। তাই আমার চলার পথে চিহ্ন রাখবার জন্য গাছের গুঁড়িতে ছুরি দিয়ে আমার নামের প্রথম অক্ষর কেটে রেখেছিলুম। আর, যেখানে গাছ পাইনি, সেখানে ছোট গাছগুলোকে বেঁধে রেখে গিয়েছিলুম।

লিলি জিজ্ঞাস করলে, 'তুমি সোজা দক্ষিণে এসেছ দেখলুম, ভুল করে উত্তরেও তো চলে যেতে পারতে ?'

রজত মৃদু হেসে বললো, 'আমরা দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে রেলপথ বসিয়ে চলেছি। সুতরাং কাফ্রীরা আমাকে দক্ষিণের দিকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে না। আর পূব দিকে আছে শহর। কাজেই তারা নিয়ে যাবে উত্তর অথবা পশ্চিম দিকে। এখন দেখছি, তারা আমাকে

উত্তর-পশ্চিমে নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আজ সকালে সূর্য দেখে দিক ঠিক করে সোজা দক্ষিণ দিকে যাবার চেষ্টা করেছি।

মিঃ পিয়ার্সন জানতে চাইলেন, 'এদিকের কাফ্রীরা তোমাকে আক্রমণ করলো কেন রঞ্জত ?'

রঞ্জত বলতে আরম্ভ করলো, 'পথ চলতে চলতে একটা প্রান্তরের কাছে এসে পৌছলুম। কাছেই একটা ছোট পাহাড় নজরে পড়লো। এদিকে আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। কাজেই কোন্ দিক দিয়ে গেলে আমাদের তাঁবুতে পৌছানো যায় তা ঠিক করার জন্যে সেই পাহাড় ধরে উঠলুম। চারিদিকে তাকিয়ে কিছু দূরে কাফ্রীদের একটা গ্রাম দেখতে পেলুম। আর প্রায় আধ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেশ খানিকটা স্থান জুড়ে ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে বলে মনে হ'ল। আরও কিছুটা দূরে ইঞ্জিনের ধোঁয়া উড়ছে দেখে মনে আশা হ'ল যে, এবার তাঁবুর কাছে এসে পড়েছি। পাহাড় থেকে নেমে মনের আনন্দে তাঁবুর দিকে চলেছি, এমন সময়ে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে দু'জন কাফ্রী আমার দু'পাশে এসে দাঁড়ালো। ওদের ভাষা যতটুকু জানা ছিল তার সাহায্যে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। তারা মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই আশ পাশ থেকে দশ-বারজন কাফ্রী আমাকে ঘিরে ফেললে। যতক্ষণ কাছে অস্ত্র আছে ততক্ষণ বন্দী হতে মন চাইছিল না। কাজেই যে লোকটা আমাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়ালে, তাকে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে ফেলে দিয়ে, কাছেই একটা গাছে পিঠ লাগিয়ে রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়ালুম। তারা আক্রমণ করতেই আত্ম-রক্ষা করার জন্য গুলি ছুঁড়লুম। দু'জন কাফ্রীকে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে তারা ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল, আর চীৎকার জুড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটের গ্রাম থেকে তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে একদল কাফ্রীকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তাদের দেখে আর বাঁচার আশা রইল না। ওদের তীরে বিষ মেশানো থাকে জানতুম। যে কোন মুহূর্তে একটা তীর এসে জীবনান্ত ঘটাতে পারে চিন্তা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিশেষতঃ আমাদের তাঁবুর এত কাছে এসে, এভাবে মরতে হবে মনে করে, মনটা বিষাদে পূর্ণ হ'ল। যাহোক, জীবন্ত অবস্থায় ধরা দোব না,এই ঠিক করে তৈরীহয়ে রইলুম। সশস্ত্র কাফ্রীদের আসতে দেখে নিকটের কাফ্রীরা সদলে পুনরায় এগিয়ে আসতেই আমাকে আবার রিভলবার ছুঁড়তে হ'ল। এবারও দু'জন আহত হয়ে পড়তে তারা পেছিয়ে পড়লো। এমন সময়ে কাফ্রীদের রণহুঙ্কার শুনে জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যখন হতাশ হয়ে পড়েছি, ঠিক সে সময়ে আপনারা গিয়ে না পৌছলে আফ্রিকার জমিতেই আমার দেহ রাখতে হ'ত। (ক্রমশঃ)

বাণ খেলা

শ্রীগোপাল দে সরকার

তোমরা নিশ্চয় বাণ খেলা দেখেছ? এই সব খেলাগুলো সত্যিই খুবই ভয়ংকর। জীবন-মৃত্যু হাতে নিয়ে খেলা। অনেকেই হয়তো এই খেলা দেখে ভেবেছ, এসব অলৌকিক অথবা জাল-জুয়াচুরি। কিন্তু তা নয়, কারণ আগে আমিও তাই ভাবতাম—কিন্তু যা নিজের চোখে দেখেছি, তা কখনো জাল-জুয়াচুরি নয়।

এই জগতে মন্ত্রতন্ত্র বলে যা কিছু আছে, তা আমি কোনকালেই বিশ্বাস করতাম না। আমি ডাক্তার, সুতরাং ওই সব অলৌকিক শব্দগুলোকে একপ্রকার মন থেকে দূরেই ফেলে দিয়েছিলাম।

কয়েক বছর আগেকার কথা। আমি তখন বিহারে। নূতন চেম্বার খুলে বসেছি। কিছু দিনের মধ্যে আমার খুব পসারও বেড়েছে।

একদিন কথায় কথায় আমার এক বন্ধু অঞ্জন বললো, যাবি নাকি?

আমি বিস্মিত ভাবে মুখ তুলে চাইলাম।

—কোথায়?

—বাণ খেলা দেখতে। অঞ্জন আবার বলল, চল না জবর খেলা চলছে। আজকেই শেষ। বাঙ্গালীটোলার বীণাপাণি ক্লাবের মাঠে লোক ধরার জায়গা নেই। অঞ্জন একটু থামলো।

—তাই নাকি! আমি একটু হেসে বললাম, কি কি খেলা দেখাচ্ছে?

শুধু বাণ খেলা। অঞ্জন আবার বলল, একটা বছর দশেকের মেয়েকে 'হিপনোটাইজ' করে তার উপর মন্ত্রপূত বাণ মারা। বাস্, কয়েক সেকেণ্ড মাত্র! মেয়েটি ছটফট করবে যন্ত্রণায়, তারপর মুখ দিয়ে রক্তের বান ছুটে আসবে!

—আমি বিশ্বাস করিনে এ সব। একথা বলতেই অঞ্জন জোরে হেসে উঠলো। তারপর বলল, বিশ্বাস না করিস তো চল না একবার—নিজের চোখেই দেখে আসবি। বললাম, ঠিক আছে, চল দেখি কেমন বাণ খেলা! ওসব অলৌকিক মন্ত্রতন্ত্র আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে অঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বেশী দূরের পথ নয়, মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা এসে উপস্থিত হলাম বাঙ্গালীটোলার বীণাপাণি ক্লাবের মাঠে।

মাঠে লোকারণ্য। একটু পরেই খেলা শুরু হবে। টিকিট করে নয় অবশ্য—তবে যে যার সামর্থ্য মত খেলার শেষে খেলোয়াড়ের হাতের ঝোলাটায় দু'চার আনা ফেলে দেবে।

এক কোণায় গিয়ে আমি আর অঞ্জন দাঁড়ালাম। একট পরেই খেলা শুরু হ'ল। সাপুড়ের

উপর নেমে এলো একটি যুবক। শতছিন্ন ময়লা জামা। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। হাতে ওর মরা মানুষের কিংবা কোন জন্তু-জানোয়ারের একখানা দীর্ঘ আট-দশ ইঞ্চি হাড়। পরে অবশ্য ওর নাম শুনেছিলাম, শ্যামল। শ্যামল সিংহ।

যুবক খেলোয়াড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা নয়-দশ বছরের মেয়ে। ওর নাম রত্না সিংহ। খেলোয়াড় শ্যামল সিংহের একমাত্র ছোট বোন।

কোন এককালে গ্রাম্য পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল শহরে চাকরীর খোঁজে—বৃদ্ধ পিতার সংসারের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য। কয়েক দিন পরে শ্যামল টেলিগ্রাম পেয়েছিলো তার বাবা মারা গেছেন।

কোলকাতা থেকে শ্যামল ফিরে এসেছিল তাদের গ্রামে। শেষ সম্বল বাস্তু ভিটেটা বিক্রী করে, কিছু টাকা হাতে নিয়ে, ছোট বোনটার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিলো।

চাকরী অবশ্য জোটেনি, কিন্তু কোন এক গুণিনের কাছ থেকে 'বাণ মারা' বিদ্যা শিক্ষা করেছিলো শ্যামল। ছোট ভগনীপোতকেও তার কাজে লাগিয়েছিলো। এ কাহিনী আমি পরে অঞ্জনের মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

যাই হোক, শ্যামল রত্নাকে কাছে ডাকলো। রত্না কাছে দাঁড়াতেই শ্যামল জনতাকে লক্ষ্য করে বলতে আরম্ভ করলো: দয়া করে কেউ হট্টগোল করবেন না। আমি যখন খেলা দেখাবো তখন কেউ দয়া করে গণ্ডগোল করবেন না, তাহলে ওই মেয়েটিকে আমি বাঁচাতে পারবো না; এ বড় সাংঘাতিক খেলা!

ওর কথা শুনে আমি একটু মুচকে হাসলাম। ছেলেটা বলে ভালো। খেলা দেখাবার পূর্বে কথা বলার ভঙ্গীগুলো যেন ভালো ভাবেই আয়ত্তে এনেছে।

যুবকটি মেয়েটির সর্বাঙ্গে মড়ার হাড়টি একবার ঘুরিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার দু'হাত মেয়েটির চোখের সামনে তুলে ধরে নাড়তে লাগলো। কিন্তু একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! মেয়েটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। যুবকটি একটি কালো কাপড় দিয়ে ওকে বেশ ভালো করে ঢেকে দিলো, তারপর দর্শকদের দিকে ফিরে চেয়ে বললো, আপনারা জোরে হাত তালি দিন—জোরে, আরও জোরে।

কিন্তু মুহূর্তে মঞ্চের আলো নিবে গেলো। পাওয়ার হাউসের কারেন্ট ফেল করেছে। দশ-বারো মিনিট নয়, প্রায় বিশ মিনিট বাদে যখন মঞ্চের আলো জলে উঠলো, তখন

মেয়েটির শরীর থেকে কালো কাপড়খানি খুলে নিলো। কিন্তু একি! দর্শকেরা এক সঙ্গে অনেকেই চোখ বুজলো।

মেয়েটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে গলগল করে রক্তের প্লাবন। এতো রক্তও মানুষের দেহে থাকতে পারে!

'মেয়েটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তের প্লাবন।'

আমি চিন্তা করছিলাম এসব কি সত্যি না রংয়ের কারসাজী। কিন্তু না—কয়েক সেকেণ্ড মাত্র কেটেছে যুবকটি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। সকলে ছুটে গেলো মঞ্চের দিকে। ততক্ষণে মেয়েটির বুকে আছড়ে পড়ে তরুণ খেলোয়াড় শ্যামল সিংহ ছেলেমানুষের মত ডুকরে কাঁদছে।

মেয়েটা মারা গেছে!

বেশ কিছুক্ষণের আলোর গণ্ডোগলের জন্য শ্যামল মন্ত্র ভুল করেছে। সময় পার হয়ে গেছে। শ্যামলের খেয়াল ছিলো না। মাত্র সাতের মিনিটের জায়গায় তিন মিনিট বেশী, অর্থাৎ কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

শ্যামলের মন্ত্র আর হাড়কাঠি আজ হার মেনেছে। আমিও ছুটে গিয়েছিলাম মঞ্চের উপর অনেক ভিড় ঠেলে। মেয়েটির পাল্‌স্ পরীক্ষা করলুম, না কোনই আশা নেই—মারাই গেছে। একটা হৈ চৈ আরম্ভ হ'ল খেলার মাঠে। অঞ্জন আমার হাত ধরে মাঠ থেকে বেরিয়ে এলো।

কয়েকদিন পর সকাল বেলা দরজা খুলতেই চমকে উঠলাম। একটা লোক উপুড় হয়ে মরে পড়ে আছে আমার বারান্দাটির উপর।

পুলিশ এলো। মৃতদেহ সরাতেই চমকে উঠলাম—এ তো সেদিনকার সেই 'বান খেলা'র খেলোয়াড় শ্যামল। ছুটে ভেতরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। পরে অঞ্জনের মুখে শুনেছিলাম—ও নিজের বোনের এই অপঘাত মৃত্যু সহ্য করতে পারেনি—একটি মাত্রই বোন। ওর উপর অনেক ভরসা ছিলো ওর। কিন্তু পেটের দায়ে খেলা দেখাতো রত্নাকে নিয়ে শ্যামল। কিন্তু রত্না যে এ ভাবে মারা যাবে ও কল্পনাও করেনি। তাই নিজের 'বাণ মারা' মন্ত্রপূত বাণে নিজেকে বিদ্ধ করে ও আত্মহত্যা করেছে।

কিন্তু আমি আজও জানি না—শ্যামল আমার বারান্দায় এমনি ভাবে অপঘাতে মরলো কেন—এ তো আমি চাইনি!

বৃষ্টি-গান

শ্রীস্মৃতিবিকাশ ঘোষ

ঝম ঝম ঝম মিষ্টি মাদল
আকাশ ভেঙে নামল বাদল
পাতায় পাতায় তাই তো কাঁপন
বর্ষা-মেয়ের ছন্দ-নাচন।

টিনের চালে বৃষ্টি-ঘুঙুর
নাচছে কেমন টাপুর টুপুর
পলকী হাওয়ায় মেঘের পুতুল
ছুলকী চালে ছুলছে দোদুল।

মেঘের ফরাস পাতল আকাশ
গুমোট ভারী হচ্ছে বাতাস
ঈশান কোণে বসলো আসর
কড়াৎ! কড়াৎ! বাজছে কাঁসর!

পাখী-টিকটিকির কথা

শ্রীঅর্ণবজ্যোতি দেব

'পাখি-টিকটিকি' কথাটা শুনেই তো খুব অবাক হচ্ছ তাই না! ভাবছ ঘরের দেয়ালে যে সব টিকটিকিরা ঘুরে বেড়ায় তারা আবার পাখির মত উড়তে পারে নাকি! এদের গায়ে তো ডানা নেই যে উড়বে। তোমাদের ভাবনা মিছে নয়, ঠিকই। কিন্তু সত্যি এক ধরণের টিকটিকি রয়েছে যারা পাখির মত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বেড়ায়।

তোমরা হয়ত এইসব পাখি-টিকটিকিদের কেউ দেখনি। কারণ এই সব অদ্ভুত প্রাণীদের আমাদের দেশে দেখা যায় না। মালয় ও ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জে এদের দেখা যায়। এদের শরীরের দু'পাশে খানিকটা চামড়া আছে। কোথাও উড়ে যাবায় প্রয়োজন বোধে এরা দু'পাশের চামড়াকে বাড়িয়ে প্রজাপতির ডানার মত করে নেয়। এদের ডানায় মধ্যে খুব সরু সরু হাড় রয়েছে। এদের ডানার চারটি রঙ দেখা যায়—যেমন লাল, নীল, হলুদ ও কাল। এরা যখন এই ডানা মেলে কোথাও উড়ে যায়, তখন এই উড়ন্ত অবস্থায় এদের দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এরা অবশ্য পাখিদের মত দ্রুত উড়তে পারে না কিংবা পাখিদের মত উড়ে উড়ে অনেক দূর যেতেও পারে না। এরা এক গাছ থেকে নিকটবর্তী অন্য গাছে সহজেই উড়ে গিয়ে বসতে পারে। গাছেই এদের বসবাস।

—সাধারণ টিকটিকিদের মত এদের কিন্তু ঘরের দেয়ালে কখনও দেখা যায় না।

এদের গলায় থলি আছে। কোন কারণে যদি এরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই এদের গলার থলি ফুলে যায়। পুরুষ পাখি-টিকটিকিদের গলায় যে থলি রয়েছে তার রঙ কমলালেবুর রঙের মত। স্ত্রী পাখি-টিকটিকির গলার থলির রঙ নীল।

এরা লম্বায় আট ইঞ্চি। চওড়ায় সাধারণ টিকটিকিদের চেয়ে একটু বেশী। এরা কিন্তু সাধারণ টিকটিকিদের মত গায়ের খোলস ছাড়ে না। সাধারণ টিকটিকিদের লেজ একটু ধরলেই যেমন খ'সে পড়ে, এদের লেজ কিন্তু সেভাবে কখনও খসে পড়ে না।

এরা ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়। ছোট ছোট পোকামাকড় হচ্ছে এদের প্রধান খাদ্য।

ছড়া

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঁশতলীতে বংশী বোসের বাস
হাঁসখালিতে চরে শুধুই হাঁস।

নাকতলীর ঐ নাকুর বড় নাক
কদমতলীর ঢ্যাম কড়াকড় ঢাক।
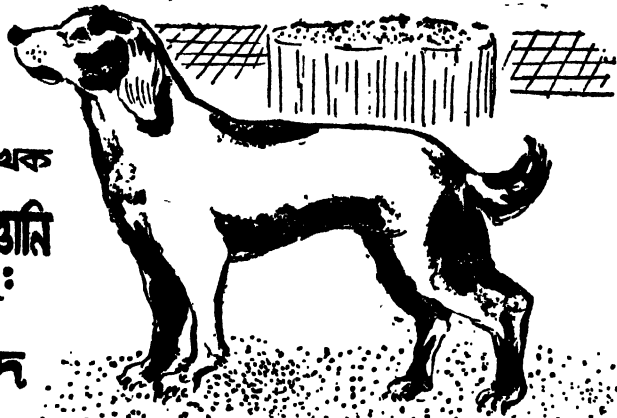
॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

আবার ওর যাত্রা হ'ল শুরু

পরদিন সকালে ট্রেনে আসতে আসতে ভীত, চিন্তিত মনে আমি রেলের লোকদের (যারা ডিউটিতে ছিল) মুখের দিকে চেয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। ভাবছিলাম, ওদের কাছেই কুকুরটার মৃত্যু-খবর পাবো, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। অতএব বুঝে নিলাম ল্যাম্পো এখনও মরেনি। মনে আশা হ'ল আবার। ভাবলাম, ভেট ডাক্তার ভুল করেছে এমনও তো হতে পারে।

ক্যাম্পিগলিয়া ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই আমি লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে আমার আপিসে ছুটলাম। ভয়ে ভয়ে দরজা ঠেলে একটু ফাঁক করে দেখি, শ্রীমান ল্যাম্পো আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। লেজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে হেঁটে এল। বেশ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম আজ ও অনেক ভাল আছে। ওকে অভিনন্দন জানিয়ে ছুটে গিয়ে 'বার' থেকে ওর জন্য একবাটি গরম দুধ এনে দিলাম। ল্যাম্পো তৎক্ষণাৎ লোভীর মত সমস্ত দুধটা খেয়ে ফেলল। ব্যস, এবার আমি নিশ্চন্ত। ও ঠিক বেঁচে যাবে। আমাদের কাছে ফিরে আসবার শক্তি যখন ও পেয়েছে, তখন মৃত্যুকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেবার শক্তিও সে পাবে। এরপর এক্সপ্রেস গাড়ী যখন ষ্টেশনে ঢুকল, তখন তো ল্যাম্পো আমাদের চাক্ষুষ প্রমাণ দিল যে, আমাদের ছেড়ে ও যাবে না। ট্রেনের আওয়াজ শুনে প্রথমে কান দুটো একটু খাড়া করল, তারপর ডাইনিং কারের

দিকে এগিয়ে গেল। আমরা সবাই আপিস ছেড়ে ওর পিছন পিছন এসে দেখি, উনি একটি বড় মাংসের টুকরো (যেটা ডাইনিং কারের রাঁধুনি ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে) সামলাতে ব্যস্ত। আমাদের যত আনন্দ, তত বিস্ময়। ল্যাম্পো বেঁচে গেল। না, সেদিন পিওম্বিনো থেকে আসাটা ওর শেষ পাড়ি ছিল না। আরও অনেক ট্রেনের পাড়ি ওকে দিতে হবে। ও আবারও চলবে মাইলের পর মাইল। আমাদের এই পৃথিবীতে কত মানুষ, আরও কত কী-ই ওর এখনও দেখবার আছে।

ল্যাম্পো সত্যিই সেরে উঠল, আর আগেকার সুদর্শন কান্তি ফিরে পেল। আবার ওর সেই পুরোনো অভ্যাস ট্রেনে চড়ে টো টো কোম্পানী শুরু করে দিল। মনে হ'ল, এবারে ট্রেনে বেড়িয়ে ও যেন আরও খুশী হচ্ছে—বিশেষ করে ট্রেন বদলে ওর ভারী ফূর্তি। কিন্তু তাই বলে কর্তব্য কাজে ও ঢিল দিল না; আগের মত মির্ণার সঙ্গে স্কুলে যাবার জন্য, নির্দিষ্ট সময়ে সকাল বেলা আমার বাড়ীতে উপস্থিত হতে লাগল। মির্ণা অবশ্য এখন আর কিন্ডার গারটেনে যায় না—এলিমেণ্টারী স্কুলে পড়ে।

সন্ধ্যে বেলা ল্যাম্পোই সবচেয়ে আগে ট্রেনে উঠে বসে আমার সঙ্গে পিওম্বিনো আসবে বলে। অবশ্য মাঝে মাঝে যখন দূরের পথে পাড়ি দেয়, তখন ওর ক্যাম্পিগলিয়াতে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। সেদিন আমার সঙ্গে আর আসতে পারে না। কাজেই, এটা বেশ বোঝা গেল যে, ওর সেই বিশ্রী অভিযানের কোন ছাপই আর ওর ওপরে নেই এখন—কেবল একটা তিক্ত স্মৃতি ছাড়া তা ক'দিনে সেটাও ভুলে গেল। আমি কিন্তু তখনও ভাবি ও কোথায় পৌঁচেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কী ভাবে ফিরে এল! যদিও বুঝি সে কথা জানবার উপায় নেই।

কতকগুলি চিন্তাকে এক সঙ্গে গেঁথে তুলে আমি এর একটা উত্তর ঠিক করলাম। যে গার্ডটির জিম্মায় ওকে দেওয়া হয়েছিল, সবচেয়ে প্রথমে তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সে ওকে সুদূর নেপলস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ল্যাম্পোকে সে তার নিজেরই এক সহকর্মী, যে তখন একটা মালগাড়ী 'বারী'তে নিয়ে যাচ্ছিল, তার হাতে সমর্পণ করে। এই ট্রেনটা পথে কোথাও থামবার কথা নয়। শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ গার্ডটিকে জানিয়েছিল যে, সে ল্যাম্পোকে বারলেতা ষ্টেশনে নিজ হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সে ভাবেনি যে ল্যাম্পো অতদূর থেকে ফেরবার রাস্তার পাত্তা পাবে। ক্যাম্পিগলিয়া থেকে বারলেতা ষ্টেশনের দূরত্ব ঠিক ৬৮৬ কিঃ মিঃ (মোটামুটি ৪২৬ মাইল)। চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ল ঠিক বটে, ঠিক! দক্ষিণ থেকে আগত একটি ট্রেনের ড্রাইভার আমাকে বলেছিল, [illegible]

চালিয়ে আসছিল, তখন যেন জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছিলো, যাত্রীদের বিশ্রামাগারের সামনে ল্যাম্পো পায়চারী করছে।

গাড়ীটা ষ্টেশনে থামতেই এঞ্জিন ড্রাইবার ছুটে গেল ল্যাম্পোর সন্ধানে। কিন্তু কুকুরটা ততক্ষণে উধাও। লোকটার আর খোঁজাখুজি করবার সময় ছিল না। তবে কুকুরটা যে ল্যাম্পোই সে বিষয়ে ও সুনিশ্চিত ছিল।

এই সব খবর থেকে আমি বুঝলাম যে, কুকুরটা রেগিও-ক্যালিব্রিয়া পর্যন্ত পৌছিল। তার মানে ১৫০ কিঃ মিঃ বা ৯৩ মাইল। অর্থাৎ আগের ৬৮৬ কিঃ মিটারের সঙ্গে জুড়ে বোঝা যায় ও ১২০০ কিলোমিটার চলেছিল। তাহলে ল্যাম্পো তিরহেনিয়ান উপকুল থেকে আড্রিয়াটিক্ উপকূল পর্যন্ত এসেছিল—তবে পৌচেছে ক্যালিব্রিয়ার কূলে। ও যে কত মাইল চলেছে, কতগুলো ট্রেন বদলেছে আমাদের কাছে পৌছবার জন্য—সে কথা কোনদিনই আমরা জানতে পারব না। ওর গলার তারের কলার ও ছেঁড়া দড়ি দেখে এটুকু বুঝেছি যে, দীর্ঘ তীর্থযাত্রার পথে কখনও কোন চাষীর হাতে ধরা পড়ে হয়ত ও কিছুদিন আটকে ছিল, তারপর দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে পালিয়ে এসেছে। বেচারা বোধ হয় খুবই খাওয়ার কষ্ট পেয়েছে। তাইতেই অমন মারাত্মক infection হয়ে গিয়েছিল। এই সব টুকরো-টুকরো চিন্তার সাহায্যে আমি ল্যাম্পোর ফিরে আসবার উপায়ের একটা আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু ওর দীর্ঘ দুর্গম যাত্রার আসল রহস্য কোনদিনই জানতে পারব না। যাই হোক্ এসব তো অতীতের ব্যাপার। ল্যাম্পো এখন সমুখপানে চেয়ে চলবে ভবিষ্যতের দিকে। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের কুকুরটির কদর ও খ্যাতি আরও বাড়ল। যারা ওকে জানত, ওর প্রতি তাদের ভালবাসা আরও বেড়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

ভাই বোনে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

কটোখানি ঝেড়েঝুড়ে নামালো খোকন
সন্ধ্যায় বন্ধুরা আসবে যখন—
ধূপ দীপ জেলে আর মালা পরিয়ে
গাওয়াবে অনেক গান ছোড়দিকে দিয়ে।
বিকেলেতে খেলে এসে হাতে নিয়ে মালা
টুটু দেখে বাইরের ঘরটায় তালা।
ছোড়দিরা সব চলে গেছে সিনেমায়।
বন্ধুরা এসে এসে ফিরে চলে যায়।

ছোড়দিরে বলে টুটু, "উৎসব ফেলে
সিনেমায় গেলি তোরা কোন্ আক্কেলে?"
ছোড়দিও রেগে বলে ছোট ভাইটাকে
সিনেমাকি তাই বলে বন্ধ রাখে?
বাইশে শ্রাবণ জানি রবির প্রয়াণ
পার্কেতে হয় সভা, হয় তাঁর গান।
ঘরে ঘরে উৎসব সে তো রোজই করি
গান গাই আর তাঁর বইগুলি পড়ি।

রাবণের পরাক্রম

শ্রীশতক্রশোভন চক্রবর্তী

ধনদৌলতের যেন শেষ নেই। রাশি রাশি, ভারা ভারা। ঐশ্বর্যের স্তূপের উপর বিষণ্ন অন্তঃকরণে বসে রাক্ষসরাজ রাবণ কেবলি দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে থাকলেন। তাঁর আরও চাই, আরও চাই,—ঐশ্বর্য নয়, বল প্রতাপ।

রাবণ কৈলাস পর্বতে এলেন তপস্যা করতে। শিবের আরাধনায় মিলবে অমিত বল, অমেয় প্রতাপ। কৈলাসে রাবণ। কৈলাসে তপস্বী রাক্ষস।

দিন গেল। বুকে কত আশা। ফল দেবেন। বলে ভরবে বাহু। কিন্তু শিব হয়ত পাষাণ হয়েছেন।

রাবণ এলেন হিমালয়ের দক্ষিণে বৃক্ষখণ্ডকে। গর্ত খনিত হ'ল, অগ্নি প্রজ্বলিত হ'ল, শিবলিঙ্গ স্থাপিত হ'ল। শুরু হ'ল রাবণের হোম। শিব হয়ত পাষাণ হয়েছেন।

কিন্তু রাবণের ধারণা অন্য: শিব আশুতোষ। রাবণ শিবকে বিগলিত করবেনই। প্রাণ তাঁর পণ। শির ছিন্ন করে শিবকে রাবণ অঞ্জলি দিলেন। একে একে নয়টি শির ছিন্ন হ'ল। একে একে নয়টি রক্তপদ্ম হোমের আগুনে উৎসর্গিত হ'ল।

শিব পাষাণ হয়েছিলেন। এবার পাষাণের বুকে জাগল করুণার প্রস্রবণ।

শিব দেখা দিয়ে বললেন: কি তোমার কাম্য?

রাবণ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন প্রসন্ন দেবাদিদেবের কমনীয় মুখের দিকে। কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন: বল চাই, প্রতাপ চাই। বলে প্রতাপে ভুবনে আমি হব অতুল। আমাকে এই বর দিন। আর এই ছিন্ন মস্তকগুলি বিন্যস্ত করে দিন যথাস্থানে।

ভক্তের প্রতি শিবের অপার বাৎসল্য। বললেন: তাই হোক। যাও।

রাবণ আনন্দে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে চাইলেন। এবার মুঠোয় পুরে তিনি একবার বিশ্বভুবনকে দেখে নেবেন।

দেবতা ও ঋষিদের প্রাণবায়ু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার নির্ঘাৎ তাঁদের পরাজয়, লাঞ্ছনা এবং পরিশেষে মৃত্যু।

দেবতারা সতর্ক রইলেন। বুকে সদা সংশয়, ভয়। একদা দেবর্ষি নারদকে পেয়ে দেবতারা ধরে পড়লেন: আমাদের জন্য আপনি কিনা পারেন! তা'হলে বলুন আমরা কি করব? রাবণের অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা কি একেবারে ভেসে যাব? একগুচ্ছ তৃণও কি আশ্রয় করতে পারব না? বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

নারদ বললেন: আপাতত স্থির হও। উপায় আছে। আমি করছি।

নারদ প্রস্থান করলেন। রাবণ কৃতার্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। নারদ রাবণের পথে চললেন। বীণা বাজিয়ে বাজিয়ে আনমনে নারদ চলছিলেন। লক্ষ্য : কখন আসেন রাবণ। এ পথে যে তাঁকে যেতে হবেই।

বলতে না বলতেই, চিন্তা করতে না করতেই নারদ রাবণকে দেখতে পেলেন। কৃতার্থ রাবণ। হৃষ্ট রাবণ। মনে মনে তাঁরও সুরের লহরী।

নারদ বললেন : এভাবে সহসা তোমাকে দেখব ভাবিনি। কী যে আহ্লাদ হচ্ছে কী বলব! কোথায় গিয়েছিলে? খুশিতে তো চোখমুখ টসটস করছে। কী এমন মহার্ঘ রতন পেলে? একেবারে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছ! কোথায় যাবে?

রাবণ বললেন : শিবকে পেয়েছি। বর দিয়েছেন। অতুল বল পেয়েছি। এখন গৃহে ফিরছি।

নারদ বললেন : কি করে তুষ্ট করলে শিবকে? আমি তোমার আত্মীয়, তাই জিজ্ঞেস করছি।

রাবণ বললেন : উঃ সে আর বলব না। তুষ্ট কি হন, কিছুতেই না। কৈলাসে তপ করলাম। কিছু হ'ল না। বৃক্ষখণ্ডকে গেলাম। গ্রীষ্মকালে আগুন, বর্ষায় স্থণ্ডিলে (যজ্ঞের জন্য চত্বর বা বেদী), শীতে জলে থেকে তপ করলাম। কিছু হ'ল না। খুব রাগ হ'ল। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বেলে মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে সেই আগুনে প্রতিষ্ঠিত করলাম। গন্ধচন্দন, ধূপনৈবেদ্য, আরাত্রিক দিয়ে স্তব, প্রণাম, নৃত্যগীত, বাদ্য,গালবাদ্য কত উপচারে পূজা করলাম। কিছু হ'ল না। নিজের উপর ঘেন্না হ'ল। হোম শুরু করলাম। কিন্তু কিছু হ'ল না। শিব এলেন না। মনে হ'ল ব্যর্থ এ জীবন, ব্যর্থ ধনমান। চন্দনে মাথাগুলি শুদ্ধ করে, একে একে ছিন্ন করে, আহুতি দিলাম সেই অগ্নিতে। নয়টি মাথা কাটা হয়ে গেল। শেষটি কাটতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় উনি এলেন, কৃপা করলেন, বল দিলেন অতুল, প্রসন্ন দৃষ্টির আলোয় মাথাগুলিও দিলেন একে একে জুড়ে। এখনও উনি ওখানেই আছেন, থাকবেনও। উনি বৈদ্যনাথেশ্বর। ওঁকে শেষ প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েছি। এখন আমি ত্রিভুবন জয় করব।

নারদ হেসে বললেন : শিব তোমায় বল দিয়েছেন, তোমার ভাল করবেন—তুমি এসব বিশ্বাস করেছ নাকি?

: না করার কি আছে! তিনি দিয়েছেন, বলেছেন।

: শিব পাগল। পাগলে কিনা বলে। তুমি আমার পরম আত্মীয়, পরম প্রিয়। তাই আমার কথা বিশ্বাস কর। ভাল হবে।

: কি করতে বলছ ?

: যাও, একবার কৈলাস পর্বত উত্তোলন করে তাকে আবার যথাস্থানে রেখে এখানে এস। কত যে বল পেয়েছ তা নিজেই বুঝতে পারবে।

নারদের কথায় রাবণ খুব খুশি হলেন। ছুটিতে ছুটিতে রাবণ এলেন কৈলাসে। এত বড় পর্বত তিনি উঁচু করে দু'হাতে তুলে ধরলেন।

কৈলাস পর্বত ভয়ংকর ভাবে টলে উঠল। গাছগাছালি, ঘরবাড়ি বিপর্যস্ত হ'ল। শিব লাফিয়ে উঠে বললেন: এ কি হ'ল? এ কি হ'ল?

পার্বতী সুমধুর হাস্য করে বললেন: আপনারই এক ভক্ত শিষ্যের কীর্তি। ভাল শিষ্য করেছেন, ভাল ফলও হাতে হাতে লাভ করছেন।

শিব ক্রোধে অভিশম্পাত দিলেন: তোর বলগর্ব খর্ব করবার জন্য শীঘ্রই এক পুরুষ জন্ম নেবেন।

রাবণ কৈলাস যথাস্থানে স্থাপন করে খুশিতে ফেটে পড়ে ছুটে চললেন। এবার দিগ্বিজয়! এবার দিগ্বিজয়! ত্রৈলোক্য আসবে মুঠোয়। রাবণ প্রচণ্ড গতিতে নেচে নেচে যেন ছুটতে লাগলেন।

নারদ এসে সহাস্য বদনে দেবতাদের বললেন: বর দিয়েছিলেন, শাপও এই দিলেন।*

* এই কাহিনী শিবপুরাণ থেকে সংগৃহীত। জ্ঞানসংহিতা।

অবনদাদুর জন্মদিনে

শ্রীমতী করবী সেনগুপ্ত

অবনঠাকুর বিশ্বমায়ের মধুর শোভন ছবি—
দু'চোখ ভরে দেখেছিলে তাই হয়েছ কবি।
তাই হয়েছ শিল্পী তুমি মুগ্ধ মনে-প্রাণে—
প্রকৃতিরই অরূপ শোভা আঁকলে তুলির টানে।
শিশুর প্রতি গভীর প্রীতি হৃদয় মাঝে ল'য়ে—
লিখলে কত গল্প গাঁথা শিশু-লেখক হয়ে।
সহজ কথা সরল ভাষায় তোমার সে সব লেখা
হৃদয় করে মুগ্ধ মোদের তোমার তুলির রেখা—
চিত্ত মোদের বিভোর করে রাখতে পারে আরও।
প্রতিভাবান্ অবনদাদু কিছুতে না হারো।
শিল্পী কবি লেখক তুমি সবার প্রিয়জন,
আজকে তোমার জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানায় মন।

একটি বিস্ময়কর শিল্পী-জীবন

শ্রীমতী বন্দনা গুপ্ত

মানুষের জীবনে অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই—যা' কল্পনা করা যায় না, তাও সত্যি বলে দেখা দেয় কখনো কখনো কারো জীবনে। এমনি একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে। এই ঘটনার নায়িকা "গ্রাণ্ড্‌মা মোজেস্"। কিন্তু তিনি আজ আর নেই ইহ-লোকে। ১৯৬১ সালে একশ এক বছর বয়সে এই আশ্চর্য মহিলা লোকের মনে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে ইহলোক ছেড়ে চলে যান। "গ্রাণ্ড্‌মা মোজেস্" এই নামেই তিনি সারা আমেরিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশে পরিচিত ছিলেন।

আটাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত মোজেস্ ছিলেন অতি সাধারণ একজন গৃহিণী, যাঁর সকাল থেকে সন্ধ্যে কাটত অক্লান্ত গৃহকর্মে—তিনিই একদিন জীবনের সায়াহ্নে শুরু করলেন ছবি আঁকা। আটাত্তর বছর বয়সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে তিনি হয়েছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী। তাঁর শততম জন্মদিনে আমেরিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর বহুদেশ থেকে অভিনন্দন পেয়েছিলেন তিনি অজস্র। তার মধ্যে তৎকালীন জীবিত আমেরিকার চারজন প্রেসিডেণ্টের অভিনন্দন-বাণীও ছিল।

এই মহিলার প্রকৃত নাম ছিল অ্যানা মেরী রবার্টসন। তিনি ১৮৬০ সালে জন্মেছিলেন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে। দশটি ভাইবোনের অন্যতম মেরীকে মাত্র বার বছর বয়সেই ফার্মে চাকরী নিতে হয়। মাত্র যখন তাঁর পনর বছর বয়স, তখন তিনি কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করতেন। রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, জামা-কাপড় ইস্ত্রী করা, বাসন মাজা, মাখন তোলা ইত্যাদি সব কাজই করতে হ'ত তাঁকে। এমনিভাবে সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে তিনি বিয়ে করলেন এবং পেলেন তাঁর নিজের ঘর-সংসার। তখন থেকে তিনি শুধু নিজের সংসারের সব কাজই করতেন না, সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য নানারকম বাড়তি পরিশ্রমও করতেন। সপ্তাহে একশ ষাট পাউণ্ড পর্যন্ত মাখন তুলতেন একা হাতে। তাঁর স্বামীর দুধের কারবারে দিনে একশটি দুধের বোতল ধোয়া, দুধ ভর্তি করা ও বোতলের মুখ সীল করা সবই তিনি করতেন একা হাতে। দশটি সন্তানের জননী গ্রাণ্ড্‌মা মোজেস্ এমনি অসাধারণ কর্মজীবন কাটিয়ে, আটাত্তর বছর বয়সে শুরু করলেন তাঁর শিল্পী-জীবন। তাঁর শিল্পী হওয়াটাও একটা অদ্ভুত ধরণের ঘটনাচক্র বলা যেতে পারে। এই সময় তাঁর স্বামী মারা গেলে তিনি ক্যানভাসের উপর উল দিয়ে নক্সা, ফুল লতা-পাতা তুলতেন, আর বিক্রি করতেন। কিন্তু হাতে বাত আক্রমণ করায় তিনি বন্ধুদের পরামর্শে সেলাইয়ের কাজ ছেড়ে ক্যানভাসের উপর রং দিয়ে ছবি আঁকতে লাগলেন

এবং নিজের তৈরী জ্যাম, জেলী ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন সেগুলো। হঠাৎ একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের চোখ পড়ল সেই ছবিগুলোর উপর—তিনি সেগুলো কিনেও নিলেন সঙ্গে সঙ্গে এবং মেরীকে আবার অনেকগুলো সেই রকম ছবির অর্ডার দিয়ে গেলেন। সেই ছবিগুলো অটো কালির নামে একজন শিল্প-রসিকের নজরে পড়ল এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে মেরী তাঁর সাহায্যে শিল্প-জগতে স্বীকৃতি পেলেন। ক্রমে দেশ-দেশান্তরে ছড়াতে লাগলো তাঁর নাম। অথচ তিনি কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে, কোন শিক্ষকের কাছে বা অন্য কোনখানেই ছবি আঁকার শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। নিজে-নিজেই শিখেছিলেন ছবি আঁকা এবং প্রথম প্রথম পুরানো চটের উপর বাড়ীর দেওয়াল রং করার রং দিয়ে তিনি ছবি আঁকতেন। এ তাঁর এক আশ্চর্যজনক শিল্প-প্রতিভা।

পরবর্তী জীবনে লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করেছেন তিনি ছবি এঁকে। কিন্তু না ছিল তাঁর ছবি আঁকার ষ্টুডিও, না ছিল তাঁর সেরকম সাজসরঞ্জাম বা আড়ম্বর। নিজের শোবার ঘর বা বারান্দাই ছিল তাঁর ষ্টুডিও, পুরানো কফির কৌটাতে রাখতেন তাঁর রঙ্। তাঁর নিজের সহজ সরল জীবনযাত্রার মত তাঁর শিল্পও ছিল সহজ, সরল ও প্রাণাবেগে উচ্ছল। প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর হাতে অপূর্ব রূপ নিত। রঙের ম্যাচিং ছিল অদ্ভুত। জার্মানীতে একবার তাঁর ছবি দেখে এক মুগ্ধ দর্শক বলেছিল, "তাঁর ছবিতে পাহাড়ের উপর দিয়ে বয়ে আসা তাজা বাতাসের স্পর্শ যেন অনুভব করা যায়।"

জীবনের শেষ কুড়ি বছরে তিনি পনর হাজারেরও বেশী ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য আমেরিকা তাঁর নামে একবার ডাকটিকেট বের করেছিল, তার ছবিও ছিল তাঁরই আঁকা।

গ্রাণ্ডমা মোজেসের আঁকা "লুসিক্ ভ্যালি ফ্রম্ মাই উইণ্ডো", "মেরী এণ্ড দি লিটল্ ল্যাম্প," "অ্যাপল অরচার্ড" প্রভৃতি ছবিগুলি সমস্ত পৃথিবীর শিল্প-রসিকদের অভিনন্দন লাভ করেছে। ওয়াশিংটনের হোয়াইট্ হাউস্-এ এবং প্যারীর ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে তাঁর ছবি রাখা হয়েছে। খাঁটি বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে বিচার করলে হয়ত অনেক অসঙ্গতি ও খুঁত ধরা পড়বে তাঁর ছবিতে, কিন্তু সব মিলিয়ে তা অনবদ্য এবং তার আবেদন সার্বজনীন। যে বয়সে মানুষ কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করে, সেই বয়সে শিল্পচর্চা আরম্ভ করে তিনি যে কি করে এই রকম অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি করতে পেরেছেন তা রসিকগণের কাছে চিরকাল একটা বিস্ময় হয়ে থাকবে।

চলন্ত ছবির বই

এবার আর নিশ্চল ছবির বই নয়, একেবারে চলন্ত ছবিওলা বই। একাধারে ছবির বই, ধাঁধা ও খেলনা। এ বইয়ের নাম 'পপ্ আপ' বই। বইয়ের ছবিগুলি চলন্ত ও ত্রিমাত্রিক। 'পপ্ আপ' ধাঁধার বইগুলিও মজাদার ছবি ও ছড়ায় ছোটদের নানা মজার কাজের সমাধান করতে বলা হয়। মলাটের মধ্যে সমাধানগুলি লুকানো থাকে। ছবির কয়েকটা অংশ অদলবদল করলেই গুপ্ত স্থান থেকে সমাধান বেরিয়ে আসে। এসব বই থেকে তোমাদের যেমন বুদ্ধি খুলবে, তেমনি তোমরা নানা রকম সমস্যার সমাধান শিখে খুশি হবে।

ছাতার তলায় গোটা গ্রাম

পশ্চিম জার্মানীর একটি গ্রাম। গ্রামের নাম রোরমুস। গ্রামটি যেমন ছোট, তেমনি ভিজে। এই গ্রামেই সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। গ্রামের লোকসংখ্যা আঠারো। বৃষ্টির হাত থেকে এই আঠারো জনের মাথা এক সঙ্গে বাঁচাবার জন্য একটি জার্মান ছত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের একটি ছাতা দান করেছে। একাধারে জনকল্যাণ ও বিজ্ঞাপন!

নিরাপদ, বাস্তব ও রোমান্টিক

আজকাল সবদিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। সেই নজর দেবার ফলেই শিশুদের জন্যে যে খাট তৈরি হয়েছে, ডাক্তারদের মতে সেই খাট শিশুদের পক্ষে আদর্শ। আরাম, নিরাপত্তা ও রোমান্টিসিজমের সমন্বয়। এতে শোওয়া অবস্থায় বাচ্চার কোথাও লাগবে না, মাথার দিকে ঢাকনা থাকায় ধুলোবালি, পোকামাকড় কিংবা কড়া আলো থেকে শিশু রক্ষা পাবে ও হামাগুড়ি দিয়ে খাট থেকে বেরুতে পারবে না। এই ঢাকনা জিপারের সাহায্যে খোলা যায় ও বন্ধ করা যায়। খাটটিকে খেলার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, আবার মুড়েঝুড়ে থলেয় পুরে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া চলে।

সারা দুনিয়া থেকে ছোটদের বই

এই শহরে ২০ তম আন্তর্জাতিক শিশু ও যুব পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। রাশিয়া সমেত ৩০ টি দেশ থেকে মোট ২৫০০ বই এসেছিল। পাঠক, লেখক ও প্রকাশক সকলেই খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন। যুবকদের জন্যে যে বইগুলি সেরা বিবেচিত হয়েছে, সেগুলি সবই চেক ও ফরাসী বইয়ের অনুবাদ। মিউনিখের আন্তর্জাতিক ইউথ বুক লাইব্রেরীতে দুনিয়ার মধ্যে যুবকদের জন্যে সেরা বইয়ের সংগ্রহ আছে।

একটি পরিশ্রমী ঘোড়ার স্মৃতিস্তম্ভ

যন্ত্রের যুগে মানুষের একান্ত বাহন ঘোড়া আজ পরিত্যক্ত। কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়, তাই ডেনমার্কের মানুষরা অশ্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তাদের একটি শহরে ব্রঞ্জের একটি পূর্ণাবয়ব অশ্বের প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে। এই মূর্তিটি ঢালাই হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর নোয়াক নামে একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে।

মেঠুড়ে
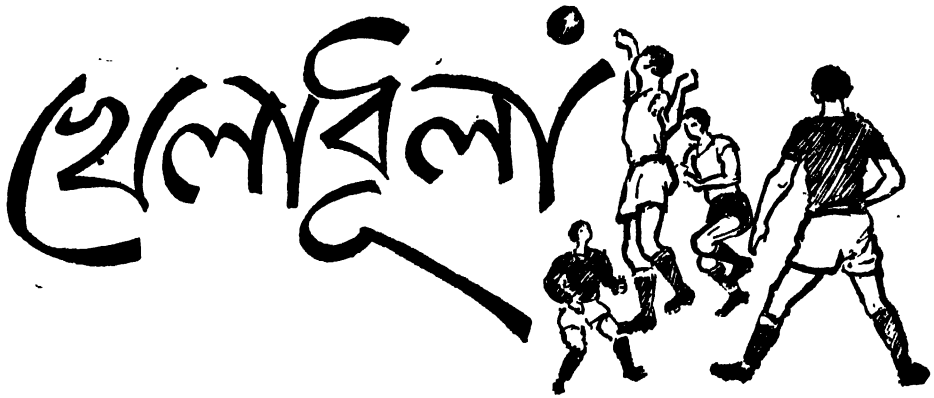
বিশ্ব টেনিস

লণ্ডনে বিশ্বটেনিস অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা হাত ভরে উইম্বলডনের পুরস্কার দেশে নিয়ে গেছেন। প্রধান পাঁচটা পুরস্কারের ভেতর তিনটেই অষ্ট্রেলিয়ার দখলে। পুরুষদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জন নিউকোমব, মেয়েদের মধ্যে মিসেস মার্গারেট কোর্ট, পুরুষদের ডবলসে নিউকোমব ও টনি রোশ।

গত পনর বছরের ভেতর অষ্ট্রেলিয়ার পুরুষ খেলোয়াড়রা বারো বার উইম্বলডন জয় এবং বারো বার রানার্সের সম্মান পেলেও শুধু ১৯৬৫ সালেই একবার একসঙ্গে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ পায়। ১৯৬৫-তে রয় এমার্সন এবং মার্গারেট কোর্ট পুরুষ ও মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছিলেন। এবার পেয়েছেন নিউকোমব এবং মার্গারেট কোর্ট। মার্গারেটের এবার নিয়ে মোট তিনবার উইম্বলডন জয়। তাছাড়া ১৯৬৪-র রানার্সও। গতবারের রানার্স জন নিউকোমব এবার নিয়ে চার বছরের ভেতর দু'বার উইম্বলডন জয় করলেন। ১৯৬৭-তে প্রথম বিজয়ী হয়েছিলেন ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর খ্যাতনামা খেলোয়াড় উইলহেলম বুনগার্টকে হারিয়ে।

মার্গারেটের সামনে এখন 'গ্রাণ্ড স্লাম' লাভের স্বর্ণ সুযোগ। পৃথিবীর চারটে বড় প্রতিযোগিতা (ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, উইম্বলডন ও ফরেস্ট হিলস) একই বছরে জয় করে এক মাত্র আমেরিকার মোরিন কনোলী ছাড়া আর কোনো মহিলা খেলোয়াড় 'গ্রাণ্ড স্লাম' পাননি। মার্গারেট এ বছর এর আগে ফ্রান্সের ও অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছেন। উইম্বলডনেরও পেলেন। বাকী আমেরিকার চ্যাম্পিয়ানশিপ।

১৮৭৭ সাল থেকে উইম্বলডনের সূচনা। উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য, একটা নতুন রেকর্ড এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফলে এবারের উইম্বলডন স্মরণীয়। যদিও এর আগে পশ্চিম জার্মানীর বুনগার্ট ও অষ্ট্রেলিয়ার আওয়েন ডেভিডসন উইম্বলডনের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড়কে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন, তবু এবার লেভারের হার বিস্ময়ের। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ফলাফল এবার আরও ঘটেছে। প্রথম রাউণ্ডে মেত্রেভেলির কাছে তেরো নম্বর বাছাই চেকোশ্লোভাকিয়ার জান কোডসের পরাজয়, তৃতীয় রাউণ্ডে বারো নম্বর বাছাই ক্লিফ ড্রিসডেলের পরাজয় আমেরিকার উঠতি খেলোয়াড় টম গোরম্যানের কাছে, চৌদ্দ নম্বর বাছাই স্পেনের জিমিনোর কাছে হার স্বীকার করে তিন নম্বর বাছাই আমেরিকার আর্থার অ্যাশ-এর বিদায় ইত্যাদি। তবে বিস্ময় সৃষ্টির দিক দিয়ে রজার টেলরের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী। তারপর আন্দ্রে জিমিনোর। টেলর চতুর্থ রাউণ্ডে শুধু লেভারকেই হারায় নি, কোয়ার্টার ফাইনালে ন-নম্বর বাছাই আমেরিকার ক্লার্ক গ্রেবনারকেও পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে কেন রোজওয়ালের কাছে হেরে যান। স্পেনের জিমিনোর কাছে তিন নম্বর বাছাই এবং এবারের অষ্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান আর্থার অ্যাশ এর ষ্ট্রেট সেটে পরাজয় রীতিমত অভাবনীয়।

ফাইনালে পঁচিশ বছর বয়েসী নিউকোমব-এর কাছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসী রোজ-ওয়ালের পরাজয়কে শৌর্য ও শক্তিদীপ্ত খেলার কাছে পেলব স্পর্শ মেশানো শিল্পে সৌন্দর্যময় খেলার পরাজয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহিলাদের ফাইনালে মার্গারেট কোর্ট ও বিলি জিন কিংয়ের খেলা উইম্বলডনের এক নতুন রেকর্ড। যদিও ষ্ট্রেট সেটে মার্গারেট পর পর তিন বছরের উইম্বলডন বিজয়িনী বিলি জিনকে পরাজিত করেছেন, তবু খেলা হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, যে খেলার ছেচল্লিশটা গেমের মধ্যে ছিল কখনো উত্থান কখনো পতন এবং দু'ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের প্রবল উত্তেজনা। উইম্বলডনের ইতিহাসে মহিলাদের কোনো ফাইনালে ছেচল্লিশটা গেম খেলা হয়নি।

উইম্বলডনে এবার ভারতের জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লাল মোটেই সুবিধে করতে পারেন নি। দ্বিতীয় রাউণ্ডেই জয়দীপ হেরে যান ব্রিটেনের রজার টেলরের কাছে। প্রেমজিত তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হন আমেরিকার ক্লার্ক গ্রেবনারের কাছে ষ্ট্রেট সেটে।

ডাবলসের প্রথম রাউণ্ডেও জয়দীপ-প্রেমজিতকে ব্রিটেনের মার্ক কক্স ও গ্রাহামকে সিটওয়েলের কাছে ষ্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়।

ক্রিকেট

লর্ডসের প্রথম টেষ্টে এক ইনিংস ও ৮০ রানে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকারের পর, দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশকে পরাজিত করেছে।

ট্রেণ্ট ব্রিজের দ্বিতীয় টেস্টকে ক্রিকেটের এক চিত্তাকর্ষক লড়াই বলা যায়। খেলা হয়েছে সমান তালে। প্রথম দিন অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের ২৭৬ রানে ইনিংস শেষ। ইংলণ্ডের ডলিভেরা ও টনি গ্রেগের বলের দাপটের মধ্যেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্লাইভ লয়েড সেঞ্চুরি করেন এবং রিচার্ডস ও প্রোকটার ভালো রান তোলেন। দ্বিতীয় দিন ২৭৯ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। আবার এডিবার্লোর ব্যাটিংয়ের জন্যে দ্বিতীয় ইনিংসে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ ২৮৬ রান ওঠান। ডলিভেরা ও গ্রেগের দ্বিতীয় দফায় প্রশংসনীয় বোলিং সত্ত্বেও বার্লো একাই ১৪২ রান করেন।

চতুর্থ দিনের শেষে ইংলণ্ড ২ উইকেটে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে। কাউড্রে প্রথম ইনিংসে সুবিধে করতে না পারলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে স্বমহিমায় ব্যাট করতে থাকেন এবং ৬৪ রান করে হ্যামণ্ডের টেস্ট রানের রেকর্ড অতিক্রম করেন। কাউড্রে এবং লাকহার্স্টের ব্যাটিং নৈপুণ্যই ইংলণ্ডকে জয়ী হতে সাহায্য করে। পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলায় আর কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। লাকহার্স্ট ১০৩ রান করে নট আউট থাকেন। লাঞ্চের আগেই খেলা শেষ হয়ে যায়।

কমনওয়েলথ গেমস

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত একচল্লিশটা দেশের প্রায় দু'হাজার প্রতিযোগী দশদিন ব্যাপী ক্রীড়ানুষ্ঠানে অনেকেই উন্নত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অ্যাথলেটিকসের প্রায় প্রত্যেকটা বিভাগে নতুন কমনওয়েলথ রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে মাত্র একটা। সে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী জামাইকার মেরিলিন ন্যুফভিল। মেরিলিন চার'শ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। পদক প্রাপ্তিতে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারু কারেন মোরাস। তিনি মোট চারটে সোনার পদক পেয়েছেন।

এডিনবরার সদ্য সমাপ্ত নবম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় মল্লযোদ্ধারা দশটা বিভাগের ন'টা বিভাগে পাঁচটি সোনা, তিনটি রুপো এবং একটা ব্রোঞ্জের পদক নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। আমাদের দশজন মল্লর মধ্যে পাঁচজন বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন, তিনজন পেয়েছেন রানার্সের সম্মান, একজন পেয়েছেন তৃতীয় স্থানের পুরস্কার। শুধু একজন কোন পুরস্কার পাননি।

চোদ্দ বছর বয়সী বালক বেদ প্রকাশই ভারতকে প্রথম সোনার পদক জয়ের সম্মান এনে

দিয়েছেন লাইট ফ্লাই ওয়েটে কানাডার চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর কেন স্যাণ্ডকে পরাজিত করে। বেদ প্রকাশ ছাড়া ভারতের আর যাঁরা সোনার পদক পেয়েছেন, তাঁরা হলেন ফ্লাই ওয়েটে স্বদেশ কুমার, ওয়েল্টার ওয়েটে মুক্তিয়ার সিং, লাইট ওয়েটে উদয়চাঁদ ও মিডেল ওয়েটে হরিশ্চন্দ্র। রুপোর পদক পেয়েছেন লাইট হেভি ওয়েটে সজ্জন সিং, হেভি ওয়েটে বিশ্বনাথ এবং সুপার হেভি ওয়েটে মারুতি মানে। রনধাওয়া ফেদার ওয়েটে পেয়েছেন ব্রোঞ্জের পদক।

কমনওয়েলথ গেমসের পদক তালিকায় এবার ভারত যে সপ্তম স্থান পেয়েছে তার মূলে মল্লবীরদের অবদানই মুখ্য। মল্লদের ন-টা পদক লাভ ছাড়া বাকী তিনটে ব্রোঞ্জ পদক এসেছে ভারত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ ও অ্যাথলেটিকস থেকে। ভারোত্তলনে ফেদার ওয়েট বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন অ্যান্টনী ডেভিস, মুষ্টিযুদ্ধের ওয়েল্টার ওয়েটে শিবাজী ভোঁসলে এবং অ্যাথলেটিকসের হপ স্টেপ জাম্পে মহীন্দার সিং।

মধুচক্র

(২৩২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পল্লীবাসী এই মানুষটি পরাধীন ভারতের জ্বালা নিজের অন্তরে বুঝেছিলেন বলে শহরে রাজনীতি থেকেও নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি।

তাঁরই ভাষায় তাঁকে বলি, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।'

শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১ ভাদ্র, ১২৮৩—প্রণাম জানাই তাঁকে।

চিঠি পেলাম তোমাদের—

কোলকাতা থেকে কস্তুরী নাগ, শম্পা পাল, অমলেখা মিত্র, রাধা দত্ত, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রজিৎ, অনির্বাণ, সহাস চৌধুরী, বনি চক্রবর্তীর। লক্ষ্মৌ থেকে মোনালিসা মজুমদার; শ্রীরামপুর থেকে জয়দীপ, কৃষ্ণনগর থেকে নূপুর, শোভনা ও শুক্লা। সকলের জন্য ভালবাসা রইল।

পাকিস্তানের যে চিঠিটি এবার 'গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা'র পাতায় ছাপা হয়েছে, সেটি তোমরা পড়ো এবং তার সঙ্গে 'পত্র-মিতা' পাতাতে চাইলে চিঠি দিয়ো। মিষ্টি এই চিঠিটি সম্পাদক মশাই আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আলাদা ছেপে দিয়েছেন।

তোমাদের—মধুদি।

একখানি চিঠি*

মধুদি,

আমার এ চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হয়ে গেছ, তাই না? ভাবছ এ আবার কে? আমি পূর্ব বাঙলার তোমার ছোট্ট ভাই। ভাবছ ভাই হলাম কেমন করে, তাই না? আমরা একই বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দু-মুসলমান, খণ্ডিত বাঙলার বাঙালী সন্তান, কাজেই…।

'মৌচাক'-এর ভাইবোনদের সাথে পত্রালাপ করার জন্য আমার নাম, ঠিকানা তোমার বিভাগে ছাপিয়ে দিও।

যদি দাও তবে হিন্দু ভাইবোনদের সাথে আবার বন্ধুত্বের সুযোগ হবে, নয়ত নয়। জান কত দিনের বাসনা ভারতে ভাইবোনদের সাথে বন্ধুত্ব করি, কিন্তু কি করে করবো, তাদেরও নাম-ঠিকানা পাই না, আমারটাও তারা পায় না। এবার তোমার কিন্তু সে সুযোগটা করেদিতেই হবে, আর তা না হলে তোমার সাথে আড়ি করবো। তুমি চিঠি না লিখলে, আমি কিন্তু লিখব। তাতে তুমি বিরক্ত হয়েশেষে বলবে, "হতচ্ছাড়াটার একটা উপায় করে দেই।" ভাল কথা, 'মৌচাক' কিন্তু আমরা পড়তে পাই না। এখানে আসে না তো, কাজেই চিঠি লিখেই উত্তর দিও। আচ্ছা মধুদি' তোমাদের কি ইচ্ছা হয় না এই পূর্ব-বাঙলার ছেলেমেয়েদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে? তোমাকে যে তুমি বলেছি তাতে রাগ করছ নাকি? করলে কিন্তু ক্ষমা করো। না হয় যা ইচ্ছে তাই করো। আমার তো কোন দিদি নেই।

এই পূর্ব-বাঙলার ভাই-এর অফুরন্ত আন্তরিক ভালোবাসা নিও। চিঠির উত্তর দিও। নাম, ঠিকানা ছাপিয়ো কিন্তু। ইতি—

—হাসেম

* পূর্ব-বাঙলার এই ভাইটির সঙ্গে তোমরা ইচ্ছে করলে চিঠি লিখে বন্ধুত্ব করতে পাবো। তার ঠিকানা: আবুল হাসেম (বয়স ১৬), ২২ দিলু সড়ক, ম বাজার, ঢাকা-২, পূর্ব-পাকিস্তান।

সাফল্য

আমার জীবনে আজ সফলতা এলো,
কুসুমের কলি সব ফুটিয়া উঠিল।
রবির কিরণ মোরে দিল আয়ু দান;
সেই আয়ু মাঝে আমি হব অফুরান।
মোর হৃদয়ের সুরে গেয়ে যাব বীণা,
বীণাটি অক্ষয় হবে আমি তো রব না।
তুলি ফুল গাঁথি মালা তোমাদের তরে,
সে মালা অক্ষয় হবে দেবতার বরে।

—কুমারী রীতা চক্রবর্তী

ধানবাদ ভ্রমণ

এবারে মার্চ মাসের ২৭ তারিখে গুডফ্রাইডের ছুটিতে আমরা ধানবাদ যাব ঠিক করলাম। ২৭ তারিখে ভোর ৬টার সময় ট্রেন। তার আগের দিন সব গোছগাছ করে, সেই দিন ভোর ৪টার সময় আমরা মুখ-হাত-পা ধুয়ে রেডি হয়ে নিলাম। ধানবাদে আমার দিদি-জামাইবাবু থাকেন। আমরা মোট ৬জন যাব ঠিক হয়েছিল। ক্রমে ভোর ৫টার সময় ট্যাক্সি করে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। আমাদের সীট রিজার্ভ ছিল। আমি, মা, আমার বোন, আমার পিসতুতো দাদা, পিসতুতো দিদি ও তার ছেলে—সবাই ট্রেনে উঠে বসলাম। আমি জানালার ধারে বসলাম। বাইরের দৃশ্য ভারী সুন্দর। এই ট্রেনটা ছিল 'ব্লাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেস'। এটার পথে আটটা স্টপেজ—বর্দ্ধমান, দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, আণ্ডাল, আসানসোল, মানকর, ওয়ারিয়া, ধানবাদ; এখানেই শেষ। হাওড়া থেকে ধানবাদ ১৮০ মাইল। যাই হোক আমরা বারটার সময় ধানবাদ ষ্টেশনে পৌছলাম। সেখানে ট্যাক্সি করে আমরা পুঁটকী কোলিয়ারীর দিকে যেতে লাগলুম। পথে কত কোলিয়ারী দেখতে পেলাম। উপর দিয়ে তারের সাহায্যে ১২ মাইল দূর থেকে বালি নিয়ে যাচ্ছে-আসছে। ক্রমে আমরা দিদির বাড়ীতে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে গিয়ে চান করে সবাই খেয়েদেয়ে তারপর বসে বসে কাগজ পড়তে লাগলাম। বিকেলে আমি ও আমার পিসতুতো দিদির ছেলে পিয়াল ক্রিকেট খেলা করলাম ও সন্ধ্যেবেলা তাস খেললাম। পরের দিন একটি সিনেমা দেখলাম তার পরের দিন পুঁটকী কোলিয়ারী দেখলাম। খুব ভালো লাগল। সোমবার দিন সকাল বেলা গোছগাছ করে বিকেলের ট্রেনে রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছলাম। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরলাম।

—শ্রীসত্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবে করিব প্রেম

ভগবান, ভগবান!
মানবে করিব প্রেম, মোরে
সেই বল কর দান।
(জানি) মানুষের মাঝে জাগ্রত হরি,
তাই যেন তারে সদা সেবা করি,
মানুষের হিতে মরিবার মত
শক্তি কর গো দান।
ভগবান, ভগবান!
(জানি) মানুষের মাঝে সবে মোরা জাতি
তবু কেন রচে শত জাতি-পাঁতি,
মুসলিম, শিখ, জৈন, হিন্দু,
চণ্ডাল, খৃষ্টান।
ভগবান, ভগবান।
(জানি) মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
মানুষের মাঝে দেবতা সদাই,
মানুষের মাঝে সকল তীর্থ,
মানুষেই তাঁর স্থান।
ভগবান, ভগবান!

—শ্রীজয় ভট্টাচার্য

১। ডাইনের ছকের ফাঁকা ঘরগুলি ছয়টি এমন সংখ্যা দিয়ে পূরণ করতে হবে, যাতে পাশাপাশি তিনবার এবং খাড়াখাড়ি তিনবার মোট ছয়বারই যোগফল ত্রিশ হয়। এক সংখ্যা একাধিকবার যেন না হয়।

	৯	

২। বাঁ-দিকের ছকটি এক অঙ্কের সংখ্যা (কোন সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহার না করে) দিয়ে এমন ভাবে পূর্ণ করতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং খাড়াখাড়ি প্রতিবারই যোগফল পনের হয়।

৩। অঙ্ক দুটির যোগেও যা
গুণ করেও তা—
ভাগেও হয় একই
চিন্তা করে বল তো
দুই অঙ্কের সংখ্যাটি কি ?

৪। অঙ্ক তিনটির যোগেও যা
গুণ করলেও তা—
বিয়োগ কিছুই নাই
তিন অঙ্কের সংখ্যাটি কি
চিন্তা করে বল দেখি ভাই।

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের 'ধাঁধার পাতা'র উত্তর ॥

১। (ক) মানব, নকুল, বলদ (খ) শকুন, কুকুর, নর ২। নৈহাটি (বাঁ থেকে ডাইনে) (উপর থেকে নীচে) নৈনিতাল, হাওড়া, টিটাগড় ৩। তামা

মহারাজ!

রাজ্য নেই, সিংহাসন নেই, তবুও তিনি মহারাজ! প্রাচীন বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে এই নাম উজ্জ্বল—সেই ইতিহাস ফাঁসির মঞ্চ, কারাগার ও আত্মবিসর্জনের। স্বদেশী-আন্দোলনের বিপ্লবী মহান্ নেতা এই মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। ময়মনসিং-এ জন্ম। এবার এলেন ভারতে তেইশ বছর পরে ঢাকা থেকে। স্বাধীন ভারতে এলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পুরোনো বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকের সঙ্গে দেখা হলোও—তারপর গেলেন রাজধানীতে। প্রধানমন্ত্রী ও আরো গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে ভোজসভায় সাক্ষাৎ করলেন—ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী-প্রয়াসী মানুষটি অনেক কথা বললেন—এরই কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মহারাজের জীবন কেটেছে তিরিশ বছর কারাগারে—চার-পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসে। তখনকার দিনের দেশনেতা বারীনবাবু পুলিনবাবু, সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, মোস্তাফা আমেদ প্রভৃতির সঙ্গে আন্দামানে ছিলেন—অসহ্য কষ্টের মধ্যে কেটেছে তাঁদের দিন। মান্দালয় জেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও জেলে কাটিয়েছেন অনেক দিন—ধরতে গেলে জীবনের অধিকাংশ সময়ই পরাধীন রাজত্বে কেটেছে তাঁর কারাগারে। কিন্তু বিপ্লবী নেতাকে কোনদিনই কেউ এই আন্দোলন থেকে নড়াতে পারেনি—ইংরেজ কর্তৃপক্ষও নয়, পুলিশের তাড়না নয়, অমানুষিক দৈহিক কষ্টও নয়। নিজের আসল নামকে গোপন করার জন্যই 'মহারাজ' নাম গ্রহণ করছিলেন।

এসেছিলেন ভারতে। অগণিত অনুরাগী বন্ধু ও নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতের মৃত্তিকাতেই লয় হয়ে গেলেন।

দেশমায়ের একান্ত ভক্ত সন্তান বিপ্লবী-বীর মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথকে আমাদের শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই আর তরুণ সমাজকে তাঁর আদর্শকে স্মরণ করতে বলি।

শরৎচন্দ্র

বাংলা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় আর দরদী লেখক রূপে কে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যাবে—দু'টি মাত্র কথায়—শরৎচন্দ্র।

সাধারণের কাছ থেকে জীবনের বহু বছর নিজেকে আত্মগোপন করে রেখেছিলেন—নিরহঙ্কার, নির্লোভ এই অসাধারণ মানুষটি। বহুদিন পর্যন্ত একান্তে থেকে জীবনের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা—সবই দেখেছেন, শুনেছেন—কিন্তু নিজেকে ধরা দেননি।

ধরা কিন্তু একদিন দিলেন। সাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক আর লেখককে কেন্দ্র করে সকলের মনে জেগে উঠলো পরম কুতূহল—ব্যক্তি মানুষটি কিন্তু তখনও পর্দার আড়ালে—বাংলা দেশ থেকে দূরে ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন শহরে। বাংলা দেশের মানুষ তাঁকে আহ্বান জানালো তাদের পরমাত্মীয় বলে। সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার মনে একই সঙ্গে এতখানি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার আসনে আর কোনো বাঙ্গালী লেখক শরৎচন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—একথা বলা যাবে না। বাঙ্গালীকে অত গভীর আর অন্তরঙ্গভাবে কতজন জেনেছেন? সমাজের ছবিটি রইল তাঁর নখদর্পণে—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভয়-ভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়। স্বভাবতঃই স্পর্শকাতর আর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল তাঁর অন্তর। বুদ্ধি দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে তিনি বাংলা দেশের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন—অনেক উঁচু থেকে মানুষকে দেখতে চাননি, দেখতে চেয়েছেন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে। তাই বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ঘটেছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। সে পরিচয় অত্যন্ত খাঁটি আর নির্ভেজাল। তাই তো তাঁর বইগুলো যখন আমরা পড়ি—তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে যাদের প্রতিদিন নিজেদের চোখে দেখছি, যাদের কথা শুনছি—তাদেরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যখন নিজের দিকে তাকাই, তখনই গভীরভাবে অনুভব করি আমিও ওদেরই একজন। এই আপনকরা আত্মীয় বোধটির প্রয়োজন আজ সব চাইতে বেশী। (শেষাংশ ২২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৬০ পয়সা

মহিষমর্দিনী

শিল্পী : শ্রীঅশোক ধর

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা *

৫১শ বর্ষ] আশ্বিন ঃ ১৩৭৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

অকাল-বোধন

শ্রীসুশীল রায়

দেশের দশা যেমনই হোক

তবু তোমার চাই আগমন,

বিপর্যয়ের মধ্যে থেকেও

তোমার জন্যে তাই আয়োজন।

ষোলো রকম উপচারে

সাজিয়েছি এই পূজার বেদী

ভক্তি বলো, শ্রদ্ধা বলো,

সেইসঙ্গেই তোমাকে দি'।

দৈবে এবং দুর্বিপাকে

দেশের দশা যেমনই হোক—

অন্ধকার যে এসে গেছে,

তখন চাইব নাকি আলোক ?

দুঃখ এবং দৈন্য আছে,
থাকুক, তা'তে কী বা ক্ষতি,
অসুর আছেন, সে সঙ্গে তো
আছেন লক্ষ্মী-সরস্বতী।

বিপর্যয়ের কাছে'পরা-
জিত হবার কী প্রয়োজন
শুভ যা তা রক্ষা তুমি
করবে জানি, অসুর-নাশন।

আমরা যাকে জীবন বলি
নয় সে কেবল সুখের আকর,
নানারকম উপদ্রবেও
সহজে তাই হইনে কাতর।

দেশের মাটি দিয়ে তোমার
মূর্তি গ'ড়ে এনেছি আজ
কেউ দিয়েছি কাগজ কেটে
কেউ দিয়েছি ডাকেরই সাজ।

তোমার পূজা সর্বজনীন
কারো অর্ঘ্যই বাদ পড়েনি,
সমাজ যাকে বলি, তারই
যাগ দিয়েছে সকল শ্রেণী।

অসুর-নাশন তুমি, তোমার
দশ হাতে ওই দশ প্রহরণ
সর্বনাশের করবে বিনাশ
তাই তো আবার অকাল-বোধন।

নেকিরাম

শ্রীমনোজ বসু

'আমি মরলাম—ওরা সব রইল'।—পৃঃ ২৩০

নেকিরাম দলুই। সত্তরের উপর বয়স। কিন্তু দেহে বয়সের ছাপ পড়েনি, মনেও না।

বাড়ির দক্ষিণে ঢিপি—দোমহলা-তেমহলার সমান উঁচু। বাড়ির উত্তরে মজা দীঘি-ঘাস বনে ভরা তেপান্তরের মাঠ যেন পড়ে আছে। সেকালে দীঘি কাটার সময় মাটি তুলে তুলে ঐ পাহাড় জমেছে, লোকে চিরকাল দেখে আসছে।

নেকিরাম হঠাৎ ক্ষেপে গেল: দক্ষিণে বাতাস আমার বাড়িতে কোন দিন পাই নে। গরমে মারা যাই। ঢিবিতে বাতাস আটকে দিচ্ছে।

কথা সত্যি, কিন্তু করবার কি আছে। এক হতে পারে, এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও বাড়ি বানাও গে। যেখানে দক্ষিণ চাপা নয়।

নেকিরাম রেগে আগুন। বলে, বাস্তুভিটে সাত পুরুষের বসত কক্ষনো আমি ছাড়ব না। আর ভগবানের পাঠানো দক্ষিণে-বাতাসই বা কেন ছাড়তে যাব?

কী করবে তবে?

নেকিরাম বলে, ঢিবি থাকবে না, বাতাস আসবে।

সে কি, কেমন করে?

নেকিরাম সংক্ষেপে বলল, সকালবেলা দেখো।

সকালবেলা কোদাল হাতে নেকিরাম ঢিবির উপরে উঠে গেল। বুড়ো হলে কি হবে, তাগত আছে দস্তুরমতো। ঢিবির মাথায় কোদাল মারছে, ঘামের ধারা বইছে সর্বাঙ্গে।

কৌতূহলী মানুষজন বিস্তর জড় হয়েছে। তারা শুধায় : ও নেকিরাম, ঢিবি কাটছ কেন ?

কোদাল বন্ধ করে নেকিরাম হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কেটে চৌরস করে ফেলব।

বউ বলে, কাটছ তো মাটি—ফেলবে গিয়ে কোথায় ?

আদ্যন্ত নেকিরাম ভেবে রেখেছে। বলে, ঐ মজা দীঘিতে। ভরাট করে ফেলব। চাষবাস হবে ওখানে, লোকের ঘরবাড়ী হবে।

দিনের পর দিন এক হাতে করে যাচ্ছে। দিনই মাটি কাটে, ঝুড়ি ভরতি করে দীঘিতে নিয়ে গিয়ে ফেলে। পুরো দিনে ঝুড়ি দশেকের মতন মাটি পড়ে দীঘিতে।

গ্রামের মানুষ হাসাহাসি করে। কোদাল মেরে উনি ঐ পাহাড় চৌরস করবেন, অত বড় দীঘি ভাঙা করবেন। পয়লানম্বুরি হ্যাকা—নেকিরাম যে নাম দিয়েছিল, কেমন করে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিল সে মানুষ।

নেকিরামের নাতিপুতি একগাদা। দাদুর কাণ্ডকারখানা দেখে মজা পেয়ে যায় তারা। বেড়ে এক খেলা তো ! মাটির চাঁই হাতে হাতে দাদুর ঝুড়িতে তুলে দেয়। দা-কুড়াল যা পায় নিয়ে এসে মাটিও খোঁড়ে অল্পস্বল্প। অন্য খেলা ছেড়ে এই খেলাতেই বুড়োর সঙ্গে ছেলেরাও আজকাল মেতেছে।

একদিন বুদ্ধিশ্বর অধিকারী এলো দূরের গ্রাম থেকে। নেকিরামের অতিবড় সুহৃৎ। হেসে বলল, বোকা তুমি চিরকাল। কিন্তু এতবড় বোকামির কাজে কখনো তুমি নামনি।

সবিস্ময়ে নেকিরাম বলে, কেন, কেন ?

কোদালে কেটে ঐ ঢিবি উড়িয়ে দেবে, হয় কখনো এ জিনিস ?

হচ্ছেই তো। নিজের চোখে দেখো কাল।

পরের সকালে নেকিরাম হাত ধরে বুদ্ধিশ্বরকে ঢিবির উপরে নিয়ে গেল। বেশ একটা গর্ত মতো সেখানে, নেকিরাম সগর্বে অঙুল বাড়িয়ে দেখায় : হচ্ছে না ? বলো—

কতদিন লেগেছে এই গর্তটুকু করতে ?

আঙুলের কর গুণে গুণে নেকিরাম বলল, আঠারো দিন—

বুদ্ধিশ্বর বলল, সমস্ত ঢিবিটা খুঁড়ে ফেলতে কত লাখ লাখ দিন লাগবে, হিসাব করো তবে। বয়স তোমার সত্তর ছাড়িয়ে গেছে ক'টা দিন আর বাঁচবে ?

বুড়ো নাতিদের দেখায় : ওরাও লেগে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না? আমি মরলাম, ওরা সব রইল। ওদের ছেলে হবে, নাতিপুতি হবে। দেখাদেখি তারাও সব লেগে যাবে। তাদের পরে আরও আবার আসবে—

খলখল হাসে নেকিরাম। তাচ্ছিল্য করে বাঁ হাতের তর্জনী তোলে ঢিবিটার দিকে : আর ঐ যে উনি মাটি জমে পাহাড় হয়ে বসে আছেন—এক রতি বাড় বৃদ্ধি নেই, কোদালের মুখে কমছেনই কেবল। যেতেই হবে ওঁকে শেষ হয়ে, রক্ষে নেই!

বুদ্ধিশ্বর দাঁড়িয়ে দেখে। বৃদ্ধ নেকিরাম কোদাল মারছে। গায়ে ঘামের স্রোত। বাচ্চাগুলো ছুটোছুটি করে ঝুড়ি ভরছে। পাহাড় ওরা সরাবেই।

দশভুজার পূজা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী

দশভুজা মাগো তুমি দুর্গা,
তোমার পূজায় মোরা মত্ত,—
দাও প্রাণে সাহস ও শক্তি,
সদা যেন লভি যাহা সত্য।

লক্ষ্মী মাগো লক্ষ্মী মা,
ধনের তোমার নাই সীমা,—
দাও যদি একরত্তি,
লাগবে গায়ে গত্তি।

মাগো সরস্বতী
বীণা তব হস্তে,
অজ্ঞতা থেকে, মাগো
বাঁচাও, নমস্তে।

হস্তিবাহন গণপতি
গণেশদাদা গো,
পেটটি যেন তোমার মত
ভর্তি মোদের রয় সতত,—
মনটি সাদা গো।

দেবলোক-সেনাপতি
তুমি কার্তিক,—
লড়ায়ে সদাই যেন
রই নির্ভীক।

শক্তির মদমত্তে
মহিষ ছিল যে মোহাবর্তে,—
দেবীর আয়ুধে দিয়ে প্রাণ
স্বর্গেতে পেল তার স্থান।

সিংহ, ময়ুর, হংস, ইঁদুর,
পেচক, শোন কই,—
যে দেবদেবীর তোমরা বাহন,—
পেলেও ভুজো হাজার কাহন,
কোথাও যেন যান না তাঁরা
মোদের গৃহ বই।

সব কাজ থাক্ না

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

আইঢাই, করি শুয়ে বিছানায়
ঘুম নেই থির চোখে চাইছি
ভ্যাপসা গরম লাগে, ভাপে-তাপে
সারা দেহে—ঘামে যেন নাইছি।

মন যায় জানলায় বার বার
চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু আকাশে
মনে হয় ভেসে যাই পারি যদি
জল ঝড় নেমে আসে বাতাসে।

ফাঁকা ফাঁকা নীলিমায় কারা ওই
উড়ো উড়ো হয়ে এসে জম্‌ছে
কাজল কালির মত দানা বাঁধা
বাড়ছেই—একটু না কম্‌ছে।

ঝিক্‌মিক্ ক'রে ও'কে ঝল্‌সায়
কড়কড় ডাক দেয় মাদলে—
এক্ষুনি মজা হয় বড় যদি
বৃষ্টির মেঘ নামে বাদলে।

ঝম্‌ঝম্ ঝরঝর আয় আয়
ছোঁয়া নিয়ে কোমলতা মিষ্টি
তরল আমেজ ভেজা সারা দেহ
স্নিগ্ধতা ছেয়ে দিক সৃষ্টি।

জান্‌লা রয়েছে খোলা সাম্‌নেই
নাই বাধা—খোলা সব শার্সি
নেচে আয় মন্দিরে নূপুরের
নিগূঢ় আপন হয়ে পড়শী।

রিনিঝিনি সেই সুর-ছন্দেই
মনপ্রাণ মশগুল হোক্ না
তোমার পরশ পেয়ে গন্ধেই
নেচে উঠি সব কাজ থাক্ না।

বিদ্যাসাগর

শ্রীরাণা বসু

কাঠ জ্বলে জ্বলে আগুন হয়
আগুনে জ্বলে জ্বলে কাঠ ছাই হয়।
স্বামীহারা রমণীর চোখের জল,
দুঃখীর করুণ মিনতি
তোমার হৃদয়ে নামাত করুণার ঢল
কাঠের মতোই তুমি জ্বলে জ্বলে
ভাস্বর হয়েছ॥

জ্ঞানই অজ্ঞানকে রক্ষা করে।
অজ্ঞানতা ঘোচাতে
তুমি স্বজাতির চোখে পরিয়েছিলে
জ্ঞানের মায়াকাজল,
জাদু হাতে রচনা করেছিলে
বর্ণপরিচয়, কথামালা আরও কত কী॥

গোপন ছিল তোমার দান।
প্রার্থীকে ডান হাতে তুমি যা
তুলে দিয়েছ
বাম হাত তা জানতে পারে নি।
তুমি গর্জনহীন দয়ারসাগর॥

সাগরের মতো প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে
তুমি এসেছিলে।
তোমার জীবন সমুদ্রের
ছোট বড়ো নানান ঢেউ আমরা দেখেছি
আর বারংবার উদ্‌বেল করুণাসিন্ধু
আমাদের অবাক্ অবাক্ করেছে॥

বাঁদিক থেকে প্রথম : হেয়েরডাল 'রা ১' নৌকোতে বসে আছেন। দ্বিতীয় : অশান্ত সমুদ্রের বুকে 'রা ১' নৌকো
তৃতীয় 'রা ১' নৌকাটি ডুবে গেছে, ডঃ হেয়েরডাল জলে ভাসছেন।

মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক অভিযান

শ্রীসুনীল সরকার

আজ যখন মনুষ চাঁদের পথে পা বাড়িয়েছে তখনো এই মর্ত্যলোকেই দুঃসাহসের অভিযানের দিন ফুরোয় নি,—একথা নরওয়েজিয়ান অভিযাত্রী থর হেয়েরডাল আর একবার প্রমাণ করলেন। এভারেষ্ট আছে বলেই তাকে জয় করতে হবে,—একথা যিনি বলেছিলেন, তাঁর মত নিছক অভিযানের জন্তই অভিযানে নামেন নি হেয়েরডাল—ইতিহাসের একটি তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্তই তিনি এই অভিযানে বেরিয়েছিলেন। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে,—প্যাপিরাস ঘাসের তৈরী নৌকা 'রা-২' অ্যাটলাণ্টিকের বুকে ভাসিয়ে মরক্কোর সমুদ্র উপকূল থেকে বার-বাডোজ দ্বীপ পর্যন্ত ৫ হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ মাত্র ৫৭ দিনে পাড়ি দিয়ে নৃবিজ্ঞানী হেয়েরডাল তাঁর সেই তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন। চার হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায় পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে হেয়েরডাল ও তাঁর সঙ্গীরা একালের নতুন ইতিহাস তৈরী করলেন,—এতে তাঁদের অভিযানের গৌরব আরো বাড়লো।

নৃবিজ্ঞানী থর হেয়েরডালের পক্ষে এই গৌরব কিন্তু নতুন নয়—তিনি আরো একটি অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিলেন। সেই কনটিকি-অভিযান এখন সুপরিচিত। তোমারা জানো কি না জানি না, দক্ষিণ আমেরিকার সূর্য দেবতার নাম ছিলো 'কনটিকি'। সেই নামের কাঠের ভেলা ভাসিয়ে হেয়েরডাল ও তাঁর ছ'জন সঙ্গী দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে হাওয়া ও স্রোতের টানে ১০৫ দিনে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে গিয়ে পৌচেছিলেন। তাঁর 'কনটিকি' অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো একথা প্রমাণ করা যে,—হাজার, হাজার বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা ওই ধরনের ভেলায় চড়ে পলিনেশিয়ান দ্বীপগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। 'কনটিকি' আজ দুঃসাহসের অক্ষরে ইতিহাসের পাতা নতুন করে লেখার এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অসীম সাহসের প্রতি আজকের দিনের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীকে পরিণত হইয়াছে।

প্যাপিরাস ঘাসের তৈরী নৌকা 'রা-২' সেই একই জাতেরই অভিযান। প্রাচীন মিসরের সূর্য দেবতা 'রা'র নামে উৎসর্গকৃত এই নৌকা নিয়ে অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পিছনে হেয়েরডালের উদ্দেশ্য ছিলো একথা প্রমাণ করা যে, নীল নদের তীরে প্যাপিরাস নামে যে নলখাগড়া জাতীয় গাছ জন্মাত,—যা থেকে পেপার বা কাগজের নামকরণ করা হয়েছে—সেই গাছের পাতা দিয়ে তৈরী নৌকোয় করে চার হাজার বছর আগে অফ্রিকার মনুষরা দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে পারতেন। ইতিহাস এরূপ কথা বলে। ইতিহাস বললেই তো হবে না, সেটা প্রমাণ করা দরকার। আর তা প্রমাণ করার জন্যই নৃবিজ্ঞানী হেয়েরডাল ইংরেজী ১৯৬৯ সালে, এই প্যাপিরাস গাছের পাতা দিয়ে যে 'রা-১' নৌকা তৈরী, তা নিয়ে বারবাডোজ উপকূল থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু হাজার কিলোমিটার গিয়ে নৌকোটি ভেঙ্গে পড়ায় তাঁকে অভিযান পরিত্যাগ করে ফিরে আসতে হয়েছিলো। কিন্তু একটা কথা সত্যি যে, ব্যর্থতাই জীবনের চরম সাফল্যের কারণ। এবার 'রা-২'-এর সাফল্য ডঃ হেয়েরডালের সেই ব্যর্থতার গ্লানি দূর করে দিয়েছে। যে বয়সে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বানপ্রস্থ অবলম্বন করার কথা চিন্তা করেন, সেই ৫৫ বছর বয়সে থর হেয়েরডাল-এর এই সাফল্য নিশ্চয়ই মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তির একটি গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন।

'রা-১' অভিযান ব্যর্থ হওয়ার কারণস্বরূপ থর হেয়েরডাল বলেছেন: 'রা-১'-এ চড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু, শীগগিরই আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। তবে প্রথম দিনের জলযাত্রার পরে আমাদের কিছুটা অপ্রীতিকর ধারণা জন্মেছিলো। ঠিক মতো সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ার আগেই আমাদের দুটো দাঁড়ই ভেঙে গেলো। একটা দাঁড় টানছিলাম আমি এবং অন্যটা টানছিলো মাউরি। দাঁড় ভাঙলো নিশ্চয়ই আমাদের অভিজ্ঞতা কম ছিলো বলে। দুটো দাঁড় ভাঙা, কর্মীদের দু'জন অসুস্থ—সব মিলিয়ে আমরা একটু বিরক্তিই বোধ করছিলাম। আর একটা অপ্রীতিকর দিন হলো ১৯৬৯ সালের ১৮ই জুন। আমাদের দাঁড় দু'খানা ভাঙলো সেই তৃতীয় বার। তখন রাত্রিবেলা। প্রবল বায়ু প্রবাহে সমুদ্র তখন অশান্ত, বৃষ্টিও পড়ছিলো। ঘুমোতে পারলো না কেউ। নৌকোর যে অর্ধেকটা স্টারবোর্ড সেটা তখন জলের নীচে, তেমনি স্টার্নও। তখন আমাদের ছোট কেবিনে কোমর জল। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালাম। পরের দিন একখানা 'ইয়াট' এসে আমাদের উদ্ধার করলো। ততক্ষণ আমরা সমুদ্রের জলে 'রা-১' ধরে ভেসেছিলাম। আমরা সাফল্যলাভ করতে পারলাম না—সেটা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা। তবু এটা প্রমাণিত হলো যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের সমুদ্র নাবিকদের পক্ষে প্যাপিরাসের নৌকো করে সাগর পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিলো। তিনি আরো বলেছেন, নৌকা তৈরীতে যেমন ত্রুটি হয়েছিলো, তেমনি আবহাওয়াও ছিলো খারাপ।

বাহাদুর ভাইপো

শ্রীসত্যানন্দন ভট্টাচার্য

'হাতে যেদিন ও রাইফেল পেলে, ওর কি আনন্দ।'—পৃঃ ২৪২

"চলতে নারে,—
তার বন্দুক ঘাড়ে।"
বছর বারো তো বয়স। আবদার—"আমায় বন্দুক দাও—আমি লড়াইয়ে নামবো।"

বাপের কথা ওর স্মরণে থাকার কথা নয়। পিতৃহারা এই বলাকের একমাত্র সম্বল তার মা। তাঁকে ঘিরেই ওর ভুবন। খেলাধূলো, গল্প-গুজব স্বপ্ন-বায়না সবই ঐ স্বামীহারা মেয়েটিকে কেন্দ্র করে। মা আর ব্যাটা—দু'জনের জগত হলেও বিরাট তার পরিধি। ছেলেকে চোখের মণি করে রাখে মেয়েটা, কত কষ্টে দিন গুজরান করে—ছেলেকে টেরটি পেতে দেয় না।

মিলিটারী গাড়ী মাঝে মাঝে ওদের কুঁড়ের পাশ দিয়ে ছুটে যায়। বিদ্রোহীদের খোঁজে মিলিটারীরা হন্যে হয়ে গেছে। কিন্তু সামনে পেছনে-পাশে বিপ্লবীদের আক্রমণে ওরা নাস্তানাবুদ। চলাচলের কায়দা হয়ে গেছে তাই দিশা-

হারা। সেদিন একটা জীপ ছুটেছে ওদের এলাকা দিয়ে। কাঠ কুড়োচ্ছিল মেয়েটা। সরবার অবকাশ না দিয়েই পিশে বেরিয়ে গেল গাড়ীটা! রক্তমাখা মাংসের দলার ওপর আছড়ে পড়ে কি কান্না ছেলেটার! কিন্তু ঘরে আর মাকে তুলতে পারল না! ওদের মতই গরীব পাঁচঘরের পড়শী মেয়েরা, বুড়ীরা ওকে টেনে নিয়ে গেল—নাইয়ে-খাইয়ে প্রবোধ দিয়ে সুস্থ করে তুলতে তাদের কোনও ত্রুটী রইল না। কিন্তু আন্‌মনা ভাব আর ওর কাটে না।

ছেলেটা এপাশ-ওপাশ ঘোরে—কাদের যেন খোঁজে। সবাই ভাবে মাকে হারিয়ে ওর মাথাটা বিগড়িয়েই গেল। ওকে দিয়ে আর কোনও কাজ হবে না।

একদিন ছেলেটা গিয়ে গণফৌজের গোপন আস্তানায় হাজির। কম্যাণ্ডারের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ও জোর গলায় বারবার কি যেন দাবী জানাচ্ছে! না—তারা ওর দাবী পূরণ করতে পারছে না। বন্দুক বইবার ক্ষমতা এখন ওর হয়নি। তাই তারা ওর কাঁধে হাতিয়ার তুলে দিতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে শত্রুর আনাগোনার হদিস যোগাবার ভার আদায় করে ছাড়লো। তাতেই ওর স্ফূর্তির অন্ত নেই।

কয়েক দিনের মধ্যেই, বাচ্চা হলেও, দক্ষতায় ও অনেককে পেরিয়ে গেল। যেমন সাহস, তেমনই ঐকান্তিকতা। এই একাগ্রতা ওকে এই অল্প বয়সে গেরিলা বনবার সুযোগ এনে দিল।

হাতে যেদিন ও রাইফেল পেল ওর কি আনন্দ! বুকে জাপটে ধরে ওর নিজের বুকের হৃদয়ানন্দ রাইফেলকে শুনিয়ে দিল। এমন নতুন প্রাণের ছোঁয়ায় ও এক নতুন মানুষ। ওর আর তর সইছে না। হাত নিস্‌পিস্ করছে। কখন সেই মহেন্দ্রক্ষণ ওর কাছে আসবে।

সুযোগ এসে গেল। ওদের দলটা টহলে বেরিয়েছে! খবর এল শত্রু গাঁয়ে ঢুকছে। উল্লাস! না-না এখন বিচলিত হলেই সর্বনাশ! এই আনন্দ-হিল্লোলই হয়ত জীবনের প্রথম সুযোগকে বানচাল করে দেবে! ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ে রাইফেলটাকে চেপে ধরে আগে সব উত্তেজনাকে দমন করে শান্ত হয়ে নিল। আসছে—এসেছে! রেঞ্জের মধ্যে পেতেই পাঁচ-পাঁচবার আগুন ঠিক্‌রে দিল। শত্রুরা একজন খতম আর একজনকে ধরাধরি করে নিয়ে বাকীরা পালাল। সাথীরা ওকে কাঁধে তুলে, কোলে নিয়ে, চুমু খেয়ে অভিনন্দন জানাল! সাবাস! কিন্তু ওর আশ এতে মেটেনি। এ তো ব্যর্থতারই সামিল! পাঁচটা দানা ছেড়ে একটাকে মাত্র ফেলা গেল—এ গ্লানি ওকে অবার আচ্ছন্ন করে ফলেলো। ও এবার শত্রুর খোঁজে হন্যে হয়ে উঠলো।

একদিন দেখা গেল মাথার ওপর হেলিকপ্টারের পাখা ঘুরছে—এবার নামবে। এবার ও মরিয়া। হ্যাঁ, ওর চেষ্টাও ফলবতী হয়েছে। আগুন আর ধোঁয়া ছাড়া হেলিকপ্টারের দেবার বা নেবার কিছু রইল না।

দু'দুবারের পারদর্শীতায় ওর সাহস বেড়েছে—উৎসাহ হয়েছে অদম্য। সড়কের ওপর মাইন পেতে শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ী দিল উড়িয়ে। বহু রক্তলোলুপ হানাদারেরও ঐ সঙ্গে প্রাণ গেল।

সারা এলাকার মানুষ মিলল একদিন। বহু কণ্ঠের সাবাসের সঙ্গে পেল তিন-তিনটে খেতাব—শত্রুর পদভাকি, সাঁজোয়া ও বিমানের দুষমন বাহাদুর। আর সবচেয়ে বড় সম্মান পেল—"চাচা হোর বাহাদুর ভাইপো" বলে অভিবাদন। ছেলেটার নাম, রো চাম খুঙ! বাপ-মা মরা অনাথ এই ছেলেটা বয়ে যায়নি। আজ তার নাম সবার মুখে মুখে। বয়স এখন হল ১৬ বছর। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের 'গিয়ানাই' প্রদেশে ওর জন্ম এবং কর্মক্ষেত্র। এ বছরের জুলাই মাসের ভিয়েৎনাম পত্রিকায় এই বীর বালকের খবর দিয়ে তারা গৌরব বোধ করেছে।

সাবাস ছেলে! এরাই তো দুনিয়ার মানুষের কাছে উদাহরণ। স্বাধীনতার লড়াই বা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে এরা যুবকের সমান শক্তিধর ও রণকুশলী। চিনেছে শত্রুকে—জেনেছে বন্ধুকে এবং পথ সঠিক বাছাই করেছে। সাবাস চাচার সাবাস ভাইপো! চাচা হো আজ না থাকলেও বাহাদুর ভাইপোরা তার ইজ্জৎ রাখছে।

মাড়াই

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

কল্পনাতে যাও ডিঙিয়ে পাহাড়,
মনে মনে পার হয়ে যাও নদী,
তোমরা সবাই করতে পারতে সাবাড়
মানুষ নামক অমানুষদের যদি···

রাক্ষসদের চেনা অনেক সোজা,
তাদের কথা শুনেছ রূপকথায়।
কিন্তু যাদের যায় না কভু বোঝা—
ভাবছ পাবে, তোমরা তাদের কোথায়?

তারা আছে তোমার আমার পাশে,
মিষ্টি কথায় ঘুম পাড়িয়ে তারাই,
কেউ কি জানে, কখন এ-প্রাণ নাশে!
পায়ের তলে তাদের করো মাড়াই।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

বনের পশুরা মিলে করে ভারী আপসোস—
ইস্কুল্ নেই বনে, না-থাকাটা মহাদোষ।
ছেলেমেয়েগুলো সব বাজে কাজে ঘুর্‌ছে।
হয় ভেজে বিষ্টিতে, নয় রোদে পুড়্‌ছে।
দলে দলে বল খেলে, নয় তাস পিট্‌ছে।
দাঁত, শিঙ্, নখ দিয়ে খুন করা শিখ্‌ছে।
কালকের ছোঁড়াগুলো সিগারেট ফুঁক্‌ছে ;
সন্ধ্যায় দল বেঁধে কফি-ঘরে ঢুক্‌ছে।
বন-বেরালের ছানা নাকে দেয় নস্যি ;
শুয়োরের বাচ্চারা হ'ল মহা-দস্যি।
দোকানে চা-টোষ্ট্ খাবে, ফেল্‌বে না কড়িটা ;
চুরি ক'রে বেচে দেবে বাপেদের ঘড়িটা।
বকেদের মেয়েগুলো সাঁঝে ক'রে সাজগোজ,
ফিশ্-চপ্, ফ্রাই খেতে হোটেলেতে ঢোকে রোজ।
হরিণেরা ছেলে বুড়ো 'কিউ' দেয় সিনেমায় ;
খোকা-বাঘ করে লোভ মোগ্‌লাই পরোটায়।

এই সব আলোচনা মিটিংয়েতে চল্‌ল।
শেয়ালের লেক্‌চারে সব মন টল্‌ল।
প্রস্তাব হ'ল পাস—হবে প্রতি পাড়াতে
এক-একটি পাঠশালা মূর্খতা তাড়াতে।
হাতি হবে হেড-সার্ বাঘ হবে মাস্‌টার।
হনুমান নিল ভার ভালো বই লিখ্‌বার।
কমিটির মেম্বার্ হ'ল চিতা-গণ্ডার ;
টিয়া পাখি পেল ভার ছড়া-গান শেখাবার।
খঞ্জনা হ'ল রাজি কথাকলি শেখাতে ;
কাদাখোঁচা চার্জ নিল তালপাতে লেখাতে।
ড্রিল্ রোজ করাবে সে—বুনো মোষ বল্‌ল।
ইস্কুল বসাবার তোড়ে জোড় চল্‌ল।

উদোবুদোর আত্মহত্যা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সারাদিন বসে থাকা। উদোর বাত ধরে গেল, অগ্নিমান্দ্য হলো। যা খায় হজম হয় না, অম্ল হয়, খিদে নেই। উঠতে-বসতে হাঁটু খট্‌খট্ করে, কোমর কনকন করে। উদো বললো—শরীরটা তো বিগড়ে যাচ্ছে বুদ্ধিরাম।

বুদো বললো—আমারও ওই অবস্থা।

কবিরাজকে খবর দেওয়া হলো, তিনি বললেন—হজমিগুলি খেলেই হজম হবে, ওটা কিছু না। কিন্তু ওই বাতের ব্যাপারটাই মুস্কিল। ওর ওষুধ বাঘের চর্বি। কিন্তু সে এখন পাই কোথা? কোথায় বাঘ আর কে তাকে মেরে আনবে!

উদো বললো—আমার এতো বড় রাজ্যে দু-পাঁচটে বাঘ নেই?

রাজবৈদ্য বললো—বনে-জঙ্গলে আছে নিশ্চয়ই, তবে তার সন্ধান করা ও মেরে আনা সময়সাপেক্ষ।

—তাহলে আমর চিকিৎসা হবে না?

—হবে। শাস্ত্রে আছে মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অর্থাৎ মধু না পেলে গুড় দেওয়া চলে। বাঘ অভাবে বাঘের সমজাতীয় জীবের চর্বি দেওয়া যেতে পারে। যেমন বিড়ালের চর্বি। বিড়ালকে দেখতে বাঘের মতই, শুধু আকারে ছোট। বাঘের চর্বিতে যদি দশগুণ উপকার হয়, বিড়ালের চর্বিতে একগুণ তো হবে।

কবিরাজ মশাই বিড়ালের-চর্বির ব্যবস্থা করে গেলেন।

সারাদিন চর্বি মালিশ। গা দিয়ে তেল গড়ায়। চর্বিতে রসুনের গন্ধ, গা ঘিন ঘিন করে। কিন্তু উপকার কিছুই হয় না। উদো বললো—এ রাজবদ্যির কাজ নয়, হাকিমকে ডাকো।

হাকিম এলো, বললো—জানি এ রোগ, এর নাম গাঁট্ খটাস্। গাঁটের মাংস ঢিলে হয়ে গেছে, ওকে জোরালো করতে হবে, লংকা দিয়ে আমি মালিশ বানিয়ে দোব। লংকার ঝাঁজে ওই সব ঝিমুনো পেশী চনচন করে উঠবে।

হাকিমী মালিশ এলো। মালিশ করতে না করতেই কোমর আর হাঁটু হুহু করে জ্বলতে সুরু করলো, সে জ্বালা আর সহজে থামতে চায় না।

উদো বললো—এ মালিশ থাক্, অবধূতকে ডাকো। অবধূত বললো—এ কিছুই নয়, ওল সিদ্ধ খান, রক্ত পরিষ্কার হবে, আর রসুন-তেল মালিশ করুন, পেশী সতেজ হবে।

বড় বড় ওল এসে গেল, সকাল বেলাই একটা বড় সিদ্ধ করে উদো বুদো আধাআধি খেয়ে নিলে। বুনোলও। সুরু হ'ল তার কুটকুটুনি। গলা ফুলে উঠলো। উদে বুদো তো অস্থির।

অবধূতের কাছে লোক ছুটলো, তিনি বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা দিলেন।

উদো বুদো সারাদিন বসে বসে তেঁতুল চুষেই কাটালো। গলার কুটকুটুনি কমলো বটে কিন্তু একেবারে গেল না। সারাটা দিনে সামান্য গরম দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়া গেল না।

পরদিন সকলে ঘুম থেকে উঠে উদো গলায় হাত বুলিয়ে বললে—এখনও ব্যথাটা আছে।

বুদো বললে—আমারও গলা ফুলে আছে।

উদো বললে—শরীরটা একেবারে গেছে, এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমি কাল সারারাত ভেবেছি, আমার আর বেঁচে দরকার নেই। আমি মরবো।

বুদো বললো—সে তো সবাই মরবে।

—না, আমি আজই মরবো।

—কি করে মরবে?

—গলায় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলবো।

বুদো বললো—সে তো বড্ড কষ্ট হবে। জিভ্ বেরিয়ে যাবে, ঘাড় ভেঙে যাবে, হাত পা ছুঁড়বে।

—তাহলে পুকুরে ডুবে মরবো।

—সে আরো খারাপ, দম্ বন্ধ হয়ে যাবে। জল খেয়ে পেট ফুলে ঢাক হয়ে যাবে। তারপর মাছে নাকটা খুব্‌লে খাবে, কানটা খুবলে খাবে। যখন ভেসে উঠবে, তখন আর তোমায় চেনা যাবে না।

—তাহলে বিষ খাবো।

—সে বড্ড যন্ত্রণা। মেঝেয় পড়ে দু-চার ঘণ্টা হাত পা ছুঁড়তে হবে।

—তাহলে ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ি।

—সে তো থেঁৎলে একটা মাংসের তাল পাকিয়ে যাবে।

—তবে কি বুকে ছুরি মারবো?

—নিজের বুকে নিজে ছুরি মারতে পারবে না। একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হবে, কিছুদিন ভুগতে হবে।

—আমি না পারি, তুমি আমায় ছুরি মারো।

—তাহলে খুনের দায়ে তো আমার ফাঁসি হবে।

—আমি বলবো—আমি বলেছি।

—মরে গেলে তুমি কি বলবে?

—তাহলে কি আমার মরা হবে না?

উদো এবার রেগে ওঠে।

বুদো বললো—কেন হবে না। নিশ্চয়ই হবে। তুমি একজন ভূতপূর্ব রাজা, এমন ব্যবস্থা করবে যে ভূত হবার পূর্ব অবধি তুমি রাজার মতো থাকবে।

—সেটা কি তাই বল?

—সেটা আফিম। আফিম খাওয়া অভ্যাস কর। রোজ একটু করে আফিম খাও আর ঝিমোও। শেষে একদিন বেশী করে খাবে, আর ঝিমুতে ঝিমুতে মরে যাবে, নিজেও টের পাবে না, দিব্যি পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে মরে যাবে। আরামে মরবে। রাজার মতো মরবে।

'বুদো ছুটলো পথ দিয়ে। উদো মোটা মানুষ, থপ থপ করে সেও ছুটলো।'—পৃঃ ২৯১

—সে তাহলে সময় লাগবে।

—লাগবে। রাজা কি সাধারণ প্রজার মত পড়লো আর মরলো হবে? রাজার মরতে সময় লাগবে না? তার উপর যে রাজা ভূতপূর্ব হয়েও ভূত হয়নি, বহাল তবিয়তে বর্তমান আছে, তার মরে ভূত হওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার!

—ঠিক আছে, তুমি তাহলে আফিমের যোগাড় দেখ।

—আজই ছটাকখানেক যোগাড় করবো।

—মাত্তর এক ছটাকে কি হবে ?

—ওতেই তোমার স্বর্গের দরজা খুলে যাবে।

—বেশ তবে তাই কর, অন্যথা না হয়!—হবুচন্দ্র খুশি হলো, মরবার একটা সহজ পথ পাওয়া গেল। বললো—আমি তাহলে এবার আমার 'উইল'টা লিখে ফেলি।

—তোমার সবকিছুই তো হবুচন্দ্রকে দিয়ে দিয়েছ। অবার উইল কিসের ?

—তাকেই তো আমার শেষ ইচ্ছেটা জানিয়ে যাবো। যাতে অমার অবর্তমানে কেউ না কষ্ট পায়।

—তখনই উদো কালি, কলম নিয়ে বসে গেল উইল লিখতে।

বুদো বললো—টাকা দাও অফিম কিনিগে।

—কত টাকা ? উদো জিজ্ঞাসা করলো।

—তা জানি না, কখনো তো কিনিনি। খুচরো বিক্রী হয় দু-আনা, চার-আনা। একেবারে এক ছটাক মানে পাঁচ ভরি কিনতে হলে চুরি করে কিনতে হবে। বেশী দাম চাইবে।

—বেশ লিখে দিই, রাজকোষ থেকে একশো টাকা নিয়ে যাও।

—তাহলে সব জানাজানি হয়ে যাবে।

—এ দেখছি মরতেও অনেক বাধা!—ক'মিনিট ভেবে নিয়ে উদো বললো—এই নাও আমার আংটি বেচে দিয়ে টাকার যোগাড় করবে।

বুদো আংটি নিয়ে চলে গেল, উদো উইল লিখতে বসলো।

উইল মানে, কোথায় কি সম্পত্তি আছে, মৃত্যুর পর কে সে সব কতটা পাবে। উদো সম্পত্তির হিসাব করতে বসলো।

সারা রাজ্যই তার ছিল—হবুচন্দ্রকে দেওয়া হয়ে গেছে।

সিংহাসন রাজমুকুট তলোয়ার—হবুচন্দ্র নিয়েছে।

মন্ত্রিত্ব—বুদোর ছেলে গবুচন্দ্র পেয়েছে।

সেনাপতি কোটাল, সভাকবি, সভাপণ্ডিত, দাসদাসী—কোন পদই খালি নেই।

রাজবাড়ী টাকাপয়সা, হীরে-জহরৎ—সব এখন হবুচন্দ্রের।

উদোর নিজস্ব কি আছে ?—তিন অঙ্গুলে তিনটে আংটি, গলার মুক্তার মালা, আর হরিনামের ঝুলি।

চাকর রোজ রাতে তেল মালিশ করে, সে পাবে হীরের অংটিটা।

পাচক রোজ রান্না করে খাওয়ায়, সে পাবে পান্নার আংটি। (বাকি অংশ ২৯০ পৃষ্ঠায়)

রাজকন্যা কমললতা

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

সে অনেক দিনের কথা। চিয়াঙ চৌ শহরে বাস করতেন এক কবি। নাম তার তৌ স্থন্। গ্রীষ্মকালে একদিন তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন শোবার ঘরে, এমন সময় স্বপ্নে দেখলেন কে একজন জমকালো পোশাক পরে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। কী তার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, তার মনিব তাকে পাঠিয়েছেন কবিকে আমন্ত্রণ জানাতে।

"কে তোমার মনিব?" জিজ্ঞাসা করলেন তৌ। আগন্তুক সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, "আমার মনিবের বাড়ী বেশী দূরে নয়। অনুগ্রহ করে চলুন আমার সঙ্গে।"

তৌ দ্বিরুক্তি না করে পিছু নিলেন তার। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর তৌ এক জঙ্গলের মধ্যে দেখলেন বিস্তর শাদা রঙের বাড়ী। বাড়ীগুলির চারিপাশে রকমারি গাছের ঝোপ। দরজাগুলি অদ্ভুত ধরনের। তৌ-এর সঙ্গী সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে এগিয়ে চলল নীরবে। সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে জনকতক লোক পায়চারি করছিল পথে। তৌ-এর সঙ্গীকে তারা জিজ্ঞাসা করলে, "তৌ-স্থন্ এসেছেন নাকি?" সে একটু হেসে ঘাড় নেড়ে দেখিয়ে দিতে তৌকে।

আরো খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর, তাঁরা একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখতে পেলেন সামনে। তৌ-এর সঙ্গী ভিতরে ঢুকল তৌকে সঙ্গে করে। হোম্‌রা-চোম্‌রা একজন লোক এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন কবিকে। তাঁর চেহেরা ও পোশাক দেখে মনে হল, নিশ্চয়ই তিনি একজন পদস্থ লোক। তৌ ইতস্ততঃ করে বললেন, "আপনাদের সৌজন্যে আমি পরম পরিতুষ্ট। কিন্তু আপনাদের প্রভুর পরিচয় জানবার সৌভাগ্য এখনও আমার হয়নি।"

"আমাদের প্রভু অর্থাৎ এদেশের রাজা আপনার গুণপনার কথা অনেক দিন থেকেই শুনে আসছেন—আপনার সঙ্গে তাই সাক্ষাৎ-পরিচয়ের অভিলাষী।" জবাব দিলেন রাজকর্মচারী।

"কিন্তু আপনাদের রাজা কে?" প্রশ্ন করিলেন তৌ।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি দেখতে পাবেন তাঁকে। কর্মচারীর কথা শেষ হতে না হতেই দুটি সুন্দরী মেয়ে উৎসবের পতাকা হাতে করে উপস্থিত হল সেখানে এবং তৌকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল রাজসভায়।

তৌ এসে দাঁড়াতেই রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। তারপর তাঁর হাত ধরে পরম সমাদরে আসন দিলেন বসতে। সভাসদেরা সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন তৌকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসবের আলোজন হল। বড় বড় পাত্রে করে খাবার এল হাজার রকমের—সঙ্গে সুগন্ধি সরবৎ। খাবারের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখে তৌ একেবারে অবাক।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না যেন। তৌ চারিদিকে তাকালেন কৌতূহলী দৃষ্টিতে। এ কোথায় এসে পড়লেন তিনি? এ স্বপ্ন, না সত্য? হঠাৎ এক সময় দৃষ্টি পড়ে দেওয়ালে টাঙানো একখানা বড় কাগজের উপর। কি যেন লেখা রয়েছে তাতে। তৌ ভাল করে লক্ষ্য করেন। লেখাটা পড়ে ফেলেন অনায়াসে—কসিয়ার রাজদরবার। কিন্তু কৈ এ নাম তো কোনদিন শোনেন নি এর আগে। তৌ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন, শুধু অবাক হয়ে দেখেন রাজদরবারের বিপুল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর।

হতবুদ্ধির মতো তৌকে চারদিকে তাকাতে দেখে রাজা বললেন, "আপনার মত গুণীকে বন্ধু পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি মনে কোন ভয় বা অবিশ্বাস পোষণ করবেন না, সানন্দে উৎসবে যোগদান করুন।"

রাজার কথায় তৌ অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। ভয় ও উদ্বেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে, তিনি এবার আমোদ-প্রমোদে যোগদান করলেন। ভোজনপর্ব শেষ হতে না হতেই দূরে বাঁশী বেজে উঠলো বিচিত্র সুরে, আর সেই সঙ্গে সুমিষ্ট কণ্ঠের গান। তেমন গান তো কোনদিন শোনেন নি। সুরের মায়াজাল যেন আচ্ছন্ন করে সারা মনকে।

গান শেষ হবার পর রাজা বললেন, "আমি এবার শ্লোকের একটি চরণ আবৃত্তি করবো—আপনারা পাদপূরণ করুন।

সেটি হচ্ছে এই: "ভাবভুবনের বাণীরে মুখর করে কবি গুণীজন—"

সভায় উপস্থিত কবি ও পণ্ডিতেরা পাদপূরণের জন্য যখন ভাবছেন একমনে, তখন তৌ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হৃদি-মধু লোভে কমলের পাশে অলি করে গুঞ্জন।"

রাজা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "এ অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার! পাদপূরণের জন্য আপনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করলেন, তার মধ্যে আমার মেয়ের নাম এসে পড়েছে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে! আমার মেয়ের নাম কমললতা। জানি না এর পিছনে দৈবের কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে কিনা। কিন্তু আপনি যখন নামটা তার উচ্চারণ করেছেন, তখন তার সঙ্গে আপনার পরিচয়টা করিয়ে দেওয়া দরকার।"

রাজা মেয়েকে দরবারে আনবার হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই রাজকন্যা কমললতা অপরূপ সাজসজ্জা করে সখীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন দরবারে। রাজকন্যার বয়স পনেরো যোলো—নিখুঁত সুন্দরী। তার রূপের জলুস দেখে তৌ অবাক হয়ে গেলেন—একদৃষ্টে

তাকিয়ে রইলেন তার মুখের পানে। রাজা মেয়েকে বললেন, কবিকে অভিবাদন করতে। কমললতা নত হয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ধীরপদে ফিরে গেলেন অন্তঃপুরে।

তৌ যে রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন রাজা তা লক্ষ্য করলেন। তাই তিনি তৌকে উদ্দেশ করে বললেন, "রাজকন্যার বিবাহের বয়স হয়েছে—আমি ওকে পাত্রস্থ করতে চাই। কিন্তু এমনি আমার ভাগ্য যে নানা জায়গায় সন্ধান করেও উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না।" কিন্তু তৌ তখন রাজকন্যার ধ্যানে এমনি তন্ময় যে রাজার কোন কথাই তাঁর কানে গেল না।

রাজকন্যা কমললতার রূপের জলুস দেখে তৌ অবাক হয়ে গেলেন।

তৌকে অন্যমনস্ক দেখে রাজার একজন পরিষদ তৌ-এর হাতখানা স্পর্শ করে মৃদুস্বরে বললেন, "মহারাজ যা বললেন তা আপনি শুনতে পেয়েছেন কি?" তৌ-এর চমক ভাঙল। বিনীত ভাবে ত্রুটি স্বীকার করে তিনি বিদায় চাইলেন রাজার কাছে।

রাজা বললেন, "আপনার সাহচর্য পেয়ে আজ আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করছি। আপনি যদি আমাদের ভুলে না যান, তবে আশা করি আবার আপনার দর্শন পাবো দিনকতক পরে।"

তৌকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য রাজা একজন পদস্থ কর্মচারীকে পাঠালেন সঙ্গে। পথে যেতে যেতে কর্মচারী এক সময় তৌকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মহারাজ যখন আপনাকে

মেয়ে দিতে চাইলেন তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? আপনি কি তাঁর কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি?"

তৌ হাঁ করে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। অমন সুযোগটা যে তিনি হেলায় হারিয়েছেন, একথা ভেবে মনটা তার অনুতাপে ভরে গেল।

ঠিক এই সময় তৌ-এর ঘুম ভেঙে গেল। সূর্য তখন অস্ত গেছে, সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে। চুপ করে বিছানার উপর বসে তৌ স্বপ্নের কথা বার বার ভাবতে থাকেন। রাজকন্যা কমললতার অনিন্দ্যসুন্দর মুখ তখনও যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে, তার কেশের সুগন্ধ তখনও যেন মিশে রয়েছে বাতাসে।

রাত্রে আবা। যখন তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়, আলোটা আর বেশীক্ষণ জ্বলিয়ে রাখলেন না। ভাবলেন আলোটা নিবিয়ে দিলে হয়তো দুপুরের দেখা সেই স্বপ্ন আবার এসে ধরা দেবে মনের মধ্যে।

কিন্তু পর পর কয়েক রাত্রি কেটে গেল, সে স্বপ্ন আর ফিরে এলো না। তারপর একদিন রাত্রে এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন তৌ; রাত্রে আর বাড়ী ফেরা হল না। সবে ঘুমটা এসেছে, এমন সময় সেই আগেকার লোকটি এসে আমন্ত্রণ জানাল রাজার।

আবার তৌ চললেন তার পিছু পিছু—সেই পুরোনো পথ। আগেকার দেখা সেই বাড়ীগুলো আবার চোখে পড়ল। অবশেষে তৌ এসে উপস্থিত হলেন রাজদরবারে। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে কাছে এনে বসালেন।

রাজা তৌকে বললেন, "রাজকন্যাকে যে তৌ-এর খুব পছন্দ হয়েছে তা' তিনি জানতে পেরেছেন। তৌ-এর যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে অযথা কালবিলম্ব না করে বিবাহের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।" তৌ অবশ্য আপত্তি করলেন না, এবং রাজার হুকুমে উৎসবের আয়োজন শুরু হল।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনায় কাটাবার পর অন্তঃপুর থেকে খবর এল, রাজকন্যার সাজ-গোজ শেষ হয়েছে—শীঘ্রই তিনি আসছেন সহচরীদের নিয়ে। সকলে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে। তৌ-এর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সত্যই কি তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হবে এতদিনে। ফিন্‌ফিনে গোলাপী ওড়নায় মুখ ঢেকে, লঘুপদক্ষেপে ঝরণাধারার কলধ্বনি তুলে, দরবারে এসে উপস্থিত হলেন রাজকন্যা—সঙ্গে সুসজ্জিত সহচরীর দল।

রাজকন্যাকে অভিবাদন করে তৌ বললেন, "আপনার রূপলাবণ্যের তুলনা নেই। মহারাজের অসীম অনুগ্রহেই আপনার পাণিগ্রহণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার, কিন্তু দয়া করে বলুন এ স্বপ্ন না সত্য।"

"এ স্বপ্ন হবে কেমন করে ? দেখছেন না আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনার সামনে।" মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন রাজকন্যা।

পরের দিন সকালে উৎসব উপলক্ষে রাজকন্যা যখন মুখ চিত্রিত করে বসলেন, তখন তৌ এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তুলির নিপুণ আঁচড়ে রাজকন্যার মুখের শোভা শতগুণ বেড়ে গেল যেন—সদ্য ফোটা কমলের অপরূপ বর্ণসুষমা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপর তৌ রাজকন্যার কটিবন্ধটি নিয়ে মাপতে লাগলেন রাজকন্যার কোমরের বেড়, হাতের আঙুল ও পায়ের দৈর্ঘ্য।

"এ আপনি করছেন কি ?" রাজকন্যা হাসতে হাসতে বলেন।

"একবার ঠকেছি আমি। তাই এসব যত্ন করে টুকে রাখছি। এটা যদি স্বপ্নই হয় তাহলেও আপনাকে মনে রাখবার মত কিছু একটা থাকবে।" সপ্রতিভ মুখে জবাব দেন তৌ।

যখন তাঁরা দু'জনে এই সব আলাপ করছেন, সেই সময় রাজকন্যার এক সহচরী ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে বললে, "সর্বনাশ হয়েছে আমাদের ! একটা ভয়ঙ্কর দানব প্রাসাদে এসে পড়েছে। মহারাজ ভয় পেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন গুপ্তকক্ষে ! শাস্ত্রী প্রহরী সবাই সরে পড়েছে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে !"

তৌ ব্যস্তভাবে চললেন রাজার সন্ধানে। তৌকে দেখে রাজা যেন সাহস পেলেন কতকটা। কাতরভাবে তৌকে তিনি অনুরোধ করলেন এই অপ্রত্যাশিত বিপদে সাহায্য করবার জন্য।

"আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে, এই বিপদ ঘটবার আগেই আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়েছে আমাদের। আপনি জ্ঞানী বহুদর্শী। রাজ্য আমার নষ্ট হতে বসেছে, বলুন কি উপায় করি ?"

তৌ ব্যাপারটা জানতে চাইলেন বিশদভাবে। রাজা তখন তৌ-এর হাতে একখানা পত্র দিয়ে বললেন, "এই পত্রখানি পড়ুন—সবই জানতে পারবেন তাহলে।"

পত্রখানি লিখেছেন শহরের শান্তিরক্ষক। পত্রে লেখা :

"এইমাত্র আমরা সংবাদ পেলাম একটা প্রকাণ্ড দানবকে প্রাসাদের সিংহদ্বারের সামনে দেখা গেছে। এরই মধ্যে সে নাকি মহারাজের হাজার পনেরো প্রজাকে উদরস্থ করেছে এবং আরো শিকার ধরবার আশায় এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। চারিদিকে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রজারা যে-যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। সংবাদ পেয়েই আমরা রওনা হই সিংহ-দ্বারের দিকে—সেখানে যা দেখি তাতে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। সিংহদ্বারের দশ বারো হাত দূরে একটা বিষধর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে—মাথাটা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড, চোখ দুটো সমুদ্রের মত বিরাট ! প্রতিবার সে যখন মাথা তুলছে, তখনই-বড় বড় অট্টালিকা তার মুখের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ! আবার দেহটা এমন প্রকাণ্ড যে, যখনই সে গা নাড়া

দিচ্ছে, তখনই বড় বড় দেওয়াল ধসে পড়ছে মাটিতে; এরকম ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে কুত্রাপি পাওয়া যায় না। আমাদের মন্দির ও প্রাসাদের ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমান করা যায়। অতএব অধীনের বিনীত প্রার্থনা এই যে, পত্রপাঠ মাত্র মহারাজ সপরিবারে প্রাসাদ পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করুন।"

চিঠি পড়া শেষ না হতেই একজন প্রহরী ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, "মহারাজ, পালান—পালান—শত্রু এসে পড়েছে!"

ঘরসুদ্ধ লোক ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল, বিলাপ ও ক্রন্দনের রোল উঠল অন্তঃপুরে।

রাজা নিজেও অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তৌকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। আপনি আমাদের অতিথি—আপনাকে এ বিপদে জড়াতে চাই না আমি। আপনি যেখানে নিরাপদ মনে করেন অবিলম্বে চলে যান সেইখানে।"

রাজকন্যা কমললতা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। রাজার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি এসে তৌ-এর পায়ে আছড়ে পড়লেন। "আমি অত্যন্ত বিপন্ন—আমায় ফেলে যাবেন না আপনি।" কাতরকণ্ঠে বললেন রাজকুমারী।

তৌ সস্নেহে তাঁকে মেঝে থেকে তুললেন। তারপর রাজার দিকে চেয়ে বললেন, "মহারাজ, যদি আমার দুঃসাহস ক্ষমা করেন, তাহলে একটি নিবেদন জানাই। রাজকন্যা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমার সামান্য কুটীরে অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারেন।"

"আপনি দেরি করবেন না, এখনই আমাকে নিয়ে চলুন সেইখানে।" রাজকন্যা বললেন অধীরভাবে।

রাজার কাছে বিদায় নিয়ে, তৌ তাড়াতাড়ি রওনা হলেন বাড়ীর দিকে।

পাছে রাজকন্যা কোন অসুবিধা বোধ করেন সেই ভয়ে তৌ বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন নিজের দৈন্যের জন্য, কিন্তু রাজকন্যা হাসিমুখেই বলেন, বাড়ী খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর—এ বাড়ী তাঁর বাবার প্রাসাদের চেয়েও সুন্দর ও মনোরম।

"আমি তো আশ্রয় পেয়েছি এখানে; কিন্তু আমার মা-বাবা আর অন্য সকলের কী হবে? আপনি এবার তাদের সকলকে আনবার ব্যবস্থা করুন।" রাজকন্যা অনুরোধ করেন তৌকে।

রাজকন্যার কথা শুনে তৌ অবাক। অত লোকের জায়গা তিনি দেবেন কোথায়? রাজ-প্রাসাদের লোকজন তো কম নয়! কিন্তু তৌ-এর আপত্তি দেখে রাজকন্যা গেলেন খুব চটে। রাগে মুখ লাল করে তিনি বললেন, "বিপদের সময় যে তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম, সে তাঁর স্বামী

হবার যোগ্য নয়। রাগের চোটে চোখে জল এসে গেল তাঁর। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না —কান্নার বেগ আর থামতে চায় না। তৌ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে যখন তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন, সেই সময় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং তিনি বুঝতে পারলেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি।

কিন্তু তখনও কানের কাছে ভোঁ ভোঁ একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি এবং চারিধারে ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেলেন, গোটা দুই তিন মৌমাছি এসে বসেছে বালিশের উপর। কিন্তু তাড়া দিতেও তারা কিছুতেই নড়ল না। ঘুরতে লাগল বালিশের আশেপাশে।

তৌ ব্যস্ত ভাবে ডাকলেন বন্ধুকে এবং আরও কয়েকটা মৌমাছি পোশাকের ভিতর আবিষ্কার করলেন। তাঁর ঘরের আশেপাশেও দু'চারটে মৌমাছি চোখে পড়ল। তৌ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিলেন তাড়াতাড়ি একটা মৌচাক আনবার জন্য। বন্ধুর পরামর্শ উপেক্ষা করলেন না তৌ এবং যেই মৌচাক আনা হ'ল ঘরে, অমনি ঘরের ভিতরকার মৌমাছিগুলো আশ্রয় নিল তার মধ্যে। তাছাড়া কোথা থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ে এল বাগানের দেওয়ালের উপর দিয়ে এবং নিমেষে ভরিয়ে ফেলল মৌচাকটা।

ব্যাপার দেখে তৌ আর তাঁর বন্ধুর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মৌমাছির ঝাঁক এল কোথা থেকে তাঁরা তার সন্ধান শুরু করলেন। সন্ধান মিলে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। পাড়ার এক বুড়ো চাষীর বাড়ীতে চাক বেঁধেছিল ওরা—চাক ভেঙে ফেলতে দেখা গেল তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ—তৌ-এর স্বপ্নের সেই দানব।

মৌমাছিরা তৌ-এর কাছেই রয়ে গেল আর সংখ্যায় বাড়তে লাগল দিনে দিনে।*

---

* সপ্তদশ শতাব্দীর চীন দেশীয় লেখক পু সুঙ লিঙ হইতে।

উমনো-ঝুমনো

শ্রীগোপাল ভৌমিক

উমনো-ঝুমনো দুটি বোন
কোথায় তাদের বাড়ি?
বলতে যদি পার ভালই
নইলে দিলাম আড়ি।
দুটি বোনের চোখের কোণে
একটি আকাশ তারা
নইলে তারা ঝড়-বাদলে
পড়বে পথেই মারা।

বনের পথে চলছে তারা
কোথায় কে ছাই জানে!
একটি যদি চলবে বাঁয়ে
অপরটি যায় ডানে।
উমনো-ঝুমনো দুটি বোন
হারায় না তাও পথে,
যাবেই তারা রাজপুরীতে
চড়তে সোনার রথে।

উদ্ভিদেরাও ভয় দেখায়

শ্রীঅমরনাথ রায়
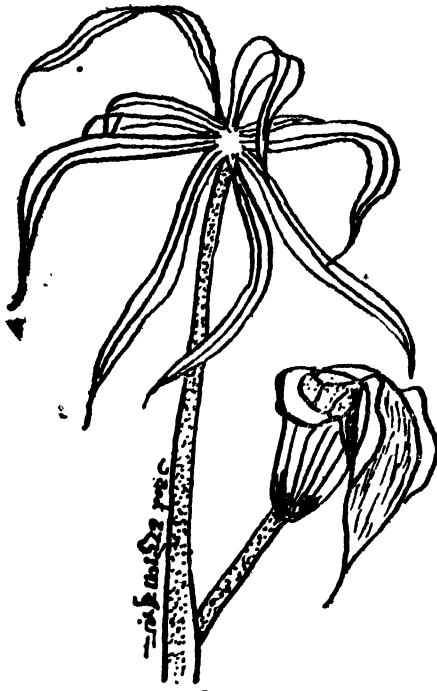
অ্যারিসেমা

উদ্ভিদেরা বড় নিরীহ হয়ে থাকে। আক্রমণ করলে উদ্ভিদ প্রতিআক্রমণ করে না। তাদের ঝাড়ে-বংশে নিধন করবার চেষ্টা করলেও তারা কোন প্রতিবাদ জানায় না। তবে হ্যাঁ, কোন কোন উদ্ভিদ বাঁচবার তাগিদে, আত্মরক্ষার তাগিদে, অভিনব কৌশল অবলম্বন করে থাকে। তারা তৃণভোজী জন্তু, অর্থাৎ তাদের শত্রুকে ভয় দেখাতে পারে। কি ভাবে—তা শোন।

তোমরা যদি কখনও আসাম রাজ্যের 'শিলং' শহরে যাও, তবে সেখানে কচু জাতীয় এক রকম উদ্ভিদ দেখতে পাবে। ঐ উদ্ভিদের নাম 'অ্যারিসেমা'। বর্ষাকালে অ্যারিসেমা প্রচুর জন্মে।

এই উদ্ভিদের মঞ্জরীপত্রটি বড় বিচিত্র ধরনের। মঞ্জরীপত্রের বাইরের রং সবুজ কিন্তু ভেতরের রং লাল। মঞ্জরীপত্রটি অ্যারিসেমার ফুলটির মাথায় সাপের মত ফণা তুলে থাকে। ফুলের মাথার ওপরে মঞ্জরীপত্রটি এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যে, দূর থেকে তাকে সাপের ফনার মত দেখায়। তৃণভোজী জন্তুরা তাদের স্বভাববশতঃ অ্যারিসেমাকে খেতে আসে। কন্তু অ্যারিসেমার ফুল দেখে সাপের ফনা ভেবে ভয়ে পালিয়ে যায়। ফলে এই উদ্ভিদটি তৃণভোজী জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচে।

এমনিভাবে আত্মরক্ষার তাগিদে কোন উদ্ভিদের অঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে কোন বস্তু বা কোন জন্তুর অঙ্গের আকার ধারণ করার নাম 'অনুকৃতি'—ইংরেজীতে 'মিমিক্রাই'। অনুকৃতির দ্বারাই অ্যারিসেমা তার শত্রুকে ভয় দেখায় ও প্রবঞ্চিত করে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

তোমরা হয়তো বন-ওল দেখে থাকবে। বন-ওলের ফুল যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হয় যেন মাটির ওপরে একটি বিষধর সাপ ফণা তুলে এগিয়ে আসছে।

বুঝতেই তো পারছ—শত্রুকে ভয় দেখিয়ে বন-ওলের আত্মরক্ষার এটা কৌশল মাত্র।

আফ্রিকার এক মা

দুই রাজা

শ্রীমতী বেলা দে

দুই রাজা - রকফেলার ও মার্কনী

সভ্য জগৎ যে কয়জন মানুষকে কখনো কিছুতেই ভুলতে পারবে না, তাদের মধ্যে দু'জনকে আমরা চিরদিন মনে রাখবো। যদিও তাঁরা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁদের অনবদ্য সাধনার সুষমা। এঁদের একজন হলেন 'রকফেলার'—ধনকুবের, অগাধ সম্পত্তির অধিকারী; আর অন্যজন প্রাকৃতিক রহস্যের অন্যতম উদ্‌ঘাটনকারী বৈজ্ঞানিক 'মার্কনী'।

এঁরা দু'জন দুই বিষয়ের রাজা এবং এঁদের রাজ্যও একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। একটির সঙ্গে অপরটির কোনো মিল নেই। রকফেলার অর্থের সম্রাট, যে অর্থ দিয়ে পৃথিবীর সব কিছুই পাওয়া যায়, যে অর্থ দার্শনিকদের মতে সমস্ত অনর্থের মূল—লক্ষ্মী সেই অর্থ তাঁকে দু'হাতে ঢেলে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন এ যুগের লক্ষ্মীর বরপুত্র।

আর একজন হলেন 'হাওয়া' বা 'বাতাস' দেশের রাজা। যে হাওয়াকে আমরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি, কিন্তু চোখে দেখতে পাই না। যে কেবল মধুর প্রভাতে আমাদের শরীর জুড়িয়ে দিয়ে যায়, তিনি হলেন সেই 'বায়ুতরঙ্গের' রাজা। কবির হাতে ছন্দ যেমন করে ধরা দেয়, শিল্পীর হাতে বীণা যেমন বেজে ওঠে, সংগীতজ্ঞের কাছে গান যেমন অপরূপ মূর্ছনার রেশ আনে, হাওয়াও তেমনি করে মার্কনীর কাছে বশীভূত হয়েছিল। আর তিনি যে রহস্যের আবিষ্কার করলেন, তার ফলে বাতাস সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য মানুষের দাস হয়ে রইল।

মার্কনী একজন খাঁটি বৈজ্ঞানিক। তিনি হলেন 'হাওয়ার যাদুকর' বা 'King of the air'.

তিনি কেবল আদর্শ সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হননি ; বৈজ্ঞানিকের যা আসল কাজ তিনি হাতেনাতে সেই পন্থা অবলম্বন করে যে তথ্য উদ্‌ঘাটন করলেন, তাতে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এল যুগান্তর, পৃথিবী পেলো নতুন জীবনের সন্ধান, মুহূর্তে যেন সমস্ত দূরত্ব ও জড়তা কেটে গেল। সারা বিশ্ব সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে তাঁকে বরণ করে নিল।

ধনকুবের রকফেলার কেবল টাকার জন্যই কি পৃথিবীতে নাম করতে পেরেছিলেন! না, তা নয় ; প্রথমতঃ তিনি তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে গেছেন যে, প্রকৃত ক্ষেত্র পেলে অর্থাৎ উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে, যত বড় দরিদ্রই হোক না কেন, অধ্যবসায় ও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করলে লক্ষ্মী যে তাঁর ঘরে আবির্ভূত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মহামানবের বাণীকে অবহেলা করেন নি। তাঁর দান অনন্তকাল ধরে মানুষের সুখশান্তি সাধনে সহায়তা করবে।

আর মার্কনী পৃথিবী জয় করলেন কি করে জানো? তাঁর মৃত্যুর পর শোক দেখাবার জন্য দু'মিনিট কাল সব বেতার কার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই দুই মিনিট না করে যদি দু'ঘণ্টা করা হোত, তাহলে পৃথিবীর কত লোকের যে কত ক্ষতি হোত তার ইয়ত্তা নেই। কাজেই কতখানি তাঁর সাধনা মানবজীবনে অনির্বার্যরূপে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, এই ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখলেই তোমরা তা বুঝতে পারবে। তাঁর এই দান পৃথিবী কিছুতেই ভুলতে পারবে না। তাঁকে আমরা সসম্ভ্রমে চিরদিন যেন স্মরণ রাখতে পারি।

এই দু'জনের সাধনার ক্ষেত্রে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেন এঁদের দু'জনের কথা একসঙ্গে উল্লেখ করলাম তার কারণ, এই দু'জন বিশ্ববিশ্রুত মানুষ একই বছরে পৃথিবীর আসন শূন্য করে অজানা দেশে যাত্রা করেছিলেন।

তাই মনে হয় রাজা-রাজড়ারা রাজ্য জয় করে যে কীর্তিস্তম্ভ কালের বুকে রেখে যেতে পারেন নি, নিঃসন্দেহে এই দু'জন মনীষী ততোধিক দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করে বরণীয় হয়ে থাকবেন চিরদিন।

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি সোভিয়েত দেশের ডাকটিকিট

কুমীদুরের গ্রহ

শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
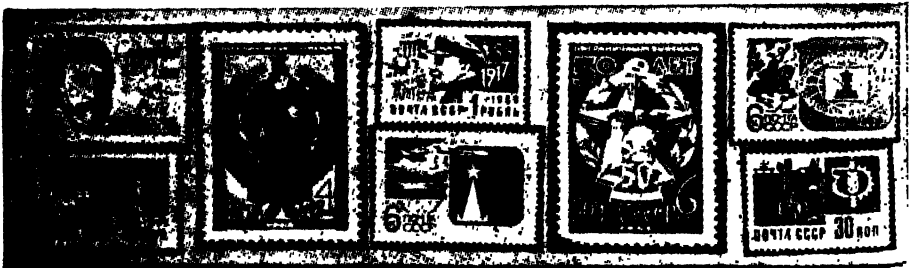
মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে। চাঁদ থেকে যাবে মঙ্গলগ্রহে। তারপর শুকতারার দেশে। আরও অনেক দূরে অন্য গ্রহে। যেখানে থাকবে প্রাণ। জীবন। জীব।

ধরা যাক সেদিন এসেছে। মানুষ আমাদের চেনা সূর্যের জগৎ ছাড়িয়ে অচেনা সূর্যের জগতে গেছে। একটি গ্রহে জীবন্ত প্রাণীর সন্ধান পেয়ে রকেট-জাহাজ নামিয়েছে। আশ্চর্য সে গ্রহে বিচরণ করে কিম্ভূতকিমাকার জীবের দঙ্গল। কুমীরের মত বপু—কিন্তু ইঁদুরের মত মুখ। তবে নির্বোধ নয়।

তারপরের কাহিনী সে-গ্রহের এক বাসিন্দার মুখে শোনা যাক। মনে রাখতে হবে, এ কাহিনী যে বলছে, চেহারায় সে হাঁসজারু। অর্থাৎ কুমীর আর ইঁদুরের বিটকেল সংমিশ্রণ। অথচ ঘটে যৎসমান্য বুদ্ধি রাখে। মানুষ দেখে প্রথমে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, এ আবার কি রে বাবা! দু-পেয়ে জানোয়ার বাপের জন্মে তো দেখিনি! রকেট-জাহাজের উজ্জ্বল ধাতব-দেহ দেখেও কুমীদুর (কুমীর যুক্ত ইঁদুর) জীবের চোখ কপালে উঠেছিল নিশ্চয়। মনে মনে বলেছিল—কী সাংঘাতিক! এ যে দানব-পাখী!

চক্ষু চড়কগাছ হয়েছিল এর পরেই। সহসা উজ্জ্বল-দেহ রাক্ষুসে পাখীর পেট চিরে

বেরিয়ে এসেছিল দু-পেয়ে মানুষগুলো। কী ভয়ানক! কুমীতুরের উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষে এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখিনি!

কুমীতুরদের কুৎসিত চেহারা মোটেই ভাল লাগেনি মহাকাশ অভিযাত্রীদের। পক্ষান্তরে মানুষের বিদঘুটে চেহারা দেখে শিহরিত হয়েছে কুমীতুর জীবরা। মানুষ দেখে তাদের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, একজন কুমীতুরের জবানীতে তাই শোনা যাক।

কুমীতুর বলছে:

প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আকাশ থেকে এমন রাক্ষুসে পাখী কখনো আমাদের তল্লাটে নামেনি। কি বিকট চেহারা পাখীটার। ঝকমক করছে সারা গা। শূন্য থেকে নামবার সময়ে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরোচ্ছিল ল্যাজ দিয়ে, পাখী যে এতবড় হয় তা সেই প্রথম দেখলাম।

উপত্যকায় নামল রাক্ষুসে-পাখী। তৎক্ষণাৎ ল্যাজের আগুন নিবে গেল। আমাদের বুক ঢিপঢিপ করছিল, তাই দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরেই চমকে উঠলাম। পাখীটার পেট ফাঁক হয়ে গেল। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল আর একটা বিদঘুটে জন্তু আকারে খুব ছোট আমাদের ল্যাজের চাইতেও ছোট।

এরকম সৃষ্টিছাড়া জানোয়ার আমরা কখনো দেখিনি। পুঁচকে চেহারা হলে কি হবে, ল্যাজের সংখ্যা কিন্তু দুটো—আমাদের মত একটা নয়। দু'দুটো সরু সরু ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাণীটা। লিকপিকে শুঁয়োর মত দুটো হাত নাড়ছিল দেখে তো আমরা তাজ্জব বনে গেলাম।

[পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় বুঝেছেন কুমীতুরের চোখে মানুষের জোড়া ল্যাজ দুটি আসলে দুটি পা। যেহেতু কুমীতুরের সংজ্ঞায় নিম্নতম প্রত্যঙ্গ হলেই ল্যাজ হয়, অতএব মানুষের পদযুগলও তার কাছে ল্যাজের সামিল। কুমীতুর অবশ্য জানে না, এককালে আমরাও ল্যাজ নাড়তাম। এখন অবশ্য তারা আমাদের পূর্বপুরুষ শাখামৃগ নামেই পরিচিত।]

কিন্তু কী আশ্চর্য! রাক্ষুসে পাখী কি মরে গেল? আগুন ছিটানো নেই, হাঁকডাক নেই। চুপচাপ পড়ে রইল অবিকল মরা পাখীর মতই। চেরা পেট থেকে আরো একজন দু'পেয়ে জানোয়ার বেরিয়ে এল। আরো দুটো ল্যাজ। রগড় দেখার জন্যে এবার একটু কাছে গেলাম। ভয়? আরে ছোঃ! রাম-পুঁচকে প্রাণী দেখে আঁৎকে ওঠার মত কলজে এ শর্মার নয়! তেমন বেচাল দেখলে ল্যাজের এক ঝাপটায় যমালয়ে পাঠাতে কতক্ষণ!

তাই গুটি গুটি কাছে এগিয়ে গেলাম। বিতিকিচ্ছিরি জন্তু ড়ুটোকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। দেখে তো গা পাক দিয়ে উঠল। রামো! রামো! গায়ের রঙের এ কী ছিরি? কাঁচা মাংসর রঙ যে রকম—জন্তু ড়ুটোর গাত্রবর্ণ অবিকল সেই রকম। তার ওপর ইয়া বড় একটা মাথা—যেন একটা মস্ত জালা। চকচকে জালা। সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে মাথার মধ্যে মাথা। কি হল? বোঝা গেল না? আরে বাবা, বাইরে একটা চকচকে মাথা—ভেতরে আর একটা ছোট্ট মুণ্ডু। মুণ্ডুর ড়ুটো চোখ। চোখের নিচে খানিকটা কাটা মত জায়গা। নিশ্চয় মুখ। কাটা জায়গাটা ফাঁক করে কি যেন বলছে রাক্ষুসে জীবটা। অদ্ভুত আওয়াজ করছে।

[কী এই মাথার মধ্যে—মাথার রহস্য? মহাকাশযাত্রীদের স্পেশহেলমেট পরতে হয়। স্বচ্ছ বর্তুলাকার বায়ুনিরোধক হেলমেটের মধ্যে অভিযাত্রীর মাথা সুরক্ষিত থাকে। চাঁদে যাঁরা গিয়েছিলেন—এ হেলমেট তাঁদেরও পরতে হয়েছে। কুমীড়ুররা এই স্পেশ-হেলমেটকেই ভেবেছে জালার মত মস্ত চকচকে মাথা।]

অনেকক্ষণ মাটি আঁকড়ে বসে রইলাম। কিম্ভূতকিমাকার জীবটা সূর্যের দিকে হাত বাড়িয়ে কি যেন বলল। তারপর নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধ উজ্জ্বল পাখীর গা চাপড়ালো। সবশেষে হাত দেখালো জমির দিকে।

মোড়ল বসেছিল আমার পাশেই, বিজ্ঞের মত বলল—"আচ্ছা আহাম্মক তো! কি বলছে বুঝেছিস?"

"না।"

"বলছে, সূর্য নাকি মাটি খায়!"

"ইয়ার্কি মারছে বোধহয়।"

"ইয়ার্কি? দোব নাকি ল্যাজের এক বাড়ি—"

আমি আর কিছু বললাম না। দেখলাম, কিম্ভূতকিমাকার জন্তু ড়ুটো কিরকম অদ্ভুতভাবে হেঁটে হেঁটে মাটিতে নেমে এল। ড়ু'জনেরই হাতে ড়ুটো খেঁটে। চকমকে লাঠি। লাঠি নেড়ে আমাদের ডাকল।

আমি চিরকালই ডানপিটে। তাই একাই এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, জন্তু ড়ুটোর গায়ে আঁশ নেই। ভারী আদিম জন্তু তো! তা নাহলে পাখীর পেটে থাকে। পাথরের ঘর বানাবার মুরোদও নেই।

ড়ুটো ল্যাজে ভর দিয়ে জন্তু ড়ুটো কাছে এল। মুখের কাটা জায়গাটা নেড়ে নেড়ে কি যেন

বলতে লাগল। আমিও বললাম—তোমরা এত কুৎসিত কেন? ওরা পাথরের কুচির মত সাদা দাঁত দেখাল। মনে হল হাসছে।

আমার কিন্তু ধারণা হল, ওরা যা বলতে চাইছে ইচ্ছে করলে জানা যায়। ওদের ভাষা ওদের মতই নিশ্চয় কুৎসিত। শিখতে দোষ কি? মোড়লকে গিয়ে তাই বললাম।

ধাঁ করে রেগে গেল মোড়ল। ডানপিটে একটা ছোকরা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। রাগের মাথায় মোড়ল তাকে এমন ল্যাজের ঝাপটা মারল যে বেচরী সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেল। আমিও গেলাম রেগে। মারলাম ল্যাজের পালটা ঝাপটা। বেগতিক দেখে লম্বা দিল মোড়ল। আমার ল্যাজকে ভয় পায় না এমন জীব এ তল্লাটে নেই। এত বড় আর এমন সাংঘাতিক কাঁটাঅলা ল্যাজ বলতে গেলে শুধু আমারই আছে। তাই এত সমীহ!

যাই হোক, আমি ফিরে গিয়ে জন্তু দুটোর কাছে বসলাম। দু'জনেই একটু পিছিয়ে গেল। হাতের চকচকে লাঠি দুটো নাড়তে লাগল। আমিও ল্যাজ নাড়তে লাগলাম।

মোড়ল সবাইকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল। দেখলাম, পাহাড়ের ওপরে আস্তে আস্তে ওদের চেহারা মিলিয়ে গেল। আমি কিন্তু সারারাত সেখানে বসে রইলাম। সমস্ত রাত ধরে বিচ্ছিরি জন্তুগুলো আমার সামনে এল আর গেল। কত বকবক করল।

সকাল হলে পাহাড়ের ওপর আমার বাড়ি গেলাম। আমাকে দেখেই আমার বউ পেছন ফিরে খেতে বসল। এইটাই প্রথা। আমি ল্যাজের এক বাড়িতে বউকে মেরে ফেললাম।

খেয়েদেয়ে বেরোলাম নতুন বউ আনতে। গাঁয়ের একদম শেষে বাড়তি মেয়েদের খোঁয়াড়। এখানে ওরা ডিমে তা দেয়। ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করে। যার দরকার পড়ে, খোঁয়াড় থেকে বউ বেছে নিয়ে যায়। আমাদের সুসভ্য সমাজে কুড়ি দিনের বেশি ঘরে বউ থাকে না। অসভ্য সমাজে কয়েক মাস বউকে জীইয়ে রাখে। কিন্তু আমরা বর্বরতার পর্যায় ছাড়িয়ে এসেছি অযুত বছর আগে। আমাদের সমাজে মেয়ে বেশি জন্মায়। ছেলে খুব কম। তাই কুড়ি দিনের বেশি এক মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পায় না। কুড়ি দিন কি তারও আগে বউকে মেরে আবার খোঁয়াড় থেকে বউ নিয়ে যাই। মেয়েরা এ অবস্থায় খুব খুশী।

রাস্তায় মোড়লের সঙ্গে দেখা হল। মোড়ল এইমাত্র তার বউকে মেরে এল। দু'জনে খোঁয়াড় থেকে দুটো বউ বেছে নিয়ে ফিরলাম। পথে মোড়লকে বললাম, কাল রাতের জন্তুগুলো পাখীর পেটে থাকলে কি হবে, খুব খারাপ নয়। আলাপ করতে চায়। করি না কেন? ভাষাটাও জেনে নিই। মোড়ল আমার ল্যাজকে ডরায়। তাই রাজী হয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন গেল। রোজ পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় যাই। আমার দলবলরা

কোনোদিন আসে, বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন জিনিস দেখতে বেরোয়। যা রোজকার অভ্যেস।

সকাল-বিকেল কেবল আমিই আসতে লাগলাম। জন্তুদের অনেকের সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম ওদের মধ্যেও মেয়ে আছে। তবে আরো লিকপিকে। যেন ফুঁ দিলেই উড়ে যায়। যেখান দিয়ে কথা বলে, সেই জায়গাটা লাল। মেয়ে হলেই নাকি ও জায়গাটা লাল হয়। [পাঠক এবং পাঠিকাদের কাছে লাল ঠোঁটের রহস্য নিশ্চয় অজানা নয়। একেই বলে লিপিস্টিক মহিমা।]

রোজ রোজ এসে, কান খাড়া করে ওদের বকবকানি শুনে কাজ চালানোর মত কিছু কিছু ভাষা শিখে ফেললাম। ওদেরকেও আমাদের উন্নত সভ্যতার কিছু কিছু কথা জানালাম। দেখলাম, হেঁড়ে মাথা হলে কি হবে, ওদের শেখবার ইচ্ছে আছে। আমি যখন কথা বলতাম, ওরা অনেক কালো কালো কলকব্জা এনে সামনে রাখতো। একদিন চমকে উঠলাম একটা যন্ত্রের মধ্যে আমার গলা শুনে। সেদিনই ল্যাজের বাড়ি মেরে জন্তুগুলোকে সাবাড় করতাম। কিন্তু একটা জন্তু বুঝিয়ে দিল। ওটা নাকি কথা ধরার কল। যা বলব, তাই ধরে নেয়। পরে ঠিক আমার মতই কথা বলে। দেখলাম, জন্তু হলেও ওরা কিছু-কিছু সভ্য হয়েছে।

ওদের হাবভাব কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, ওরা আরও মিশতে চায়। আমাকে ওদের ভালো লেগেছে। আমার গাঁ দেখলে ওদের ভালো লাগবে ভেবে মোড়লকে গিয়ে বললাম। মোড়ল ওদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। আমি পীড়াপীড়ি করতে রাজী হল।

আমি ওদের নিয়ে এলাম। ওরা অনেকে এল। লাল ঠোঁটওলা মেয়েরাও এল। সঙ্গে আনল কথা ধরার যন্ত্র, আরও অনেক কল। প্রত্যেকের হাতে চকচকে লাঠি দেখলাম। লাঠিগুলো কি অ্যাদ্দিনে বুঝিনি। বুঝলাম সেদিন।

ওরা গাঁয়ে ঢুকে আমাদের পাথরের নুড়ি দিয়ে তৈরি বাড়ি দেখে হাঁ হয়ে গেল। হবেই তো। পাখীর পেটে থাকা অভ্যেস তো। নুড়ি দিয়ে কুঁড়ে তৈরির কায়দা জীবনে দেখেনি। বাড়ি বাড়ি ঢুকে ওরা আমাদের সংসার দেখতে লাগল। যন্ত্রপাতি নেড়ে নেড়ে কি সব করতে লাগল। যন্ত্রের মধ্যে চোখ লাগিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। দেখলাম, ওরা সত্যিই অবাক হয়ে গেছে আমাদের কীর্তি দেখে।

ওরা মেয়েদের খোঁয়াড়ে গেল। মেয়েরা কিভাবে রাশি রাশি ডিমে তা দিচ্ছে দেখল। তারপর এল মোড়লের বাড়ি। মোড়ল আমাদের সঙ্গেই বাড়ি ঢুকল। ঢুকেই দেখল বউ

পেছন ফিরে বসল। তার মানে, বউ মনে করিয়ে দিল কুড়ি দিন তো হল বাপু! আর কেন, মারো আমাকে! কাল থেকে যে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। গাঁয়ে আর মুখ দেখানো যাবে না।

এত কথা অবশ্য মোড়লের বউ বলল না। শুধু পেছন ফিরে বসল। এইটাই নিয়ম। সতী-সাধ্বীরা এইভাবে স্বামীদের মনে করিয়ে দেয় তাদের কর্তব্য। স্বামীরা সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যপালন করে। ল্যাজের এক ঘায়ে বউ মেরে নূতন বউ নিয়ে আসে। খোঁয়াড়ের মেয়েরা শুনে হিংসেয় মরে। আহা রে, কবে তারা বউ হবে। কুড়ি দিন ঘর করে ল্যাজের বাড়ি খেয়ে পটল তুলবে।

মোড়লের বউ যথাসময়ে মোড়লকে কর্তব্য মনে করিয়ে দিতেই মোড়ল কর্তব্যপালন করল। ল্যাজের এক ঝটকায় বউকে দেওয়ালে আছড়ে মেরে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠল দু'ল্যাজওয়াল' জন্তুগুলো। তড়িঘড়ি দুটো জন্তু বাইরে বেরিয়ে গেল। ওরা আমাদের মত ক্ষিপ্র নয়। দুটো মাত্র ল্যাজে ভর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হয়, পাহাড়ে উঠতে দম বেরিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সেদিন মোড়লের বউকে মরতে দেখে ওরা এমন ছিটকে বাইরে গেল যে, অমনি আমার মনে হল তবে কি পুরুষটার খেয়াল হয়েছে বউ মারার সময় হয়ে গেছে? ওরা দু'জনে ছিল। একজন পুরুষ, আর একজন নারী। দু'জনেই হাতে চকচকে লাঠি বাগিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল ভয় পেয়েছে।

মোড়ল আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওরা অমন করছে কেন। আমি বুঝিয়ে দিলাম আমার অনুমান। বিচ্ছিরি দেখতে হলেও ওরা নেহাৎ বর্বর নয়। আমাদের সভ্য সমাজব্যবস্থা দেখে নিশ্চয় লজ্জা পেয়েছে। বুঝেছে বউ মারবার সময় হয়েছে। নইলে কেলেঙ্কারির একশেষ।

মোড়ল শুনে খুব খুশী। বলল, আমি ঠিকই ধরেছি। ওরা চকচকে পাখীর পেটে বসে উপত্যকায় কুড়ি দিন আগেই নেমেছিল। আজকে ওদেরও নিশ্চয় বউ বদলাবার সময় হয়েছে। কুড়ি দিন ফুরোতেই টনক নড়েছে।

কিন্তু পুরুষটা এত ভ্যাবাগঙ্গারাম যে বলবার নয়। হাতের চকচকে লাঠি নেড়ে খালি চেঁচাতে লাগল। অন্য বাড়ি থেকে ওর সঙ্গীরা দলে দলে বেরিয়ে এল।

মোড়ল বলল,—বুঝেছি। ওদের নিয়ম অন্য রকম। স্বামী বউকে মারে না। অন্যেরা এসে মেরে যায়। তাই দলবল ডাকছে। বেশ তো, আমিই ওর হয়ে মেরে দিচ্ছি। বলে, ল্যাজের এক ঝাপটায় মেয়ে-জন্তুটাকে বিশ হাত দূরে আছাড় মারল।

হাউমাউ করে উঠল বাকী জন্তুগুলো। পুরুষটা চকচকে লাঠি ফেরালো মোড়লের দিকে। লাঠির ডগা দিয়ে আগুন বেরিয়ে এল। মোড়ল গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠে আছড়ে পড়ল। আর নড়ল না।

জন্তুগুলো দল বেঁধে পিছু হটতে লাগল। আর আগুন ছুঁড়তে লাগল। গাঁয়ের অনেক পুরুষ মারা গেল। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনটি হবে ভাবিনি। কি ভেবেছিলাম, আর কি হল।

ওরা আগুন ছুঁড়ে আমাদের ছেলেদেরই কেবল মারল। মেয়েদের কিছু হল না। তারপর পাহাড় বেয়ে নেমে গেল। উঠল পাখীর পেটে। এই অত্যাচারে খুবই ক্ষুব্ধ হল গ্রামবাসীরা। এ কী অনাচার! মোড়ল ভাল করতে গেল—তাকেই কিনা মারা হল? অসভ্য, বর্বর জন্তু কোথাকার!

খোঁয়াড় থেকে মেয়েরা খবর পেয়ে বেরিয়ে এল। ঘোর অনাসৃষ্টি! একটা মেয়েকে মোড়ল মেরেছে—পুণ্যের কাজ করেছে। তাই বলে কিনা এতগুলো পুরুষকে মারা হল। আরও খারাপ হয়েছে একটা মেয়েকেও না মেরে। কি কুচুটে জন্তুরে বাবা! গাঁয়ের ছেলেদেরই শুধু তুলোধোনা করে গেল। মেয়েদের গায়ে হাত দিল না! কি নিষ্ঠুর! কি অন্যায়! কি অসভ্য!

আশপাশের গাঁয়ের খোয়াড় থেকে মেয়েরা এসে জুটল এ গাঁয়ে। সবাই ক্ষুব্ধ। এর একটা বিহিত করা দরকার! ছেলেদের গায়ে হাত দেয় এতবড় স্পর্ধা! শালীনতা সভ্যতা কিচ্ছুই জানে না জন্তুর দল! মেয়েরা এ বর্বরতা কিচ্ছুতেই বরদাস্ত করবে না। তাদের সুখের সমাজে পুরুষ মেরে বাহাদুরি করে যাওয়ার শাস্তি হাতে-নাতে দেবে!

উপত্যকার চারিদিকের পাহাড়ে মেয়েরা ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের বউরাও জন্তুদের ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। তারপর পাহাড়ের ডগা থেকে আলগা পাথর গড়িয়ে দিতে লাগল। গড়াতে গড়াতে পাথরের চাঙড়গুলো ছিটকে গেল চকচকে পাখীটার দিকে।

দু'ল্যাজওলা কিম্ভূতকিমাকার জন্তুগুলো পাখীর পেটে সেঁধিয়ে ছোট ছোট গর্ত দিয়ে আগুন ছুঁড়তে লাগলো। আগুনের ছোঁয়ায় দলে দলে মেয়েরা মারা গেল। ফলে, আরো ক্ষেপে গেল ওরা। রাশি রাশি পাথর গড়িয়ে দিল নিচে। সে কী আওয়াজ! মনে হল কানে তালা লেগে যাবে। পাথরের টানে আলগা পাথরগুলোও উপত্যকার মাঝে ছিটকে পড়ল। দেখতে দেখতে যেখানে যত আলগা পাথর ছিল, স্রোতের মত নামতে লাগল উপত্যকার দিকে। শিলাবৃষ্টির মত পাথর পড়তে লাগল পাখীর গায়ে। দুমদাম শব্দে কানে তালা লেগে গেল।

এতদিন ঘুমিয়েছিল যে পাখী, মার খেয়ে তার ঘুম ভাঙল। ল্যাজ দিয়ে হড়হড় করে

আগুন বেরিয়ে এল। বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে আকাশে উঠল। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল শূন্যে।

ছেলেদের ওপর মারধোরের শোধ এইভাবে মেয়েরা নিল। গাঁয়ে শান্তি ফিরে এল। আবার মেয়েরা ডিম পাড়তে লাগল, ডিমে তা দিতে লাগল, কুড়ি দিন ঘর করে মনের সুখে মরতে লাগল।

খানিক কল্পনা, খানিক সত্য মিশোনো উদ্ভট এই কাহিনী শোনা যেতে পারে অনেক বছর পরে রকেট-জাহাজের সেই কম্যাণ্ডারের মুখে।

ঠিক দুপুরে

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঠিক দুপুরে মেঘগুলো সব পেঁজা তুলোর রাশি;
গাছের মাথায় হালকা হাওয়ার মিষ্টি মধুর হাসি।
রোদ ঝিকঝিক ঝিল,
রোদ মাখা ওই চিল,
এমন করে হাওয়ায় হাওয়ায় যাচ্ছে কোথায় ভাসি ?

ঠিক দুপুরে কুকুরগুলো মুখ লুকিয়ে আছে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের কাছে।
ঝিলের জলে জলে—
হাঁসের ছায়া দোলে।
শ্যামলা গরু ঝিমোয় পাড়ে, লেজটি শুধু নাচে !

ঠিক দুপুরে ঠাকুর ঘরে আচার ভরা তাকে—
চোরের মত হাত দু'খানা খুঁজছে এমন কাকে ?
কলম খোলা ওই—
উড়ছে খাতা বই,
সব নিঝ্‌ঝুম ; দূরে কোথায় 'কুলপী বরফ' হাঁকে।

সাপের ছোবল

শ্রীবিমল দত্ত

সেবার আমি বি-এ পাশ করে ঠিক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছিলাম না, তবে ম্যা-ম্যা করে বেড়াচ্ছিলাম অর্থাৎ (M. A, M. A.) কি করে M. A. পড়া যাবে সেই ফন্দী ভাঁজছিলাম। এমন সময়ে আমার বন্ধু হাস্যময় এসে হাজির।

একটা টিউশানি নিবি?

লাফিয়ে উঠলাম, "টিউশানি? আরে ঐ কথাই তো ভাবছিলাম, কোথায়? কাকে পড়াতে হবে? কত তঙ্কা মাইনে?"

হাস্যময় বললে, "বেশী দূরে নয় রে নেবুতলায়। ছেলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। মাইনে চল্লিশ টাকা মাসে।"

ভারী খুশি হয়ে বললুম, "রাজী—কবে নিয়ে যাবি?"

হাস্যময় বললে, "এখুনি। আজ মাসের পয়লা, আজ থেকেই সুরু করে দে। গতকাল ওর আগের মাষ্টার মশাই চলে গেছেন।"

হঠাৎ কেমন খট্‌কা লাগল। —"চলে গেলেন কেন?"

হাস্যময় প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে তাকাল। "সে জেনে তোর কি হবে? কার কিসে পোষায় না পোষায় সে ভেবে তোর লাভ কি? আয়—"

সার্টটা গলায় ঢুকিয়ে স্যাণ্ডেল ঘষতে ঘষতে হাস্যময়ের পিছনে পিছনে চললাম। বৌ-বাজারে এসে হাস্যময় ঢুকলো একটা গলিতে—তারপর বাঁক ঘুরে এমন ভাবে চলতে লাগল যে, আমার সুকুমার রায়ের 'ঠিকানা' কবিতাটার কথা বার বার মনে পড়ে ভীষণ হাসি আসতে লগেল। তবে আশ্চর্য হবার কারণ নেই—গলির নাম সার্পেণ্টাইন লেন।

খুব সরু একটা গলির মুখে খুব বড় একটা চকমকে নতুন রং করা বাড়ীর সামনে এসে হাস্যময় দাঁড়াল। নম্বর দেখলুম—৯।১।৫ গ—। মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। ভাবতে লাগ্‌লাম রোজ পথ চিনে আসতে পারবো তো! যা হোক সার্পেণ্টাইন লেনে যখন এসেছি, তখন সাপের ছোবলের ভয় না করে হাস্যময়ের পিছনে পিছনে বাড়ীতে ঢুকলুম।

সামনেই প্রশস্ত উঠোন—দাঁড়ে এক বিরাট্ ধবধবে কাকাতুয়া। দুলছে আর বলছে, "সি এইচ এ এল্ কে চল্‌কে না কলকে? সি এইচ এ এল্ কে চল্‌কে না কলকে?"

বারান্দা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকলুম। সেখানে ফরাস পাতা—তাকিয়া ঠেশ দিয়ে গড়গড়ার নল মুখে এক বৃদ্ধ বোধ হয় ঝিমুচ্ছিলেন। হাস্যময় জুতোর শব্দ করেঢুকতে ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন—"কে? হাস্যময়? সঙ্গের ছোকরাটি কে?"

হাস্যময় বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, "আমার বন্ধু বংশীবদন বটব্যাল—সন্তুর জন্য ওকে এনেছি।"

"বেশ! বেশ! তবে দেখো তোমাকে যে মাইনের কথা বলেছিলুম সেটাই দেব, তবে সন্তুর সঙ্গে নন্তু আর বন্তু-ও পড়বে—ওরা কি পড়বে? পড়ে তো কেলাস থিরি আর টু'তে—! ঐ এক সঙ্গে বসবে। কেমন ব্যাটবল বাবু, আপনি রাজী তো!"

আমি সংশোধন করে দিলুম, "ব্যাটবল নয়, বটব্যাল।"

"ঠিক ঠিক। বটব্বল, বটব্বল, ও আমি দু'দিনেই রপ্ত করে নেব। আর দেখো ভাই, একটু খেটে পড়াতে হবে। এর আগে বরাবরই মাষ্টার রেখেছি—কিন্তু পড়ানোর সঙ্গে সম্বন্ধে নেই মাস মাস টাকা নিয়েছে—সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। সন্তু খুব চালাক, ইন্‌টেলিজেণ্ট—কিন্তু মোটেই ডিলিজেণ্ট নয়। যা আজকালকার জেণ্টদের ধরণ!" বলেই ভুঁড়ি কাঁপিয়ে ভদ্রলোকের কী হাসি।

একটু বাদে কলাই-করা কাপে চা এল। তারপর ভদ্রলোক—হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি তাঁর নাম বনমালী বাগ (বাঘ নয়)। কলকাতায় খান সাতেরো বাড়ির মালিক, আবার বসিরহাটেও কিছু আবাদী জমি আছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল—বনমালী বাবু বললেন, "ওহে বটব্যাল্, আজ থেকেই সুরু করে দাও। হ্যাঁ ভাল কথা তুমি বি, এ পাশ তো? বলে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

বন্ধু হাস্যময় বললে, "নিশ্চয়। ওর সংস্কৃতে অনার্স ছিল—পেয়েছে।"

বনমালী বাবু বললেন, "আমার ছেলে সন্তু সান্‌সা ছেলে, সব সবজেক্টে পাশ—শুধু এগ্রিগেট্ না কি একটা নতুন সাবজেক্ট হয়েছে তাতেই ক'বছর ফেল হচ্ছে। তোমার কি বাবু এগ্রিগেট্ সবজেক্টটা ভাল জানা আছে?" আবার তাঁর চশমার ফাঁকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ হল।

বনমালী বাবু যে বনের মালী—একেবারে নীরেট্ তা এতক্ষণে বুঝলাম। তাঁকে কিছু বোধ দিতে উদ্যত হতেই হাস্যময় আমাকে থামিয়ে বললে, "বনমালী বাবু, এগ্রিগেট সাবজেক্ট নয়—মোট নম্বর—ও সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বংশীবদন ও সব ঠিক করে নেবে।"

একটি হাফ-প্যাণ্ট পরা যুবক ঘরে এসে ঢুকলো। বনমালীবাবু তাকে বললেন, "এই সন্তু, ইনি তোর নতুন মাষ্টার মশাই—গড় কর্।"

সন্তুর দশাসই চেহারা দেখে আক্কেল গুড়ুম! এই ছেলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র!

বেশ মোচা গোঁফ বেরিয়েছে, আর দাড়ি কামাচ্ছে অন্ততঃ বছর তিনেক। তারপরেই এল নন্ত ও বন্ত। এরাও বেশ বড় হয়েছে। সিক্স, সেভেনে পড়ার উপযুক্ত। তারাও পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করল।

বললাম, "বই খাতা নিয়ে এসো।"

সন্ত বললে, "স্যার, পড়ার ঘরে আসুন এই দিকে।" বলে বাড়ির মধ্যে যেতে আরম্ভ করে দিল। হাস্যময় বিদায় নিল। আমি পড়ার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম—সঙ্গে তিন ছাত্র সন্ত, নন্ত আর বন্ত।

সন্তর দশাসই চেহারা দেখে আক্কেল গুড়ুম।—পৃঃ ১৬৮

বন্ত আমার কানে কানে বললে, "মাষ্টারমশাই, বড়দা বিড়ি খায়—আর আমাকে মারে।"

ও-কথায় কান না দিয়ে, গম্ভীর ভাবে বললাম, "বই বার করো—"

ছাতাটা ঘরের এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ বনমালী বাবু ছাতাটা নিয়ে বারান্দায় আল্‌নার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ঘরের কোণে দেয়াল ঠেসে ছাতা রাখতে নেই—রোজ রাখতে রাখতে চুন বালী খসে কোণটা নোংরা হয়ে যাবে। এ আমার অনেক টাকার বাড়ী। সব সময়ে নজর রাখতে হয়। কিছু মনে করবেন না। নিন পড়া শুরু করুন। সাতটায় এসেছেন এখন সাতটা পনের হয়ে গেল, পড়াই শুরু করলেন না? আবার ন'টা

হলেই তো ছাতা বগলে হাঁটা দেবেন ! মনে রাখবেন "Time is money". বনমালী বাবু বোধহয় বনেই মালীগিরি করলে ভাল হ'ত। ধরণ-ধারণ মোটেই আমার ভাল মনে হ'ল না।

সন্তু বই খুললে—ইংরেজী বই।

"কোনটা পড়া আছে ? কাল গদ্য না পদ্য ?"

—"পদ্য স্যার, এই যে এইটা।" ব'লে বুড়ো আঙ্গুলে থুতু দিয়ে সে একটা করে পাতা উল্টে এল 'Casabianca' পদ্যতে।

"পড়ো"—

চুপ করে বসে রইল বনমালী বাবুর সান্‌সা পুত্র intelligent but not diligent.

"পড়ো, উচ্চারণ করো।" আমার গলার স্বর ক্রমশঃ চড়তে লাগলো। কিন্তু সন্তু হাঁ-ও করে না, হুঁ-ও করে না। চুপাচপ বসে রইল। নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু—ঠকাস্ মার্বেল !

আবার যেই হাঁক পড়েছি, "পড়ো, উচ্চারণ করো।" সহসা বেগে বনমালী বাবুর আবির্ভাব। "মাষ্টার মশাই, আগে আপনি বলে দিন তারপর ও বল্‌বে। ধরে নিন ও কিচ্ছু জানে না। যাকে বলে tabula rasa, শাদা শ্লেট।"

ভুল বুঝতে পেরে বলতে সুরু করলাম, "সি-এ এস-এ কাসা, বি-আই এ-এন্ বিয়ান্, সি-এ কা—কাসাবিয়ানকা—বলো—"

আবার বনমালী বাবুর আবির্ভাব। তিনি দোরের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "উঁহু—একবার বললে কি ও রপ্ত করতে পারে—আপনি কয়েকবার বলে দিন—ও শুনে শুনে যখন বলবে 'হয়েছে স্যার' তখন জিগ্যেস করবেন—নিন্ বলুন।"

ধৈর্য শেষ সীমায় এসে গেল। বললুম, "আমার ছাতাটা ?"

বনমালী বাবু মুচকে হেসে বললেন, "ছাতা আছে—হারাবে না। এখন ছাতার কি দরকার ? ঘরের মধ্যে কি বৃষ্টি হচ্ছে ?"

ভাবলাম বলি, "বৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু করাতে ইচ্ছে করছে। আপনার ঐ সন্তুর পিঠে দমাদ্দম কয়েক ঘা ছাতার বাড়ি না মারলে ও কি পড়বে ?" কিন্তু ভাবটা চেপে গেলাম। বললাম, "না ; মানে এরকম পড়ানো আমার পোষাবে না।"

বনমালী বাবু চটে উঠলেন, "তবে কি রকম পোষাবে ? শুধু কচ্ ছেলেটাকে প্রশ্ন করবেন —না বুঝিয়েই প্রশ্ন ? শুনুন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে আপনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট্— ভাল ছেলে একটু খেটে পড়ান—অত অল্প ধৈর্য হলে কি চলে ? কচি ছেলে সব। ওরা

কিছু জানে না—ওদের শেখান—জ্ঞান দিন, বিদ্যে দিন, মনের মধ্যে আলো জেলে দিন। আচ্ছা আমি চললাম।" বলে বনমালী বাবু বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

আবার সন্তুকে নিয়ে পড়লুম। "সি-এ, এস্-এ, বি-আই, এ-এন্, সি-এ"…কাসা-বিয়ান্‌কা…মধুর সুরে বললুম—উদাত্ত সুরে বললুম—দ্রুত করে বললুম—বিলম্বিত লয়ে বললুম। বলেই চললুম—সন্তু বসে শুনছে—চোখ কান সজাগ, যেন রেডিওতে খেলার ধারা-বিবরণী শুনছে। ওদিকে নজর করলুম, নন্তু আর বন্তু সিলেটে কাটাকুটি খেলছে নিঃশব্দে। এক হাতে নন্তুর কান, আরেক হাতে বন্তুর কান ধরে নাড়া দিয়ে বললুম, "এর নাম পড়া হচ্ছে?"

দু'জনে উঠে দু'দিকের দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ছুট্‌লো—"মা, বাবা, মাষ্টার আমাদের মেরেছে—কানে হাত দেবে কেন ও? ও! ভারী তো মাস্টার!"

ওদের চীৎকার ও রোখ শুনে আক্কেল গুড়ুম।

ওদিকে সন্তু বাবু এতক্ষণ বাদে রা কাড়লেন—সি-এ, এস্-এ, বি-আই, এ-এন, সি-এ "কাঁচা ব্যাংখা!"

ধমকে উঠলুম। "ও আবার কি? এতক্ষণ ধরে কি ঐ শেখালাম?"

"স্যার, সবাই বলে ওটার আসল উচ্চারণ 'কাঁচা ব্যাংখা'—ও তো ফরাসী শব্দ—ইংরেজীর মত উচ্চারণ তো হবে না। হ্যাঁ স্যার, আপনি ফ্রেঞ্চ জানেন?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ছেলেটার বেয়াদবি দেখে। উঠে দাঁড়ালাম।

সন্তুকে বললাম, "তোমার বাবা কোথায়?"

"বইয়ের ঘরে।"

গড়গড়া থেকে মুখ তুলে বনমালী বাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন, "কি হ'ল?"

"আজ্ঞে আমি পড়াতে পারবো না।"

"তা বেশ! বসুন, আপনার হিসেবটা করে দিই।"

"কি হিসেব?"

"এই যে পড়ালেন—বলেছি তো Time is money. আমি কথার মানুষ। এক পয়সাও কারো মারি না। ঘড়ি দেখেছি—আপনি আধঘণ্টা পড়িয়েছেন। আধঘণ্টায় বেতন হ'ল মাসে চল্লিশ হলে তিনদিনে চারটাকা। তিনদিন্ ৬ ঘণ্টা পড়াবার কথা। তা'হলে ৬ ঘণ্টায় ৩৩ নয়া পয়সা—এই খাতাটায় সই করুন।" বলে খেরো-বাঁধানো একটা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

কাণ্ড দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। বললুম, "ও চাই না, আমার ছাতাটা দিন বাড়ি যাই।"

"আহা! তা কি হয়? আমি কারো এক পয়সাও মারবো না—আপনার ন্যায্য পাওনা আপনি নিয়ে আমাকে বাধিত করুন।'

কি করবো ছাতার দায়ে আমাকে সই করতে হ'ল এবং তেত্রিশ নয়া পয়সা নিতেও হ'ল। তারপর বনমালী বাবু ছাতা এনে দিলেন। বললেন, "হাস্যময়কে বলবেন, আপনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট্ হলেও আমার কাছে ফেল্।" বলে আমার পিছনে সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন।

এরপর বহু টিউশানি করেছি, কিন্তু সার্পেণ্টাইন লেনের সেই সাপের ছোবলের কথা কোন দিন ভুলতে পারিনি।

অভিযোগ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শুনেছ মা, দুষ্টু খোকার কথা—
'দিদি' আমায় বলবে নাক'
ডাকবে যথাতথা
নামটি ধরে 'রুমা'।
এ নাব ডাকে উমা,
আর ডাকে সে ইস্কুলে যে, দিদিমণি 'লতা'।

উমা আমার বয়েসী, তাই নামটি ধরে হাঁকে
বড়দি'মণি অনেক বড় বলব কি আর তাঁকে।
কিন্তু খোকার ছয়,
আমার পুরো নয়।
তিন বছরের বড় দিদির নাম ধরে কেউ ডাকে?

তোমার কাছে নালিশ আমার তাই
এমনটি ফের শুনতে যদি পাই,
খোকার বাড়াবাড়ি,
করেই দেব আড়ি।
ধমকে দিও ঃ বলতে এমন নাই।

এক ছিল চড়াই আর চড়ুনি। চড়ুনির মনে বড় দুঃখ। ঝড়ে তার বাসা ভেঙে যায়। ডিম ফুটলেও বাচ্চাগুলো বাঁচে না। কখনো বিড়ালে খেয়ে নেয়, কখনো বা চিল-শকুনের পেটে যায়। কাকেরাও বড় উৎপাত করে।

চড়ুনি মুখ ভার করে এক চালা ঘরের চালে বসেছিল। ডিম পাড়ার সময় হয়েছে, তাই তার এত ভাবনা। চড়াই তার কাছে এসে বললে: গিন্নী! সাত-সকালে বসে বসে এত কি ভাবছ?

তোমার আর কি! চড়ুনি ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান ভরে বললে: বাড়ীর কর্তা হয়েছ, অথচ তোমার কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। কেবল নেচে-কুঁদে বেড়ালেই কি চলবে?

—আ হাঃ! চটছো কেন গিন্নী। চড়াই রসিকতা করে বল্লে: কি করতে হবে তাই বল না, ছাই!

গাছের ডালে আর বাসা বাঁধা চলবে না। চড়ুনি একটু ভেবে বললে: একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে হবে। এমন জায়গায় বাসা করতে হবে, যেখানে কেউ আর আমার বাচ্চাদের খেতে পারবে না।

—কিন্তু অমন পছন্দসই জায়গা তো মেলাই ভার, গিন্নী! চড়াই আমতা-আমতা করে বল্লে।

—তা'হলে উপায়? চড়ুনির বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হলো। বললে: একটা উপায় না হলে যে, আমাদের বংশই লোপ পাবে। তা'হলে···

—বকম্! বকম্! বকম্!

তার কথায় বাধা দিয়ে একটা গোলা পায়রা সেখানে এসে বললে: একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

—সেই ব্যবস্থাটা কি শুনি? চড়ুনি সাগ্রহে শুধাল।

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

মা ষষ্ঠীর কাছে গিয়ে দরবার করতে হবে। তিনি নিশ্চয় এর একটা বিহিত করে দেবেন। আমরা যখন ষষ্ঠীর জীব, তখন তিনি কি আমাদের কথা ভাববেন না?

—ঠিকই তো! কথাটা চড়ুনির বড় মনে ধরল। অথচ কোথায় গেলে যে মা ষষ্ঠীর দেখা মিলবে, তা সে জানতো না। তাই সে জিগ্‌গেস করলে: মা ষষ্ঠীর আস্তানাটা কোথায়? এখন কি তাঁর দেখা পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়! গোলা পায়রা তাকে ভরসা দিয়ে বললে: ওঃ, জান না বুঝি? ঐ ঘোষ পাড়ায় যে ষষ্ঠীতলা আছে না, সেখানেই বাঁধানো বটগাছের নীচের তাঁর দেখা পাবে।

—ঘোষ পাড়াটা ঠিক কোন্ দিকে? চড়ুনি এবার সাগ্রহে শুধালে।

—ঘোষ পাড়া? চড়াই সোৎসাহে জবাব দিলে। বললে: ঐ তো মতি মুদির দোকানের পাশে। সেখানে যে বটগাছটা রয়েছে, তার চার পাশটাকে বলে ঘোষ পাড়া। আর সেই বটতলারই নাম ষষ্ঠীতলা। ওখানে নিত্য পূজা হয়। বটপাতায় সিঁদুর হলুদ মাখিয়ে পাড়ার মেয়েরা পূজা দিতে আসে। বোশেখ মাসের শেষে সেখানে বিরাট মেলা বসে। আমিও অনেক বার দেখেছি।

—তবে এতদিন সে কথা বলোনি কেন? চড়ুনি যেন কৈফিয়ৎ চাইলে।

আরে আমিই কি ছাই এত কথা জানতাম। চড়াই একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে: শুধু জানতাম আমরা কেষ্টোর জীব। কিন্তু খোদ মা ষষ্ঠীই যে আমাদের বংশরক্ষার মালিক, সে কথা তো এই মাত্র পায়রা ভায়ার কাছেই শুনলাম।

আর দেরি করো না। গোলা পায়রাটা যেন চড়ুনিকে তাগিদ দিলে। বললে: ঐ নদীর জলে চান করে, চট করে একখানা গরদের শাড়ী পরে এসো দেখি। আমি ততক্ষণ হলুদ সিঁদুর ফলমূল আর বটপাতার যোগাড় দেখি।

—আর আমি কি করবো? চড়াই সাগ্রহে জানতে চাইল।

তোমারও অনেক কাজ আছে। পায়রাটা জবাব দিলে। বললে: চট করে ফুল-চন্দন আর বেলপাতা সংগ্রহ করে আনো।

গোলা পায়রাটা চড়াইকে এই উপদেশ দিয়ে বার হয়ে গেল মা ষষ্ঠীর সন্ধানে।

আগেভাগে তাঁকে একটা খবর না দিলে কি চলে? নইলে মা যদি তুষ্ট না হন?

গোলা পায়রার একটু পরেই চড়ুনি ষষ্ঠীতলায় গিয়ে পৌছলো। এদিকে চড়াই এনেছে ডালি ভরে পূজার উপকরণ।

আয়োজন দেখে চড়ুনি কী খুশী!

তাড়াতাড়ি চড়াই-এর হাত থেকে ফুল বেলপাতা সিঁদুর চন্দন দিয়ে মা ষষ্ঠীর পূজা দিয়ে চড়ুনি ভক্তিভরে বললে : একটু মুখ তুলে চাও, মা। নইলে যে আমাদের বংশরক্ষা হয় না!

চড়ুনি ধর্ণা দিল মা ষষ্ঠীর স্থানে। তার মুখে ঐ একই কথা : মুখ তুলে চাও, মা। মুখ তুলে চাও।

তবুও মা ষষ্ঠীর মুখে রা নেই!

চড়ুনিও নাছোড়বান্দা। সে এর একটা বিহিত করবেই করবে।

ষষ্ঠীতলার মাটি নিল সে!

তিন দিন, তিন রাত্রি কেটে গেল। তবু চড়ুনির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তখন এক কঠোর সংকল্পে অবিচল!

শেষে মা ষষ্ঠীর কৃপা হ'ল। তিনি সস্নেহে তাকে ডেকে বললেন : আমি বর দিচ্ছি যে, আজ থেকে মানুষে তোমাদের মাংস খাবে না। আর তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে সংগৃহস্থের ঘরে। ঠিক কড়ি কাঠের নীচে। সেখানেই নির্ভয়ে থাকবে। মানুষের ভয়ে কেউ আর সেখানে যাবে না। তা'হলে দিব্যি সুখে থাকবে। তবে একটা কথা, মানুষের বিশ্বাসভাজন হতে হবে?

—কি উপায়ে তা' সম্ভব? চড়ুনি হাত জোড় করে জিগ্‌গেস করলে।

—উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে সে কাজ করতে হবে। মা ষষ্ঠী চোখ বুজে হাসলেন। মনে মনে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন : এখুনি মতি মুদির টিনের চালে গিয়ে বসো। আর মানুষের উপকার করবো—মনে মনে শুধু এই চিন্তা করো, তা'হলেই একটা উপায় হবে।

পরদিন সকালে চড়ুনি গিয়ে বসল টিনের চালে। একটু বাদে সে দেখল, একটা হুলো বিড়াল গুটি গুটি রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিড়ালটা খুব চালাক।

সে এক লাফে রান্নাঘরের জানালায় গিয়ে লেজ গুটিয়ে বসল। তারপর ম্যাঁও ম্যাঁও করে বার দুই চাপা গলায় ডাকল। তখন মতি মুদির বৌ হেঁসেল ঘরে ছিল না। ভিতর থেকে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। সুযোগ বুঝে হুলো বিড়ালটা ঢুকে পড়ল হেঁসেল ঘরে। তাক করে সে যেই দুধের কড়াই-এ মুখ দিতে যাবে, অমনি চড়াই-চড়ুনি এক যোগে বিড়ালটাকে ঠোকরাতে শুরু করলে।

ভয় পেয়ে বিড়ালটা যেই পিছনে হটেছে, অমনি গেল একটা গামলা উল্টে। ঝনাৎ করে একটা আওয়াজ হ'ল। সেই শব্দ শুনে মতি মুদির বৌ এল ছুটে। আর মুদি-বৌ ঘরে ঢুকতেই বিড়ালটা জানালা দিয়ে সরে পড়ল।

চড়াই-চড়ুনি তখন ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে বসল একটা জানালার কপাটে।

মতি মুদির বৌ এবার বুঝতে পারলে কে রোজ দুধ চুরি করে খেয়ে যায়। মতি গিন্নী এবার সস্নেহে চড়াই দুটোর দিকে ফিরে বললে: তোমরা আমাদের খুব উপকার করেছ, বাবা! তোমাদের জন্যেই আজ চোর ধরা পড়েছে।

এমন সময় একটা বেজি নালি দিয়ে হেঁসেল-ঘরে ঢুকছিল। এই বেজিটা ছিল বড় পাজী। সে রোজ মাছ চুরি করে নিয়ে পালাত। তাকে দেখা মাত্রই চড়াই পাখী দুটো কিচিরমিচির করে ডেকে উঠল।

মতি-গিন্নী এবার তাক করে একটা চেলা কাঠ ছুড়ে মারলে। বেজিটা কোন রকমে গা বাঁচিয়ে পালাল।

মতি-গিন্নীর তখন কিছুটা রাগ পড়েছে। সে তখন চড়াই-চড়ুনিকে ডেকে বললে: তোমাদের উপকারের কথা কোন দিনই ভুলতে পারবো না।

—এমন আর কি করেছি, মুদি-বৌ। চড়ুনির কণ্ঠে আত্মীয়তার সুর ফুটে উঠল। বললে: বিনিময়ে…চড়ুনি কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

—কি চাও তোমরা। মতি-গন্নী যেন অভয় দিলো।

—তোমাদের ঘরে একটু আশ্রয় দিতে হবে। চড়ুনি দুই ডানা তুলে মিনতি জানালে।

—বেশ তো। মুদি-বৌ সৌজন্যের হাসি হাসলে। বললে: আজ থেকেই তোমরা আমার ঘরেই থাকো। বৈঠকখানার কড়িকাঠের নীচেয় যে জায়গা রয়েছে, ইচ্ছে করলে সেখানেই থাকতে পারো।

—এতে আমার কোন আপত্তি নেই। মতি-গিন্নী সানন্দে সম্মতি জানিয়ে রান্নার কাজে মনোযোগ দিলে।

চড়াই-চড়ুনি সেই সুযোগকে কাজে লাগাল। দেখতে দেখতে বৈঠকখানায় কড়িকাঠের নীচেয় একটি তোফা বাসা রচিত হলো। সেই থেকে চাড়াই-চড়ুনির আর কোন দুঃখ নেই।

রোদ-বৃষ্টিতে আর তাদের কষ্ট পেতে হয় না। সেই থেকে তারা দিব্যি সুখে গৃহস্থের ঘরে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে। এখন তাদের বংশ লোপ পাওয়া তো দূরের কথা, মা ষষ্ঠীর কৃপায় দিনে-দিনেই তাদের বংশবৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ মানুষে তার মাংস খায় না। সে নিরাপদ আশ্রয়ে বহাল তবিয়তে আছে। সেই থেকই চড়াই-চড়ুনির মত সুখী আর কেউ নেই।

একটু হাসো
দিলীপ দাস

একটা আজব গাড়ী তৈরি করছি

তা হলে আমি চেপে দেখি

প্রশ্নোত্তর

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

শুনুন, শুনুন, বলুন দেখি,
রমাকান্ত পণ্ডিত,
মাঘ মাসে কি বাঘের মাসী
চিৎ হয়ে গায় গীত ;

কোন ফাঁদে চাঁদ ধরা দিয়ে
মিষ্টি ছড়া কাটে,
ক্ষান্ত বুড়ী পান্তা খেয়ে
কি ভাবে শোয় খাটে ;

ইঁদুর শোকে বিধুর হ'লে
গায় কি মধুর গান,
কোন আবেগে মেঘে হঠাৎ
ছোটে রঙের বান ;

তিমি এবং পুঁটির কেন
একই নামের বহর,
মাঝ রাতে কোন্ স্বপ্নে ঢোলে
ভূতে-পাওয়া শহর ;

গোবর-পোরা মাথায় কবে
বুদ্ধির গাছ হয়,
ঘোড়া পিটিয়ে গাধা হ'লে
কিসের বোঝা বয়।

পাবেন না তো, রমাকান্ত,
এসব জিজ্ঞাসার
সঠিক জবাব খুঁজুন যতই
পুঁথিপত্রের ঝাড়।

চোখ কান মন খুলে যদি
হন আমাদের মতো
'বিশ্বকোষে'র পাতায় মিলবে
জবাব শত শত।

নন্দখুড়ো

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

পাড়ার খুড়ো নন্দ বুড়ো ফোকলা দাঁতে হাসে
ফুস্থুর-ফুস্থুর বিড়ি টানে, খুকুর-খুকুর কাশে।
তিনকুলে কেউ নেইকো খুড়োর থুড়থুড়িয়ে চলে
বিড়বিড়িয়ে আপন মনে আপনি কথা বলে।
চুল কাটে না, গোঁফ ছাঁটে না, চান করে না রোজ
পাড়ায় ঘুরে বাড়ী বাড়ী সবার করে খোঁজ।
বাচ্চা ছেলে দেখলে পরেই হাত বাড়িয়ে ধরে
ওরা কিন্তু ধরার আগেই পিছলিয়ে যায় সরে।
রাগ করে না নন্দখুড়ো, কেবল ডাকে, 'শোন্,
আয় না কাছে, একলা যে আজ ? কোথায় ছোট বোন ?
একটু বাদেই হা হা করে হাসে, আবার বলে,
ওঃ বুঝেছি ভয় পেয়েছিস, তা পেলে কি চলে ?
আয় দেখি, নে চারটে টফি, বোনকে দিবি দুটো,'
বলেই বুড়ো আলতো করে খোলে হাতের মুঠো।
তেলচিটে হাত ভরতি অনেক টফি, লবেনচুষে
চারটি দিয়ে বাকিগুলো হাতেই রাখে পুষে।
শুধায়, 'হ্যাঁ রে, বাবলুটাকে দেখছি না যে পাড়ায় !
ঐ ছেলেটা বড্ড ভালো, দেখলে আমায় তাড়ায়।
তা করুক, ওর দোষটা কি বল? হাসিস কেন ? বাঃ রে
এই চেহারা দেখলে কি কেউ ভয় না পেয়ে পারে ?
বেদম হাসে নন্দখুড়ো দু'চোখ বুজে বুজে
ক'দিন থেকেই পালিয়ে ফিরিস, আজ পেয়েছি খুঁজে।
ভয় কি ? আহা থাক বেঁচে থাক্ জুড়িয়ে মায়ের বুক
কাছে আসিস না-ই বা আসিস, দেখেও তোদের সুখ।
কোমর ধরে এগোয় খুড়ো, একটু গেলে দূরে
লুকিয়ে থাকা ছেলের পাল আবার আসে ঘুরে,
কিলবিলিয়ে দল পাকিয়ে আবার পিছু লাগে
মুখ ফেরালেই আবার তারা হুড়হুড়িয়ে ভাগে :
রাগ করে না, তাকায় খুড়ো মিষ্টি অনুরাগে
কেবল বলে, 'আয় না কাছে, বড্ড ভালো লাগে।'

সভাপতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

সভা, ফাংশন, মিটিং—কথাটা দৈনন্দিন জীবনে শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। প্রতিদিনই যেমন ফাংশন, তেমনি তার শেষে সমালোচনাও শুনতে পাওয়া যায়—অমুক ফাংশনে অমুক ঘটনা, কিংবা 'নৃত্যগীত অতি সুন্দর'—সকাল বেলা সংবাদ পত্র খোলার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।

কিন্তু ফাংশন ও মিটিং-এর জয়যাত্রায় আমরা যতই অভ্যস্ত হই, আনন্দ পাই—সেদিনের ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম।

কি রকম?

বলছি শোনো। এই শহরে সেদিন যা ঘটলো।

নেমন্তন্ন বাড়ী গিয়ে সুখাদ্য পরিবেশন না দেখে যদি দেখো, তখন উনুনে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা হচ্ছে—কিংবা ছ'টার ফাংশনে গিয়ে যদি দেখো, সবেমাত্র চেয়ার নিয়ে ঠেলাগাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে, আর অপেক্ষা করে যখন অব্যবস্থার চূড়ান্ত দেখে বাড়ী ফিরে যাবে কিনা ভাবছ, সেই সময় উৎসব শুরুর সূচনা ধ্বনিত হলো। মেজাজটা আগে থেকেই তিক্ত হয়ে যায় সন্দেহ নেই, আর বিশেষ ক্ষেত্রে ছোট বয়সে নেমন্তন্ন বাড়ীর ঐ ব্যাপার দেখলে, রাগে-দুঃখে চোখে জল আসাও বিচিত্র নয়—তোমরা কি বল?

হ্যাঁ, সেদিন যা ঘটলো। ঐ ভোজবাড়ীর মতই অবস্থা।

ফাংশন। তিন দিনের উৎসব। সামনে ছোটরা, পিছনে বড়রা। আলিম্পন, চিত্র-বিচিত্র করে গেট সাজানো—সবই যেমন সর্বত্র হয় তার ত্রুটি নেই, বরং উৎসব-ক্ষেত্রের চাকচিক্য কারুকার্য আরো উজ্জ্বল।

আছে তো সবই—এখন সভাপতি এলেই হয়। শুরুর সময় ছিল ছ'টা, কিন্তু সাড়ে চারটার সময়ই সভাপতির বাড়ী গিয়ে ডাকাডাকি সুরু হলো। সবে মাত্র বাড়ীতে ফিরেছেন তিনি—বললেন কি ব্যাপার? ছ'টার অনেক দেরি, এখনই কি?

না, না দেখুন—একটু আগেই চলুন—রাস্তার যা অবস্থা! শেষ পর্যন্ত সভাপতি গিয়ে পৌছলেন—সুসজ্জিত স্থানে, কিন্তু একটা মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা চাবি-বন্ধ ঘর খুলে তাঁকে বসিয়ে—লোকটিকে আর দেখা গেল না। সভাপতির অপেক্ষা আর শেষ হয় না! একটি ঘরে তিনি বসে তাঁর কাজের হিসাব করছেন: এখান থেকে বেরোবার কথা সাতটায়, বালিগঞ্জের মিটিং সাড়ে সাতটায়, সাড়ে আটটা থেকে ন'টায়

কাজটুকু সেরেই পারিবারিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে—তারপর তাঁর বাড়ী ফেরার হিসাব—সুতরাং সবগুলি নিয়ম মাফিক করতে হবে।

কিন্তু বসে বসে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন যাকে দেখতে পেলেন, সে তাঁকে আশ্বাস দিলে—এই সুরু হচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণের পরে যখন সত্যই বেরিয়ে আসার জন্য ঘরের বাহিরে পা দিয়েছেন, তখন উদ্যোক্তাদের দেখা গেল এবং তাঁকে সভায় নিয়ে যাওয়া হলো।

'কি বললেন, আসতেন না?'—পৃঃ ২৮১

বিরক্তিতে এবং অন্য এনগেজমেণ্টে-এর গুরুত্বের কথা এবং সময়ের হিসাব করে তিনি তখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন। সবিনয়ে বললেন, আমার কাজটুকু সেরে চলে যাই—কারণ সাতটায় বালিগঞ্জ পৌছবার কথা, আপনাদের আগেই বলেছিলাম।

সেটুকু অনুগ্রহ উদ্যোক্তারা করলেন এবং প্রায় ৮ টায় সময় গাড়ীতে উঠে সভাপতি বললেন, আপনাদের উদ্যোগ-আয়োজন সবই ভাল হয়েছে—কিন্তু সময় ঠিক না রাখতে পারলে আমাদের কাজের অসুবিধা হয়, আপনাদের কি হয় না? পরের এনগেজমেণ্ট রাখার আর সময় নেই। ঘটনা ঠিক এমন হবে জানলে এখানে এসে অপেক্ষা করার সময় অন্য কাজে লাগাতে পারতাম কিংবা আসতাম না…।

সভাপতির কথা তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—কি বললেন, আসতেন না? অনুষ্ঠানে আসবেন না? আপনার এখানকার পর কি ফাংশন আছে তা দেখবার আমাদের দরকার নেই, আপনি কোন সাহসে বলছেন আসতেন না…তারপর বিভিন্ন কণ্ঠে নানারূপে আস্ফালন বিদ্রূপ শুনে সভাপতি স্তব্ধ—তারপর হাতঘড়িতে সময় দেখতে চাইলেন যে, আর পরবর্তী মিটিং করার কোন সম্ভবনা আছে কিনা—

কিন্তু বজ্রপাতের মত শব্দে কানের কাছে ধ্বনিত হলো—রাখুন মশায় অন্য এনগেজমেণ্ট! বলছেন কিনা আসতেন না? আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়!…

—আচ্ছা ঠিক আছে, নমস্কার, চলি তা'হলে?

—আরে মশাই চলবেন কোথায়?—বলেন কিনা আসতাম না। একটু-আধটু দেরি হয়েছে তো কি হয়েছে? আজকাল চারদিকে কত হৈ-হাঙ্গামা—তার মধ্যে ফাংশন হয়েছে তাই কত না!—সভাপতি গতিক দেখে সবিনয়ে বললেন, আরো দুটো দুটো কাজ রয়ে গেছে, সেগুলোতে উপস্থিত না হতে পারলে!…

ইতিমধ্যে বেশ ভিড় হয়ে গেছে। ওদিকের ফাংশনের অবস্থা কি হচ্ছে তা দেখা ও জানার চেয়ে এদিকের জটলার আকর্ষণ বেশী—ফাংশন তো রোজই আছে, প্রায় সর্বত্রই আছে। সভাপতি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন আর ব্যকুল হয়ে উঠছেন। অবশেষে বললেন—আচ্ছা বেশ নমস্কার, এখন আসি তা'হলে?

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলে উঠলো—এখনই কি! এরপর হলো ছোটদের ভিড়। সভাপতি বুঝতেও পারলেন না অপরাধ কি তাঁর।—

পারুন আর নাই পারুন সভ্যসমাজে বাস করে শিক্ষিত ভদ্রলোক উপরন্তু সভাপতির পদ নিয়ে সময় শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতার ঈষৎ ইঙ্গিত দিতে গিয়ে 'ঘেরাও' হলেন।

অনেক রাতে কার করুণার বশে জানা নেই সভাপতির পদ থেকে মক্তি পেলেন বটে, কিন্তু যানবাহন কিছুই পেলেন না।

সভাপতির পদে নমস্কার জানিয়ে, প্রায়-ভোর রাতে বাড়ীতে যখন থানা-হস্পিটালে খবর নেওয়া প্রায় শেষ—অবসন্ন দেহে বাড়ী ফিরে বললেন—জীবনে আর সভাপতিত্ব নয়—আর কিছু বলতে পীড়া বোধ করছিলেন হয়তো, কারণ আগামী সকালের সংবাদপত্রের কথাও মনে পড়ছিল।

তরু দত্ত

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

সে যে বনহরিণী ছিল আপন-মনে

এ ধরণীর একটি ছোট কোণে।

আর, আপন-মনে বেড়াত সে। গান সে গাইত না, কিন্তু গান লিখত,—লিখত নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গান, নিজের দেখা পৃথিবী আর প্রকৃতির গান, ভারতবর্ষের অতীত গরিমার গান।

বাপ-মা, পাঁচ বছরের বড় ভাই, দু'বছরের বড় বোন, আর সে নিজে,—এই নিয়ে তাদের সংসার। বয়সে সে সবার ছোট, তবু তাকে না হলে একদণ্ড চলে না কারও। সে-ই যেন সংসারের কর্ত্রী। দুরন্ত নয়, দুষ্টুও নয়, তবু সে-ই পরিচারক-পরিচারিকাদের 'দিদি'—এমন কি, বয়সে বড় ভাই-বোনদেরও! বসন্ত বছরের শেষ ঋতু, তবু তা-ই বছরের সেরা ঋতু ; এ মেয়েটিও বাপ-মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান হয়েও শ্রেষ্ঠের মর্যাদা অর্জন করেছিল।

নাম তার তরু, কিন্তু কাজে সে সঞ্চারিণী লতা—সবার মনের মধ্যে লতিয়ে বেড়ায় সে উদ্দীপনা আর আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে। অল্প ক'টা দিনের জীবন তার ; তবু সেই ছোট্ট জীবনখানি ছিল তার পরিজনদের কাছে উদ্দীপনা ও আনন্দের উৎস। তাদের বাড়িতে বাইরের লোকের আনাগোনা বিশেষ ছিল না, যে ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়ের সমাগম হ'ত, তাঁদেরও সে আনন্দ ও উদ্দীপনা যোগাত। সে আনন্দ, সে উদ্দীপনা মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তির মত প্রখর ছিল না, ছিল উষার অরুণরাগের মত শান্ত ও শোভন, কোমল ও কমনীয়।

তরুর বাপ গোভিন্ চান্দ্ার্ ছিলেন কলিকাতার রামবাগান-পল্লীর বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের লোক। গোভিনের পিতামহ নীলমণি দত্ত ধনে-মানে, দানে-ধ্যানে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, মনের ঔদার্যে, রুচির সৌষ্ঠবে, সেকালের কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক ছিলেন,—সেকালের কলিকাতা অর্থাৎ রামমোহন ও দ্বারকানাথের কলিকাতা, যে কলিকাতায় জীবনের নবস্পন্দন জাগতে আরম্ভ করেছিল। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও, ইংরেজী ভাষায় নীলমণি অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। আপন পরিবার মধ্যেও তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বিশেষভাবে প্রচলিত করেছিলেন। ফলে, তাঁর নাতিরা প্রায় সকলেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশারদ পণ্ডিত হয়েছিলেন এবং সেকালেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইংরেজীতে লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাঙ্‌লাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন নীলমণিরই প্রপৌত্র।

দত্তেরা ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাঁরা বেশ কিছুটা ইউরোপীয় রীতির অনুসরণ করতেন ; কিন্তু তা

সত্ত্বেও তাঁরা সাহেব বনে যাননি,— তাঁরা মনে-প্রাণে ছিলেন তাঁরা ভারতবাসী। তাঁরা ইউরোপের ভালটুকুই নিয়ে ছিলেন, মন্দটুকু নয়।

তরুর বাবা গোভিন্ ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে তিনি নাম করেছিলেন। তাই বলে তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানকে অবহেলা করেন নি। এ সবেও তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁর মধ্যে গঙ্গা ও টেইম্‌স্ নদীর অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটেছিল।

কুমারী তরু দত্ত

গোভিনের সংসারে ইংরেজ পরিবারের নিয়মানুবর্তিতা চালু ছিল। প্রত্যহ সকালে সবাই বাঁধা সময়ে শয্যাত্যাগ করতেন; তারপর বাঁধা সময়েই চলত প্রাতরাশ-ভোজন, পড়াশোনা, সংগীতচর্চা ও আলোচনা, মধ্যাহ্নে স্নানাহার, অল্পকাল বিশ্রাম, আবার পড়াশোনা ও আলোচনা; সন্ধ্যার কিছু পরে নৈশভোজ, আবার পড়াশোনা অবশেষে শয্যাগ্রহণ। সত্যি বলতে কি, গোভিনের সংসার ছিল নিয়মের চাকায় বাঁধা। কিন্তু সে নিয়ম কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হ'ত না—কারও তা অসহ্য লাগত না, বরং সে নিয়মকে আলো-বাতাসের মত স্বাভাবিক ভেবে সবাই মেনে নিয়েছিল তা। সেজন্য সংসারে নিয়মভঙ্গ বড়-একটা হ'ত না।

পৈতৃক সম্পত্তির বলে গোভিন্ ছিলেন সেকালের কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী। রামবাগানে প্রাসাদোপম বাসগৃহ, বাগমারিতে এক-শ বিঘার বাগান-বাড়ি; এ ছাড়া আরও নানা রকম আয়ের উৎস ছিল তাঁর। ধনী ছিলেন গোভিন্, কিন্তু ধনের অহংকার তাঁর ছিল না। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ছিল তাঁর পরিবারে; সেখানে হইচই ছিল না, ছিল নিরন্তর বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানচর্চা আর সংগীতচর্চা। যেন আধুনিক তপোবন একটি।

দত্তবংশ দীর্ঘকাল ধরেই ছিলেন বনেদি ও আনুষ্ঠানিক হিন্দু। বার মাসে তের পার্বণে এ বংশে ধুমধামের অন্ত ছিল না। নীলমণি তো প্রত্যেক পুজোয় বেহিসাবী খরচা করে করে প্রায় ফতুর হতে বসেছিলেন। কিন্তু সেই নীলমণির মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর পরিজনবর্গ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

দত্ত-পরিবারের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের কাহিনী বড় বিচিত্র, বড় সুন্দর। সেই যুগে বহু ভারতবাসী হিন্দু খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই খ্রীস্টান হয়েছিলেন আশায়, নেশায় বা লোভে। সেকালে হিন্দু সমাজে তথাকথিত ছোট জাতদের যেমন অমর্যাদা ভোগ করতে হ'ত, তেমনি তাঁদের উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার; অথচ, তাঁদের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের ফলে গোটা হিন্দু সমাজের অন্ন, বস্ত্র ও বাসগৃহ জুটত, জুটত জীবনধারণের জন্য অন্য সমস্ত অপরিহার্য বস্তু আর নানান্ আরাম-আয়েশ। তবু বামুন কায়েত প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ভদ্র ও সুস্থ জীবনের সকল দরজায় কঠোর পাহারা বসিয়েছিলেন, যাতে না ছোট জাতের লোকেরা ভিতর প্রবেশ করতে পারেন। এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বহু ছোট জাতের হিন্দু খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীস্টধর্ম ছিল সেকালের শাসক ইংরেজদের ধর্ম; তাই উচ্চবর্ণ হিন্দুরা নিম্নবর্ণ হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করলেও, কোন খ্রীস্টানের প্রতি এতটুকু রূঢ় ব্যবহার করতে ভরসা পেতেন না।

আরেক দল হিন্দু—এঁরা প্রধানতঃ উচ্চবর্ণের লোক—খ্রীস্টান হয়েছিলেন সাহেব সাজার নেশায়। বিলেত যাব, সাহেব হব, মেম বিয়ে করব, ব্যারিষ্টার বা ডাক্তার বা হাকিম হব, রাজার জাতের শামিল হব,—এই সর্বনাশা নেশায় মেতে তাঁরা পৈতৃক ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করে খ্রীস্টান হয়েছিলেন।

আরেক দল হিন্দু খ্রীস্টান হয়েছিলেন চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লোভে।

এমনি ভাবে যে সমস্ত হিন্দু খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কিছুমাত্র খ্রীস্টভক্ত ছিলেন না,—খ্রীস্টধর্ম যে কি, তাও এঁদের অনেকেই জানতেন না। এঁদের কাছে ধর্ম ছিল পোশাক-পরিচ্ছদের মত—প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে পরিবর্তন করা চলে!

দত্ত পরিবারের ধর্মান্তর গ্রহণ কিন্তু এমন ছিল না। তাঁরা কোন আশায়-নেশায় বা লোভে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন নি। তাঁরা অন্তর দিয়ে খ্রীস্টধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, খ্রীস্ট-ধর্মের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এজন্যই তাঁরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এবার তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণের কাহিনীটি বলা যাক।

নীলমণির পুত্র রসময়ের পরম প্রিয় গ্রন্থ ছিল বাইবেল। তিনি বাইবেলের সমস্ত 'সাম' (psalm) অর্থাৎ ভজন-গান বাঙলায় অনুবাদ করার জন্য তাঁর পরিবারের মহিলাদের অনুপ্রাণিত করেন। রসময়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর পুত্র কিষেনও মারা যান। কিষেন খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মুমূর্ষু অবস্থায় একদিন খ্রীস্টধর্ম বর্ণিত পরলোকের স্বপ্ন দেখেন; এর ফলে তিনি মৃত্যুর পূর্বে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ঐ রুগ্নাবস্থায় তাঁকে গির্জায় নিয়ে দীক্ষা দেওয়া অসম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশ নিজে হিন্দু হয়েও বাড়িতেই মৃত্যুপথযাত্রীকে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। কিষেনের মৃত্যুর পর গিরিশের অনুরোধে ক'দিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর গোটা পরিবারটিই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। খ্রীস্টের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং খ্রীস্টধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল বলেই দত্তেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এই পরিবারের প্রায় সবারই অন্তরে ভগবদ্ভক্তির ফল্গু বইত; তাই জীবনে চরম আঘাত পেলেও তাঁরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে তা সইতে পারতেন।

এই পরিবারেই লোক ছিলেন গোভিন্ এবং তাঁর তিন সন্তান—অব্জু, অরু ও তরু।

গোভিন্ তাঁর সন্তানদের যথাসাধ্য উত্তম শিক্ষা দেবার সংকল্প করেছিলেন, তাতে যদি তাঁর সমস্ত ধন নিঃশেষিত হয়ে যায় তো দুঃখ নেই। তাঁর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়ে তিনটি শিশু বয়স থেকেই কঠোর পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত হ'ল—জ্ঞানার্জনই হ'ল তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। নিতান্ত বাল্যাবস্থাতেই তারা অমর ইংরেজ কবি মিলটনের 'প্যার্‍্যাডাইস্ লস্ট্' (Paradise Lost) নামক কাব্যের প্রথম সর্গটি পুরো এবং দ্বিতীয় সর্গেরও অনেকখানি মুখস্থ করে ফেলেছিল। এই সময়ে তারা জনৈক ইংরেজ মহিলার কাছে পাঠ নিয়ে পিয়ানো বাজাতে ও ইংরেজী গান গাইতে পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংগীতেও অবশ্য তারা পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপ-মা প্রায়ই তাঁদের বাগমারির বাগান-বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। নানা গাছ-গাছালিতে ভরা বিশাল বাগান-বাড়ি শিশু-মনে জাগিয়ে তুলত অপরূপ মায়া, বিপুল পুলক। ঐ বাগান-বাড়ি তাদের কাছে ছিল রূপকথার জাদুপুরীর মত, সেখানে তারা ঘুরে বেড়াত যেন রূপকথারই তিনটি শিশু।

অমনি করে শান্ত পরিবেশের মধ্যে গভীর আনন্দে কাটছিল তাদের জীবন। কাটছিল নিরন্তন পড়াশোনা, সংগীতচর্চা আর জ্ঞানালোচনার মধ্যে। সাধারণ খেলাধূলা তাদের জীবনে ছিল না। বাপের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃত সম্বন্ধে আলোচনা করাই ছিল তাদের কাছে খেলা। অরু আবার চমৎকার ছবি আঁকতেও শিখেছিল।

তাদের বাড়িতে অতিথিসমাগম অল্প হ'ত বটে, কিন্তু অতিথিরা সবাই ছিলেন সেকালের নামকরা বিদ্বান্ ও জ্ঞানী। তাঁদের সঙ্গে ভাই-বোনদের নানা জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হ'ত। অতিথিরা বালক-বালিকাদের বিশেষ করে তরুর জ্ঞানবুদ্ধির গভীরতা দেখে অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা অবাক্ হতেন তাদের ভগবদ্ভক্তি দেখে—কচি বুক তিনটির ভিতর থেকে ভগবদ্ভক্তির অমৃতধারা যেন নিরন্তর উৎসারিত হ'ত।

তিন ভাইবোনের মধ্যে তরুই একটু যা চঞ্চল ছিল, অরু ছিল নিরীহ ও শান্ত, আর অব্জ ছিল নির্জনতা-প্রিয়। বিশাল বাগান-বাড়ির মধ্যে অব্জু কয়েকটি নিভৃত স্থান খুঁজে বের করেছিল নিজের জন্য। ঐ সব জায়গায় সে একাকী বসে থাকতে ভালবাসত। বলতে কি, বাগান তো নয়--শান্তির আশ্রম। সহসা সেই আশ্রমের প্রথম শান্তিভঙ্গ হ'ল অকালমৃত্যুর অবির্ভাবে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে অব্জু মারা গেল। অরুর বয়স তখন এগার, তরুর বয়স নয়।

অব্জুর মৃত্যু বালিকাদের অন্তরে বিষম আঘাত হানল। কিন্তু তারা তো সাধারণ বালিকা নয়,—অসামান্যা বিদূষী তারা, ঐ বয়সেই তারা জ্ঞানের সুধা আকণ্ঠ পান করেছিল। তাই প্রাণসমপ্রিয় একমাত্র ভ্রাতার মৃত্যুতে তাদের কচি হৃদয় দুটি ছিন্নভিন্ন হওয়ার উপক্রম হলেও তাদের চক্ষু রইল নিরশ্রু। ভাইকে সমাহিত করে তারা নীরবে বাড়ি ফিরে এল, ধীরে ধীরে প্রবেশ করল লাইব্রেরী-ঘরে। পিতা গোবিন্ও এলেন; তাঁরও চোখে জল নেই, আছে শুধু বুক-ভরা মর্মদাহ। লাইব্রেরী-ঘরে নিজের নিজের টেবিলের সামনে বসলেন তাঁরা, তারপর এক-একজনে এক-একখানা গভীর তথ্যপূর্ণ ইংরেজী বই খুলে পড়ে চললেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনে হ'ল, বিশাল এক দিঘিতে যেন ফুটে রয়েছে বড় বড় তিনটি পদ্ম—শত ঝড়েও তারা ডুবতে জানে না! বাপের মত বোন দুটিও অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে খ্রীস্টের প্রতিশ্রুতিতে, খ্রীস্টের করুণায়,—বিশ্বাস করে স্বর্গবাসের অধিকার পেয়েছে অব্জু।

অব্জুর মৃত্যুর পর পাঁচ বছর কেটে গেল। কন্যাদ্বয়কে সুশিক্ষিতা করে তোলার জন্য তাদের নিয়ে সস্ত্রীক গোভিন্ ফ্রান্সে গেলেন।

ফ্রান্সে পৌছে অল্পদিনের মধ্যেই অরু ও তরু ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে এবং বিবিধ বিষয়ে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। স্বদেশ ভারতবর্ষ তাদের কাছে পরম প্রিয় ছিল, তার

পরেই তারা ভালবাসতে শিখল ফ্রান্সকে। পরবর্তীকালে তরু যখন ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় লিখে নাম করল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসীরা তো তাকে ফরাসী নারী বলেই দাবি করে আসছে! ফ্রান্সকে বড় ভালবেসেছিল তরু; মাত্র পনের বছর বয়সে ফ্রান্স সম্বন্ধে সে যে কবিতা লেখে, তা আজও ইংরেজী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

কিন্তু একদিক থেকে তরু ও অরুর পক্ষে ফ্রান্স হয়ে উঠল মাতৃভূমি। অল্প যে ক'টি মাস তারা সেখানে ছিল, সে ক'টি মাসের মধ্যেই একদিকে তারা যেমন ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যাদিতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করল, অপর দিকে তেমনি যক্ষার মত কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। সেকালে যক্ষা বাস্তবিকই কালব্যাধি ছিল—এ রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য। আজকের দিনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কি উন্নতিই না হয়েছে—সাংঘাতিক যক্ষারোগীরও আর তেমন মৃত্যুভয় নেই। কিন্তু সেকালের অবস্থা ছিল ভিন্ন—যক্ষা মানেই মৃত্যু।

মেয়েদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গোবিন্ সপরিবারে ফ্রান্স থেকে ইংল্যানডে গেলেন। কিন্তু সে দেশেও তরু ও অরুর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়ে অবনতিই ঘটল। তখন ডাক্তারের উপদেশে সবাই স্বদেশে ফিরে এলেন। তরুর বয়স তখন সতের।

দেশে ফিরে পরিবারটি প্রধানতঃ বাগমারির বাগান-বাড়িতেই বাস করতে লাগল। ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রথম বোন দুটির স্বাস্থ্যের বেশ কিছুটা উন্নতি দেখা দিল। বাপ-মায়ের মনে আশা জগল; হয়ত মেয়েদের জীবন-দীপ দুটি অকালে নিবে যাবে না, হয়ত আঁধার হয়ে যাবে না তাঁদের সংসার।

তত দিনে অরু ও তরু ইংরেজী কবিতা লিখে নাম করে ফেলেছে। দু'বোন মিলে একখানা ইংরেজী কবিতার বইও বার করেছে। বইখানার নাম: A Sheaf Gleaned in French Field (ফরাসী ক্ষেত থেকে কুড়ান শস্যের আঁটি)। বিভিন্ন ফরাসী কবির লেখা কবিতাবলীর অনুবাদ ছিল এই বইখানায়।

এডমান্ড্ গস্ ছিলেন সেকালের—শুধু সেকলের কেন, সর্বকালের ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক। কিছুকাল যাবৎ ইংরেজী কবিতার এমন অধঃপতন ঘটেছিল যে, গস্ কোন নোতুন ইংরেজী কবিতার বই সমালোচনা করা দূরে থাক, খুলে পর্যন্ত দেখতে চাইতেন না। এমন সময়ে, যে পত্রিকায় তিনি সাহিত্য-সমালোচনা করতেন, সেই পত্রিকার সম্পাদক তাঁর হাতে একখানা পাতলা কবিতার বই গুঁজে দিলেন। গসের মেজাজ বিগড়ে গেল—ইংরেজ

কবিরাই আজকাল ভাল কবিতা লিখতে পারছে না, তা এ আবার বিদেশিনীদের লেখা একখানা চটি কাব্যগ্রন্থ ; বইখানার ছাপা বাঁধাই কাগজও ভাল নয়। গস্ বিরসমুখে বইখানাকে নিয়ে বাড়ি গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ফিরে এসে সম্পাদককে যা বললেন, তার সারমর্ম হ'ল : অপূর্ব—অপূর্ব! এ কবি যুগের আবিষ্কার! এই নাও তোমার সমালোচনা। সমালোচনা বেরুল কাগজে, বইখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন গস্। কোন ভারতবাসী ইংরেজীতে কবিতা লিখে আজ পর্যন্ত এত যশোলাভ করতে পারেন নি। তরু তখনও বয়সে কিশোরী মাত্র। বইখানার প্রচ্ছদ এঁকেছিল অরু।

কিন্তু হায়, মরণের নির্মম দাবি ঠেকান গেল না। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যক্ষারোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল অরু।

দাদা গেল, দিদি গেল, বনহরিণী তরু এবার বাস্তবিকই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। এবার থেকে প্রকৃতই শুরু হ'ল তার আপন-মনে খেলা।

তরুর দেহেও তখন কালব্যাধি যক্ষ্মা পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছে। তবে দেহ-মনে অরুর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত মেয়ে ছিল সে ; তাই দিদির মৃত্যুতে অন্তরে কঠিন আঘাত পেলেও সে রোগের ধাক্কাটা বেশ খানিক সামলে উঠল, শরীরও কিছুটা ভাল হ'ল। মনে তার আশা জাগল : আবার বিলাতে যাবে। ওদেশের বান্ধবীদের সে চিঠি লিখল : দেহ ভাল হচ্ছে, তোমাদের দেশে নিশ্চয় আবার যাব, ওদেশের পড়াশোনা শেষ করব।

বিলাতে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল তরু। নিরলসভাবে সে পড়াশোনা আর সংগীতচর্চা করতে লাগল, এবং সেই সঙ্গে বাপের কাছে সংস্কৃত শিখতে লাগল। দেখতে দেখতে সে ইংরেজী, ফরাসী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এমন জ্ঞান অর্জন করল যে, তার সুপণ্ডিত পিতাকেও ছাড়িয়ে গেল। ইংরেজী, ফরাসী বা সংস্কৃত শব্দাদির বুৎপত্তি প্রভৃতি নিয়ে প্রায়ই বাপে-মেয়েতে বাজি-ধরাধরি হ'ত, এবং প্রতি দশবারের মধ্যে ন'বারই হার হ'ত বাপের!

সংস্কৃতচর্চার ফলে ভারতবর্ষের অতীত গরিমা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তরুর মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। এ দেশের পুরাকাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে সে কয়েকটি অনবদ্য কবিতা লেখে। তার মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে ঐ কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ; গ্রন্থখানির নাম : Ancient Ballads and Legends of Hindusthan (হিন্দুস্থানের প্রাচীন গাথা ও লোক-কাহিনী)। এ গ্রন্থখানিও উচ্চপ্রশংসা লাভ করে।

বড় আশা ছিল তরুর : সে ভাল হয়ে উঠবে, আবার সে যাবে বিলাতে ইংরেজীতে আরও অনেক কবিতা লিখে ভারতের ছবি তুলে ধরবে বিশ্বের দরবারে।

কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হ'ল না—বাঙ্‌লার তরু আর বিলাতের মাটির স্পর্শ পেয়ে ফলে-ফুলে ভরে দিল না কাব্যদেবীর অর্ঘ্যথালি। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে জন্ম হয়েছিল তার, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট মাত্র একুশ বছরে তরু মারা গেল। একদিকে ভরা ভাদরের কান্না, অন্য দিকে তরুর শোকে তার বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কান্না! সেদিন বোধহয় কোন কাব্যরসিকের চোখ শুষ্ক ছিল না—শুষ্ক ছিল না কাব্যলক্ষ্মীর চোখ দুটিও।

তরু মারা গেছে। রেখে গেছে তার Sheaf আর Ballads, এবং ফরাসী ভাষায় লেখা একখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানি তার মাত্র আঠার বছর বয়সের লেখা। এ উপন্যাস-খানিও ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহিত্য-সমালোচকদের উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছিল। তাঁরা তরুকে সেকালের সেরা উপন্যাস-রচয়িত্রীদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন দিয়েছিলেন।

তরু মারা গেছে। কিন্তু আজও বেঁচে আছে তার সৃষ্ট সাহিত্য, বিশেষ করে তার কবিতাবলী। আজও তার লেখা পড়বার পাঠক আছে—আজও সেগুলি ছাপা হচ্ছে।

তরু মারা গেছে। কিন্তু ফুরিয়ে সে যায়নি। সুকণ্ঠ গায়কের উচ্চাঙ্গ সংগীত থেমে গেলেই ফুরিয়ে যায় না, তার রেশ থাকে এবং সেই রেশ গুন্‌গুনিয়ে নতুন লহর তোলে নোতুন গায়কের কণ্ঠে। বনহরিণী তরু দত্ত আজ নেই—নেই তার বড় বড় চোখ দুটির মোহনীয় দীপ্তি, নেই তার প্রতিভা-ভাস্বর মুখের অপরূপ মায়া, তার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির স্নিগ্ধ শোভা; তবু তার মনোহারিণী কবিতাগুচ্ছ—আছে হরিণীর আপন-মনে-চলা পথের বিচিত্র রেখা। সে রেখা ধরে পথ চলবে ভবিষ্যৎ বাঙ্‌লার অনেক হরিণী!

ছড়া

শ্রীআশিস সান্যাল

হাঁটি হাঁটি পা পা,
যা বৃষ্টি দূরে যা।
ঘাট ছেড়ে মাঠ ছেড়ে
আমাদের পাড়াগাঁ। না—
কোন কথা মানবো না।

যা বৃষ্টি নড়েচড়ে,
পাবদা মাছের মাথায় চড়ে;
সজনে গাছের তলা দিয়ে
যা রে ছুটে যা। আজ আর
কোন কথা মানবো না।

উদোবুদোর আত্মহত্যা

(২৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অবধায়ক সে রোজ বিছানা পাতে, জামা কাপড় কাচে, জুতো সাফ্ করে, সে পাবে চুনির অংটিটা।

আর গলার মুক্তোর মালাটা বিক্রী করে যে টাকা পাওয়া যাবে সেটা কি হবে? উদো ভাবতে সুরু করলো। অনেকক্ষণ চিন্তা করে মাথা খুলে গেল। তার চিতাভস্মের উপর একটা বেদী গাঁথা হবে, সেই বেদীর উপর তার একটা পাথরের মূর্তি রাখা হবে।

তারপর রইল হরিনামের ঝুলি।

এই ঝুলি নেবার যোগ্য পাত্র বুদো। বুদো নেবে এই ঝুলি।

উইল লেখা শেষ হলো। উদো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যাক্ আর ভাবনা নেই, এখন শুধু আফিমটা এলেই হয়, কাম ফতে! উদো বসে বসে পা নাচাতে থাকে।

খানিক পরে বুদো এসে পড়লো। বললো—অনেক কষ্টে আফিম যোগাড় করেছি। দাম বড় চড়া!

উদো বললো—তা তো হবেই। রাজার বাবা কম দামী বিষ খেয়ে মরলে তার পদমর্যাদা লঘু হয়ে যাবে। বেশী দামী বিষ নাহলে মর্যাদা থাকবে না। আমি এখন এই আফিমটারই অপেক্ষায় আছি। উইল লিখে ফেলেছি। আর আমার কোন চিন্তা নেই।

—কি লিখেছ শুনি।

উদো পড়তে সুরু করলো।

শেষ অবধি শুনে বুদোর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললো—আমার বেলায় শুধু ওই হরিনামের ঝুলি?

—তোমার তো ওইটেই বেশী দরকার।

—কেন আমার তো একটা রয়েছে।

—এবার দুটো হবে। দু'হাতে দুটো মালা জপবে, তাতে দ্বিগুণ পুণ্যি হবে।

—আমার পুণ্যিতে কি হবে? তুমি মরে গেলে আমি খাব কি? পথে পথে ভিক্ষে মাগবো?

—কেন, তুমিও আমার সহমরণে আসবে। নাহলে স্বর্গে গিয়ে আমি কথা বলবো কার সঙ্গে?

—স্বর্গে গিয়ে কি আবার লোকে কথা বলে নাকি? দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে মুখ পাবে কোথায়? সব তো তখন হাওয়া!

—কে বললে ভূতে কথা বলে? আজ অবধি দুনিয়ায় যত মানুষ মরেছে সবাই কথা বললে আকাশে কি ভয়ানক সোরগোল হতো বলো দিকি!

—তাই তো!—উদো ভাবনায় পড়লো—তাহলে মরে গেলে আর কথা বলতে পাবো না? তাহলে তো যা বলার আছে সবই এখানে বলে যেতে হবে। কিন্তু সব কথা তো মনে আসছে না, কাল কি বলবো, পরশু কি বলবো, সাতদিন পরে কি বলবো, একমাস পরে কি বলবো, সে সব কথা মনে করি কি করে?

—তুমি মনে করগে, এই রইল তোমার আফিম্ আমি চললাম।

—কেন? আমার কথা শুনে যাও?

—যাদেরকে হীরে, পান্না, চুনী দিচ্ছ তাদেরকে শোনাও গে—আমি হরিনামের ঝুলি নিয়ে আর কোন কথা শুনবো না।

—বেশ তো, রাগ করছ কেন, তোমার কি চাই বল?

—বেশ বেশ, এই নাও, রেখে দাও, আমি মারা যাবার পর এটা হবুচন্দ্রকে দিও।

—মারা যাবার পরে কেন, মারা যাবার আগেই দোব—এখনি দোব। আত্মহত্যা করার আইন জানো তো, ছ'মাস জেল। তোমার ছ'মাস জেল হবে। দেখবো তখন তুমি কেমন করে আত্মহত্যা কর, আর তোমার এই উইল কি কাজে লাগে! এই আফিমও আমি জমা দোব রাজসভায়। হরিনামের ঝুলি দিয়েছ আমাকে, ওই হরিনামের ঝুলি নিয়ে তুমি বসে থাকবে জেলখানায়। আমি চললুম—

আফিমের কৌটো আর উইল নিয়ে বুদো বেরিয়ে পড়লো।

—আরে, শোন শোন—

—না কোন কথা নয়।

বুদোর পিছনে উদোও এলো। বললো—আমার উইল ফেরত দাও!

বুদো ছুটলো পথ দিয়ে।

উদো মোটা মানুষ, থপ্ থপ্ করে সেও ছুটলো।

পথের লোক তো অবাক।

রাজবাড়ী প্রায় আধ-কোশ পথ। উদো অতো ছুটতে পারবে কেন, মাঝপথে সাড়া তুললো—চোর—চোর—

পথের লোকেরা বুদোকে গিয়ে ধরলো। ধরে নিয়ে এলো উদোর কাছে।

বুদো বললো—আমি চোর? তুমি তাহলে খুনী। এই দেখ সবাই আফিমের কৌটা।

সবাই তো থ'। একজন রাজার বাবা, একজন মন্ত্রীর বাবা, একজন বলছে চোর, আরেক জন বলছে খুনী! সবাই বললো—চল, তবে কোটালের কাছে যাই—

উদো বললো—আমি আর কোথাও যাবো না, বাড়ী যাবো। আমায় একখানা পাল্‌কী ডেকে দাও—

পাল্‌কী ছিল না, এলো গরুর গাড়ী। উদো গাড়ীতে উঠে বসলো। বুদো বললো—এই উইল আর আফিমের কৌটা কি হবে?

উদো বললো—ও তুমি নিয়ে যাও। ও আর আমার দরকার নেই। আমার এখনি যা বুক ধড়ফড় করছে, আমি বাড়ী পৌঁছেই হার্টফেল করবো।

—আর আমি এই পথের উপর উইল আর আফিম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো?

—বেশ তো তুমিও এসো—

বুদো উঠে পড়লো গরুর গাড়ীতে।

চোর আর খুনী এক গাড়ীতে পাশাপাশি চলে গেল।

বাড়ী পৌঁছেই উদো বললো—বড্ড দৌড়ঝাঁপ করে এসেছি। আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমুবো।

বুদো বললো—আর আমি বুঝি দৌড়ঝাঁপ করিনি? আমিও ঘুমুবো।

দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো সেই সন্ধ্যেবেলা।

উদো বললো—বুদো, খিদে পেয়েছে!

বুদো পেটে হাত বুলিয়ে বললো—আমারও।

উদো বললো—আশ্চর্য ব্যাপার, অনেক দিন তো এমন খিদে পায়নি।

বুদো হাঁক দিল—ঠাকুর, লুচি আর কাঁচাগোল্লা নিয়ে এসো।

উদো বললো—যদি খেদেই পায় তাহলে তো শরীর ঠিক হয়ে গেল। তাহলে আফিম খেয়ে মরতে যাই কেন?

বুদো বললো, তুমি আফিম খাও। আমি লুচি-সন্দেশ খাই।

উদো বললো—তুমি লুচি-সন্দেশ খাবে, আর আমি বসে বসে দেখবো সেটা হবে না। আমিও খাব।

উদো বুদো খেতে বসে গেল।

খেয়েদেয়ে উদো বললো—অসুখ সেরে গেছে, কি করে সারলো বল দেখি?

বুদো বললো—আত্মহত্যার ভয়ে রোগ পালিয়ে গেছে।

উদো বললো—না, রোদে ছুটোছুটি করে শরীরটা আবার মজবুত হয়ে গেল। রোজ এবার রোদে ছুটবো।

বুদো বললো—রোজ চোর চোর বলে পথে আমায় তাড়া করবে?

উদো বললো—তুমি যদি রোজ চোর না হতে চাও, একদিন তুমি চোর হবে একদিন আমি চোর হব, শোধ বোধ হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে দুপুর রোদে উদো বুদোর চোর-চোর খেলা সুরু হলো। উদো বললো—আবার আমরা ছেলেমানুষ হয়ে গেছি, আত্মহত্যার পর পুনর্জন্ম!

রক্ত-ঝরা গড়

শ্রীছবি মুখোপাধ্যায়

শীতের রাত। এ শীত ঠিক হাড়-কাঁপানো শীত নয়, এ শীত শরীরের মজ্জায় মজ্জায়, শিরা-উপশিরায় একটা যেন দারুণ হিমেল প্রবাহের আঘাত হানল। আজমীর ষ্টেশন থেকেই এটা টের পেয়েছিলাম। তারপর যখন ট্রেনটা ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকে পড়লো, তখন থেকেই উত্তরোত্তর এর ভীষণতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমাদের। যত জোরে গাড়ী ছুটছিল, তত জোরেই যেন ওই ঠাণ্ডা গ্রাস করছিল গাড়ীটাকে। এমনি করেই ভোর রাতে সেদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজস্থানের চিতোরগড়ে এসে পৌছলাম। এ গাড়ীর যাত্রা এখানেই শেষ হয়েছিল, অতএব যাত্রীরা সব এখানেই গাড়ীতে থেকে গিয়েছিল সেদিন বাকি রাতটুকু। আমরাও পড়ে রইলাম যে-যার বিছানায় মাথা মুড়ি দিয়ে, লেপ-কম্বলের চাপাচুপির মধ্যে। একবার শুধু মুখটা খুলে আমাদের সকলকে বললাম যে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন উঠো না।

আমার কথা শুনে পাশের বেঞ্চির বিছানা থেকে ছোট্ট বুলবুল তার মাথাটা একটু বের করে পিট্‌পিটে চোখে বলল, কখন উঠবে কাকু? তারপর সে কলকলিয়ে উঠলো যেন। তার মা তাকে জোর করে ধরে শুইয়ে রাখবার জন্যে টেনে রাখতে রাখতে বলল, এখন চুপটি করে শুয়ে থাকো, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

বুলবুলের ছোট্ট দিদি রূপু—বুলবুলের চেয়ে বছর চারেকের বড়, অর্থাৎ বছর বারো তেরো বয়স হবে তার। সে বেশ ভারিক্কী চালেই বলল, উঠিস্ না ভাই, ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে জ্বর হলে আবার কিছুই দেখা হবে না আমাদের—বলে দিচ্ছি কিন্তু! সুতরাং জ্বরের ভয়েই সেও চুপ করে গেল তখন। এরপর বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দ ছিল গাড়ীর ভেতরটা। কিন্তু তারপরই কেমন যেন একটা খটাখট্ খটাখট্ আওয়াজ শোনা গেল। এই আওয়াজের সঙ্গেই গোলমাল, চেঁচামেচি, তারপরই দেখতে পেলাম—একজন যাত্রীর দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে যেতে। এই না দেখে, রূপু-বুলবুলের বাবা তাঁর ফ্লাস্ক থেকে গরম জল বের করে ওই যাত্রীটির দিকে এগিয়ে গেলেন। আর এই নিয়ে বেশ একটু ধস্তাধস্তিও করতে হোলো তাঁকে ওই যাত্রীর সঙ্গের লোকজনদের হয়ে। এই রকম কিছুক্ষণ যাবার পর, সেই যাত্রীটি মুখ খুল্‌ল। উঠে পড়ে বেশ কাঁপতে কাঁপতেই বলল, বহুৎ সর্দি; অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা। যাইহোক এই ভাবেই সেদিন প্রভাতের মুখে দেখেছিলাম আমরা। বাইরে আলো ফোটার পর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল চারিদিক, তখন যাত্রীরা একে একে নেমে গেল গাড়ী থেকে। আমরাও নেমে টাঙা ভাড়া করে সোজা হোটেলের দিকে যাত্রা করলাম।

রাস্তায় যেতে যেতে আমার পাশে বসেই সেদিন বুলবুল জিজ্ঞেস করেছিল, কাকু তোমার সেই পদ্যটা মনে আছে?

কি?

সেই যে, "জলস্পর্শ কোরবো না আর চিতোর রানার পণ;
বুঁদির কেল্লা মাটির ওপর থাকবে যতক্ষণ।"

বেশ তালে তালে আবৃত্তি করেই বলল সে।

রূপুও বলে উঠলো তখন, এই সেই চিতোর কাকু?

হেঁসে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

'বুলবুল জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা কি কাকু?'—পৃঃ ২৯৫

এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই টাঙা তার স্বভাবসিদ্ধ ঠুনঠুন আওয়াজ করে পৌছে দিল আমাদের এখানকার হোটেলে। এ হোটেলটাই এখানকার মধ্যে নাকি একমাত্র হোটেল। এখান থেকেই দেখতে পেলাম আরাবল্লী পর্বতকে। আর পেলাম তার গায়ে জলজলে প্রকাণ্ড অরুণরাগে রঞ্জিত সূর্যকে। ওই সূর্যের আলোয় যে আরাবল্লীকে দেখেছিলাম, তাতেই উদ্ভাসিত হয়েছিল রাজপুত জাতের বীরত্ব-কাহিনীর কতই না কথা! ছেলেবেলার পড়া ইতিহাসের সে ঘটনাগুলো যেন চোখের সামনেই এসে পড়লো তখন। দেখতে দেখতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বুলবুলের কথায় আমার চমক ভাঙলো। সে হোটেলের বাড়ীটা দেখিয়ে বলল, এইখানে আমরা থাকবো বুঝি কাকু?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

হুইহুই করে এরপর সকলে নেমে পড়লাম এবং জিনিসপত্তর দেখে-শুনে মিলিয়ে নিয়ে ঢুকলাম মাঝের তলার একটা ঘরে। অল্পদিনের জন্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মোটামুটি মন্দ নয় এখানকার। যাই হোক সেদিন দুপুরে স্নান-খাওয়া সেরে দেখতে বেরিয়েছিলাম চিতোর দুর্গ।

এই দুর্গকে এখানকার সকলে বলে গড়। তাই এর নাম হয়েছে চিতোর গড়।

সেদিন টাঙা করেই ওই গড় দেখতে বেরিয়েছিলাম। যখন বেরিয়েছিলাম তখন মধ্যাহ্ন-সূর্যের উত্তাপ আর তার সঙ্গে শীতের ঠাণ্ডা, দুইয়ে মিলে বেশ ভালোই লাগছিল আমাদের। টাঙা করে সেদিন এর সিংহদ্বার, অর্থাৎ যার নাম পুলদরওয়াজা, তার ভেতর দিয়ে দুর্গের অনেকটা ভেতরে গিয়েছিলাম। তারপর হাঁটতে হয়েছিল আমাদের। হেঁটে-হেঁটেই সমস্ত কেল্লাটা দেখেছিলাম আমরা। সেদিন বুলবুলও সমান তালেই আমাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই দেখেছিল কেল্লার সব কিছু।

এই দুর্গটি হোলো ভারতে য৲ ঐতিহাসিক দুর্গ আছে তার মধ্যে একেবারে অন্য ধরনের। আর এ হোলো সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সবচেয়ে পুরনো। কিংবদন্তী আছে যে, এ দুর্গ নাকি মহাভারতের যুগে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তৈরী। এর অবস্থিতি হোলো আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। সমতল ভূমি থেকে পাঁচশ ফুট ওপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই দুর্গটি। সবসুদ্ধ সমুদ্র সমতল থেকে এটি আঠারোশ পঞ্চাশ ফুট ওপরে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় তিন মাইলের বেশি। চওড়ায় প্রায় পৌনে এক মাইল। এর নীচে দিয়ে গম্ভীরী-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই দুর্গে সাতটি বড় বড় ফটক আছে। প্রধান ফটক হোলো পাদাল পোল। পোল মানেই ফটক। এরপর আছে ভাইরান পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোরলা পোল, লক্ষ্মণ পোল ও রাম পোল।

সেদিন টাঙা থেকে নেমে প্রধান ফটক দিয়ে যেতে যেতে বুলবুল জিজ্ঞেস করছিল, একটা শ্বেতপাথরের মস্ত বড় জলাধার দেখে, এটা কি কাকু?

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, সেটার নাম হোলো ঝালী বাউ। অর্থাৎ ঝালী জলাধার। এই জলাধার রাণা উদয়সিংহের রানী ঝালী তৈরী করেছিলেন বলেই এর নাম হয়েছে ঝালী বাউ। এর পাশেই আছে একটি খুব সুন্দর ফুলের বাগান। তারপরেই পড়ে এক-একটা ফটক। একদা এই চিতোর রাজপুতদের স্বাধীন রাজ্য মেবারের রাজধানী ছিল। এখানে থাকতেন বীরশ্রেষ্ঠ সংগ্রামসিংহ। এই সংগ্রামসিংহ নিজের জীবনে মুসলমানদের সঙ্গে ষোলটি বড় বড় যুদ্ধ করেছিলেন। ইনি দিল্লীর লোদী ও মালওয়া রাজকে পরাজিত করেন। বাবরের সঙ্গেও ইনি যুদ্ধ করেন। এখনো বাবরের একটি ছিনিয়ে আনা কামান আজও সাক্ষী দেয় এই বীরত্ব কাহিনীর। পরে ইনি বাবরের সঙ্গে খানওয়া যুদ্ধে হেরে যান। এই যুদ্ধে

ইনি একটি পা, একটি চোখ হারান ও ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে ফেরেন। কিন্তু তবুও নিজের দেশকে পরাধীনতার হাতে সঁপে দেননি।

এরপর আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম বিজয়স্তম্ভ, রানী মীরাবাইয়ের মন্দির ও ঘিয়ের কুণ্ড।

বিজয়স্তম্ভের কথায় রূপু ও বুলবুল প্রশ্ন করেছিল, এটা ঠিক দিল্লীর কুতুব মিনারের মত, তাই না কাকু?

উত্তর দিয়েছিলাম, এই স্তম্ভ কুতুব মিনারের চেয়েও ভালো—একথা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলে গেছেন। এই স্তম্ভ তৈরী করে গেছেন রাণা কুম্ভ।

এরপর রূপু জিজ্ঞেস করেছিল, কিসের বিজয়স্তম্ভ কাকু?

বলেছিলাম, রাণা কুম্ভ মালওয়ার মামুদ খিলজীকে পরাজিত করে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নির্মাণ করেন চোদ্দ'শ চোদ্দ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর রানী মীরাবাইয়ের কথা বলেছিলাম। আর বলেছিলাম, এই বিজয়স্তম্ভ ও ঘিয়ের কুণ্ডের কথা। এই কুণ্ডটি হোলো, একশ পঁচিশ ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া এবং এর গভীরতা হোলো তিরিশ ফুট।

দেখতে দেখতে কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছিল তা আগে বুঝতেই পারিনি। বুঝতে পারলাম পরে। সেদিন বুলবুল বলেছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহ কি এখানে থাকতেন না?

—না, তিনি থাকতেন উদয়পুরে। এখান থেকে উদয়পুর হোলো কয়েকটা স্টেশন পরেই।

রূপু জিজ্ঞেস করেছিল, ইনিও তো দিল্লীর বাদশা আকবরের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ করেছিলেন না কাকু?

—হ্যাঁ, ইনি নিজের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

আমরা গল্প করছি, ঘুরছি, ঠিক এমন সময় কেল্লার মধ্যে শোনা গেল রেডিও বাজার আওয়াজ। এই আওয়াজ ভেসে আসছিলো এখানকারই এক পাহারাদারের ঘর থেকে। পাহারাদারটি হোলো রাজস্থান সরকারের কর্মচারী। শোনা যাচ্ছিলো নেতাজীর আজাদ হিন্দ যুদ্ধের সেই গানটি—'কদম্ কদম্ বাড়াহে যায়, খুশী কি গীত গায়ে যায়; জিন্দগী হ্যায় কৌম কি, কৌম পে লুটায়ে যায়।'

যে গান শুনে বুলবুল বলেছিল তখন, মহারানা প্রতাপ আমাদের নেতাজীর মত দেশের জন্যে জীবন দিতে বলেছিলেন দেশের লোকদের, তাই না কাকু?

তার সেকথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তখন। আর বলেছিলাম, ঠিক তাই বুলবুল, ঠিক তাই।

সত্যিই সেদিন রাজপুত বীরের সঙ্গে আমাদের এই বাঙালী বীরের কোন পার্থক্য দেখিনি।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০, বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : '৬০ পয়সা
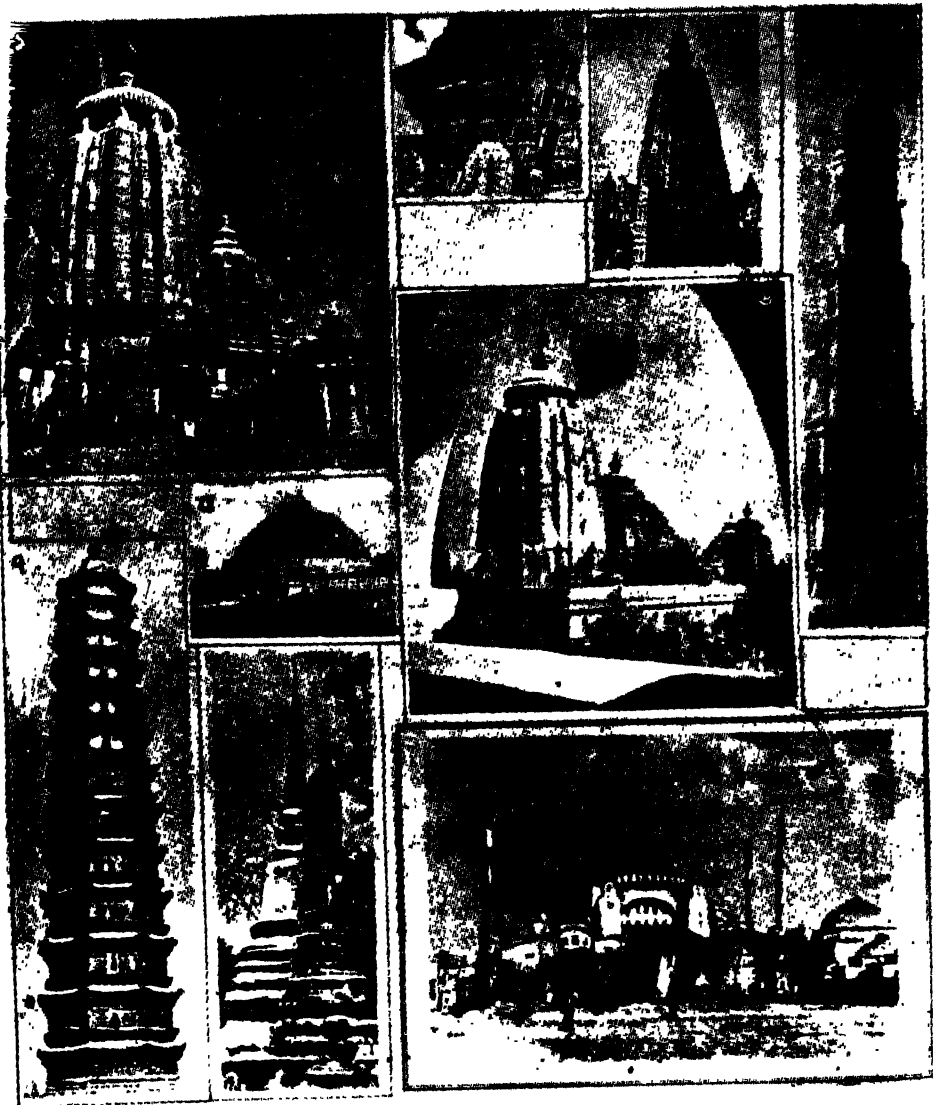
ভারতের তথা পৃথিবীর মন্দির-শিল্পের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

১। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মন্দির ২। রথাকৃতি কোনারকের মন্দির ৩। ৫ম শতাব্দীর গয়ার বুদ্ধ-মন্দির ৪। মস্কোর (ক্রেমলিন) গ্রেট্ বেল টাওয়ার ৫। সাঁচীর বৌদ্ধস্তূপ ৬। পুরীর জগন্নাথের মন্দির ৭। চীনের আয়রণ প্যাগোডা ৮। থাইলাণ্ডের দুটি বৌদ্ধস্তূপ ৯। কনস্ট্যানটিনোপোলে সেণ্ট সোফিয়ার মন্দির।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা *

৫১শ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৭৭ [৭ম সংখ্যা

আয়নার বায়না

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

আয়নার মধ্যে না আছে যেই ঘর
সেই ঘরটাই
পেতে আমি চাই।
যতই না তাড়াতাড়ি ছুটেই না যাই—
নেই নেই নেই!
দেখতে না দেখতেই কোথায় হারায়!
এমনি সাজানো আর পাশাপাশি খাট
পাতা—সেই ঘরটার আমি সম্রাট!
যেই ফের ফিরে এসে সামনে দাঁড়াই
আয়নার—আবার সে ডাকে আমাকেই—
বলে এই আছি আমি, পাশাপাশি ঠিক
এমনিই খাট পাতা টেবিল চেয়ার
সাজানো এ-ঘরটার তুমিই মালিক।

আবার আমাকে তার ইশারা বাড়ায়।
ফের আমি ভুলে তার হাতছানিতেই—
পাশ দিয়ে ছুটে যাই এক দৌড়েই…
চক্ষের পলকে কি তখুনি লোপাঠ ?
নেই নেই সেই ঘর কোথাও সে নেই !
সারাবেলা এমনিই লুকোচুরি খেলা—
চলে সেই ঘরটার সঙ্গে আমার।
একদিন ওকে আমি ধরে ফেলবই।

এমনি সাজানে আর এমনি জমাট
চেয়ার টেবিল আর সোফা দেরাজেই
সাজানো-গোজানো ঘর সামনেই ওই—
এই ঘরটার মত। এবং তাতেই
আশা করি এমন কি আয়নাও নেই ?

এমনি দেয়াল জোড়া এমন বিরট ?
সেই আয়নার ফাঁকে ফের আবার ঘর—
আরো আরো ঘর সেই ঘরের ভেতর
তার আর নায় ?
সেই সব ঘর তাই মোর পাওনাই।

এ-ঘরের পাশ দিয়ে চট করে ছুটে
একদিন ঘরটাকে ধরতে হবেই।
চোখের সামনে আছে—ওকি মিথ্যেই ?
কতো ঘরে আমার যে কতো কতো খাট
আমার জন্যে পাতা—আমি সম্রাট !

টপ-সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

আজ তোমাদের চাঁদে যাওয়া নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার ভেতর যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিলো সেই গল্প বলবো।

তোমরা সবাই জানো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী এক রকেট বোমা আবিষ্কার করেছিলো। হিটলার ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবার জন্যে এই রকেট বোমাকে কাজে লাগিয়েছিলেন আর এই রকেট বোমার নাম ছিলো ভি-ওয়ান, ভি-টু।

আর এই রকেট বোমা তৈরী হচ্ছিলো সমুদ্র প্রান্তে পেনিমিনডে শহরে। আর বোমার কাজকর্মের তদ্বির-তদারগ করছিলেন মেজর জেনারেল ওয়াল্টার ডোরনবার্জার। আর বোমা বানাচ্ছিলেন ডোরনবার্জারের এক সহকর্মী, তরুণ বৈজ্ঞানিক। সেদিন এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের নাম কেউ জানতো না, কিন্তু আজ সবাই এই বৈজ্ঞানিকের নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। বৈজ্ঞানিকের নাম ছিলো ভেরন হের ফন ব্রাউন।

ফন ব্রাউন কিন্তু এই রকেট বোমা লণ্ডন ধ্বংস করবার জন্যে বানান নি। অল্প বয়স থেকে তিনি রকেটে করে চাঁদে যাবার স্বপ্ন দেখতেন। এই রকেট নিয়ে প্রথমে গবেষণা করেছিলেন এক রাশিয়ান স্কুল টীচার কনষ্টানটিন সিলকোভস্কি। তারপর এই নিয়ে আমেরিকান বিজ্ঞানিক গর্ডাড এবং জর্মান বৈজ্ঞানিক হেরম্যান ওবেরয় যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সুরু হলো, তখন ফন ব্রাউন আর ডোরনবার্জার এই রকেট নিয়ে কাজ সুরু করলেন। ডোরনবার্জার ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, ফ্যাক্টরীর কর্তা। আর ফন ব্রাউন তার অধীনেই কাজ করতেন।

জার্মানী রকেট বোমা ও এ্যাটম বোমা নিয়ে কাজ করছে এই খবর ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা জানতে পারলেন। একদিন ব্রিটীশ এয়ারফোর্স পেনিমিনডে শহর আক্রমণ করলো। ব্রিটীশ বিমানের বোমার আঘাতে ফ্যাক্টরীর বেশ খানিকটা ধ্বংস হয়ে গেলো। ফন ব্রাউনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নিহত হলো। এদের মধ্যে ডাঃ থিয়েলের নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ ডাঃ থিয়েল এই রকেট বোমার ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ বিমান বাহিনীর আক্রমণে ডোরনবার্জার ও ফন ব্রাউন কাবু হয়ে পড়েন নি। তাঁরা পুরোদমে তাঁদের গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন এবং ভি-ওয়ান ও ভি-টু রকেট বোমা তৈরী করেছিলেন।

কিন্তু রকেট বোমা তৈরী করেও হিটলার যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি। যুদ্ধের শেষ

যতোই নিকটে ঘনিয়ে আসতে লাগলো, জর্মানীর গেষ্টাপো বাহিনী এই সব বৈজ্ঞানিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হলেন। প্রথমে এদের পেনিমিনডে শহরে থেকে সরিয়ে নিয়ে আল্পস পর্বতের কাছে একটা গ্রামে নজরবন্দী করে রাখা হলো। কিন্তু গেষ্টাপো বাহিনীর হাতে বন্দী হবার আগে ফন ব্রাউন এক কাণ্ড করে বসলেন। সেদিন ফন ব্রাউন যদি মনে সাহস করে ঐ কাজ না করতেন, তাহলে আজ চাঁদে যাবার জন্যে রকেট বানাতে অনেক কষ্ট হতো। ফন ব্রাউন তাঁর দুই বিশ্বস্ত সহকর্মী বার্নাড টেসম্যান এবং ডিটার হুজেলকে ডেকে পাঠালেন। তারপর রকেট বোমা নিয়ে, যতো গবেষণা করেছিলেন এবং এই গবেষণা যে সমস্ত কাগজে টুকে রেখেছিলেন, সেই কাগজের বাণ্ডিল তাঁর দুই সহকর্মীর হাতে তুলে দিলেন। দিয়ে বললেন: এতোদিন আমরা যে পরিশ্রম করেছি, সব কিছুই আমরা লিখে রেখেছি। তোমাদের কাজ হবে এই কাগজগুলো কোন নিরাপদ জায়গায় রেখে দেওয়া, যাতে এই দুষ্প্রাপ্য কাগজ শত্রুর হাতে না পড়ে।

জানতে চাও এই কাগজের বাণ্ডিলের ওজন কতো ছিলো?—মোট চোদ্দ টন।

* * *

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল।

ডোরনটন একটি ছোট গ্রাম। নিঃঝুম, নিঃস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে দূর থেকে শত্রুর কামানের গর্জন ভেসে আসছে।

রাতের এই নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে একটি লরি এগিয়ে চলেছে। লরির ভেতর বার্নাড টেসম্যান ও ডিটার হুজেল বসে আছেন। তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন জার্মান সৈন্য বসে আছে। কিন্তু লরি কী দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছে, সেই খবর জার্মান সৈন্যরা জানে না। শুধু সেই খবর বার্নাড টেসম্যান ও ডিটার হুজেল জানেন। খানিকটা পথ অতিক্রম করে গাড়ী থামলো। সামনেই একটা পাহাড়। পাহাড়ের পাশে একটি ছোট খনি। আজকাল সেই খনিতে কোন কাজ হয় না। বার্নাড টেসম্যান ও ডিটার হুজেল এবার গাড়ী থেকে বাক্সগুলোকে নামালেন। তারপর তার সঙ্গীদের গড়ীর ভেতর বন্ধ করে রাখলেন। দু'জনে মিলে বাক্সগুলো খনির ভেতর নিয়ে গেলেন। তারপর বাইরে ডিনামাইট দিয়ে খনিতে যাবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এমন কী এই অঞ্চলে যে একটা খনি ছিলো, সেইটে বোঝাও দুষ্কর হয়ে উঠলো। আর খনির ভেতর আটকা রইলো এক বিচিত্র রহস্য রকেট বানাবার নকশা, চাঁদে যাবার প্ল্যান।

লড়াই শেষে আমেরিকান, রুশ, ব্রিটীশ ও ফরাসী সৈন্য-বাহিনী এই সব জার্মান বৈজ্ঞানিকদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলো। সবাই জানতে চাইলো জার্মানীর রকেট বোমা

বার্নাড টেনমান ও ডিটার হুজেল গাড়ী থেকে বাক্সগুলো নামালেন।—পৃঃ ৩০০

কোন্ সব বৈজ্ঞানিকেরা তৈরী করেছিলো। আমেরিকান হাই-কম্যাণ্ড জার্মান বৈজ্ঞানিকদের একটা নামের লিষ্ট তৈরী করলেন। এই লিষ্টের নাম হলো 'অসেনবার্গ লিষ্ট'। অসেনবার্গ ছিলেন এক জার্মান। জার্মান কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সমস্ত জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং তাদের কার্যকলাপের একটা লিষ্ট তৈরী করেছিলেন। আর ভাগ্যক্রমে এই লিষ্ট আমেরিকানদের হাতে পড়েছিলো। আমেরিকান ইনটেলিজেন্স বাহিনী এবার এই লিষ্ট অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকদের খুঁজতে লাগলেন। আর এই লিষ্টের প্রথম নাম ছিলো ভেরন হের ফন ব্রাউনের।

ওবেরমেরগাও বলে একটি গ্রামে ফন ব্রাউন ও অন্যান্য পেনিমিনডের কর্মচারীদের নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিলো। এই গ্রামে এসে ফন ব্রাউন ও ডোরনবার্জার অন্যান্য সহকর্মীদের দেখা পেলেন। কিছুদিনের জন্যে চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি হাসপাতালে এডমিশন নিলেন। হাসপাতালে থাকাকালীন ফন ব্রাউন খবর পেলেন যে, আমেরিকান সৈন্য-বাহিনী তাদের গ্রামের অতি নিকটে চলে এসেছে। সেখান থেকে ফন ব্রাউন গেলেন হাউস ইনসবুর্গ বলে আর একটি গ্রামে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, ফন ব্রাউন, ডোরনবার্জার ও পেনিমিনডের অন্যান্য কর্মচারীরা আত্মসমর্পণ করবেন।

আমেরিকান সৈন্য-বাহিনী তখন রয়েটে বলে একটি গ্রামে বিশ্রাম করছিলেন। একদিন সেই গ্রামে ফন ব্রাউনের ভাই ম্যাগনাস ফন ব্রাউন সাইকেলে করে এসে আমেরিকান সৈন্য-

বাহিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। আমেরিকান সৈন্য-বাহিনীর কাছে তখনও ফনব্রাউনের নাম অজ্ঞাত ছিলো। ম্যাগনাস ফন ব্রাউন যখন আমেরিকান প্রাইভেট ফ্রেড স্নাইকারের কাছে ফন ব্রউান ভি-ওয়ান, ভি-টু রকেট বোমার কথা বললো, তখন স্নাইকার বিস্ময়ে চোখ তুললো। রকেট বোমা? কী ব্যাপার? এবার কাউন্টার ইন্‌টেলিজেন্সের কর্তারা এসে ম্যাগনাস ফন ব্রাউনকে জেরা সুরু করলো। জেরায় সন্তুষ্ট হয়ে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ভেরনহের ফন ব্রাউন, ডোরনবার্জার ও তাদের সহকর্মীদের আত্মসমর্পণ করবার অনুমতি দিলেন।

তার পরের ঘটনা ঘটে গেল দ্রুত লয়ে।

আমেরিকার কর্তৃপক্ষ অনেক দিন ধরে ঠিক করেছিলেন যে, এই সমস্ত জার্মান বৈজ্ঞানিকদের তাদের দেশে নিয়ে যাবেন এবং গবেষণার কাজে লাগবেন। ঠিক হলো প্রায় তিনশো জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং টেক্‌নিশিয়ানদের আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাদের পরিবারকে জার্মানীতে থাকতে হবে। কারণ, আমেরিকার এফ. বী. আই ঘোরতর আপত্তি করেছেন যে, আমেরিকায় জার্মান বৈজ্ঞানিকদের পরিবার এলে গণ্ডোগোল সৃষ্টি হতে পারে। সেদিন আমেরিকা যদি এই সামান্য ভুলটুকু না করতেন, তাহলে হয়তো রাশিয়া এতো তাড়াতাড়ি চাঁদে যাবার জন্যে রকেট বানাতে পারত না। কারণ, ফন ব্রাউনের সঙ্গে অনেক বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক তাঁদের পরিবারকে জার্মানীতে রেখে আমেরিকায় চলে গেলেন, কিন্তু সেই দলের একজন সেরা পণ্ডিত স্পষ্ট বললেন: আমি জার্মানী ছেড়ে কোথাও যাবো না।

এই ভদ্রলোকের নাম হলো হেলমুট গ্রোটরুপ। তিনি ফন ব্রাউনের সঙ্গে পেনিমিনডেতে কাজ করতেন। এই হেলমুট গ্রোটরুপের প্রতি ফন ব্রাউনের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলো।

আমেরিকাতে চলে আসবার পর আমেরিকান কর্তৃপক্ষ যখন ফন ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাশিয়া রকেট বানাতে পারবে কিনা, তখন ফন ব্রাউন বললেন: যদি হেলমুট রাশিয়ানদের সঙ্গে কাজ করে, তাহলে ঐ রকেট বানাতে একটুও অসুবিধে হবে না। কারণ, হেলমুটের জ্ঞানের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

এবার রাশিয়ানদের কাহিনী শোন। তারাও জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং তাদের কার্যকলাপ জানবার ফিকিরে ছিলেন। ১৯৪৪ সালে মালেনকভকে নিয়ে জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং তাদের গবেষণার কাজ জানাবার জন্যে তারা এক কমিটি করেছিলেন। এই কমিটির কাজ ছিলো চেকোস্লভাকিয়া, হাঙ্গারী ও জার্মানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈজ্ঞানিকদের পাকড়াও করে নিয়ে আসা। কিন্তু তারা জার্মান বৈজ্ঞানিকদের পাকড়াও করবার আগেই ডোরনবার্জার, ফন ব্রাউন, ষ্টাইনহফকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হেলমুট গ্রোটরুপ আমেরিকানদের সঙ্গে যাননি। তার এক গোঁ—তিনি জার্মানী ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

তিনি এবং তার স্ত্রী ইরমগ্রাদ গ্রোটরূপ উইতোহাউসেন গ্রামে বসবাস করছিলেন। এমনি সময় রেড আর্মির সৈন্য-বাহিনী এসে সেই গ্রামে ঢুকলো। রাশিয়ানরা হেলমুট গ্রোটরূপ এবং পেনিমিনডের আরো কিছু কর্মচারী গ্রেপ্তার করলেন। শুধু ভি-ওয়ান ও ভি-টু রকেট বোমা নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তাদের আটক করা হলো না; জর্মান এভিয়েসন ইন্‌ডাষ্ট্রির বড়ো বড়ো কর্মচারীদেরও আটক করা হলো।

হেলমুট গ্রোটরূপকে রাশিয়ানরা বললেন যে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে জার্মানীতে বসে তাঁর গবেষণার কাজ করতে পারেন। কেউ তাঁর কাজে বাধা দেবে না। হেলমুট গ্রোটরূপ ও তাঁর সহকর্মীরা এবার নিশ্চিন্ত মনে রকেট নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। আর হেলমুট গ্রোটরূপ যে রাশিয়ানদের সাহায্য করছেন এই খবর আমেরিকানদের কানে গেলো। তারা বেশ একটু চিন্তিত হলো। সি.আই.এ শুনতে পেলো যে, হেলমুট গ্রোটরূপ ইনষ্টিটিউট রাবে'তে কাজ করছেন।

* * *

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ানরা তাদের প্রতিশ্রুতির খেলাপ করলেন। হেলমুট গ্রোটরূপ ও তার সঙ্গীদের পরিবারের সবাইকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হলো।

দিনটা ছিলো ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল। গবেষণার ব্যাপার নিয়ে রাশিয়ান জেনারেল গাইডুকও হেলমুট গ্রোটরূপের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গবেষণা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। আলোচনা অন্তে জেনারেল গাইডুকও হেলমুট গ্রোটরূপ এবং তার সঙ্গীদের ককটেলে নেমন্তন্ন করলেন।

সবাই যখন মশগুল হয়ে ককটেল পার্টিতে স্ফূর্তি করছেন, এমনি সময় রাশিয়ান সৈন্য-বাহিনী গ্রোটরূপ এবং অন্যান্য জর্মান বৈজ্ঞানিকদের বাড়ীতে হানা দিলো। সবাইকে বললো: তৈরী হয়ে নাও; তোমাদের সবাইকে রাশিয়াতে যেতে হবে।

হেলমুট গ্রোটরূপের স্ত্রী ইরমগ্রাদ এবার তাঁর স্বামীকে টেলিফোন করলেন। কী ব্যাপার? সবাইকে রাশিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? তাহলে কী রাশিয়ানরা সবাইকে গ্রেপ্তার করছে? হেলমুট গ্রোটরূপ তার স্ত্রী'র কথা শুনে অবাক হলেন। বুঝতে পারলেন যে, রাশিয়ানদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। মনের কোন বিচলতা প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন: প্রতিবাদ করে লাভ নেই, এদের খপ্পরে যখন একবার পড়েছি, তখন আর কখনই মুক্তি পাব না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

সোভিয়েত পুলিশ ইতিমধ্যে তন্ন তন্ন করে হেলমুট গ্রোটরপের বাড়ী খানাতল্লাসী করলো এবং বাড়ীর জিনিসপত্র নিয়ে গেলো। হেলমুট গ্রোটরূপ ও অনান্য জার্মান বৈজ্ঞানিকদেরও

এক ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই সঙ্গে তাদের পরিবারকেও নেওয়া হলো। হেলমুট গ্রোটরূপ এবার রাশিয়ানদের কথার খেলাপের জন্যে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। 'কিন্তু তার উত্তরে রাশিয়ানরা শুধু বললেন: যুদ্ধের সময় তোমরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করেছ; আমাদের দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে তোমাদের সাহায্য করতে হবে। পটসড্যাম এগ্রিমেণ্টে আমরা মীমাংসা করেছি যে, জার্মানদের আমাদের দেশ নতুন করে গড়ে তুলতে কাজে লাগান হবে। এবার হেলমুট গ্রোটরূপ স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন: আমি আবার কবে নাগাদ জর্মানীতে ফিরে যেতে পারব?

আমরা রকেট তৈরী করছি। এই রকেট বানাতে তুমি এবং অন্যান্য জর্মান বৈজ্ঞানিকদের কাজে লাগান হবে। যেদিন আমাদের রকেট আকাশে উড়বে সেদিন তোমরা মুক্তি পাবে।

হেলমুট গ্রোটরূপ আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে গবেষণার কাজ সুরু করলেন। কিন্তু সোভিয়েত রকেট রিসার্চ ষ্টেশনের বিশৃঙ্খল কাজকর্ম দেখে হেলমুট গ্রোটরূপ নিরাশ হলেন। চারদিকেই বিশৃঙ্খলা। কাজ করবার কোন সাজসরঞ্জাম নেই। গ্রোটরূপ এবার ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্রীর মন্ত্রী উষ্টিনভের কাছে কাজের এই বিশৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করলেন। 'কিন্তু রুশ মন্ত্রী উষ্টিনভ হেলমুট গ্রোটরূপকে বললেন: আপনি কাজের বিশৃঙ্খলা নিয়ে নালিশ করবেন না। কাজ করে যান। যেদিনই আকাশে আমাদের রকেট উড়বে, সেদিনই আপনাদের মুক্তি দেবো।

এবার থেকে হেলমুট গ্রোটরূপ এবং তার অন্যান্য সহকর্মীরা বাইরের জগৎকে ভুলে গিয়ে একমনে কাজ করতে লাগলেন। এমন কি বৈজ্ঞানিকদের পরিবারেরাও তাদের স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না। কারণ এই সব জর্মান বৈজ্ঞানিকদের একমাত্র নেশা ছিলো কাজ আর কাজ।

তারপর কয়েক মাস বাদে একদিন হেলমুট গ্রোটরূপের স্বপ্ন সফল হলো। ষ্টালিনগ্রাদ থেকে ১২৫ মাইল দূরে কাজাকিস্থান। এই নির্জন প্রান্ত থেকে রাশিয়ানরা তাদের প্রথম রকেট আকাশে ওড়ালো। দিনটা উল্লেখযোগ্য। ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৭।

গ্রোটরূপ ও তার সঙ্গীরা উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। 'রকেট তৈরী, এবার এক থেকে দশ গুণলেই হলো। কিন্তু যেই নম্বর গোনা সুরু হলো, অমনি দেখা গেলো রকেটের একটি পা ভেঙ্গে গেছে। তাড়াতাড়ি রকেটের পা ঠিক করা হলো। তারপর হেলমুট গ্রোটরূপ চীৎকার করে বলে উঠলেন—Start free.

হেলমুটের হুকুম সোনার খানিকবাদেই সোভিয়েট রকেট আকাশে উঠলো। হেলমুট গ্রোটরূপের গবেষণা সার্থক হয়েছে। প্রথম সোভিয়েত রকেট আকাশে উঠলো।

যে সময়ে হেলমুট গ্রোটরূপ রকেটকে আকাশে উঠবার হুকুম দিলেন, সেই সময়ে আমেরিকায় ভোরনবার্জারও ভেরন হের ফন ব্রাউন আমেরিকান রকেট নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

সোভিয়েত সরকার এবার হেলমুট গ্রোটরূপকে বিদায় দিলেন। গ্রোটরূপ দম্পতি এবং জার্মান টেক্‌নিসিয়ানরা বিদায় নিলেন। এর কিছুদিন বাদেই আকাশের বুকে সোভিয়েত রকেট স্পুটনিক উঠলো।

স্পুটনিক আকাশে উঠবার পর বিখ্যাত অভিনেতা বব হোপ ঠাট্টা করে বলেছিলেন: মনে হচ্ছে ওদের জার্মানরা আমাদের চাইতে ভালো, (Their Germans are better than our Germans).

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো আমেরিকান জার্মান ফন ব্রাউন সবার উপর টেক্কা মারলেন।

নাসের স্মরণে

শ্রীপ্রকৃতি সরকার

"নাসের নেই"—এই একটি খবর,
শোনা মাত্র বিশ্ববাসী বিমূঢ়, বিহ্বল ;
কেহ ক্ষুব্ধ, কেহ স্তব্ধ, অচল, অনড়,
কেহ সিক্ত আঁখি ঢাকে জড়িয়ে আঁচল।
মিশর তেমনি আছে, পিরামিড তার
আছে বুকে, আজো বহে নাইলের জল ;
আছে ফিঙ্কস্ ও সাহারা লয়ে হাহাকার,
নেই আজ হায় তার নাসের কেবল।
গামাল নাসের তুমি করেছ বরণ,
মরণ গৌরব-মালা—হে বীর সাবাস্।
আঁসোয়ান বাধ আর সুয়েজের রণ,
রয়ে গেল কীর্তি তব হয়ে ইতিহাস।

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এই প্রকার অদ্ভুতভাবে রজতের জীবন রক্ষা হওয়ায় সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো।

রজত মিঃ পিয়ার্সনকে বললে, 'এতক্ষণ তো আমার কথাই জানালুম। আমাকে যারা ধরিয়ে দিয়েছিল সেই কৈলাস আর মদনের খোঁজ কি করে পেলেন? আর আমাকে এত তাড়াতাড়ি কি করে খুঁজে বার করলেন জানতে আমার বড্ড ইচ্ছা করছে?'

মিঃ পিয়ার্সন উত্তরে বললেন, 'অনেকক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে লিলিই তোমার অন্তর্ধানের কথা আমাকে প্রথম জানায়। তারপর খোঁজ করতে তোমার বন্দুকটা বনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেল। বন্দুক ফেলে যে এখানে কোথাও তুমি যাবে না, তা জানি। কাজেই তোমার যে কোন বিপদ হয়েছে তা বুঝতে পারলুম। সেখানে তোমার পদচিহ্ন দেখে কাফ্রী সর্দার জানালো যে, এখানকারই লোক তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে একজন ভারতীয় কুলি কৈলাসের সম্বন্ধে অনেক কথা জানায়। তখন তাকে ডাকা হ'ল। প্রথমে সে স্বীকার করেনি। পরে তার পায়ের দাগের সঙ্গে সেখানকার পায়ের দাগের ছাপ মিলে যেতে সে বাধ্য হয়ে তার সঙ্গী মদনের নাম করে। মদনই সব কথা প্রকাশ করে দেয়।'

লিলি বললে, 'জানো রজতদা, এরাই যে তোমাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল—সে কথা মদন স্বীকার করেছে।'

রজত বিস্মিত হয়ে বললে, 'ওদের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাক্, ওদের সঙ্গে আগে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। ওরা আমার সঙ্গে এ রকম শক্রতা করতে এল কেন?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'ওরা সেই হরনাথ দত্তের লোক। তোমার সম্পত্তি হাত করতে পেরে তোমাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে সে ওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল। হরনাথ মদনদের জানিয়েছিল যে, তোমার মৃত্যুর পর তোমার আর কোন নিকট আত্মীয় না থাকায় সেই তোমার সম্পত্তির মালিক হবে।'

মানুষের অন্তরের নীচতা যে মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে সে কথা চিন্তা করে রজত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

মিসেস পিয়ার্সন বললেম, 'দুঃখ করে কি করবে রজত? ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে এ জগৎ। এখানে যেমন হরনাথরা মানুষের সর্বনাশ করার চেষ্টা করে, তেমনই ভগবান কাক্রীদের বুকে কর্তব্যজ্ঞান দিয়ে তার হাত হতে উদ্ধারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।'

রজত বললে, 'তা স্বীকার করি। ভগবানের কল্যাণস্পর্শ আছে বলেই আমার একান্ত দুরবস্থার সময়ে আপনাদের স্নেহ লাভ করতে পেরেছিলুম। কিন্তু এরা স্বার্থান্ধ হয়ে কোথায় নেমে চলেছে—এ কথা যখন চিন্তা করি, তখন মনটা দুঃখে ভরে ওঠে।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'যাক্ গে ও-সব কথা। তোমার উদ্ধারে যারা সাহায্য করেছে, তাদের কিছু পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এসো, তাদের ডাকা যাক্।'

অল্পক্ষণ পরে সকলে সমবেত হলে মিসেস পিয়ার্সন তাদের কাজের প্রশংসা করে যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণ করলেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বিশ্রাম করে রজত সুস্থ বোধ করতে লাগলো। অপরাহ্নে সে মিঃ পিয়ার্সনের তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে লিলি ও তার মা ছিলেন। চা খেতে খেতে রজত তার পকেট থেকে কয়েক টুকরো পাথর মিঃ পিয়ার্সনের টেবিলের ওপর রেখে বললে, 'দেখুন তো ড্যাডি, এগুলো কোন মূল্যবান পাথর কিনা?' তারপর সে এক টুকরো লিলির মাকে ও এক টুকরো লিলিকে দিলে। তাঁরা সকলে পাথরগুলোকে অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'এগুলো থেকে মনে হচ্ছে যেন আলোর জ্যোতি বেরুচ্ছে। কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা না করালে এর মূল্য ঠিক বোঝা যাবে না। এগুলো কোথায় পেলে রজত?'

রজত বলতে লাগলো, 'আজ সকালে যে পাহাড়ে উঠে চারিদিক লক্ষ্য করছিলুম, এগুলো সেই পাহাড় থেকেই পেয়েছি। পাহাড়ে উঠে যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, তখন যে

পাথরটার ওপর দাঁড়িয়েছিলুম, সেটা পায়ের চাপে নীচের দিকে নেমে যেতে আমিও টাল খেয়ে চার-পাঁচ হাত তলায় পড়েগেলুম। প্রথমটায় একটু ভয় হয়েছিল, তারপর হাত-পায়ে কোন চোট লাগেনি বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে উঠে চারদিক তাকাতে লাগলুম। যে জায়গাতে পড়েছিলুম সেটা একটা গর্তের মত, আশপাশ থেকে পাথর ঢালু হয়ে সেখানে এসে মিশেছে। নানা জাতের বুনো গাছপালায় জায়গাটা ভর্তি; স্থানে স্থানে কাঁটা-ঝোপও আছে। বুঝতে পারলুম, একটু আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, তার নীচে ফাঁপা থাকায় দেহের ভারে সবসুদ্ধ পড়ে গিয়েছিলুম। ওপরে ওঠবার পথ খুঁজছি, এমন সময়ে একদিকে কাঁটা-ঝোপের ফাঁকে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে বলে মনে হতে, ভিতরে কি আছে তা দেখবার ইচ্ছা প্রবল হ'ল। ছুরি দিয়ে আগাছাগুলো কেটে ভেতরে ঢোকবার মত পথ তৈরী করে নিলুম। তারপর টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকলুম। যদি কোন অতর্কিতে বিপদ আসে, সেজন্য ডান হাতে রিভলবার তৈরী রেখে পথ চলছিলুম। সেটা একটা গুহার মত, বেশ উঁচু। কাজেই মাথা খাড়া রেখেই চলতে পারছিলুম। গুহাটা ঢালু, ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত যাবার পর অন্ধকার পাতলা হয়ে গিয়ে আলো ফুটে উঠতে লাগলো। সেখানে একটা ক্ষীণ জলধারা কুল কুল করে বয়ে যচ্ছে, আর তার দু'পাশে এরকম অসংখ্য নুড়ি-পাথর ছড়িয়ে আছে। তাদের আলোয় গুহা আলোকিত হয়ে রয়েছে। টর্চের আলো পড়তেই নুড়িগুলো জল্ জল্ করে শতগুণ দীপ্তি দান করতে লাগলো। টর্চের আলো একবার জ্বেলে ও একবার নিবিয়ে বুঝতে পারলুম, সেখানে যে সব নুড়ি রয়েছে সেগুলো থেকে অন্ধকারে আলো বিচ্ছুরিত হয়, আর আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয়। কাছে গিয়ে দেখি যে, নানা রঙের ছোট বড় নুড়িতে সে জায়গাটা ভর্তি হয়ে রয়েছে। হীরে মনে করে কয়েকটা সঙ্গে করে এনেছি।'

লিলির মা বললেন, 'যদি এগুলো দামী পাথর হয়, তাহলে এগুলো যেখানে পাওয়া গিয়েছে তার গুরুত্ব আছে। যেখান থেকে এগুলো পেয়েছ, তুমি সেখানে আবার যেতে পারবে রজত?'

রজত উত্তরে বললে, 'পাছে ভুল হয়ে যায় সেজন্য জায়গাটায় একটা নক্সা করে এনেছি।' এই বলে সে টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজে পেন্সিলে আঁকা একটা স্কেচ রেখে মিঃ ও মিসেস পিয়ার্সনকে তার অবস্থান সম্বন্ধে বোঝাতে লাগলো।

লিলিও তার আসন হতে উঠে এসে স্কেচটার অবস্থান বুঝে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা রজতদা, স্কেচে যে পাহাড়টা এঁকেছ, এর নীচেই তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি?'

রজত সম্মতি জানাতে লিলি বললে, 'ও জায়গাটা আমার বেশ মনে আছে। ওখানে যেতে কোন অসুবিধা হবে না, কি বল ড্যাডি?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'ঠিক বলেছ, পাহাড়টা এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।' তারপর

রজতকে উদ্দেশ করে বললেন, 'পাথরগুলো কাটিয়ে কি রকম দাম পাওয়া যায় দেখতে হবে। এগুলো মূল্যবান হলে গভর্নমেণ্টের কাছ হতে জায়গাটা কিনে নিতে হবে। তুমি কাল সকালেই একবার কেপ টাউনে গিয়ে এগুলোর ব্যবস্থা কর রজত।'

রজত বিপন্ন ভাবে বললে, 'আমি তো একেবারে আনাড়ী। জিনিসগুলো মূল্যবান হলেও আমাকে ঠকিয়ে দেবে। আর কোন অভিজ্ঞ লোককে পাঠালে হ'ত না?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'ঠকবার ভয় ক'র না। আমি তোমাকে চিঠি লিখে যেখানে যেতে বলবো, তারা ঠকাবে না। এ সব বিষয় বাইরের কাকেও বলা উচিত বলে মনে করি না। তুমিও কোথা থেকে এ সব পেয়েছ, সে কথা আর কারও কাছে প্রকাশ কর না।' এই কথা বলে কেপ টাউনে কোথায় কার কাছে যেতে হবে তা বুঝিয়ে বললেন।

রজত এর আগে কখনও কেপ টাউনে যায়নি। সুতরাং তার বিষণ্ণ মুখ দেখে লিলি বললে, 'আমিও রজতদার সঙ্গে যাব ড্যাডি?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'বেশ, তাহলে তো ভালই হয়। তোর তো 'ফিনলে এণ্ড্ জেম্‌সে'র দোকান জানা আছে। রজতকে নিয়ে সেখানেই যাবি। যদি কাল আসা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের জানালে তারা থাকবার ব্যবস্থাও করে দেবে।'

পরদিন সকালে রজত ও লিলি ট্রেনে চেপে কেপ টাউনে উপস্থিত হ'ল। সেখানে ফিন্‌লে এণ্ড্ জেম্‌সের জহরতের দোকানে গিয়ে রজত মিঃ ফিনলের হাতে মিঃ পিয়ার্সনের চিঠিখানা দিলে ও লিলির পরিচয় জানালো।

মিঃ ফিনলে চিঠিখানা পড়ে ও লিলিকে মিঃ পিয়ার্সনের মেয়ে জেনে তাদের সাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। রজত দু'খানা পাথর মিঃ ফিনলের হাতে দিলে, তিনি তার আকৃতি ও ঔজ্জ্বল্য দেখে বিস্মিত হলেন। অত বড় হীরে খুব কমই দেখা যায়। তিনি বললেন, 'পাথর দু'খানা না কাটলে এর মূল্য ঠিক করা যাবে না।'

লিলি বললে, 'বেশ, আপনি কাটাবার ব্যবস্থা করুন, আমরা অপেক্ষা করছি।'

যে ঘরে হীরে কাটা হয়, মিঃ ফিনলে সেখানে ওদের নিয়ে গেলেন। দক্ষ মিস্ত্রী তার যন্ত্র দিয়ে একখানা হীরা কেটে পল তুলতে লাগলো। কিছু পরে হীরেটি থেকে অপূর্ব দ্যুতি বার হয়ে সেস্থানে একটা নীল আভায় পূর্ণ হ'ল। মিস্ত্রী তার কাজ শেষ করে বললে, 'এ রকম সুন্দর হীরে আর কখনও কাটিনি।'

মিঃ ফিন্‌লে হীরেটি নিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখে ও যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, 'এ একটা অমূল্য সম্পদ। এর দাম যে কত হতে পারে তা বলা কঠিন। ধনী দিলদার লোক এর বদলে দশ-বার লাখ টাকা দিতেও ইতস্ততঃ করবেন না।'

রজত ও লিলি পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করলো। হীরাটির দাম যে অত বেশী হতে পারে তা তাদের কল্পনার অতীত। বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে তুলে রজত বললে, 'আমরা সে রকম ধনী কোথায় পাব? আপনি যদি নেন তো কত দিতে পারেন?'

মিঃ ফিনলে হেসে বললেন, 'এটা কেনবার মত অর্থ আমার নেই। তবে আমি বিক্রী করার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ইতিমধ্যে অপর হীরেটিও কাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেটি প্রথমটির মত অত ভাল না হলেও যথেষ্ট মূল্যবান। তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিলি বললে, 'হীরে দুটো কত টাকায় বিক্রী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন, মিঃ ফিনলে?'

মিঃ ফিন্‌লে উত্তরে বললেন, 'কেনবার মত খরিদ্দার পেলে ভাল দামেই বিক্রী হতে পারে। এক কাজ কর। আজকের দিনটা তোমরা আমার কাছে থেকে যাও। মিঃ পিয়ার্সনের কাছ থেকে তোমরা যখন এসেছ, তখন যাতে তোমরা হীরে বিক্রী করে উপযুক্ত মূল্য পাও সেদিকে দেখা আমার কর্তব্য। আমি এখানকার কয়েকজন ধনীকে হীরে দুটি দেখাই। তাদের যে দরে বিক্রী করা হবে আমাকে তার শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন দিও।'

রজত ও লিলি উভয়েই সানন্দে তাদের সম্মতি জানালে। (ক্রমশঃ)

শরতের ভোরে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

দোপাটি ফুটেছে দু'রঙের দুটি
রাঙ্গা জবাটির আড়ে
অপরাজিতাটি করে খুনসুটি
হাতখানি তার নাড়ে,
ও যে দোপাটির খোঁপাটি খুলিতে চায়।
ওপাশে শেফালি হেসে মরে খালি
লুটোপুটি করে ঘাসে
সন্ধ্যামণিরা রাত জাগা চোখ
মুদে সেই অবকাশে—
থলকমলের মেয়ে সাড়ী বদলায়।

ধানের সবুজে কাশের কেশর
করে শুধু ঢলাঢলি,
আকাশের নীলে পলকা মেঘেরা
ভাসে সাদা পাল তুলি
কেতকী তাহার সবুজ পাপড়ি মেলে।
সদ্য ফোটা ও পদ্ম শালুকে
ভোমরার আনাগোনা
সকালের রোদে সোনা হয়ে দোলে
পাতায় শিশির-কণা
এসেছে শরৎ গোপনে চরণ ফেলে।

আমিষ-খেকো উদ্ভিদ

শ্রীঅমরনাথ রায়

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে উদ্ভিদেরাই আদর্শ অহিংস জীবন যাপন করে থাকে। মাটি থেকে উদ্ভিদ রস শুষে নেয়। তারপর সূর্যের আলোয় সেই রস থেকে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে নেয়। সে খাদ্য খাঁটি নিরামিশ খাদ্য। তাতে আমিষের নাম-গন্ধও নেই।

হ্যাঁ, বেশীর ভাগ উদ্ভিদই এই রকম নিরামিশাষী হয় এবং অহিংস জীবন যাপন করে। তবে কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে, যারা অন্যান্য উদ্ভিদের মত সূর্যের আলোয় নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে। আবার সুযোগ পেলেই কীটপতঙ্গ শিকার করে তাদের মাংসও হজম করে ফেলে। এদের আমরা বলি 'পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদ'। এরাই 'আমিষ-খেকো উদ্ভিদ'। এদের কেউ কেউ মাটিতে জন্মে। এদের নানা প্রজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

আমাদের দেশের পুকুর, ডোবা, খাল, বিল ইত্যাদি জলাশয়ে তোমরা হয়তো ঝাঁঝি নামক উদ্ভিদ দেখে থাকবে। সেই যে, সবুজ রঙের সরু কাণ্ড, সবুজ রঙের সরু সুতোর মত পাতা, আর হলুদ রঙের ফুল—হ্যাঁ, ঐ উদ্ভিদেরই নাম ঝাঁঝি।

ঝাঁঝির বৈজ্ঞানিক নাম 'ইউট্রিকিউলেরিয়া'। এরা জলজ উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড ও পাতা জলের নীচে ছড়িয়ে থাকে। পাতা এত বেশী খাঁজ কাটা যে, সরু সরু সুতোর মত দেখায়। পাতার কোন কোন অংশ ছোট ছোট থলি ব্লাডারের মত ফাঁদে পরিণত হয়। এই থলি হচ্ছে ছোট ছোট জলজ কীট ধরার ফাঁদ।

থলির মুখে একটি কপাট থাকে। আর তার বাইরের দিকে থাকে চারটি রোম। যখন কোন কীট জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ ঝাঁঝির থলির মুখের রোম স্পর্শ করে, অমনি থলির মুখের কপাটটি খুলে যায়। ফলে পোকা সমেত জল থলির ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর তক্ষুনি কপাটটা যায় বন্ধ হয়ে। ভেতর থেকে ঠেলা মারলেও ঐ কপাট আর খোলে না। ফলে পোকা ঐ থলির মধ্যে আটকা পড়ে মারা যায়।

পোকা মরে গেলে তার দেহের আমিষ জাতীয় উপাদান ঝাঁঝি শোষণ করতে থাকে। ঝাঁঝির থলির গ্রন্থি থেকে একরকম পাচক রস বেরোয়। ঐ রসের সাহায্যে পোকার দেহের আমিষ জাতীয় উপাদান ঝাঁঝি হজম করে ফেলে। তাতে অর্থাৎ ঐ খাদ্যে ঝাঁঝির দেহ পুষ্ট হয়। একটি পোকা পুরো হজম করে ফেলা না পর্যন্ত ঝাঁঝি তার থলির কপাট আর খোলে না।

ওদের কথা কেউ বলে না

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দুস্তর মরুভূমি যাঁরা পাড়ি দেন, হিমালয়ের দুরারোহ শীর্ষচূড়ায় যাঁরা পদক্ষেপ করেন, দাঁড় টেনে যাঁরা বিস্তীর্ণ সাগর পার হন, অথবা মহাশূন্যের ইন্দ্রজাল ভেদ করে যাঁরা কল্পনাতীত ভাবে চন্দ্রলোকে পৌছান—স্নায়ুশক্তি তাঁদের অপরিসীম, তাঁরা নির্ভীক সন্দেহ নেই।

তাঁদের কথা আমরা বলি এবং সহস্রবার তা বলা উচিত। কারণ, তাঁরাই দেন আমাদের জীবনে প্রেরণা, দুর্জয়ের আহ্বানে কানে অভয়মন্ত্র দেন তাঁরাই—তাঁরাই প্রাণে উদ্বুদ্ধ করেন নব-জীবনের সুপ্রভা।

কিন্তু এইসব খ্যাতিমান ব্যক্তি ছাড়াও এই দেশেরই অন্তরীক্ষে এমন সব বীর আছেন, যাঁদের স্নায়ুশক্তি ও পেশীশক্তি অনন্যসাধারণ—যাঁরা নির্ভীক, কিন্তু দারিদ্র-ক্লিষ্ট। তাই তাঁরা অনাদৃত। তাঁদের কথা আমরা কেউ বলি না।

কবি বলেছেন, 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বেঁচে আছে কারা? যাঁরা সভ্যসমাজে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে তারা?—না, যাঁরা জীবিকার সংস্থানে ঝড় ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য অভিযান করেন তাঁরা?—কে তাঁদের খবর রাখে?

অল্প কয়েক দিন আগে ছোট্ট একটি খবর বেরিয়েছিল দৈনিক পত্রিকায়: কুলপী থানার রংপালা গ্রামের ঝড়ুচন্দ্র নাইয়া কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সুন্দরবনে কাঠ আহরণ করতে গেলে একটি বাঘ তাকে ধরে ফেলে। বাঘ যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঝড়ু একটি গাছ আকড়ে ধরে এবং বাঘের মুখ থেকে ছাড়া পায়। এই সময়ে ঝড়ু সুযোগ বুঝে বাঘের মাথায় কুঠারের এক আঘাত করে। সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং কাকদ্বীপ হাসপাতালে দেয়। একদিন পরে আহত বাঘটির মৃত দেহ পাওয়া যায়।

খবরটি পড়ে কারও কারও কাছে মন্তব্য শুনেছি,—লোকটার কপাল-জোর খুব বলতে হবে, বাঘের মুখ থেকে ফিরে এল!

কিন্তু ঝড়ু কি কেবল কপাল-জোরেই বেঁচে গেল এ যাত্রা? তাঁর স্থিরবুদ্ধি, মনের দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং দৈহিকশক্তির কি কোনই মূল্য নেই এখানে?

সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের মুখ থেকে ছিটকে এসে সেই বাঘকেই আবার ঘায়েল করা —সে যে কত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার, তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে!

ব্যক্তিগত ভাবে আমার এ ধরণের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সেটা অবশ্য কেবলমাত্র দর্শনের অভিজ্ঞতা। সেই কথাই আজ বলছি।

'ঝড়ু চন্দ্র গাছ ধরে নিজেকে বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিলে।

কাকদ্বীপ থেকে নৌকাযোগে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে। বন্ধুদের কয়েকজন ভালো শিকারী। তাদের সঙ্গে রিভলভার ও রাইফেল। চব্বিশ পরগণা জেলা শাসকের চিঠি ও মালখানার বন-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

পাথর প্রতিমা থেকে একজন বড় শিকারীকেও সঙ্গে নেওয়া হ'ল। এই শিকারী ও অঞ্চলের খবর রাখে। তার সঙ্গে স্থানীয় দু'চারজন লোকও এলো। এরা তার সহকারী।

সুন্দরবনে শিকার করা খুব সহজ নয়। উত্তর বাংলায় বা আসামের জঙ্গলে শিকার করতে গেলে যে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়—সুন্দরবনে তার কিছুই পাওয়া যায় না বলা যেতে পারে।

আমরা প্রায় এক সপ্তাহ ছিলাম ওখানে।

এই প্রসঙ্গে নৌকা মাঝির কথাও কিছু না বললে অবিচার করা হবে।

একদিন অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে যেতে যেতে হঠাৎ বঙ্গোপসাগরের মুখে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। সম্মুখে দিগন্তবিসারী নীল, অনন্ত জলরাশি। ঠিক সেই সময় দেখা দিল প্রবল ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গ। দূরে অনেকগুলি পাল তোলা নৌকা দেখা যাচ্ছিল —নিমেষের মধ্যে সেগুলি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

মাঝি হলধর নাইয়া। বয়স পঞ্চাশ। পেশীবহুল দেহ। গায়ের শক্তিতে সে পঁচিশ বছরের যুবককেও হার মানায়। বড় বড় ঢেউ আর ঝঞ্ঝাবৃষ্টির মধ্যে ঠিকভাবে নৌকা চালাবার কলাকৌশল সে জানে। হয়ত এদেরই পূর্বপুরুষেরা একদিন বাণিজ্য তরি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুমাত্রা জাভা বোর্নিওতে গিয়েছে।

আমরা তখন প্রাণ হাতে ক'রে নৌকার মধ্যে দুর্গানাম জপ করছি; কারণ বন্দুক দিয়ে বাঘ মারা যায়—কিন্তু ঢেউ থামানো যায় না। বড় শিকারী হলে ভালো সাঁতারও সে জানবে এমন কোন কথা নেই।

হলধর তখন হাল ধারণ করে অমিত বিক্রমে বৃষ্টি ঝড় আর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। সেদিন তার জন্যই আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম।—হাঁ, নাইয়া বটে! কিন্তু ওদের কথা কেউ বলে না, এই কথাই সেদিন মনে হয়েছিল আমার। আজ ঝড়ু নাইয়ার কথায় হলধর নাইয়ার কথা মনে এল।

বাঘের কথায় ফিরে আসা যাক্।

আমরা একদিন একটা বনের মধ্যে ঢুকে বাঘের খোঁজ করতে লাগলাম। সুন্দরবনে বাঘের প্রাদুর্ভাব আছে। সেজন্য বেশ সাবধানেই আমাদের চলতে হচ্ছিল। ব'লে রাখা ভালো,— আমি কিন্তু শিকারী নই এবং বন্দুকও নেই আমার হাতে। ওদের উপরেই আমার যত বল ভরসা। তাই ব'লে নার্ভাস্ বা ভীরু বলেও যে আমার দুর্নাম ছিল তাও নয়।

শিকারীকে জিজ্ঞেস করলাম, বাঘের চিহ্নও তো দেখছি না কোথাও!—আমাদের দেখে বাঘ কি পালিয়ে গেল নাকি? শিকারী হেসে বলে,—বড়মিয়া হচ্ছেন বনের রাজা, পালাবার পাত্র নয়!

: তবে সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন তার?

: আছেন হয়ত ধারেকাছেই আত্মগোপন করে। দেখতে পাচ্ছি না আমরা। রাজ-দর্শন কি আর ভাগ্যে না থাকলে হয়? তিনি কিন্তু দেখছেন আমাদের!

: কি ভয়ানক!—বাঘ আমাদের দেখছে, অথচ আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না!

শিকারী হেসে বলে, ভয় নেই বাবু। তিনি ভদ্দোরলোকদের কিছু বলেন না। যত আক্রোশ সব গরীব না খেতে পাওয়া মানুষের উপর। তারা লুকিয়ে কাঠ বা মধু সংগ্রহ করতে

আসে। অনেক সময় জল-পুলিশের ভয়ে রাত্রেও তাদের থাকতে হয় এই বনে। তখন বাঘের সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করতে হয়।

অনেক ঘোরাঘুরির পর বাঘের কয়েকটা পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেল। ধারে-কাছে কয়েকটা গাছে উঠে আমরা ওত পেতে রইলাম সকলে। সবাই চুপচাপ। কথাবার্তা যা কিছু হাত মুখ নেড়ে—সংকেতে।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু বাঘের দেখা নেই! কাঁহাতক এইভাবে গাছে চড়ে ডাল ধরে থাকা যায়। সকলেই তখন নেমে পড়বে মনে করছে।

হাঁ, ভাগ্যবান আমি, রাজদর্শন ঠিক সেই মুহূর্তে আমারই ভাগ্যে ঘটে গেল! আমি যে গাছটায় উঠেছিলাম, তার কয়েক হাত দূরেই ঝোপের পাশে বসে আছেন—দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! অথচ আর কারও চোখে তিনি পড়েন নি তখনও। আমি দেখলাম, কি দেখলাম সে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। চিড়িয়াখানায় যে রয়্যাল বেঙ্গল দেখেছি, মহিমমণ্ডিত আকৃতিতে এর কাছে সে কিছুই নয়। দুটি হাত সম্মুখে রেখে রাজকীয় ভঙ্গীতে বসে আছেন প্রভু! দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে,—ইনিই এতদাঞ্চলের একচ্ছত্র, শক্তিমান সম্রাট!

হাত দিয়ে আমার একটা গাছের ডাল ধরা ছিল। হাতটা যেন আমার কেমন অবশ হয়ে আসছে ব'লে মনে হ'ল। আমি সম্মোহিতের মত তার দিকে তাকিয়ে আছি—চোখ ফেরাতে পারছি না। পা থরথর করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না! হাত নেড়ে যে কোনও শিকারীকে দেখিয়ে দেবো বাঘ তাও পারছি না! আমি দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আমার দেহের যেন কোন ওজন নেই, আমি শূন্যের উপর ভাসছি!

মাত্র দু-চার মিনিটের ব্যাপার। তারপরই দেখি, তিনি নির্ভয়ে এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে চলে গেলেন ঝোপের ভিতর দিয়ে।

এরপরই বিরক্ত হয়ে ওরা সব গাছ থেকে নেমে পড়লেন। বন্ধুরা আমাকে তাগিদ দিলেন, —কৈ? নেমে এস। ভুয়ো গাছে বসে থেকে আর কি হবে!

আমি দেখছি সব, শুনছিও ওদের কথা; কিন্তু আমার যেন সম্বিৎ নেই!

ডাকাডাকির পরও যখন আমি নামছি না বা কথা বলছি না, তখন শিকারী তার বন্দুকটি মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে আমাকে ধরে ফেলল। 'কোথায় দেখলেন বাঘ?' প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করল আমাকে। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরাল না। সকলে তখন ধরাধরি করে আমাকে নামিয়ে আনল গাছ থেকে। কি হ'ল কি হ'ল বলে ওদের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা জেগে উঠল। শিকারীর গাঁয়ের একজন লোক বলল—পেরথমেই বলেছিলাম, জঙ্গলের উপ-

দেবী রূপা পরীর পূজো দিয়ে নাও। ওদের ধারনা রূপা পরীতে পেয়েছে আমাকে। আর একজন বলল, 'না, এডা ওড় পরীর কাজ। তাকেও পুজো দিয়ে তবে বনে ঢুকার নিয়ম।

কত জনে কত কি জিজ্ঞাসা করছিল আমাকে। আমি বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম!

নৌকায় এসে ঘণ্টা দুই পরে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল। কিন্তু আমাকে বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করতে হ'ল না। শিকারীই যথাযথ ভাবে সব বুঝিয়ে দিল ওদের। এরূপ ক্ষেত্রে আমার নাকি হাত পা শিথিল হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কথা!

জিম করবেটের কাহিনীতেও পরে পড়েছিলাম,—সঙ্গীকে বাঘে ধরে নেওয়ার দৃশ্য দেখার পর ছ'মাসের মধ্যে কে একজন কথা বলতে পারেনি।

বনের মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গলের দর্শনেই যে সম্মোহন, শিহরণ এবং হাত পা অবশ হয়ে স্তম্ভন—সেটা তো আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।

এবার ঝড়ুচন্দ্র নাইয়ার বীরত্বের কথা মনে করতে হবে। সে গাছ ধরে ছিট্‌কে নিয়েছে নিজেকে রয়্যাল বেঙ্গলের মুখ থেকে। তার হাতিয়ার হাতের কুড়ুল কিন্তু ছাড়েনি এবং প্রাণ ভয়ে পালিয়েও যায়নি। পরক্ষণে রক্তাপ্লুত ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে কুড়ুল দিয়ে মেরেছে বাঘের মাথায়—এ কি কম কথা! এরাই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে আজও।

একালের ছড়া

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

দম দিলে বন্‌বন্‌ ঘোরে হরদম,
দম খেয়ে হেঁটে যায় কদম কদম।
কাল নয়, আজ হবে পুতুলের বিয়ে;
খুকুমণি ভাবে—তাকে সাজাবে কী দিয়ে।
দম দেওয়া গাড়ি আসে, তাতে আছে বর;
দম খেয়ে বর হাঁটে মজার খবর।
খুকুমণি পুতুলকে দিল তার সাড়ি,
মা দিলেন চম্‌চম্‌ তাকে এক হাঁড়ি।
বিয়ে হলে পুতুলেরা গেল এক কোণে,
খুকু খায় চম্‌চম্‌ একা এক মনে।
তাই দেখে ভাই দিল বেদম প্রহার;
তবু দমবে না খুকু, চম্‌চম্‌ তার।

লম্বা নাকের বড়াই

(বিদেশী গল্প)

শ্রীমঙ্গলময় দত্ত

জাপানের উত্তর-ভাগে বিরাট পর্বত-মালা। এই পর্বতের উপর বাস করত দুটি রাক্ষস। একটির গায়ের রঙ নীল, আর একটির রঙ্ লাল। দু'টিরই নাক খুব লম্বা। এত বিরাট লম্বা নাক কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। এ জন্য তারা বেশ গর্ববোধ করত। এমন কি, কার নাক বড়, এ নিয়ে রাক্ষস দু'টির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হ'ত।

চাকরানীরা সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় রাক্ষসটির লম্বা নাকের উপর ঝুলিয়ে রাখলে।

একদিন পাহাড়ের উপর নীল রাক্ষসটি বসে আছে। এমন সময় তার নাকে ভেসে এল বেশ মিষ্টি গন্ধ। রাক্ষসটি বলে উঠল, বড় সুন্দর গন্ধ! কিসের গন্ধ! যে দিক দিয়ে গন্ধ আসছে সেই দিকে সে তার লম্বা নাক বাড়াতে লাগল। ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে সাতটা পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নাকটি সমতলভূমিতে এক রাজপ্রাসাদের ছাদে এসে শেষ হ'ল। সেই সময় রাজপ্রাসাদে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা 'হোয়াইট ফ্লাওয়ার' ভোজসভার আয়োজন করেছেন। সভায় আরও সব রাজকন্যারা এসেছেন।

রাজার একমাত্র সুন্দরী কন্যা! বেশভূষার কি জাঁকজমক, কি ঘটা! যত সব দামী দামী বেশভূষা আছে সবই বের করে অন্যান্য নিমন্ত্রিত রাজকন্যাদের দেখাচ্ছেন। সুগন্ধ মিশ্রিত এই সব দামী কাপড়-চোপড় দেখে সবাই মুগ্ধ। এই তীব্র প্রাণ মাতানো সুগন্ধ ভেসে গিয়েছিল নীল

রাক্ষসটির নাকে। রাজকন্যা তাঁর জাঁক-জমকের বহর সবাইকে দেখাচ্ছেন, কিন্তু তাতেও তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না। নানা রঙের সুন্দর সুন্দর কাপড়চোপড় এক জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে প্রাণ ভ'রে সবাইকে দেখাতে না পারলে তাঁর মনে তৃপ্তি হচ্ছে না। তাই, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন কি ভাবে কোথায় ঝুলিয়ে রাখা যায়। এমন সময় চোখ পড়ল ছাদে নীল রাক্ষসটির লম্বা নাকের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন, 'ঐ দেখ, ছাদের উপর কে যেন নীল রঙের লম্বা কাষ্ঠখণ্ড ঝুলিয়ে রেখেছে। ঐ কাঠের উপরেই আমার কাপড়চোপড় টাঙিয়ে রাখি।' রাজকুমারী চাকরানীদের ডাকলেন। তারা যত সব সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় রাক্ষসটির লম্বা নাকের উপর ঝুলিয়ে রাখল। কিন্তু এদিকে রাক্ষসটি বুঝতে পারলে তার নাকের উপর কি যেন চাপান হয়েছে। সে তখন তার লম্বা নাকটি পাহাড় থেকে টানতে লাগল। রাজকন্যারা দেখলেন, দামী দামী বেশভূষা কেমন বাতাসে উপরে উঠে যাচ্ছে। সবাই হতভম্ব! সবাই চেষ্টা করলেন ধরবার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে সব চলে গেছে নাগালের বাহিরে। নীল রাক্ষসটি দামী কাপড়চোপড় সমেত লম্বা নাকটি তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিল। এত দামী সুন্দর কাপড়-চোপড় পেয়ে সে আনন্দে আত্মহারা। নিজের লম্বা নাকের নিজেই তারিফ করল। পাশের পাহাড় থেকে লাল রাক্ষসটি তাকে আমন্ত্রণ জানালে দামী কাপড়চোপড় দেখাবার জন্য। লাল রাক্ষসটি এ সব দেখে একেবারে স্তম্ভিত। সে নীল রাক্ষসটিকে বললে, 'আমার নাকও কম যায় না! তোমার নাক আর কি এনেছে! আমার নাকেরও বাহাদুরি দেখাব। অপেক্ষা কর কিছুদিন। তাক লাগিয়ে দোব তোমাকে!'

পাহাড়ের উপর বসে আছে লাল রাক্ষসটি। কয়েক দিন কেটে গেল। কোন সুগন্ধ তার নাকে ভেসে এল না। বড়ই অস্থির হয়ে পড়ল সে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে, নাকটাকে লম্বা করে একেবারে সমতলভূমিতে পাঠিয়ে দিই। নিশ্চয় কিছু চমৎকার জিনিস পাওয়া যাবে। নাকটিকে সে ক্রমশঃ লম্বা করতে লাগল। সাতটি পাহাড়-পর্বত পার হয়ে শেষ পর্যন্ত নাকটি একই রাজ প্রাসাদের বাগানে এসে শেষ হ'ল। সেই সময় রাজপুত্র ভ্যালোরস্‌ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাগানে খেলা করছিল। রাজপুত্র লাল রাক্ষসটির নাক দেখে অবাক হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দেখ, দেখ, কি মজা! কে যেন লাল কাষ্ঠখণ্ড ঝুলিয়ে রেখেছে। এস, আমরা সবাই এর উপর উঠে ঝুলতে থাকি।' ছেলেরা সবাই লম্বা লাল কাঠের সঙ্গে শক্ত করে দড়ি বাঁধল এবং মহানন্দে ঝুলতে লাগল।

কেউ দোলনার মত দড়ি ধরে উপরে উঠলো, আবার নীচে নামল। কেউ আবার লাফ দিয়ে উপরে উঠছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামছে। এমন কি, একজন ছুরি দিয়ে লাল কাষ্ঠখণ্ডটি অর্থাৎ লাল রাক্ষসটির খাসা নাকটি কাটতে লাগল। পাহাড়ের উপর বসে

রাক্ষসটি ভাবছে, বড়ই বিপদে তো পড়া গেল, এখন কি করা যায়! নাকটি এত ভারী হয়েছে যে, সে টানতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে যথাশক্তি দিয়ে নাকটিতে এক ঝাঁকুনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে নাকটা থেকে ছেলেরা মাটিতে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত আর অপেক্ষা না করে লাল রাক্ষসটি তার সাধের নাকটি প্রাণপণে যত শীঘ্র সম্ভব টেনে গুটিয়ে পাহাড়ে নিয়ে গেল। এদিকে নীল রাক্ষসটির মহানন্দ। মুখে হাসি আর ধরে না। মনে মনে ভাবলে, কেমন জব্দ হয়েছে—আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া। লাল রাক্ষসটি বড় দুঃখে নীল রাক্ষসটিকে বললে, 'দেখ ভাই, আমার ভুল হয়েছে। তোমার প্রতি আমার ঈর্ষা করা ঠিক হয়নি। যে অপরের ঈর্ষা করবে তার অবস্থা আমারই মত হবে। আমি আর ভাই নাকের বড়াই করব না।'

রাখাল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অঞ্জন দা-কে ডেকে সঞ্জয় পাল
বললেন, 'হতে হবে তোমাকে রাখাল।
সামনে পূজোর ছুটি—দেশে চলে যাও,
মাঠে মাঠে গরু নিয়ে জোরসে চরাও।'
বড় দুঁদে বড়বাবু সঞ্জয় পাল,
কথা তাঁর না রাখলে ভাগ্যে নাকাল।
ছুটি পেয়ে অঞ্জন দেশে চলে যায়,
গরু-ফরু গুলি মারো—গাছে রস খায়!
রস খেয়ে কেরানী যে নেশায় বিভোর
ফাঁকে পেলে সঞ্জয়ে গাল দেয় জোর!
হঠাৎ ছুটলো নেশা অঞ্জন দা-র,
সামনে দাঁড়িয়ে এ কে—বড়বাবু তার?
লাঠি হাতে বড় কড়া সঞ্জয় পাল,
অঞ্জনে গরু করে'—নিজেই রাখাল!
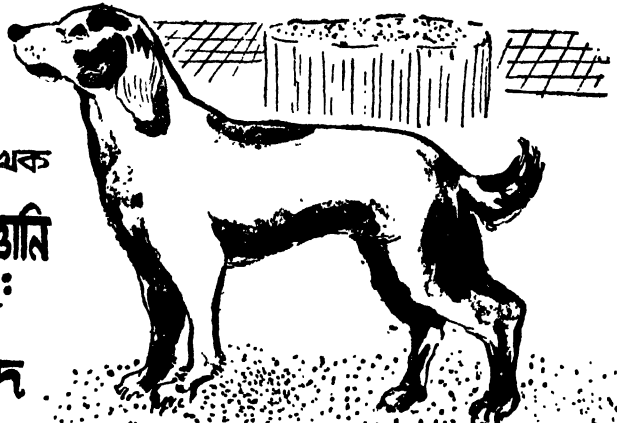
॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ খ্যাতির শীর্ষে ॥

ল্যাম্পোর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দূরে কাছে সমস্ত স্টেশন থেকে টেলিফোন বেজে চলেছে অনবরত। সকলেই ল্যাম্পো কেমন করে ফিরে এল তার বিষয় বিশদ জানতে চায়। অতএব আমরাও অবিরত, অক্লান্ত তার প্রত্যাবর্তনের বিশদ ব্যাখা করে চলেছি এবং এও জানাচ্ছি যে তাকে আর যেতে নাহি দিব।

শুধু যে রেলের কর্মীরাই ল্যাম্পোর সম্বন্ধে উৎসুক ছিল তা নয়। এমন কী যাত্রীরাও। যেই ট্রেনগুলো ক্যাম্পিগালিয়া ষ্টেশনে এসে ঢোকে, সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তারা ল্যাম্পোর ফিরে আসবার কথা জিজ্ঞেস করে। কেউ বিস্ময়ে অথবা কেউ অবিশ্বাসের সুরে। আর বাচ্চারা? তারা দল বেঁধে স্রোতের মত এসে হাজির—ছোট, বড়, সব। সবাই ল্যাম্পোকে ঘিরে ধরে, আদর করে, আর অদ্ভুত রকম মতামত প্রকাশ করে। ল্যাম্পো নিজেও বেশ কৌতুক বোধ করে, তাকে নিয়ে এত আড়ম্বর দেখে। খুশীও হয়, সবাই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসছে দেখে। প্রথম দিকে যে সব রেলের কর্মীরা ওর উপরে খুশী ছিল না, এখন তারাও বদলে গেছে। যারা ওর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল তাদের মধ্যে এখন একটা প্রতিযোগিতা দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে, কে ওকে কত খুশী ক'রে ওর ক্ষমা পেতে পারে, নিজেদের পূর্ব-কীর্তির জন্য। কিন্তু ওবী অত সহজে ভোলবার নয়! যারা একবার ওর প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছিল, হাজার

খোশামোদেও তাদের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে। তাদের বুঝিয়ে দেয়, "তোমরা আমাকে ভাঙতে পারো, কিন্তু মচকাতে পারো না।" যদি তাদের কেউ কাছে এগিয়ে আসে তো উল্টে গর্জন করে জানিয়ে দেয়, তাদের দুর্ব্যবহার ওর সবই মনে আছে।

ল্যাম্পো সম্বন্ধে অনেক কিছুই এখন বদলে গেছে। যে সব গার্ড ও টিকিট কালেক্টররা ওর ট্রেনে চড়া সম্বন্ধে রীতিমত নৃশংস যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারাই এখন ওকে উদার মনে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ল্যাম্পো ট্রেনে উঠলে ওরা ভাব দেখায় যেন দেখতে পায়নি। আর নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে চোখ দুটি বন্ধ রেখেছে। ফলে ব্যাপারটা হ'ল এই যে, ল্যাম্পো ট্রেনে উঠলে কেউ ওকে আর তাড়া করে না, স্রেফ্ না দেখার ভান করে। স্বয়ং গার্ডই যখন এত উদার, তখন এঞ্জিন ড্রাইভাররা এবং রেলের অন্য কর্মীরা তো আরোই প্রশ্রয় দেবে।

এদিকে ল্যাম্পো ট্রেনে উঠে আগেই কোন একটা সীটের নীচে ঢুকে পড়বে। যদিও ও জানত যে ট্রেনের কর্মচারীরা এখন আর ওর প্রতি বিমুখ নয়। যারা এককালে ওকে নামিয়ে দেবার চেষ্টায় থাকত, তারা সবাই এখন ওর প্রসন্নতার প্রসাদ চায়। কিন্তু পরিবর্তে শোনে অদম্য, অবিচলিত ল্যাম্পোর সুমধুর গর্জন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের বন্ধুবর বড় উদ্ধত প্রকৃতির। ক্ষমা শব্দটার মানে ওর কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। কাজেই আমাদের চীফ সাহেবের বিবিধ তোয়াজ সত্ত্বেও ল্যাম্পোর তাঁর-প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ঘুঁচল না। তবে উনি যখন পিঠ চাপড়ে আদর করতেন ওঁকে ও তখন দাত খিঁচোতো না। ল্যাম্পো জানত যে, ইনিই খোদ কর্তা এবং এঁকে একটু খাতির না দেখালে অদৃষ্টে আবারও নির্বাসন যাত্রা ঘটতে পারে। কাজে কাজেই, ষ্টেশন মাষ্টার সম্বন্ধে ও নিজেকে সংযত রাখত এবং বন্ধুভাবে না চলেও (স্বার্থের খাতিরে) ওঁকে সহ্য করত। ক্রমশই ল্যাম্পো তার আগের মত জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং বেড়ানো চালু রাখল। ও জানতেও পারল না ওর জনপ্রিয়তা দিন দিন এত বেশী বেড়ে গেল যে, আর. এ. আই. এ'র লোকেরা এখন ওকে টেলিভিশনের প্রোগ্রামে চায়।

ওর কীর্তি-কাহিনী এবং বুদ্ধির তারিফ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ক্রমশঃ লোকের কৌতূহল ও উৎসাহ বেড়ে চলল ওর সম্বন্ধে। এমন কি খবরের কাগজওয়ালাদেরও আজকাল আমাদের কুকুরের দিকে নজর পড়েছে। যেন একটা যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় (এই প্রথম) কাগজে ল্যাম্পোর ওপরে সচিত্র গাদা গাদা নিবন্ধ বেরুতে লাগল। কী সব অসাধারণ শিরনামার নিবন্ধ: "আশ্চর্য কুকুর ল্যাম্পো", "রেলের কুকুর ল্যাম্পো," "ভ্রাম্যমাণ কুকুর ল্যাম্পো," "এক্সপ্রেস গাড়ীর কুকুর ল্যাম্পো" ইত্যাদি। মোটামুটি শিরনামা ও নিবন্ধগুলি ঠিকই লেখা হোতো। যদিও সবটা একেবারে সঠিক বলা যায় না, তবুও এতে রূপকথার মত গাঁজাখুরি খবর

থাকত না এবং মোটামুটি সত্য-ঘটনাতেই নিবদ্ধ থাকত। আমাদের কুকুরের খাতির দেখে আমাদের ভারী আনন্দ হোতো এবং তার সম্বন্ধে গর্ব আরও বেড়ে যেত।

ভ্রাম্যমাণ কুকুর ল্যাম্পো ক্রমশই যেন একটা হাওয়ার সঙ্গে খ্যাতির পথে এগিয়ে চল্ল। নিবন্ধের পর নিবন্ধ দ্রুতবেগে প্রেস থেকে বেরুতে লাগল। প্রথম দিকে তো ছোট্ট একটা কোণায়, তারপর সামনের পাতায়। এমন একটা দিন যেত না, যেদিন আমরা (ক্যাম্পিগলিয়াতে) কুকুরভক্তদের চিঠি না পেতাম। ল্যাম্পো সম্বন্ধে রকমারী প্রশ্ন-ভরা চিঠি, এবং পরিশেষে তাকে ভালভাবে রাখবার অনুরোধ জানিয়ে লেখা। প্রায়ই কোন না কোন বিখ্যাত বা বিশিষ্ট কাগজের বা সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকার সংবাদদাতা এসে হাজির হোত। এরা শুধুই যে খবরের লোভে আমাদের জেরা করত তা নয়। হাজার রকম ভঙ্গীতে ছবি তোলবার জন্য ল্যাম্পোকে রাগিয়ে নাকাল করে ছাড়ত। ল্যাম্পো যাহোক এতদিনে এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সহজ ভাবে এবং ভদ্রভাবে ছবি তুলতে ও আপত্তি কোরত না। শুধু আমরা যারা ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, তাদের দিকে চেয়ে বলতে চাইত, "ওহে বন্ধুগণ! বিখ্যাত হতে হলে এটুকু মাশুল দিতে হয়। এটা আমার কর্তব্যকর্ম!"

তবে ফ্ল্যাশ-বাল্‌বে ছবি তোলাটা ও একেবারেই পছন্দ করত না। যে ফোটোগ্রাফার ওর নাকের সামনে জোর আলো ফেলে হঠাৎ ওকে চমকে দিত, ও রেগে তাকে এমন আক্রমণ করত আর গর্জন করত যে, হতভাগ্য বাধ্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিতো।

এইভাবে যখন খবরের কাগজওয়ালাদের ক্রিয়া-কলাপের হুজুক চলছে, আমার বাড়ীতে একদিন এক নামকরা কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির। এদের কাগজের কাটতি দেশে সবচেয়ে বেশী। ভদ্রলোক বল্লেন, তিনি ফ্লোরেন্স থেকে কারে করে এসেছেন শুধুমাত্র ল্যাম্পোকে দেখবেন বলে। ওর বিষয় সব জানবেন, ওর ছবি তুলবেন এবং ওর সম্বন্ধে একটি সুন্দর নিবন্ধ রচনা করতে চান। উনি ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে কুকুরটাকে দেখতে পাননি। সেদিন ও আমার সঙ্গে পিওম্বিনো এসেছিল। তাই ক্যাম্পিগ্‌লিয়ার লোকেরা ওঁকে আমার বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিল। ল্যাম্পোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক যা যা খবর জানাতে চাইলেন সবই বল্লাম। তারপর দিলাম ল্যাম্পোর আশ্চর্যজনক ভ্রমণ-অভিযানগুলির বর্ণনা। ভদ্রলোক বল্লেন, ল্যাম্পো কি ভাবে ডাইনিং-কার থেকে খাবার খেতে যায়, সেই ছবি উনি তুলতে চান। অতএব ওঁকে আমি গাড়ী করে ক্যাম্পিগ্‌লিয়া ষ্টেশনে নিয়ে গেলাম।

সেখানে পৌঁছে ভদ্রলোককে জানালাম এবার তৈরী হয়ে যান্‌ এবং কুকুরটিকে অনুসরণ করুন। তিনটের গাড়ী যেই ষ্টেশনে ঢুকবে ল্যাম্পোর তক্ষুনি ডাইনিং-কারের দিকে ধাওয়া করার

(শেষাংশ ৩২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মূর্খ রাজার অদ্ভুত বিচার

(অসমীয়া উপকথা)

মূল লেখক : ৺লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া

শ্রীধনেশ্বর দাস অনূদিত

'বাড়ীর কর্তা চোরকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন।'

একবার এক পণ্ডিত তাঁর ছাত্রের সঙ্গে দেশ-ভ্রমণে বেরোলেন। তাঁরা অন্য এক রাজার রাজ্যে এসে পৌছলেন। এখানকার সব কাজই অদ্ভুত ছিল। ভোগ-চাউলের সের দু'পয়সা এবং সিদ্ধ ও আউস চাউলের সের দু'আনা। ঘিয়ের সের চার আনা আর তেলের সের একটাকা। পণ্ডিত তাঁর ছাত্রকে বললেন—"আমাদের এখানে কয়েক দিন থাকা মন্দ হবে না।" পাণ্ডিতের কথায় ছাত্রও সম্মতি প্রকাশ করল। তাঁরা একস্থানে থাকার ব্যবস্থা করলেন।

একদিন ঐ দেশের রাজার ঘরের পাশে এক বাড়ীতে চোর ঢুকল। চুরি করে পালবার সময় চোর ধরা পড়ল। বাড়ীর কর্তা চোরকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে এনে বিচারে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে বিচার করার পর রাজা এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, সিঁদটা বড় না হলে, ঐ চোর আর ঘরে ঢুকে চুরি করতে পারত না। তাই রাজা চোরকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি রে, তুই সিঁদটা কেন বড় করে কেটেছিলি?" চোর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল

—"মহারাজ আমার দোষ ক্ষমা করুন। আমার খন্তাটা বড় ছিল। তাই সিঁদিটা বড় হয়ে গেল।" রাজা ভাবলেন—ঠিকই তো! চোরের কি দোষ? ব্যাটা কামার কেন খন্তাটা বড় করে গড়েছিল! ওকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আয়। রাজার হুকুম মত কামারকে বেঁধে আনা হ'ল। রাজা কামারকে জিজ্ঞেস করলেন—"ওরে শয়তান, তুই কেন খন্তাটা বড় করে গড়েছিলি? তোর জন্যই তো চোর ঘরে ঢুকেছিল। তুই যদি খন্তাটা ছোট করে তৈরী করতিস তাহলে তো এমন হ'ত না।" কামার ভয়ে ভয়ে রাজাকে প্রণাম করে বলল—"মহারাজ আপনি আমার মা, বাপ, দোষ না ধরলে একটা কথা বলতে পারি। এখানে আমার দোষ নেই মহারাজ।..."

"দোষ...!" রাজা রেগে ধমক দিয়ে বললেন—"বাজে কথা ছাড় হারামজাদা! আমার প্রশ্নের জবাব দে?" কামার ভয়ে কাঁপছিল। বলল—"আজ্ঞে বলছি মহারাজ। মানে, মহারাজ আমি যখন খন্তাটি বানাচ্ছিলাম, তখন আপনার, মানে আপনার ঘরের ঝি'টা আমার সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, তখন আমার চোখ ওর দিকে গিয়েছিল। তাই অন্যমনস্কভাবে খন্তাখানিতে একটা ঘা বেশী পড়ার জন্য ওটা একটু বড় হয়ে যায়।" রাজা বললেন—"তোর কথা সত্যি। এখানে তোর দোষ নেই। যত সব গণ্ডগোলের মূল ঐ ঝি'টা। ওকে আমার কাছে নিয়ে আয়।" রাজার হুকুম পাওয়া মাত্র ঝিকে তাঁর সামনে হাজির করা হ'ল। ঝি কাঁপতে কাঁপতে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"ওরে বেটী তোর আর কাজ ছিল না? কামার যখন খন্তা তৈরি করছিল, তুই তখন তার সামনে দিয়া কেন দৌড় দিয়ে গিয়েছিলি? তোর জন্যই তো ঘরে চোর ঢুকতে পারল!" ঝি জবাব দিল—"মহারাজ, আমার দোষ ক্ষমা করবেন। সে সময় রাণী-মা'র প্রসবের সময় হয়েছিল। তিনি প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাই আমি দৌড়ে দাই আনতে যাচ্ছিলুম। কামার যে আমার দিকে তাকাবে, সেটা জানা ছিল না! ঝির কথা শুনে রাজা বললেন—"তুই ঠিকই বলেছিস। এখন দেখছি তোর কোন দোষ নেই। এখন আমি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছি, যত সব গণ্ডগোলের মূল হ'ল আমার ছেলে! সে আর জন্মগ্রহণ করার সময় পেলে না! তাকে এখানে নিয়ে আয়।" রাজার হুকুম অনুসারে নবজাত শিশুকে তাঁর নিকট আনা হ'ল। রাজা শিশুটিকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি রে, তুই ঐ সময় কেন জন্মগ্রহণ করেছিলি?" শিশু কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকার জন্য তাকেই রাজা দোষী বলে স্থির করলেন এবং হুকুম দিলেন—"কাল সকালে এই শিশুকে শূলে দিতে হবে। সে আমার ছেলে হতে পারে, তাই বলে আমি অন্যায় বিচার করতে রাজী নয়।" রাজার হুকুম শুনে মন্ত্রী চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন, একটি নির্দোষ শিশুর উপর কি অত্যাচার! একে বাঁচাতেই হবে। তিনি রাজাকে বললেন—"মহারাজ, এই শিশুটিকে শূলে দিলে তার গায়ে চাপ পড়বে না। কারণ তার শরীর ছোট। তার চেয়ে কোন

মোটা লোককে শূলে দেওয়া ভাল হবে। মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা হুকুম দিলেন—"আমার রাজ্যের মধ্যে যে লোকটি সবার চেয়ে মোটা, তাকে ধরে আন এবং কুমারের পরিবর্তে তাকেই শূলে দাও।" যেমন হুকুম তেমন কাজ। মন্ত্রী রাজ্যের চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

ঐ দিকে পণ্ডিত আর তাঁর ছাত্র সস্তা দামের ভোগ-চাউলের ভাত আর ঘি খেয়ে খেয়ে একবারে ভীমের মত মোটা হয়েছিল। রাজার লোক গিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিত ঘরে ছিল না। ছাত্রকে রাজার লোক বেঁধে নিয়ে এলো। ছাত্রকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার পর পণ্ডিত ঘরে ফিরে এলেন। এসে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর ছাত্রকে শূলে দেওয়ার জন্য রাজার লোক বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। তখন পণ্ডিত ছাত্রকে বাঁচাবার জন্য তিনি রাজদরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। পণ্ডিত বললেন—"আমি একজন পণ্ডিত। আমি মানুষের হাত দেখে তার ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছু বলতে পারি।" তখন রাজা তাঁকে নিজের ও রাণীর হাত দেখতে বললেন। পণ্ডিত হাত দেখে ভাল ভাল কথা বলে রাজাকে সন্তুষ্ট করলেন। তখন রাজা বললেন—"কাল সকালে একজন লোককে শূল দেওয়া হবে। তাহার সম্বন্ধে তুমি কি জান?" এই কথা শুনে পণ্ডিত অনেকক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "আ হা হা মহারাজ! লোকটির ভাগ্য খুব ভাল। কাল সকালে যে লোকটিকে শূলে দেওয়া হবে, সে স্বর্গের রাজা হবে।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা লাফ দিয়ে উঠে বললেন—"না না, এটা হতে পারে না।" আমি থাকতে একটি সাধারণ লোক স্বর্গের রাজা হবে, এ আমি কখনো সহ্য করতে পারব না। এই বলে রাজা মন্ত্রীকে ডেকে এনে বললেন—"মন্ত্রী, আপনি ঐ মোটা লোকটিকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিন, কাল আমি নিজেই শূলে উঠব!"

॥ ভবঘুরে কুকুর 'ল্যাম্পো' ॥

(৩২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কথা। কিন্তু সেদিন শ্রীমানের আমাকে বেকুব বানাবার উদ্দেশ্য ছিল। ২-৩০ মিনিটে একটা এক্সপ্রেস আসবার কথা। কিন্তু আমি সংবাদদাতাকে বলেছিলাম, ওদিকে মন দেবেন না, ল্যাম্পো ও গাড়ীর দিকে যাবে না। কিন্তু এ কী! ল্যাম্পো সোজা ঐ আড়াইটের গাড়ীর পেছনেই ছুটল এবং তার ডাইনিং-কারের সামনে হাজির হ'ল। সাংবাদিক মশাই আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে ব্যঙ্গোক্তি করলেন, "কুকুরটার টাইম টেবিলের জ্ঞান দেখছি আপনার চেয়ে ভাল!"

আমার অবস্থা—"ধরণী দ্বিধা হও!" অতি কষ্টে একটু ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলি, "যাই হোক পরের গাড়ীর দিকেও ও ঠিক যাবে। তখন কিছু আপনি ছবি নিশ্চয় পাবেন। তাই হ'ল। পরের গাড়ীটা এল এবং সংবাদদাতা কতকগুলি সুন্দর ছবি তুললেন। আমি যেন নিজেকে ওঁর কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে স্বস্তি পেলাম। না হ'লে ওঁর কাছে ভীষণরকম বোকা বনে গিয়েছিলাম। (ক্রমশঃ)

আজি যত তারা তব আকাশে

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

রাত্রিবেলা অন্ধকারে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে মেঘহীন আকাশের দিকে তাকাও। দেখবে অসংখ্য আলোর বিন্দু ঝিকিমিকি জ্বলছে। যেন ফুল ফুটে রয়েছে। আকাশে ঐ-যে বিন্দুগুলি জ্বল্‌জ্বল্ করছে, ওগুলি কী? ওরা সব তারা নক্ষত্র। রাত্রে নির্মল আকাশের যে দিকেই তাকাও না কেন, দেখতে পাবে অগুণতি তারা। তারপর মেলা, আলোর মালা। "তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে, নিদ্রাবিহীন গগনতলে।"

রাতের বেলা গুহার মুখে বসে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আদিম যুগের মানুষের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তারার মেলা দেখে গুহাবাসী মনে করত, আকাশ থেকে বাতি ঝোলানো রয়েছে ঠিক যেমন এ যুগে আমরা ঘরের ছাদ থেকে ইলেকট্রিক বাতি ঝুলিয়ে রাখি। গুহাবাসীকে দোষ দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানের দৌলতে ক্রমশঃ ঐ ভুল ভেঙেছে। নতুবা হয়তো এ যুগের মানুষও ঐ রকম ভাবত।

দিনের আলো নিবে গেলে গুহাবাসী আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু পরিবর্তন বুঝতে পারত। দেখে দেখে নক্ষত্রাদি সম্পর্কেও সে অনেক কিছু জানল। সে দেখতে পেল, রাত্রি-শেষে দিগন্তে কয়েকটি তারা চোখে পড়ে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেগুলো মিলিয়ে যায়। সূর্যোদয় সূর্যাস্ত লক্ষ্য করে সে দেখলে কতক তারা কোন কোন ঋতুতে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে আকাশে; কতক তারা দিগন্তে দেখা দেয় বসন্তকালে, কতক শীতে, আবার কতক বা গ্রীষ্মে।

আচ্ছা, তারা কী?

ঐ ঝিকিমিকি আলোর বিন্দুগুলির প্রত্যেকটি এক-একটা প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চুল্লী। জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড, আমাদের ঐ সূর্যেরই মত। আকাশের গায় ওরা ঝিকিমিকি করে, মিটিমিটি চায়। আমরা মনে করি ওরা নেহাৎই ছোট। আসলে কিন্তু তা নয়। আকাশে এক-একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য। কোনো কোনোটি আমাদের সূর্যের চেয়ে শতগুণ বড়। পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে আছে বলে ওদের এতটুকু ক্ষুদ্র দেখায়।

আমাদের সূর্যও একটি তারা, মাঝারি আকারের। এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, তারাগুলির তুলনায় সূর্যকে এত বেশি উজ্জ্বল দেখায় কেন? এর উত্তরে বলা চলে যে, সূর্য আছে পৃথিবী থেকে মাত্র ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। কিন্তু আমাদের নিকটতম তারাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি মাইল দূরে!

আমরা বলি, তারা অসংখ্য। দূরবীন দিয়ে দেখলে তারা অসংখ্যই বটে। খালি চোখে

যেখানটায় দুটো-চারটে মাত্র তারা দেখা যায়, দূরবীনের সাহায্যে সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে হাজার তারা। খালি চোখে আকাশে যত তারা আমরা দেখতে পাই, তা আসলে অসংখ্য নয়। এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে বলেই মনে হয় অসংখ্য। তারাগুলি যদি লাইন করে সাজানো-গোছানো থাকত তাহলে ওরকম মনে হ'ত না।

আবার এও মনে হতে পারে যে, তারাগুলি বুঝি একেবারে গায় গায় লেগে আছে। কিন্তু তা নয়। লক্ষ কোটি মাইল দূর থেকে দেখছি বলেই ওরকম মনে হয়। প্রতিটি তারা দূরে দূরে ; একটা থেকে আর একটা বিস্তর ফারাকে।

অচ্ছা, খালি চোখে আমরা যত তারা দেখতে পাই তা কি গুণে কত সংখ্যা বলা যায় ? এককালীন আকাশের একটা অংশমাত্র আমরা দেখতে পাই। তাতে যত তারা এককালীন আমাদের নজরে পড়ে তার সংখ্যা ছয়-সাত হাজারের বেশি নয়।

পৃথিবী থেকে তারাগুলি কত দূরে আছে অনুমান করা কঠিন ব্যাপার। মাইল, কিলোমিটার হিসেবে এই দূরত্ব নির্ণয় করা যায় না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই দূরত্ব স্থির করেছেন সময়ের হিসেবে। এই যেমন, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার বাড়ি থেকে ইস্কুল কত দূরে, তুমি হয়তো বল, মিনিট-দশেকের পথ। তেমনি জ্যোতির্বিদরা ঐ দূরত্বটা ঠিক করেছেন আলোর গতি অনুসারে; অর্থাৎ একটা নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এসে পৌছতে যত সময় লাগে সেই হিসেবে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। এক বৎসরে এই সময়ের গতি দাঁড়ায় কোটি কোটি মাইল। কিন্তু এই কোটি কোটি মাইলের লম্বালম্বি দূরত্বটা আন্দাজ করা তো অসম্ভব ব্যাপার ? বরং একটা বৎসরের দৈর্ঘ্য হিসেব করা যায়। সেই মত হিসেব করে দেখা গেছে, আকাশে যে নক্ষত্রটি আমাদের সব চেয়ে কাছের, সেটি রয়েছে পৃথিবী থেকে চার আলোকবর্ষ দূরে। অর্থাৎ ঐ নক্ষত্রটি থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে সময় লাগে চার বছর। নিকটতম নক্ষত্রটির দূরত্ব যদি এই হয়, তবে দূরতম নক্ষত্রটি কত দূরে ? কে জানে ! এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যার আলোক পঞ্চাশ বছরেও পৃথিবীতে এসে পৌছায় না। আবার বহু নক্ষত্রের অবস্থান এত দূরে যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটেও ওদের আলোক পৃথিবীতে এসে পৌছতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়। আমরা খালি চোখে সব চেয়ে যে দূরের তারাটি দেখতে পাই, তা আছে ১৫০০০০০ আলোকবর্ষ দূরের পথে।

লক্ষ্য কর, আকাশে কতগুলি তারা অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল দেখায়। ভাবছ, ওগুলো অন্যান্য তারার চেয়ে আকারে বড়। ঠিক তা নয়। উজ্জ্বলতায় তারতম্য ঘটে নক্ষত্রের আয়তন ও দূরত্ব অনুসারে। আবার আয়তনে একই রকম হলেও, কতকগুলি তারা অন্যদের

চেয়ে বেশি আলো ছড়ায়। আমরা সর্বপেক্ষা উজ্জল যে তারাটি—সিরিয়স—সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, সেটা আকারে খুব ছোট, কিন্তু রয়েছে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। খুব নিকটে আছে বলেই এই তারাটি এমন উজ্জল দেখায়। কিন্তু আশ্চর্য, তারপরেই যে তারাটি নিকটতম, তাকে দূরবীন ছাড়া দেখাই যায় না!

নক্ষত্রদের উজ্জলতাও সকল সময়ে একই রকম থাকে না। কখনো ম্লান, কখনো উজ্জল দেখায়। সূর্যের প্রখর আলোক গ্রহতারা প্রভৃতিকে বড় অস্পষ্ট করে রাখে; তাই দিনের বেলা ওদের দেখা যায় না।

এই যে এক-একটি নক্ষত্রের উজ্জলতা—দূর থেকে যেমনটি দেখা যায়, তা নির্ভর করে প্রধানতঃ আলোর প্রখরতার উপর। অর্থাৎ একটা নক্ষত্রের আলো যত প্রখর, সেটা তত বেশি উজ্জল। আগুনে লোহা তাতানো বা গলানো দেখেছ? লক্ষ্য কর, প্রথমে লোহার রঙটা দেখায় ফ্যাকাশে লাল; ক্রমশঃ তাতে কমলা এবং পরে হলদে আভা ফুটে বেরোয়; এবং শেষে দেখায় সাদা। নক্ষত্রের বর্ণও ফুটে ওঠে তার উত্তাপ ও উজ্জলতা অনুযায়ী। লালবর্ণের তারাগুলি সব চেয়ে ঠাণ্ডা। হলদে তারা, যেমন আমাদের সূর্য, মাঝারি রকমের গরম। সাদা ও নীলাভ তারাগুলির উত্তাপ সব চেয়ে বেশি।

আবার নক্ষত্রের বর্ণের সঙ্গে তার আয়তনেরও আছে একটা সম্পর্ক। সব চেয়ে বড় বড় নক্ষত্রদের বর্ণ লাল। মাঝারি বহরের নক্ষত্র হলদে; আর ছোটদের বর্ণ হ'ল সাদা ও নীলাভ সাদা।

অবাক লাগে, আকাশে এত তারা এল কোথা থেকে? কী করে তারার সৃষ্টি হ'ল?

কারো কারো মতে মহাশূন্যে যে অনুপরমাণু—প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস—ছড়িয়ে আছে, তা থেকে নক্ষত্রের সৃষ্টি। যথেষ্ট পরিমাণে অনুপরমাণু জড় হলে ভারাকর্ষণ শক্তিতে তা পরস্পরের কাছাকাছিই এসে যায়। তারপর তা একত্র হয়ে জমাট বাঁধাতে শুরু করে এবং এক-একটা বলের আকার ধারণ করে। ওগুলো ক্রমে আরো সঙ্কুচিত হয়ে শক্ত হয়, গরমও হয়। তখন ভিতরে অনুপরমাণুর একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং বলগুলো জলতে থাকে। পরিশেষে আরো জমাট বাঁধতে বাঁধতে একেবারে নিরেট গরম নক্ষত্রে পরিণত হয়। এভাবে মহাকাশে অনবরতই নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে।

ছোট বড় নানা ধরনের নক্ষত্রের গড়নে বিরাট কোন তফাৎ নেই। বড়র ভিতরে যে পরিমাণ পদার্থ আছে, ছোটর ভিতরে তার চেয়ে কিছু কম নেই। তবে কিনা বড়র ভিতরে যা রয়েছে ছড়ানো অবস্থায়, ছোটতে তা আছে জমাট বেঁধে। যে সকল নক্ষত্রের আকার ছোট, সেগুলি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে হয়তো সামান্য বড়। আবার এমন বড় বড় নক্ষত্রও আছে,

যাদের আয়তন অনুমান করা কঠিন। ওরা এক একটা মহাসূর্য। ওদের ভিতর আমাদের সূর্য ও তার পরিবারের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ সমেত এই সৌরজগৎটাই ভরে রাখা যায়। আমাদের সূর্যের চারদিকে যেমন পৃথিবী, শুক্র, শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ অবিরাম ঘুরছে, ঐ বিরাট বিরাট নক্ষত্রগুলির চারিদিকেও এই ধরণের বহু গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিজ্ঞানীদের এইরকম আন্দাজ।

প্রাচীন যুগের মানুষের ধারণা ছিল আকাশটা স্থির, চাঁদোয়ার মত, তারাগুলি হীরামুক্তার ন্যায় তাতে গাঁথা। ওদের নড়াচড়া নেই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ধারণা দূর হ'ল। লোকে লক্ষ্য করে দেখল, কতক তারা অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল; আরো দেখল, ঐ উজ্জ্বল তারাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি থেকে কখনো বা একটা যেন নমুনার সৃষ্টি করেছে। ওরা হ'ল তারা মণ্ডল। যেমন কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল (উরসো মাইনর, উরসো মেজর) প্রভৃতি। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের লোকেরা ঐ তারামণ্ডলগুলির নাম দিয়েছিল লিট্‌ল বেয়ার, গ্রেট্ বেয়ার ইত্যাদি। এ ধরণের ৮৮টি তারামণ্ডল আছে সারা আকাশে। একই তারামণ্ডলকে বিভিন্ন সময়ে আকাশের বিভিন্ন অংশে দেখা যেতে পারে। কিন্তু, আলাদা আলাদা ভাবে বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয়, সবগুলি নক্ষত্র একই সঙ্গে ঐ নমুনার আকারে। আবার কখনো বা দেখা যায়, কতক উজ্জ্বল নক্ষত্র নির্দিষ্ট মণ্ডলে থাকে না, বৎসরের এক এক সময়ে নক্ষত্রলোকে তাদের উদয় হয়। ওদেরই বলা হয়েছে প্লানেট বা গ্রহ।

এই তারামণ্ডলকে লক্ষ্য করে করে লোকে আবিষ্কার করল, তারারা একই জায়গায় স্থির হয়ে নেই, মহাশূন্যে অনবরত চলাফেরা করছে দ্রুতবেগে। ঘুরপাক খাচ্ছে ভীমবেগে। আমাদের পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে আছে বলে, ওদের চলাফেরা আমরা বুঝতে পারিনে ; ওদের গতি ধরা পড়ে না আমাদের চোখে। বস্তুতঃ ওদের গতি ভীষণ দ্রুত।

কিন্তু, তারারা যায় কোথায় ? তারারা ঘুরছে। ওরা এক বিরাট ছায়াপথে থেকে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট পথে। কী জানো, কিছুই এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই আকাশে। সমগ্র সূর্য পরিবার, নক্ষত্রজগত মহাকাশে বন্‌বন্ ঘুরছে লাটিমের মত— সকলেই একটা নির্দিষ্ট কক্ষ বা পথ ধরে। এতটুকু ব্যতিক্রম হবার জো নেই।

নোতুন শপথ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

"নোতুন কিছু কোরতে তো চাই
করবার তো কিচ্ছুই নাই !
যা করবি তা সবই হওয়া !
যা কইবি তা সবই কওয়া !
যা লেখবি তা আগেই লেখা !
যা আঁকবি তা সবার দেখা !
আবিষ্কারের বাকি তো নেই,
মাথার কাজও করছে কলেই !
তাজ্জবও নয় চন্দ্রে যাওয়া,
মঙ্গলেতে হাওয়া খাওয়া !
যে-দিকে চাই তাই পুরানো।
সাধ কিন্তু নাম কুড়ানো।
অজানা দেশ খুঁজতে যাবি ?
ম্যাপেতে-নেই কোথায় পাবি !
বিটলে হিপির ছাড়াছড়ি,
ভাও না এখন আহা মার !
যা ভালো তায় মন্দ করা,
কলেজ-স্কুল বন্ধ করা।
পরিক্ষা তাল- গোল পাকানো,
হেথায়-হোথায় হাঁক ছোটানো,
ঝাণ্ডা ঘাড়ে বচন হাঁকা,
রাস্তা জুড়ে মিটিং ডাকা
এসব কাজও একঘেয়ে তো।
হাড়ও ভাঙে মার খেয়ে তো !
আমি নই আর করতে রাজী।"
রকে হাঁকে কানাই মাঝি,—
"বরঞ্চ আয় দল গোড়ে যাই
যেখানে যতো মন্দ তাড়াই।
একঘেয়ে নয়, মজেও যাবি,
রকমারি মজা পাবি !
মাথা খাটাতে হবে তা নিয়ে—
কাকে তাড়াবো কোন্ দাওয়াইয়ে !"

নৌকা ভাসায় খোকা

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

কাগজ দিয়ে নৌকা গড়ে
খোকন ভাসায় জলে,
নৌকা যাবে খাল পেরিয়ে
হিজল গাছের তলে।
হিজল গাছের তলায় থাকে
স্বপনপুরীর রাজা,
নৌকাতে সে বলবে উঠে
সবাই ঢোলক বাজা।
মন্ত্রী মশাই দুলে দুলে
বলবে কত ছড়া
ছড়া শুনে ফুলপরীরা
ভাজবে কলার বড়া,
নেচে নেচে বলবে রাজা
খোকন বড় ভালো
তাই তো খোকার চোখে-মুখে
এখন খুশির আলো।

মেঠুড়ে

ক্লিভল্যাণ্ডের অ্যাসফাল্ট কোর্টে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে ৫-০ খেলায় হারিয়ে দিয়ে, আমেরিকা ডেভিস কাপ নিজেদের দেশেই রেখে দিয়েছে। আমেরিকা এবার নিয়ে পর পর তিন বছর ডেভিস কাপ জয় করল। শুধু একটানা তিন বছরেরই শ্রেষ্ঠত্ব নয়, এবারের জয়ে আমেরিকা ডেভিস কাপের সত্তর বছরের ইতিহাসে মোট বাইশবার বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার রেকর্ড স্পর্শ করল।

যদিও অ্যামেচার টেনিসে এখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আর্থার অ্যাশ, ক্লিক রিচে, ক্লার্ক গ্রেবনার, বব লুজ, চার্লি প্যাসারেল প্রমুখ প্রথম সারির খেলোয়াড়, তবুও অনেকে ধারণা করেছিলেন পশ্চিম জার্মানী এবার সর্বপ্রথম ডেভিস কাপ বিজয়ী হলেও হতে পারে। এই ধারণার কারণ আন্তঃজোন ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানী শক্তিশালী স্পেনকে ৪-১ খেলায় হারিয়ে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার অধিকার পেয়েছিল।

পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলায় আমেরিকা সহজেই জয়ী হয়। পাঁচটা খেলাতেই আমেরিকা জয়ী হয়। প্রথম চারটে খেলার ভেতর পশ্চিম জার্মানী একটা সেটও পায়নি। স্ট্রেট সেটে আমেরিকা চারটে খেলায় বিজয়ী হবার পর পঞ্চম খেলা মীমাংসিত হয় পাঁচ সেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ক্রিশ্চিয়ান কুনকে আর্থার অ্যাশের কাছ থেকে দুটো সেট নিয়েছেন।

ডেভিস কাপের সত্তর বছরের ইতিহাসে অ্যাশ ও কুনকের এই খেলাটা স্মরণীয় খেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খেলাটা ডেভিস কাপের সিঙ্গলসের দীর্ঘতম খেলা। সিঙ্গলসে দীর্ঘতম খেলার রেকর্ড করেছিলেন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা এবং আমেরিকার আর্থার অ্যাশ। এই ক্লিভল্যাণ্ড কোর্টে ১৯৬৮ সালের জোন ফাইন্যালে মোট তিরিশটা গেম খেলে। এবার

অ্যাশ ও কুনকে খেলেছেন ছিয়াশিটা গেম। ৮-৬ ও ১২-১০ গেমে কুনকে প্রথম তুটো সেট পাবার পর পর তিনটে সেট পান অ্যাশ ৯-৭, ১৩-১১ ও ৬-৪ গেমে।

ফুটবল : আই. এফ. এ. শীল্ড

আই. এফ. এ. শীল্ডের সাতাত্তর বছরের ইতিহাসে কয়েকটা নতুন নজির সৃষ্টি করে এবারের শীল্ড জিতেছে ইস্টবেঙ্গল ফাইন্যালে ইরানের পাস ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। একবার মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীল্ড জয়ের হিসেব নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের দশবার শীল্ড জয় অবশ্যই নতুন নজির। কেন না আর কোনো দলই এতবার শীল্ড পায়নি।

এবারের ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে দর্শক সমাগম কলকাতার ফুটবল ইতিহাসের নতুন রেকর্ড। কেউ এর আগে এমন উত্তেজনা এবং ময়দানে মহা খেলার এমন পরিবেশ আগে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। খেলা শেষের আনন্দ উৎসবও মনের পটে বাঁধিয়ে রাখবার মতন। কাঁসর-ঘণ্টার কান-ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে বোমা ফাটানোর বুক-ধড়ফড় করা আওয়াজ তো ছিলই, আর ছিল ইস্টবেঙ্গলের বিজয়ী খেলোয়াড়দের কাঁধে নিয়ে উন্মাদ-নৃত্য। আর গ্যালারিরই বা কী শোভা! দর্শক-ঠাসা চারদিকের গ্যালারিতে হাজারো হাতে জলন্ত অগ্নিশিখা, আলো-ঝলমল পরিবেশ।

খেলার সময় প্রায় উত্তীর্ণ, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকী। মাঠের ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার দর্শক আর মাঠের বইরে লক্ষ লক্ষ বেতার শ্রোতা ধরেই নিয়েছেন খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হবে। এমন সময় জয়সূচক গোলটা করে বসলেন ইস্টবেঙ্গল দলের পরিবর্তিত খেলোয়াড় পরিমল দে। যিনি মাত্র মিনিট দেড়েক আগে আহত হাবিবের বদলে খেলতে এসেছিলেন এবং সর্বসাকুল্যে মাঠে ছিলেন মাত্র তু'মিনিট।

যাঁরা সেদিন ফাইনাল খেলা দেখেছেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, ইস্ট-বেঙ্গলের রাইট ব্যাক সুধীর কর্মকার ছিলেন মাঠের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ইরানের খেলোয়াড়রা সুধীর কর্মকারকে একবারও অতিক্রম করতে পারেন নি।

পাঁচটা ওয়াকওভার বাদ দিলে ড্র খেলা নিয়ে মোট আটত্রিশটা শীল্ডের খেলায় এবার গোল হয়েছে একশ বত্রিশটা। পাঁচজন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছেন। এঁরা হলেন— খিদিরপুর ক্লাবের ভি বাসুনিয়া, জর্জ টেলিগ্রাফের ডি. সরকার, ইস্টার্ণ রেলের বি. বিশ্বাস বার্ণপুর ইউনাইটেডের এস. গাঙ্গুলী এবং পোর্ট কমিশনার্সের টি. দাস।

গামাল নাসের

যে তারকা এতকাল ধরে—
দিতেছিল আলো ধরাতলে
স্তব্ধ হইল সেই দীপখানি—
মরণের চির আহ্বানে।
বিলীন যে হ'ল গামাল নাসের
এ-বিশ্ব হতে চিরতরে;
রেখে যে গেলেন মহান্ আদর্শ
ঘরে ঘরে আজ মোদের তরে।
বহু যুগ ধরি রবে অনির্বাণ
রবে তাঁর বাণী হৃদয় মাঝে,
মানব হৃদয়ে আঁকা রবে তাঁর
স্মৃতিখানি চির-নবীন সাজে।

শ্রীবাসন্তিকা সেনরায়।

দুই ভাই

রবি শশী দুই ভাই,
করে রোজ খাই খাই।
পরে তাঁরা লাল জামা,
দু'জনারই এক মামা।
রবি বলে : শশী ভাই,
ঝগড়ায় কাজ নাই।
তার চেয়ে মামাটারে,
নিই মোরা ভাগ করে।

শ্রীবিবেক রায়

এদের দেখিয়া শেখ

পাহাড়ের কাছে শেখ হে মানুষ
কেমনে অটল রয়।
ছোট পিপীলিকা হইতে শেখ হে
কেমনে করে সঞ্চয়।

ফল ভরা ডাল হইতে শেখ হে
গুণ যদি থাকে তবে,
কেমন করিয়া দর্প না করে
নত শির হতে হবে।

গোলাপ হইতে শেখ হে কেমনে—
দুঃখ, বেদনা মাঝে—
রহিবে, যেমনে উহারা সবাই
কাঁটার মধ্যে রাজে।

নদী হতে শেখ কেমন করিয়া
অগ্রে যাইতে হয়,
ভাঙিয়া ফেলিয়া উহার মতন
সব বাধা, সব ভয়।

শ্রীজয় ভট্টাচার্য

১। পাঁচ অক্ষরে দেশ এক
সেথা বাস করি,
প্রথম তিনটি বাদে
বারো মাস ধরি।
প্রথম দু'অক্ষরেতে
বহা যে কঠিন,
প্রথম তৃতীয় মিলে
খাই প্রতিদিন।

শ্রীতাপস রায়

২। আগায় করে খড়মড়
গোড়ায় থাকে মধু,
ফুল ধরে না, ফল ধরে না
বেড়েই চলে শুধু।
ঘরের পাশেই আছে তোমার
কি গাছ বলো ভাই,
অনেক রকম খাবার দ্রব্য
তার দয়াতে পাই।

শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী

৩। দু'অক্ষরে নাম মোর
বোঝায় এক ক্রিয়া,
শেষ অক্ষর সকালেতে
জুড়ায় সবার হিয়া।
উল্টে দিলে শব্দ দুটি
ঘোড়ায় ভালবাসে,
খুঁজে বের করো দেখি
মাথায় যদি আসে।

শ্রীছায়া ভট্টাচার্য

৪। তিন অক্ষরে নাম তার
বস্তু এক হয়,
শেষ দুই নিলে পরে
বিয়ে বাড়ি রয়।
প্রথম অক্ষর নাও যদি
জীব এক হবে,
আদি অন্ত নিলে পরে
ভূমি মধ্যে রবে।

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

৫। তিন অক্ষরে নাম তার
সর্বস্থানে রয়,
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে
পদবী এক হয়।

শ্রীবিবেকানন্দ প্রামাণিক

৬। তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে,
দ্বিতীয় অক্ষর দিলে বাদ
নারী অঙ্গে ধরে।

শ্রীস্বপন সাহা

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

৺বিজয়ার ভালবাসা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার স্নেহ-সুপ্রীতি জানাই—বলিষ্ঠ দেহ-মনের অধিকারী হও।

পূজা শেষ হলো। আশা করি বেশ ভালো ভাবেই কটিয়েছ। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানিতে মানুষের সহজ জীবনযাত্রা যেমন ব্যহত হয়েছে, তেমনি ঘটছে শান্তি-মৈত্রী-প্রীতির অপমৃত্যু। তাছাড়া প্রকৃতির অভিশাপও লেগে আছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে প্রতিদিনের অবস্থা যা হয়েছে আজ বিশেষ করে তা থেকে যেন রেহাই পাচ্ছি না আমরা। হিংসা দ্বেষ আর অশুভ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যেন পাষাণ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সকালে উঠে সংবাদপত্র হাতে পেয়েই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অন্যের কাছে এ কলঙ্ক, দুঃখ, লজ্জা আমাদেরই—হিংসায় উন্মত্ত হয়ে কত নৃশংস পথই না অবলম্বন করছে মানুষ। চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে—আজ একটি কথা মনে হয়—আড়াই হাজার বছরেরও বেশী হবে—যিনি দেহরক্ষা করেছেন—সেই ভগবান বুদ্ধকে প্রেম-ধর্মে উদ্বুদ্ধ করে কত দুষ্কৃতকারীকে এ পথ থেকে তিনি নিবৃত্ত করেছিলেন—শুধু নিবৃত্ত কেন, তাদের মনের গতি পরিবর্তন করেছিলেন—অন্যায়, অশুভ, অমঙ্গলের পথ থেকে তাদের শুভ সুন্দরের পথ দেখিয়েছিলেন—হানাহানি খুনোখুনিতে যে কোনো ফল নেই, নেই কোনো শুভ, এটা তিনি বুঝিয়েছিলেন ভালবাসা দিয়ে। ভীষণদর্শন দস্যুদেরও তিনি জয় করেছিলেন—শান্তির পথ দেখিয়েছিলেন প্রেম-ভালবাসার দ্বারা। একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করি। সে সময়ে কোশলরাজ্যে অঙ্গুলিমাল নামে এক দস্যু সেই রাজ্যের শান্তির ব্যাঘাত করেছিল। নিরীহ পথিকদের উপর অথবা শান্তিকামী গৃহস্থদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের ধনসম্পত্তি

॥ ভাদ্র মাসের ধাঁধার পাতার উত্তর ॥

(১) ১ম লাইন ১২, ২, ১৬ ; ২য় লাইন ৪, ১৮, ৮ ; ৩য় লাইন ১৪, ১০, ৬ (২) ১ম লাইন ৬, ১, ৮ ; ২য় লাইন ২, ৯, ৪ ; ৩য় লাইন ৭, ৫, ৩ (৩) ২২ (৪) ৩২১।

এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হরণ করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। যে সব লোক তার হাতে মারা পড়তো, তাদের হাতের অঙ্গুলগুলি কেটে নিয়ে সে মালার মত গলায় ঝুলিয়ে রাখতো, এইজন্য সে অঙ্গুলিমাল নামে পরিচিত হয়েছিল। তার ভয়ে কোশলরাজ্যের লোকেরা কাঁপতো। রাজা কতবার সৈন্য পাঠিয়ে তাকে এবং তার দলবলকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিফল হয়েছে সে চেষ্টা। সকলেই যখন অঙ্গুলিমালের ভয়ে তটস্থ, এমনি সময় বুদ্ধ বললেন, যে বনে অঙ্গুলিমাল থাকে, তিনি সেই বনে যাবেন। শিষ্যরা তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন, তাঁর হিতৈষীরা তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত হলেন—কিন্তু বুদ্ধ কারও নিষেধ মানলেন না। সঙ্গে কোনো অনুচর না নিয়ে একাই সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। নির্জন বন, তার আশেপাশে যে সব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল দস্যুর অত্যাচারে জনশূন্য। অনেক দূর যাবার পর তিনি দেখলেন এক ভীষণদর্শন দস্যু। তার গলায় আঙুলের মালা দেখে বুঝলেন এই সেই অঙ্গুলিমাল। দস্যু তাঁকে দেখে গর্জন করে বললে, 'থামো, আর এক পাও এগোবে না।'

বুদ্ধ শান্ত স্বরে বললেন—আমি তো থেমেই আছি, তুমি থামো। দস্যু উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল—তার আদেশ অমান্য করবার সাহস কারো থাকতে পারে একথা সে ভাবতে পারেনি।

'আমি থেমেই আছি—'এ কথার অর্থ জানতে চাইলে বুদ্ধ তাঁকে বললেন যে, তিনি অহিংসা ধর্মে স্থির আছেন। তারপর তিনি দস্যুর অনুরোধ মত তাঁকে অহিংসা ধর্ম সম্পর্কে আরো উপদেশ দিলেন।

সেই উপদেশ দস্যুর হৃদয় স্পর্শ করলো। হিংসাবৃত্তি ভুলে গিয়ে সে বুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করলো। অঙ্গুলিমালের মত দুর্ধর্ষ নরহন্তা দস্যুও তাঁর অমৃতস্পর্শে নতুন জীবন লাভ করলো।

আজকের দিনে বুদ্ধের বাণী তাঁর উপদেশই মনে হয়। হিংসার দ্বারা কিছু জয় করা যায় না, যা যায় স্নেহ প্রেম ভালবাসায়—শান্তি মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে প্রার্থনা করি এই নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের শেষ হোক—আর বলি—

"করুণাঘন ধরণীতল
করো কলঙ্ক শূন্য।"

মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক—।

তোমাদের—মধুদি'

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০, বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : '৬০ পয়সা

জন্ম ৫ই নভেম্বর, ১৮৭০] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ [মৃত্যু ১৬ই জুন, ১৯২৫

[illegible]

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা *

৫১শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৭৭ [৮ম সংখ্যা

মাইকেলের পুনর্জন্ম

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব)

তিন-বছুরী ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র

পতঞ্জলি পাত্র

ডাণ্ডাবাজির বড় পাণ্ডা,

মেজাজটি তার নয়কো ঠাণ্ডা,

হিল্লি দিল্লি দেয় সে টহল

চড়ে মোটর সাইকেল।

জ্যোতিষার্ণব সেদিন ভোরে

বলেন কোষ্ঠী বিচার করে—

"গত জন্মে পতু ছিল

মহাকবি মাইকেল।"

শুনে বললাম, "সে কি ?? একি সত্য ??

পতুই ছিল মাইকেল শ্রীমধুসূদন দত্ত,

(যিনি) অমিল ছন্দে লিখে গেছেন
মেঘনাদের কাব্য ?
জ্যোতিষার্ণব, এ যে একেবারেই অভাব্য ।"
জ্যোতিষার্ণব হেসে বললেন, "মূর্খ,
এ সব তুই বুঝবি নে, ব্যাপার বড় সূক্ষ্ম।
(যা হোক) কথাটা তুই গোপন রাখিস,
তুলসি নে ওর কানে।
(হঠাৎ) খেপে গেলে ছোঁড়া আবার
কি করবে কে জানে ?"

শুনে আমার মনে এল
কেমন একটা আবেশ।
আমি বললাম, "তা বেশ ।"
পরে যখন পতঞ্জলির পেলাম দেখা
এগ্‌জামিনের আগের রাতে,
নোট মুখস্থ করছিল সে একা—
বাংলা কবিতার। সেটা মাইকেলেরই লেখা।
ভাবতে চমক লাগে—
গতজন্মের নিজের লেখার নোট মুখস্থ করছিল সে
এগ্‌জামিনের আগে !
অদ্ভুত সে ছবি।
আমি বললাম, "পতঞ্জলি, মাইকেল শ্রীমধুসূদন দত্ত
ছিলেন মহাকবি,
যাঁর কবিতা পড়ছ তুমি।" পতু বললে, "মুখ্‌খু, তুই কি
ভাবিস
আমি পড়ব মাইকেলের ঐ রাবিশ ?
জানিস আমার সময় কত মাগ্‌গি ?
ওর কবিতার 'নোট' পড়ি যে,
তাই জানিস ওর সাতপুরুষের ভাগ্যি ।"

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার গল্প

শ্রীঅমরনাথ রায়

অনেক অনেককাল আগে আমাদের দেশে এক দয়ালু রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল মস্ত বড় রাজপুরী। আর সে রাজপুরীতে ছিল মস্ত বড় এক বাজার। সেই বাজারে দেশ-বিদেশের ব্যাপারীরা নানান জিনিস আনতো বেচতে। কারুর কোন জিনিস বিক্রী না হলে রাজা ন্যায্য দাম দিয়ে তা কিনে নিতেন। রাজার এই রকম ছিল প্রতিজ্ঞা।

রাজার বাজারে একদিন এক বিদেশী ব্যাপারী লোহার তৈরি একটি মেয়ের মূর্তি ফেরি করে বেড়াচ্ছিল। হাঁকছিল: অলক্ষ্মী চাই গো—অলক্ষ্মী। কে নেবে গো অলক্ষ্মী।

রাজার কানে গেল ফেরিওয়ালার হাঁক। তিনি ভাবলেন—অলক্ষ্মী বুঝি বিক্রী হচ্ছে না। তাই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে তিনি সেই ফেরিওয়ালাকে ডেকে ন্যায্য দাম দিয়ে অলক্ষ্মীর মূর্তিটা কিনে ঘরে রাখলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুরঘরে পুজো করতে বসে রাজা একটি মেয়ের কান্না শুনতে পেলেন। দেখলেন—ঠাকুরঘরের এক কোণে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে কাঁদছে।

রাজা বল্লেন: তুমি কাঁদছ কেন মা?

কি হয়েছে তোমার?

মেয়েটি বল্লে: আমি হলাম রাজলক্ষ্মী। এ রাজ্যের লক্ষ্মী। তোমার রাজ্যে অনেক বছর ধরে আছি। কিন্তু এখন আমাকে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেই দুঃখে কাঁদছি।

রাজা বল্লেন: কেন মা, আমার রাজ্য ছেড়ে কেন তোমাকে চলে যেতে হবে?

রাজলক্ষ্মী বল্লেন: তুমি যে অলক্ষ্মী কিনে এনে ঘরে রেখেছ। তাই এ ঘরে আমার আর থাকা চলে না। এ রাজ্যেও নয়। যাই হোক যাবার আগে তোমাকে এই বর দিয়ে যাচ্ছি যে তুমি কীট-পতঙ্গের ও পশুপাখির ভাষা বুঝিতে পারবে।

—এই বর দিয়েই রাজলক্ষ্মী সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

তারপর দিনই রাজা রাজপুরী থেকে মাঝরাতে আর একটি সুন্দরী মেয়েকে চলে যেতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা ক'রে জানালেন যে তিনি 'ভাগ্যলক্ষ্মী'।

শুধু রাজলক্ষ্মী ও ভাগ্যলক্ষ্মী নয়। যশোলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মীও এমনি ভাবে একে একে বিদায় নিলেন রাজপুরী থেকে। কারণ, সেই একই। রাজগৃহে এসেছে অলক্ষ্মী। লক্ষ্মীদের তাই আর থাকা চলে না।

এরপর একদিন ধর্মরাজও রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁকে বল্লেন: আপনি যাবেন না দয়া করে। কারণ আমি তো কোন অধর্ম করিনি। আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যেই অলক্ষ্মীকে ঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছি। আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তো অধর্ম নয়, বরং ধর্ম পালন করা।

ধর্ম রাজ অবুঝ নন্। তিনি বুঝলেন যে রাজ্য ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। তিনি তাই থেকেই গেলেন।

কিন্তু ঘরে অলক্ষ্মী আসায় রাজার অবস্থা দিন দিন খারাপ হ'তে লাগলো। রাজার এমন দুরবস্থা হলো যে তাঁর খাবার পাতে এক ফোঁটা ঘিও পড়লো না। তাঁর পাতের কাছে পিঁপড়েরা কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগলো। তারা রাজার দৈন্যের কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো।

রাজলক্ষ্মীর বরে রাজা পিঁপড়ে ও পশু-পাখিদের ভাষা বুঝতে পারতেন। খেতে বসে পিঁপড়েদের কথা শুনে তিনি হাসতেন।

একদিন খাবার সময় রাণী রাজাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বল্লেন: কারণ বলতে মানা আছে। বল্লে আমি মরে যাব। তবে তুমি যদি একান্তই শুনতে চাও কারণটা, তাহলে আমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে চল। সেখানে গিয়ে বলব।

রাণী বল্লেন: বেশ, তাই চল। রাজা ও রাণী গেলেন গঙ্গার ঘাটে। ঐ সময় ঘাটের পাশে এক জঙ্গলে এক ছাগলী ছাগলকে বলছিল: ওগো দেখ, গঙ্গার জলে কেমন সুন্দর এক বোঝা কচি ঘাস ভেসে যাচ্ছে। আমাকে এনে দাও না গো। আমি খাব।

ছাগল বল্লে: ক্ষেপেছ, ওখানে অগাধ জল। তোমার কথা শুনে ঘাস আনতে গিয়ে আমি মরি আর কি!

ছাগলের কথা শুনে রাজার সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি রাণীকে ঘাটের ধারের জঙ্গলে ফেলে রেখে লুকিয়ে প্রাসাদে চলে এলেন। রাণীর আর কোন খোঁজ-খবর নিলেন না।

রাণী এদিকে মহা মুস্কিলে পড়লেন। মনের দুঃখে তিনি সেই জঙ্গলে কেঁদে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি দেখলেন যে জঙ্গলের মাঝে পুজো হচ্ছে। পিটুলী দিয়ে লক্ষ্মীঠাকুর গ'ড়ে, তাতে রঙ লাগিয়ে তাঁরই পুজো হচ্ছে। পুজো করছে মেয়েরা। চিড়ে, নারকেলের জল, তালের ফোঁপল ও পাটালি দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো করছে। কাঁসার ও ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হাতে ফুল নিয়ে অঞ্জলি দিচ্ছে দেবীর।

তাই দেখে রাণী জিজ্ঞাসা করলেন: হাঁগো মেয়েরা, কি পুজো করছ গো তোমরা?

মেয়েরা বল্লে : এ হচ্ছে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো। এ পুজো করে দেবীর কাছে যে বর চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। অলক্ষ্মী ঘর থেকে দূর হয়। আর লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করা যায়।

ওদের দেখাদেখি রাণীর সাধ হলো লক্ষ্মী পুজো করার। তিনিও তখন পিটুলী দিয়ে লক্ষ্মীমূর্তি গড়ে ভক্তিভরে পুজো করলেন। তার ফলে রাজপুরী হতে অলক্ষ্মী দূর হয়ে গেল। রাজা ফিরে পেলেন তাঁর ঐশ্বর্য। সংসারে তাঁর লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এলো। ফিরে এলেন রাণী, রাজলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী ও আর সবাই।

সেই থেকে দেশে ঘটা ক'রে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর প্রচলন হলো।

দুর্গাপুজোর পর শারদ পূর্ণিমার দিন ঘটা ক'রে এই পুজো হয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।

ছড়া

শ্রীঅশোক হালদার

খুঁচিয়ে কাদা কী সুখ দাদা, কাদাখোঁচা!
নিন্দুকে কয় তুই পাখিদের মধ্যে ওঁচা।
বক বলে, শোন্ কাদায়-কাদা পালক গোছা
সার্ফ-সাবানে সাফ্ ক'রে বদ্নামটা ঘোচা;
আমার পাশে বস্তো খানিক, শেখাই তোরে;
টুপ্-টুপ্-টুপ্ ছোঁ-মারি মাছ কী মন্তরে!
কাদাখোঁচা বল্লো, ও ভাই, দেখ্ কুমোরে;
এই কাদাতেই দেব-দেবীদের মূর্তি গড়ে।

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥
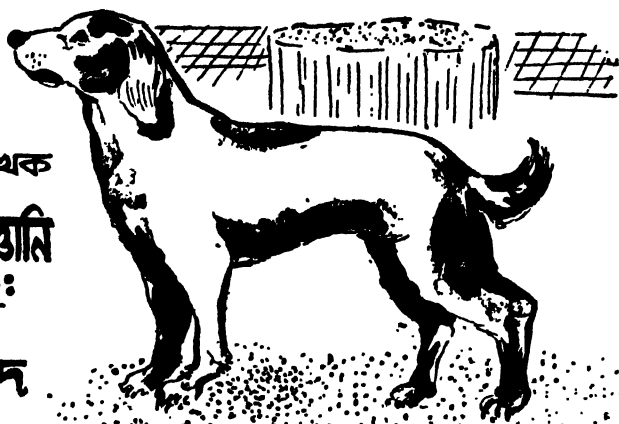
॥ চীফ্ সাহেবের অবসর গ্রহণ ॥

গ্রীষ্মকাল। গরমের প্রকোপটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। গ্রামের পাকা ফসলের সোনার ক্ষেত প্রখর তপনতাপে উত্তপ্ত। মাথায় খড়ের টুপি-পরা চাষীর দল শস্য-কাটাইয়ের মেশিনের আওয়াজের তালে তালে ছন্দ রেখে লোকসংগীত গাইছে। ষ্টেশনে রীতিমত চাঞ্চল্য। রেল-বিভাগের কর্মীরা ভারী ব্যস্ত, গরমের ছুটিতে দলে দলে শহরের লোকেরা চলেছে সমুদ্র-সৈকতে ছুটি কাটাতে। একের পর এক ট্রেন আসছে ষ্টেশনে। যাত্রীর দল মালের বোঝা নিয়ে কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ বা হৈ চৈ তুলে ছুটে চলেছে পিওম্বিনোর গাড়ী ধরতে। কিছু যাত্রী অবশ্য শহরেই থেকে যাবে। বাকীরা যাবে এল্‌বা দ্বীপে। ভিড় থেকে একটু দূরে একটা কোণাতে ল্যাম্পো গরমে হাঁপাচ্ছিল। কৌতুকের সঙ্গে হৈ চৈ, ব্যস্ততার দৃশ্য দেখছিল। ল্যাম্পোও গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুভব করছিল। আগের মত এখনও সে শুধু দরকারি ভ্রমণটুকুই করছিল। এখান থেকে পিওম্বিনো যাওয়া, তারপর সমুদ্রে স্নান, রোদ পোয়ানো এবং সন্ধ্যেবেলায় ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে ফেরা।

ল্যাম্পোর খ্যাতির সীমা ছিল না। এমনকি সমুদ্রতীরেও ওর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা হয়েছিল। ছুটি কাটানো স্নানার্থীর দল আমার ছোট্ট ঘরে অবিরাম স্রোতের মত এসে ঢুকত এবং ল্যাম্পোর সঙ্গে আলাপ করে তার সঙ্গে ছবি তুলতে চাইত। এই সব অস্থায়ী ফোটো-গ্রাফারের দল কত যে ছবি তুলল, তার ইয়ত্তা নেই। ছোট ছেলেরা কোন একটা ছুতো করে

মির্ণার সঙ্গে ভাব করতে চাইত। উদ্দেশ্য ল্যাম্পোর সঙ্গে খেলা করা। সেই শান্ত পরিবেশ, যেখানে আগেকার দিনে রোদ পুইয়ে, দিবাস্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিতাম, সেখান থেকে পালানো সাব্যস্ত করলাম। ল্যাম্পোর গুণগ্রাহী ফটোগ্রাফারদের আবদারে আমি অস্থির হতাম। তারা ল্যাম্পোকে ধার চাইত।

যখনই সমুদ্রসৈকতে যেতাম, ল্যাম্পো৷ আমার স্ত্রী মেয়ের সঙ্গে গাড়ীতে আসত। যদি কখনও আমরা যেতে না পারতাম, দেখা যেতো বন্ধুবর নিজেই পদব্রজে সমুদ্রের ধারে পৌছে যেতেন। এতদিনে পথঘাট ভাল রকমই জেনে গেছে। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, শ্রীমান্ অতখানি রাস্তা মোটেও হেঁটে যেতেন না। বাস টারমিনাসের কাছে গিয়ে সমুদ্র অভিমুখী বাসের অপেক্ষা করত। স্নানার্থীদের ভিড়ে মিশে বাসে উঠে পড়ত। ফেরবার সময়ও সেই একই পন্থা অবলম্বন করত ও। এই 'পুলম্যান' বাসগুলিকে ও ভালকরেই চিনত। কারণ বার কয়েক আমাদের সঙ্গে ও এতে করে বেড়াতে গেছে।

গ্রীষ্মের অবসান। যাযাবর পাখীরা উঁচু পাখা মেলে চলে যাচ্ছে গরম দেশের সন্ধানে। বলিষ্ঠ গড়নের মেয়েরা সরু ঝুড়ি ভ'রে আঙুর জড়ো করছে, আঙুর ক্ষেত থেকে। প্রথম পশলার বৃষ্টি শুকনো মাটি ভিজিয়ে হাওয়াটাকে ভরে তুলেছে গ্রামের মাটির সোঁদা গন্ধে। ষ্টেশনে সবাই আমরা শরতের সঙ্গে আসা টাটকা সতেজ হাওয়া উপভোগ করছিলাম। যারা সমুদ্র-সৈকতে এসে তামার মত রং-এর মুখ করে এতদিন সূর্যস্নান করছিল—তাদের শেষ দলটি এবার ফিরে চলে আপন ঘরে নিজের নিজের কাজে বা স্কুলে। তাদের ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাদের গল্প করবার ছিল কত কি-ই। অফুরান ছিল তাদের সমুদ্রসৈকতে এসে সঞ্চয় করা স্মৃতিভাণ্ড, যাকে মনের মণিকোঠায় ভরে রাখা যায়।

ল্যাম্পো আবার ট্রেনে চড়ে টোটো-কোম্পানী শুরু করেছে। জীবন তার স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে চলেছে সময়ের সঙ্গে। আমাদের ষ্টেশন মাষ্টারের সময়ও এগিয়ে চলেছে। তাঁর অবসরের দিন আসন্ন। তাঁর ৬১ বছর পূর্ণ হ'ল। যথাসাধ্য ভালভাবেই তিনি রেলবিভাগের সেবা করেছেন; এবার খুশী মনে অবসর গ্রহণ করবেন। উনি প্রায়ই ওঁর অবসর গ্রহণের কথা বলতেন। কিন্তু সত্যিই যখন সেই দিনটি এল, দেখা গেল উনি খুশি হননি মোটেও এবং দিনটা যেন বড্ড তাড়াতাড়ি এসেছে বলে উনি মনে করলেন। কত ট্রেনের আসা-যাওয়া উনি দেখেছেন। রেল লাইনের ওপরে বিছিয়ে রাখা পাথর-কাঁকরের ওপর দিয়ে কত মাইল উনি হেঁটেছেন, কত শঙ্কাকুল, বিরক্তিকর ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, এই চাকুরী জীবনে। আবার কতবার পুরস্কৃত হয়ে সফলতা ও তৃপ্তির আনন্দও পেয়েছেন। অবসর গ্রহণ করাটা ওঁর মনকে বেশ বিচলিত করেছিল।

হে বৃদ্ধ! যেহেতু তুমি এখন আমাদের ছেড়ে গেছ, চাকুরীর শেষের যে ক'টা দিন তুমি আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিলে তা' আমি চিরকাল মনে রাখব। তুমি চলে গেলে আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি পাথেয় নিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে আমাদের কাজের স্মৃতি আর তোমার প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার নমুনাস্বরূপ আমাদের দেওয়া সোনার পদকটি। তুমি ঐখানে দাঁড়িয়েছিলে ঠিক চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে। এমন সময় তুমি ল্যাম্পোকে দেখলে। তুমি ফিরে তাকালে, ওকে আদর করে হাত বুলিয়ে কিছু বল্লে মৃদুস্বরে। ষ্টেশনের দিকে একবার শেষ দেখা দেখলে, তারপর যত তাড়াতাড়ি পারো চলে গেলে। আমি জানি তোমার চোখে তখন জল ছিল।

আর ল্যাম্পো, তুই? অন্ততঃ সেদিনটা তো তুই ওঁর প্রতি একটু ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করতে পারতিস্? একটু ভাল মেজাজে থাকা, একটু লেজ নাড়া, এটুকু? না। তুই সেদিনও ওঁর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলি—একেবারে নির্লিপ্তভাবে। তুই আর ওকে কখনও দেখিস নি পরে। তুই জানতিস্, উনি চলে যাচ্ছেন। লোকটি কিন্তু খারাপ ছিলেন না। কেবল একটু খুঁতখুঁতে ছিলেন বেশী। তবু বলি, তুই যদি সেদিনটা অন্ততঃ তোর অহঙ্কারটা একটু ভুলতে পারতিস্ তো আমি খুশি হতাম। যাক্ সে সব তো চুকে গেছে। এবার পরের পরিচ্ছেদ।

একজন কর্তা গেলেন, আর একজন আসবেন। আমাদের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলল। কারণ কেউ জানিনা কে আসবেন। যতরকম সম্ভাব্য ব্যক্তির নাম করে নিজের নিজের মত প্রকাশ করতে থাকলাম। প্রত্যেকেই নিজেকে সেরা বিচারক মনে করে অন্যের মতকে নস্যাৎ করে দিই। কেউ বড় কড়া, নাঃ! কেউ বড় খুঁত্‌খুতে। কেউ বেজায় বদমেজাজী। কেউ বা ভোঁদারাম।

আমাদের আরও একটা মুস্কিল ছিল ল্যাম্পোর ব্যাপারে। নতুন যিনি আসবেন (যা এখনও আমাদের অজ্ঞাত) তিনি কুকুর পছন্দ করেন কিনা? ল্যাম্পোর এই ষ্টেশনে থাকা তিনি মেনে নেবেন কিনা? যদি তিনি না করেন তবে ল্যাম্পোর কী অবস্থা হবে? হয়ত আবার ওকে কোন দীর্ঘপথের যাত্রায় নির্বাসনে যেতে হবে এবং হয়ত এবারে ও আর নাও ফিরতে পারে।

আমাদের অপেক্ষার দিনগুলো যেন শেষ হয় না। এদিকে ল্যাম্পো অজ্ঞতার অশীর্বাদে কিছুই জানল না। যেমনি বেপরোয়াভাবে জীবনযাপন করছিল, তেমনি করতে লাগল। ও কি জানত যে ওর মাথার ওপরে বলির খাঁড়া ঝুল্‌ছে? ইতিমধ্যে যতগুলি সম্ভাব্য ষ্টেশনমাষ্টারের নাম আমরা উল্লেখ করেছিলাম সকলের নাম নাকোচ করে, একজনের নাম এমন জোরের সঙ্গে

শোনা যেতে লাগল, যে আমরা বুঝে নিলাম তাঁর ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়বে। শেষ পর্যন্ত আমাদের মাথাব্যথায় অবসান হ'ল। কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পিগ্‌লিয়া ষ্টেশনে একজন নতুন ষ্টেশনমাষ্টার নিয়োগ করলেন। আমরা এঁকে চিনতাম না, তবে এদিক-ওদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, ইনি খুবই উৎসাহী লোক, কর্মক্ষম, উদারচেতা, কিন্তু দরকার হলে কড়া হতে জানেন। আমাদের পক্ষে তো এমন লোক ভালই, কিন্তু কে জানে 'ল্যাম্পো'র প্রতি ওঁর মনোভাব কেমন হবে!

নতুন চীফের আসতে মাত্র আর ক'দিন বাকী। এই 'মাত্র ক'দিনের' মধ্যে আমরা একদিন আমার আপিসে বসে এই সব আলোচনা করছি, এমন সময় রেলের গার্ড এসে আমার টেবিলের ওপরে কিছু নথিপত্র রেখে বল্লে, "ও মশায়, জানেন? আপনাদের নতুন কর্তা যে বেজায় জন্তুজানোয়ার ভালবাসেন। জেনে রাখুন, তাঁর একটা কুকুর ও চারটে বেড়াল আছে।" আমরা হেসে অঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ল্যাম্পোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। সকলের মনেই তখন এক চিন্তা: ল্যাম্পো তাহলে আমাদের কাছে বরাবরের মতই থাকবে।

(ক্রমশঃ)

খোকার প্রশ্ন

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

'একটা দুটো অনেকগুলো
গরম জামা আমার,
মা-মণি, তার ওপর আছে
চাদর ও মাফলার।
কিন্তু দ্যাখো, ঐ ছেলেটি
ঐ যে তেঁতুল তলে
আদুড় গায়ে তুলছে, বুনো
শাক, নাকি সব বলে।

দারুণ শীতে ওর কেন নেই
গরম জামা গায়?
চপ না খেয়ে, ও কেন বা
কচুর পাতা খায়?
পায়ে কেন নেইকো জুতো?
আহা, ঠাণ্ডায় পা ফাটে—
গাড়ি চড়ে যায় না কেন?
হটর হটর হাঁটে।'

'ও যে গরিব, মানিক আমার'—
মা ছেলেকে কয়:
মানিক বলে—'মা বলো না
গরিব কেন হয়?'

অক্ষয় স্বর্গবাস

শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

মহারাজা হবুচন্দ্রের মুখে হাসি নেই। রাজসভার ভাঁড় অথবা বিদূষক কেউই তাঁকে প্রফুল্ল করতে পারছে না। ব্যাপার কি?—ব্যাপার, রাজকুমার নাদুসচন্দ্রকে নিয়ে। মহারাজার ঐ একটিমাত্র সন্তান। আজ বাদে কাল সিংহাসনে বসবে। বাবা আশা করেছিলেন, ছেলে তাঁর মতোই নামকরা হবে। কিন্তু তাঁর সব আশা বুঝি মিথ্যা হয়ে যায়। কারণ, আজ প্রায় একমাস হলো, যুবরাজ রাত্রি-দিন শুধু যাগযজ্ঞ, পুজো-উপোস করে মন্দিরেই পড়ে আছে। সংসারে থাকবার বাসনা নেই তার। নাদুসচন্দ্রের মতে, পৃথিবীতে বাস করা উচিত নয়। বাস যদি করতেই হয়, তবে স্বর্গই একমাত্র স্থান, সেখানে বসবাস করা যায়। সেইজন্য চব্বিশ ঘণ্টাই সে চিন্তা করছে, কি করলে স্বর্গবাস হয়, শুধু তাই নয়, কি করলে সেই থাকাটা অক্ষয় হবে। অর্থাৎ কোন্ পথে গেলে এবং কি করলে চিরস্থায়ী স্বর্গবাস হবে তার এই ভাবনায় সে ভরপুর হয়ে আছে রাত্রি-দিন।

সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে আর রক্ষা নেই। তাদের সে আদর করে ডেকে, ভালোভাবে খাইয়ে-পরিয়ে আর মূল্যবান উপহার দিয়ে নাদুসচন্দ্র প্রশ্ন করে, "পৃথিবীতে আমি থাকতে চাই না। কি ভাবে আমার অক্ষয় স্বর্গবাস হতে পারে, সেই তথ্যটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন কি?" এইসব সাধু-সন্ন্যাসীরা যে বাণী দান করছেন, তা শুনে পছন্দ হচ্ছে না তার। সাধু-সন্ন্যাসীদের মতে অনেক পুণ্য করলেই মানুষ স্বর্গে চিরস্থায়ী আসন পায়। অনেক পুণ্য অর্জন করতে হলে অনেক দিন ধরে অনেক ভালো ভালো কাজ করতে হবে। কিন্তু রাজকুমারের এতোদিন ধরে এতো পুণ্য করবার সময় নেই, ধৈর্যও নেই। সে চাইছে সোজা, সরল এবং অতি সংক্ষিপ্ত একটি পথ! এ রকমের পথের নিশানা কেউই দিতে পারে না। ফলে, যুবরাজ অস্থির হয়ে পড়ে।

হবুচন্দ্রের এক ভাইপো ছিল। সে খুব লোভী। নাদুসচন্দ্র মরলে সিংহাসন তারই। এই সিংহাসনের উপর তার তাই নজর ছিল। সে সব সময় তাই ভাবতো, নাদুসচন্দ্রটা কবে মরে! এখন নাদুসচন্দ্রের ঐ মনের কথাটা জানতে পেরে, সে এক সাধুকে অনেক টাকা দিয়ে পাঠালো তার কাছে। সাধু এসে বললে, "যুবরাজের জয় হোক। আমিই তোমাকে স্থায়ী ভাবে স্বর্গে থাকবার জন্য সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত পথের ঠিকানা দিতে পারি।"

—"বলুন, সাধুবাবা, বলুন। সেই পথের ঠিকানা বলুন। সেখানে যাবার জন্য আমার মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

—"তোমার বাসনা পূর্ণ হবে, কুমার। এখন যা বলছি, মন দিয়ে তাই শোনো। তুমি ক্ষত্রিয়-

সন্তান। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে মরণ হলে ক্ষত্রিয় চিরস্থায়ী ভাবে স্বর্গে থাকতে পারে। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পথই অনুসরণ করো।"

—"কিন্তু, সাধুবাবা, যুদ্ধ তো নেই। অতএব, যুদ্ধক্ষেত্রও নেই। তবে কি হবে ?"

—"উপায় আছে, নাদুসচন্দ্র। আমাদের উত্তরের প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সীমানা নিয়ে ঝগড়াঝাটি তো লেগেই আছে। বাবাকে গিয়ে বলো, কথায় ঝগড়া আর ভালো লাগে না, এবার যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রমাণ হয়ে যাক, কোন্ এবং কার সীমানা ঠিক। অর্থাৎ সৈন্যদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো—উত্তরে উত্তরদেশের রাজার রাজ্যে।"

—"কিন্তু সাধুবাবা, আমি চেয়েছিলাম একটি সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত পথ। আপনার পথ দেখছি একটু ঘোরালো।"

—"আমার পথই যুবরাজ সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুদের মাঝে। তখন শত্রু এসে মুহূর্তের মধ্যে এমন ভাবে তোমার মাথা কেটে দেবে যে তুমি বুঝতেই পারবে না। ব্যস, তারপরের মুহূর্তেই তুমি দেখতে পাবে নিজেকে নারায়ণের রথে। যাচ্ছো বৈকুণ্ঠপুরীতে। এর চাইতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত পথ কিছু নেই।"

—"কিন্তু সাধুবাবা, মাথা যখন কাটবে, তখন ব্যথা পাবো বেশ। তাই ভয় করছে।"

—"কোন ব্যথাই পাবে না, কুমার। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের আঘাতে যদি ব্যথাই লাগতো, তবে সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্য কোনো রাজা কখনই লোক পেতেন না। তোমার মাথাটা যখন কেটে নেবে, তখন বুঝতে পারবে, পিঁপড়ে কামড়ালে যতোটুকুন লাগে, ততোটুকুনই লেগেছে।"

খুব খুশি হয়ে নাদুসচন্দ্র বলে, "তবে আমি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণদান করবো।"

রাজকুমারের চাইতে বেশী খুশি হয়ে সাধু বলে, "বেশ, বেশ। কিন্তু তোমার মনের এই গোপন ইচ্ছার কথা মহারাজকে বলবে না। তিনি তোমাকে লড়াই করতে পাঠাবেনই না।"

সাধুর উপদেশ শুনে নাদুসচন্দ্র দৌড়ে যায় বাবার কাছে এবং উত্তরদেশকে শাস্তি দেবার জন্য সৈন্যদল চায়। যুবরাজের কথা শুনে মহারাজের মুখে হাসি ধরে না। তার পিঠ চাপড়ে বলেন, "এই তো রাজার ছেলের মত কাজ।" মন্ত্রী গবুচন্দ্রও হাসতে হাসতে বলেন, "মহারাজ, আজ আমাদের শুভদিন। যুবরাজ সন্ন্যাস ছেড়ে কর্মবীর হতে চলেছেন।"

অল্প সময়ের মধ্যে এক বিরাট সৈন্যদল প্রস্তুত হলো। তারপর তারা যুবরাজের নেতৃত্বে যাত্রা করলো। সঙ্গে চললেন প্রধান সেনাপতি। তাঁকে মহারাজ গোপনে ডেকে আদেশ দিলেন, "যদিও যুবরাজ নেতা, কিন্তু সৈন্যদলের আসল পরিচালক তুমি। যুবরাজ থাকবে

সকলের শেষে। কখনও এবং কোনো অবস্থাতেই তাকে যুদ্ধের মাঝখানে আনবে না। রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা সে। মনে রেখো এই কথা।”

খুব আশা করেই যুদ্ধে এসেছিল নাতুসচন্দ্র। কিন্তু এসে অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে যায়। সৈন্যদলের শেষে তার তাঁবু। তাকে আগে কি হচ্ছে জানতে দেওয়া হয় না। তাঁবুর বাইরেও তার যাওয়া নিষেধ। একদিন মন খারাপ করে বসে আছে সে, এমন সময় তাঁবুর বাইরে ভয়ানক গোলমাল শোনা গেল। একজন চাকর এই সময় তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে তাকে পালাতে বললে। কারণ, শত্রুসৈন্যের আচম্‌কা আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে হবুচন্দ্রের সেনারা পালাতে আরম্ভ করেছে। এখন এখানে থাকলে প্রাণ রাখা যাবে না।

চাকরের কথা শুনে নাতুসচন্দ্র ভাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করে প্রাণ দেবার এই সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার হাতে নিয়ে বাইরে যে ঘোড়াটি ছিল,সেই ঘোড়ায় উঠে তীরবেগে সে ছুটলো শত্রুদের দিকে। রাজকুমারকে মরণ তুচ্ছ করে এইভাবে আক্রমণ করতে দেখে তার সৈন্যরা উৎসাহ আর সাহস পেলো এবং উৎসাহ ও সাহস পেয়ে তারা নাতুসচন্দ্রের অনুসরণ করে ভীমবেগে শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করলো। সেই পাল্টা আক্রমণে শত্রুরা হেরে পালালো। বিজয়ী হয়ে তাঁবুতে ফিরলো নাতুসচন্দ্র মুখ ভার করে। তার গায়ে একটু আঁচড়ও লাগেনি।

সারারাত্রি ঘুম আসে না। খুব সকালে নাতুসচন্দ্র বাইরে এসে দেখে, শত্রুসৈন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। হবুচন্দ্রের সেনারা গতকাল যুদ্ধজয়ের জন্য গভীর রাত্রি পর্যন্ত হৈচৈ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে। তাই তারা জানতে পারছে না যে, শত্রুরা একবার পরাজিত হয়ে আজ আবার এতো সকালে আক্রমণ করতে এগুচ্ছে।

নাতুস ভাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে মরবার আর একটি সুযোগ তার সামনে। তাড়াতাড়ি তাই ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার হাতে নিয়ে একা ছুটলো শত্রুর উদ্দেশে। এবার উত্তরদেশের রাজা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি নাতুসচন্দ্রকে চিনতেন এবং গতকাল তার বীরত্বের কথাও শুনেছিলেন। আজ তাকে এভাবে একাকী আক্রমণ করতে দেখে সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, “যুদ্ধ বন্ধ রাখো। শুধুমাত্র হবুচন্দ্রের ছেলেকে বন্দী করে দুর্গে নিয়ে চলো।”

নাতুসচন্দ্রকে আঘাত না দিয়ে, কৌশলে নিরস্ত্র করে, উত্তরদেশের সেনাপতি তাকে হাজির করলো রাজার সামনে।

উত্তরদেশের রাজা বললেন, “যুবরাজ নাতুসচন্দ্র! আমি তোমার সাহস আর বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছি।”

নাতুস উত্তর দেয়, “আপনি ভুল করে মুগ্ধ হয়েছেন।”

—“তার মানে?”

—"আমার সাহসও নেই, বীরত্বও নেই। আমি মরবার জন্য অস্ত্র ধরেছিলাম মাত্র!"

কেউ তার কথা বুঝতে পারে না। তখন শ্রীমান্ নাদুসচন্দ্রই তার যুদ্ধ করতে আসার ইতিহাস শোনায় সকলকে। শুনে তো সবাই

"মহারাজ, এই বালিকা এতো হাসছে কেন?"

হেসেই অস্থির। দুর্গের মধ্যে মহারাজকুমারীও ছিলেন। এই ঘটনাটা তাঁর কানেও পৌঁছয়। তিনি শুনেই দরবারে এসে হাজির। মহারাজকুমারী যতো নাদুসচন্দ্রকে দেখেন, ততো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসেন। আগে সকলের হাসি সহ্য হচ্ছিল। কিন্তু মহারাজকুমারীর হাসি সহ্য হলো না। রেগেমেগে চিৎকার করে নাদুসচন্দ্র বললেন, "মহারাজ, এই বালিকা এতো হাসছে কেন?"

বালিকাই উত্তর দিলেন, "হাসছি আপনার বোকামী দেখে। আপনি যুবরাজ। পরে রাজা হবেন। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই রাজার ধর্ম। সারা জীবন এই ধর্মপালন করলেই স্বর্গে আপনার চিরস্থায়ী আসন হবে, আর আপনি তাড়াতাড়ি মরলে আপনার কাকার ছেলেই তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বসতে পারবেন।"

তারপর ধীরে ধীরে মহারাজকুমারী নাদুসচন্দ্রকে বোঝালেন যে, পুণ্যসঞ্চয় করবার জন্য অরণ্যে অথবা রণক্ষেত্রে না গেলেও চলে। সংসারে থেকে সৎভাবে জীবনযাপন করলেও অনেক পুণ্য অর্জন করা যায়। যার ফলে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়।

এধারে উত্তরদেশের রাজা হবুচন্দ্রকে খবর পাঠালেন, "হয় তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও, আর না হয় তোমার ছেলের আশা ছাড়ো।"

উত্তরে হবুচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, "আমার আপত্তি নেই। তবে আমার ছেলের নেই তো?"

জবাব দিলেন উত্তরদেশের রাজা, "তোমার নন্দন বলছে, বাবার আপত্তি না থাকলে তার নেই।"

তারপর যথাসময়ে শ্রীমান্ নাদুসচন্দ্রের সঙ্গে উত্তরদেশের মহারাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেল। ফলে, উভয় দেশের মধ্যে শত্রুতা আর রইলো না। দুই রাজ্যের প্রজারা ধন্য ধন্য করলে নাদুসচন্দ্রকে।

উপকারের ইচ্ছা থাকলে

শ্রীরবিদাস সাহারায়

নিজের উপকার নিজে করা হয়তো কঠিন, কিন্তু বন্ধুর উপকার করা বন্ধুর পক্ষে অত কঠিন নয়। অবশ্য যদি বুদ্ধি থাকে, আর যদি ইচ্ছা থাকে।

একটি ছাগল রাজার হাতীশালা থেকে রোজ ঘাস চুরি করে খেতো। হাতীরক্ষক একদিন তা দেখতে পেয়ে ছাগলকে এমন মার মারলো যে ছাগল প্রায় আধ-মরা। বেচারা ধুঁকতে ধুঁকতে উঠোনের পাঁচিলের এক ধারে পড়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পর একটা কুকুর এসে হাজির হলো সেখানে। তারও প্রায় সেই রকম অবস্থা, সে ও ধুঁকছে।

ছাগল সেদিকে তাকিয়ে ভাবলো, কুকুরটাও হয়তো তারই মতো কোথাও থেকে তাড়া খেয়ে এসেছে। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলো—ভাই কুকুর, তোমার কি হয়েছে? এমন করছো কেন?

কুকুর দেখলো ছাগলটাও ধুঁকছে তারই মতো। তাই খুব কৌতুহল হলো তার। সেও জিজ্ঞেস করলো—তোমার কি হয়েছে তাই আগে বলো না?

ছাগল তখন সব ব্যাপার খুলে বললো। সব কথা শুনে, দুঃখে কুকুরের হাসি পেলো। সে বললো—ভাই, আমারও দশা তোমারই মতন। আমি রাজবাড়ির পাকশালা থেকে রোজ মাংস চুরি করে খেতাম। আজ রাঁধুনিটা দেখতে পেয়ে আমাকে এমন মেরেছে যে প্রাণ যাবার যোগাড়!

ছাগল বললো—তা'হলে তো তোমার খুবই মুস্কিল হলো ভাই। আর তো তোমার পাকশালায় যাওয়া চলবে না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কুকুর বললো—আর কি যাওয়া চলে? রাঁধুনি যদি আমাকে আর কখনো দেখতে পায় তা'হলে গায়ের হাড় একটাও আস্তো রাখবে না।

ছাগল দুঃখের হাসি হেসে বললো—আমারও সেই অবস্থা ভাই। দু'জনের দুঃখই সমান। ভাগ্য যখন দু'জনেরই এক রকম, তখন এসে আমরা বন্ধুত্ব করি। একজনের দ্বারা আর একজনের যদি কোন উপকার হয়।

কুকুর ভাবলো, একটা ছাগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আর কি লাভ হবে? তবে বিপদের সময় কেউ না থাকার চেয়ে একজন থাকা ভালো। তাই বললো—আচ্ছা এসো, দু'জনে বন্ধুত্বই করা যাক।

তখন শপথ করে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কথা হলো—কেউ কাউকে বিপদে ফেলে চলে যাবে না, একজন আর একজনকে সাহায্য করবে।

সেদিন মুখ গুজে দু'জন সেখানেই পড়ে রইলো। পরামর্শ করতে লাগলো কি করে তারা বেঁচে থাকবে। রাজার বাড়ির আশেপাশে আর কোন বাড়িও নেই। কাজেই এখান থেকে খাবার যোগাড় করতে না পারলে খুবই মুস্কিল হবে তাদের।

অনেক ভাবতে ভাবতে ছাগলের মাথায় সহসা একটা বুদ্ধি এলো। সে বললো—দেখ বন্ধু, আমি কাল থেকে পাকশালায় যাবো।

কুকুর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—তুমি পাকশালায় যাবে, সেটা কি রকম কথা হলো ?

ছাগল বললো—আমি পাকশালায় গেলে রাঁধুনি আমার ওপর কোন সন্দেহ করবে না। তখন সুযোগ পেলেই এক টুকরো মাংস তোমার জন্য নিয়ে আসবো।

কুকুর বললো—বন্ধু, তোমার বুদ্ধি চমৎকার। কিন্তু তুমি কি খাবে ?

ছাগল বললো—কেন ? তুমি রোজ হাতীশালায় গিয়ে আমার জন্যে কিছু ক'রে ঘাস নিয়ে আসবে।

কুকুর আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে বললো—বন্ধু, আশ্চর্য কৌশল তুমি বের করেছ। হাতীরক্ষক অবশ্যই আমাকে কিছু বলবে না, কারণ আমি তো ঘাস খাইনে। সে একটু আড়ালে গেলেই আমি ঘাস নিয়ে আসবো তোমার জন্যে।

দুই বন্ধু পরামর্শ করে সব কিছু স্থির করে ফেললো। সেদিন খিদে সহ্য করেই রাতটা কাটিয়ে দিল তারা। তাছাড়া আর উপায় কি ? পরদিন থেকেই তারা যার যার কথা মতো কাজ করতে লেগে গেল।

সেই থেকে কোনদিন আর কারুর খাবার অভাব হয়নি। বেশ আনন্দেই দুই বন্ধুর দিন কাটতে লাগলো।

(একটি সিংহলী উপকথা অবলম্বনে রচিত)

"ভারতীয় ছাত্রদের মনে রাখা কর্তব্য যে ভারত ভাবজগৎ। জ্ঞান-গরিমার উৎস। এখান থেকে জ্ঞান-গরিমার বাণী বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।"

—রমেশচন্দ্র দত্ত

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল

উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর মিঃ ফিন্‌লে দু'টি সুদৃশ্য ভেলভেটের বাক্সে হীরা দুটিকে রেখে, রঞ্জত ও লিলিকে সঙ্গে নিয়ে বিখ্যাত হীরক ব্যবসায়ী নিকল্‌সন এণ্ড সন্স-এর দোকানে উপস্থিত হলেন। পূর্ব হতে সংবাদ দেওয়া ছিল বলে নিকলসন সাহেব দোকানেই ছিলেন। তিনি সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর মিঃ ফিন্‌লে তাঁর পকেট হতে একটা বাক্স বার করে মিঃ নিকলসনের সামনে খুলে ধরলেন। হীরাটিকে দেখে খুশি হয়ে নিকলসন সাহেব তাঁর যন্ত্র দিয়ে সেটিকে পরীক্ষা করে বললেন, 'সুন্দর, এটাকে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।'

মিঃ ফিন্‌লে এবার অপর বাক্সটি বার করে তাঁর সামনে খুলে ধরলেন। হীরাটির আকৃতি ও গঠনসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মিঃ নিকলসনের কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। তারপর সেটিকে পরীক্ষান্তে বললেন, 'জীবনে এত হীরা কেনা-বেচা করেছি, কিন্তু এ রকম বৃহৎ, সুন্দর ও নিখুঁত হীরা কখনও দেখিনি। এটা কি বিক্রী করবেন, মিঃ ফিন্‌লে?'

মিঃ ফিন্‌লে বললেন, 'উপযুক্ত দর পেলে দুটোকেই বিক্রী করতে পারি।'

মিঃ নিকলসন বললেন, বড় হীরাখানার বদলে সাত লাখ টাকা দেওয়া যেতে পারে। আর অপরটার জন্য তিন লাখ অর্থাৎ মোট দশ লাখ টাকা আমি দিতে পারি।'

মিঃ ফিন্‌লে মৃদু হেসে বললেন, 'দামটা বড্ড কম করে বলছেন। দুটোর মধ্যে বড়খানার মত হীরা পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। ওটা রাজার মুকুটেই শোভা পাবার যোগ্য। চেষ্টা করলে কেবল ওখানাই বার লাখ টাকায় বিক্রী হতে পারে। কাজেই দুটোর দাম কি করে দশ লাখ টাকা বললেন, মিঃ নিকলসন!'

মিঃ নিকলসন বললেন, 'আপনার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু কত টাকায় বিক্রী হবে, আগে থেকে তা বলা যায় না। আবার যতদিন না বিক্রী হচ্ছে ততদিন টাকাটা আটকে থাকছে, আর ও রকম দামী জিনিস ঘরে রাখারও বিপদ আছে। কাজেই বেশী দাম দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ফলে অনেক দর-কষাকষির পর হীরা দু'খানা বার লাখ টাকায় বিক্রী হ'ল। রজতরা মিঃ ফিন্‌লেকে তাঁর প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে যে পাহাড়ে হীরা পাওয়া গিয়েছিল, সে পাহাড় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কিনে ফেলার জন্য পরামর্শ করতে বসলো।

রজত বললে, 'কেনার দরকার আছে কি? যখন ইচ্ছা হবে তখন ওখানে গিয়ে হীরা নিয়ে এলেই হবে।'

উত্তরে লিলি বললে, 'ড্যাডি যখন জমিটা কেনার কথা বলেছেন, তখন ওটার স্বত্ব নিয়ে পরে গোলমাল হতে পারে—এটাই বোধ হয় তিনি মনে করেছেন। কাজেই জমিটা কিনে ফেলাই ভাল।'

রজত জানতে চাইল, 'তাহলে এ বিষয় ব্যবস্থা করার জন্যে কি করা যায় বলতো?'

লিলি বললে, 'জমি কেনা-বেচা সম্বন্ধে আমার কোন ধারনা নেই। তাছাড়া তোমার যখন নিজেরই জমি হাতছাড়া হচ্ছিল, তখন তোমারও আছে বলে মনে হয় না। এক কাজ কর। এখান থেকে একজন মুহুরীকে নিয়ে চল, লেখাপড়ার ব্যাপার সেই সব করে দেবে।'

লিলির পরামর্শ মত তারা মিঃ ফিন্‌লের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে একজন মুহুরী দিতে অনুরোধ করলো।

লিলি জানালো, তার বাবা রেল লাইনের কাছে খানিকটা জমি কিনে রাখতে ইচ্ছা করেছেন। এখন যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানকার জলবায়ু মোটামুটি ভাল। কাজেই নিজের তৈরী লাইনের পাশে কিছু জমি কিনে সেখানে তিনি বাস করবার ইচ্ছা করছেন। তাই তিনি আমাদের একজন মুহুরী নিয়ে যেতে বলেছেন।

মিঃ ফিন্‌লে বললেন, 'বেশ, কাল তোমরা যখন যাবে, তখন তোমাদের সঙ্গে যাতে একজন মুহুরী যায় তার ব্যবস্থা এখনই করছি।'

পরদিন যাবার সময় কিন্তু মুহুরী পাওয়া গেল না। কি একটা দরকারী কাজে সে আটকা

পড়েছে। দু'চারদিন পরে সে মিঃ পিয়ার্সনের সঙ্গে দেখা করবে—একথা জানিয়েছে। রজতরাও মনে মনে খুশি হ'ল, কারণ মুহুরী যাবার আগে জায়গাটা মোটামুটি দেখে ঠিক করে রাখা দরকার।

রজতরা তাঁবুতে পৌছতে মিঃ পিয়ার্সন তাদের প্রফুল্ল মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে, তারা যে কাজে গিয়েছিল তাতে তারা সাফল্যলাভ করেছে।

মিঃ পিয়ার্সনের ঘরে বসে রজত তার দু'খানা হীরা বিক্রী করা অর্থ টেবিলের ওপর রেখে সমস্ত বিবরণ জানাতে লাগলো। হীরা দু'খানা বিক্রী করে যে এত অর্থ পাওয়া যাবে, তা তাঁদের কারও ধারণায় আসেনি।

মিসেস পিয়ার্সন জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাহাড়ের গুহায় এখনও কত হীরা আছে বলে মনে হয় রজত?'

রজত উত্তরে বললো, 'এ বিষয়ে ঠিক করে বলা খুব শক্ত। তখন উত্তেজনার মুহূর্তে কি দেখেছিলুম তা ঠিক মনে নেই। তবে মনে হয় সেখানে এখনও কয়েক হাজার ছোট বড় হীরা পাওয়া যেতে পারে।'

মিঃ পিয়ার্সন হেসে বললেন, 'এ যে সলোমনের রত্নখনিকে হার মানালে তুমি! এবার জমিটাকে কিনে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।'

লিলি বললে, 'দু'চারদিনের মধ্যে একজন মুহুরী এখানে আসবে, সে ব্যবস্থা মিঃ ফিন্‌লের সঙ্গে আমরা করেছি। ইতিমধ্যে জমিটার অবস্থান ও চৌহদ্দী ঠিক করে একটা নক্সা করে ফেলতে হবে।'

এদের ব্যবস্থায় খুশি হয়ে মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'বা বেশ হয়েছে। কাল সকালে আমরা পাহাড়ে গিয়ে মোটামুটি জরিপ করে আসব। আচ্ছা রজত, টাকাগুলো কি করবে?'

রজত বললে, 'টাকার ব্যাপার আমি কি জানি? ও টাকা আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, তাতে খরচ করবেন।'

রজতের নিঃস্বার্থপরতায় মিঃ ও মিসেস পিয়ার্সন মুগ্ধ হলেন। মিঃ পিয়ার্সন মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, এ টাকা এখন আমার কাছে থাক, পরে ব্যবস্থা করা যাবে।'

লিলি বললে, 'কাফ্রী সর্দার আর তার লোকেদের জন্য কিছু পোষাক আর কয়েকটা মনোহারী জিনিস এনেছি। সেগুলো পেলে ওরা খুশি থাকবে।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'বেশ করেছ। ওদের গ্রামের পাশেই যখন জমি কেনা হচ্ছে, তখন ওদের খুশি রাখা ভাল। আচ্ছা, কৈলাস আর তার বন্ধুর সম্বন্ধে কি করা যায় রজত? ওদের আটকে রেখেই বা কি হবে?'

রজত বললে, 'ওরা আমার অপকার করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে উপকারই করেছে। ওদের ওপর আমার কোন রাগ নেই। তবে ওদের আর এখানে রাখা ঠিক হবে না।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'আমিও তাই স্থির করেছিলুম। ওদের কিছু অর্থ দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

পরদিন প্রাতে মিঃ পিয়ার্সন একদল লোক নিয়ে সেই পাহাড় অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে মিসেস পিয়ার্সন, লিলি ও রজত চললো। পাহাড়টার চারদিকে প্রায় পাঁচশ' একর পরিমিত জমির চতুঃসীমা ঠিক করা হ'ল।

ঐ অঞ্চলের কাফ্রীরা সাহেবদের কার্যকলাপ খুশি মনে লক্ষ্য করতে লাগলো। আগের দিন অপরাহ্ণে মিঃ পিয়ার্সন কাফ্রী সর্দার ও তার অনুচরদের ডেকে এনে খুব চমৎকার এক ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। তারপর বিদায়কালে প্রত্যেককে পোশাক ও নানা প্রকার উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সর্দারের পোশাক এত জাঁকজমক পূর্ণ হয়েছিল যে, সেটা পরিধান করে সে তার মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছিল না। সে পিয়ার্সন সাহেবকে তার বন্ধু বলে স্বীকার করে নিলে।

মিঃ পিয়ার্সন জানতেন, জমি কিনতে হলে উপযুক্ত মালিকের কাছ থেকেই আইনসম্মত ভাবে কিনতে হবে। তবু সর্দারকে খুশি দেখে এ সুযোগ ছাড়তে পারলেন না। যাতে সে কোনদিন তার বিপক্ষে যেতে না পারে সেজন্য বললেন, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে যখন বন্ধুত্বই হ'ল, তখন এখানেই বাস করবো ঠিক করেছি। ঐ পাহাড় অঞ্চলের আশপাশের কিছু জমি আমাকে দান করুন, আমি আপনাকে পঞ্চাশটা সিংহের চামড়া ভেট দোব।'

সর্দার জানতো, জমি এখন তার নয়। তবু যদি অতগুলো দামী চামড়া পাওয়া যায় তো মন্দ কি! বিশেষতঃ এই সাহেবরা তার প্রতিবেশী হলে অন্য কাফ্রীদের শত্রুতা থেকেও তারা রক্ষা পাবে। তাই সে জানালো, 'সাহেব, তোমাকে যখন বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছি, তখন তোমার যেখানে খুশি সেখান ইচ্ছামত জমি নিতে পার।'

সর্দারের অনুচররাও বুঝেছিল, সাহেবরা তাদের প্রতিবেশী হলে তাদের লাভই হবে। তাই তারাও মিঃ পিয়ার্সনদের সঙ্গে থেকে জমি মাপার কাজে সাহায্য করছিল।

তারপর সকলকে নীচে রেখে মিঃ ও মিসেস পিয়ার্সন, রজত ও লিলি পাহাড়ে উঠলেন। মিঃ ও মিসেস পিয়ার্সনকে বাইরে রেখে রজত ও লিলি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট ব্যাগ ভর্তি হীরা নিয়ে বার হয়ে এল তারা।

লিলি বললে, 'ড্যাডি, ওখানে এরকম কত হাজার হীরা যে আছে, তা গুণে শেষ করা যায় না!'

লিলির কথা শুনে আর ব্যাগের মধ্যে আগের মত উজ্জ্বল বহু সংখ্যক হীরা দেখে তার বাপ, মা বিস্মিত হলেন।

মিসেস পিয়ার্সন বললেন, 'রজতকে 'কনগ্র্যাচুলেট' করছি (অভিনন্দন জানাচ্ছি)। তোমার সৌভাগ্যে আমরা আনন্দিত। তুমি এখন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী লোক।' (ক্রমশঃ)

টেপ রেকর্ডার

শ্রীসুনির্মল রায়
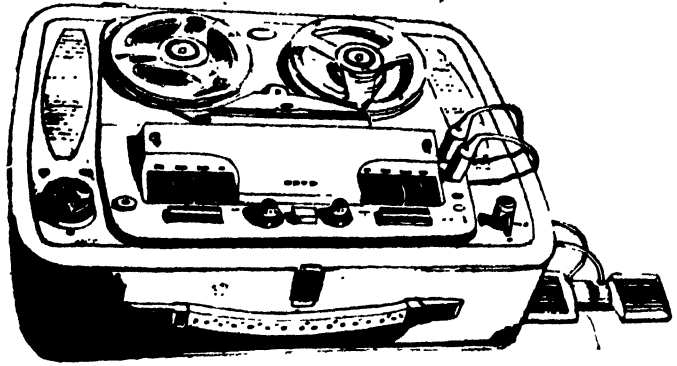
টেপ-রেকর্ডারে তখন বাজছে :

"আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে !
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান
আজিকার কোন রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে ?"

টেপ-রেকর্ডারের সামনে বসে পঁয়ত্রিশ বছরের সুভাষ বোধ হয় খুঁজে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগের ছোট্ট সুভাষকে। তখন সুভাষের আদর কত। বাড়ী-ভর্তি লোক সবারই নয়নের মণি সুভাষ। বাবা-মা'র আদর তো রয়েছেই। তাছাড়া দাদা-দিদিরাও সব সময় সুভাষকে খুশি করতে ব্যস্ত। তাদের বাড়ী সব সময়েই লোকজনে গমগম করত। সুভাষের কাকা থাকত দিল্লীতে। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে হঠাৎ তিনি সুভাষদের বাড়ী বেড়াতে এলেন। সুভাষের সময় বেশ ভাল যেতে লাগল, সারাদিন বসে কাকুর কাছে গল্প শোনে। একদিন সেই কাকুর কাছে বসেই সুভাষ শুনল টেপ-রেকর্ডারের কথা। শুনল ওতে নাকি মানুষের কথাকে ধরে রাখা যায়, পরে সেই ধরে রাখা কথাই মানুষ শুনতে পারে।

কাকু বললেন, এটা আনন্দ উপভোগের একটা উপকরণ হলেও, সাধারণতঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে ও শিল্পে একে ব্যবহার করা হয়। টেলিফোনের কথা বা বার্তা ধরার কোন লোক না থাকলে এর সাহায্যে সে কথা ধরে রাখা হয়। গাড়ী পরীক্ষার জন্য ইঞ্জিনীয়াররা একে বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর শব্দ ধরার জন্য ব্যবহার করেন।

কাকুর কথা শুনে সুভাষের টেপ-রেকর্ডার কেনার দারুণ সখ হ'ল। মেজদা'র কাছে বয়না ধরল টেপ-রেকর্ডার কিনে দিতে হবে। মেজদা পড়লেন মহা ফাঁপরে। তিনি সামান্য

এক কেরানী। কি করে কিনে দিবেন তার আদরের ভাইটিকে টেপ-রেকর্ডার? ওর দাম যে সাতশো-আটশো টাকার কম হবে না! সুভাষও নাছোড়বান্দা। কিনে দিতেই হবে। অতঃপর আর কি করা যায়, সব ভাইয়ের আর বাবা-মা'র জমান টাকার থেকে কিনে দেওয়া হ'ল টেপ রেকর্ডার। টেপ-রেকর্ডার পেয়ে সুভাষ খুশিতে আটখানা। বার বার নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল বস্তুটাকে।

কাকু বুঝিয়ে দিলেন, খুঁটিনাটি অংশগুলো—চাকার মত দুটো জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিস্? দেখ, এর একটাতে গুটানো দড়ির মত জড়ানো রয়েছে পাতলা, অল্প চওড়া প্লাসটিকের বেশ লম্বা একটা অংশ। এই লম্বা দড়ির মত প্লাসটিককেই টেপ বলা হয়। এটা পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরী। এই প্লাসটিকের একটা দিক দেখ বেশ উজ্জল ও মসৃণ। এর অন্য পিঠটা কিন্তু কিছুটা এবড়ো খেবড়ো।

এই প্লাসটিকের পাতটা একটা চাকার থেকে অন্য চাকায় গিয়ে জড়াতে পারে। একটা নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরতে থাকে এই চাকা দুটো। সুভাষ জিজ্ঞেস করল, কিন্তু এতে কথা কি ভাবে ধরা হয়?

কাকু বললেন, এই প্লাসটিকের পাতের অমসৃণ অর্থাৎ এবড়ো-খেবড়ো দিকটাতেই শব্দকে ধরে রাখা হয়। এ দিকটা খুব মিহি আয়রণ অক্সাইডের ধাতব গুঁড়ার প্রলেপে ঢাকা থাকে। এই ধাতব গুঁড়াগুলোকে ছোট ছোট চুম্বকে পরিণত করা যায়। আগে কিন্তু এই বিশেষ ধরণের টেপ ব্যবহার করা হ'ত না। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ডেনমার্কের ইঞ্জিনীয়ার ভল্‌দেমার পোলসেন মোটামুটি শব্দ ধরতে পারে এরকম একটা যন্ত্র তৈরী করেন। তাতে কিন্তু এ ধরণের টেপ ব্যবহার করার বদলে ইলেকট্রিক তার ব্যবহার করা হয়েছিল।

একদিন ঠিক হ'ল সুভাষদের বাড়ীর সকলের কথা টেপ করা হবে। কিন্তু কার কথা আগে টেপ-রেকর্ডারে টেপ করা হবে? সুভাষ তার দাদা ও দিদিদের মধ্যে ছোট্‌দিকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসত। সে বলল, ছোট্‌দির একটা গানই আগে তোলা হোক।

কিন্তু কি করে তোলা হবে? কাকুই পথ দেখালেন—টেপটা ঘুরবার সময় একটা তড়িৎ-চুম্বকের দ্বারা চাপা থাকে। এই তড়িৎ-চুম্বকটা আবার একটা অ্যামপ্লিফায়ার এবং একটা মাইক্রোফোনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

কাকু বললেন, বক্তার কথাকে প্রথমে মাইক্রোফোনে ধরা হয়। মাইক্রোফোনে এই কথা বেতারের ব্যবস্থার মতোই তড়িতে পরিবর্তিত হয়। তারপর এই তড়িৎকে অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করিয়ে তড়িৎ-চুম্বকের উপর ফেলা হয়।

ছোট্‌দির গান আগে তুলতে বলায় ছোট্‌দি তো মহাখুশি। কাকু ছোট্‌দির মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরলেন। বললেন, তুই গান শুরু করলেই আমি সুইচ টিপে দেব। সঙ্গে সঙ্গে টেপ ঘোরা শুরু করবে। আর তোর গানের কথা মাইক্রোফোনে গিয়ে তড়িৎ-এ পরিবর্তিত হয়ে, তা অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়বে তড়িৎ-চুম্বকে। তড়িৎ-চুম্বকের চাপে এবং তার প্রভাবে টেপের উপরের ছোট ও মিহি ধাতুর গুঁড়োগুলো চুম্বকে পরিণত হবে। তোর গানের কথা অনুযায়ী তড়িৎ তৈরী হবে, আর সেই তড়িৎ অনুযায়ী অর্থাৎ গানের কথা অনুযায়ী টেপের গায়ের ধাতুর গুঁড়োগুলো চুম্বকক্ষেত্র তৈরী করবে। এই টেপ-রেকর্ডার যখন বাজান হবে, তখন এই ধাতুর গুঁড়োর চুম্বকক্ষেত্র অনুযায়ী তড়িৎ তৈরী হবে। আর এই তড়িৎ অনুযায়ী শব্দ, অর্থাৎ তোর আগের বলা কথা ফুটে বেরোবে।

এতক্ষণে সুভাষ শব্দ ধরার ও তা বাজাবার কৌশলটা বুঝতে পারে। ছোট্‌দি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল না। ও শুধু কখন গান শুরু হবে তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সে বলল, কাকু তাড়াতাড়ি শুরু কর না।

কাকু তাকে ধমক দিয়ে বলল, অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? মনে রাখবি, টেপ যত জোরে ঘুরবে তত বেশী ভাল কথা ধরা যাবে। গানের সময় টেপটাকে এমন ভাবে ঘোরান উচিত, যাতে সেটা সেকেণ্ডে সাড়ে সাত ইঞ্চি ঘুরতে পারে। কিন্তু বক্তৃতা ধরার সময় টেপটাকে অর্ধেক অর্থাৎ সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি করে ঘোরালেই হবে। আচ্ছা এবারে তোর গান টেপ করা হবে, আমি এই সুইচ টিপলেই তুই গান কর। শুরু করবি, এমন সময় বাড়ীর চাকর হরি বাইরে উনুনে আঁচ দিয়ে উনুন নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সবাইকে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখে, সেও উনুন হাতে সেখানে দাড়িয়ে পড়ল। বস্তুটাকে ভাল করে দেখবার জন্য টেপ-রেকর্ডারের দিকে এগিয়ে গেল।

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, আরে করছিস্ কি? উনুনের তাপ লাগলে তো ওটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

কাকু সবাইকে শান্ত করে বলল—না, বেশী ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ এটার তাপ ও বায়ুর আর্দ্রতা সহ্য করার অনেক বেশী শক্তি আছে। আটাশ ডিগ্রী ফারেনহিট ধ্বনাত্মক তড়িৎ থেকে একশো বাইশ ডিগ্রী ফারেনহিট ধ্বনাত্মক তড়িৎ পর্যন্ত যে কোন তাপ এটা সহ্য করতে পারে।

সবাই আশ্বস্ত হ'ল। কাকু বললেন, এবার শুরু হবে। ছোট্‌দিকে বললেন, রেডি।

ছোট দি বলল, রেডি।

কাকু সুইচ টিপলেন।

হরি চেঁচিয়ে বলল, আরে আরে চাকা দুটো তো ঘুরতিছে বাবু।

হরি দাঁড়িয়েছিল ছোট্‌দির একেবারে পাশে। তাই তার কথা সহজেই মাইক্রোফোনে ধরা পড়ল। আগের মতোই সে কথা অ্যামপ্লিফায়ার ও তড়িৎ-চুম্বকের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ধরা পড়ল প্লাসটিকের টেপে চুম্বকক্ষেত্রের আকারে।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল। তাহলে হরির কথাই আগে টেপে উঠল। ছোট্‌দি তো হরিকে মারে আরকি!

কাকুই তাকে শান্ত করলেন। করে বললেন, ভয় নেই, ওর কথা মুছে তোর গানই আগে টেপে তোলা হবে। এতে আর একটা যন্ত্র থাকে যেটা সুইচের সাহায্যে ঘুরিয়ে, টেপের উপরে হরির কথা অনুযায়ী তৈরী বিশেষ চুম্বকক্ষেত্রকে নষ্ট করে দেওয়া যাবে। এতে টেপ নষ্ট হবে না। এবারে সবাই খুশি হ'ল। বেশী করে খুশি হ'ল ছোট্‌দি।

বাবা, মা, ছোট্‌দি, সবার কথাই একে একে টেপ-রেকর্ডারে ধরা হ'ল। সুভাষ অবৃত্তি করল রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল'।—

"আজি হতে শত বর্ষ পরে।"...

সবার কথা টেপে ধরার পরে অন্য একটা সুইচ টিপে সেই ধরা কথাগুলোকে শোনালেন কাকু। সবাই তো অবাক। আগের কথাগুলো অনুযায়ী যে বিশেষ চুম্বকক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল, সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে টেপ ঘোরা শুরু করল। সেই চুম্বকক্ষেত্র থেকে একই তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্যে তৈরী হ'ল বিশেষ তড়িৎ। সেই বিশেষ তড়িৎ একই অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে বেতারের কথা ধরা যন্ত্রের মতোই গিয়ে ধরা পড়ল লাউড-স্পীকারে—সেই আগের কথা বলা আকারে।

সবাই নিজের নিজের গাওয়া গান, অবৃত্তি, কথা, নিজে নিজে শুনতে পেয়ে খুশিতে হ'ল ডগমগ।

পঁয়ত্রিশ বছরের সুভাষের কাছে মনে হ'ল এ তো বেশীদিনের কথা নয়। তখন তাদের ঘরে একটা শান্ত খুশি খুশি ভাব ছিল। ঘরে ছিল অঢেল শান্তি। তারপর যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! বাবা-মা গেলেন মারা। ছোটদিটাও কোথায় হারিয়ে গেল। দাদারাও কেমন যেন পাল্টিয়ে গেল। সুভাষকে আর কেউ কোন কথা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। বিয়ে করেনি সুভাষ; বোধ হয় এই মেসেই কাটিয়ে দেবে সারা জীবন। সবাই যেন কেমন পর হয়ে গেল। অতীতকে ভোলার চেষ্টা করে সুভাষ। কিন্তু পারে না। কিন্তু সুভাষ এখন দেশের একজন

নামকরা লোক, একজন নামকরা শিক্ষাবিদ, বক্তা ও লেখক। বাবা-মা আজ বেঁচে থাকলে হয়ত কত খুশি হতেন। দাদারা একটু খোঁজ খবর নিতো, এখন আর তাও নেয় না। বাইরের অনেক লোকের সঙ্গেই তার ভাব হয়েছে। তারা হাসি মুখে, মিষ্টি মুখে বলেও অনেক কথা। সুভাষের কিন্তু ওসব ভাল লাগে না একদম। কেন না ও ভাল ভাবেই জানে, এই হাসি ও কথা সবই প্রায় নকল করা, সবই বানানো—কাজ বা সুবিধা আদায় করার উপায় মাত্র। সুভাষকে বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, হাসতে হয়, কিন্তু ভিতরে যে বিষাদের সুরটা সব সময় বেজে চলেছে, সেটাকে তো ও অস্বীকার করতে পারে না। মাঝে মাঝে সুভাষের ইচ্ছা হয় আত্মহত্যা করতে, কিন্তু মরতেও ভরসা হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সন্ন্যাস নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে। ইচ্ছে করে ভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। সবার সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশে যেতে, কিন্তু তাও পারে না। কে যেন ওকে বেঁধে রেখেছে এখানে, তবে কি এখানেই হবে ওর পথের শেষ?

এখন এই টেপ-রেকর্ডারই তার একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু। সে আপাতদৃষ্টিতে সবাইকে হারিয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যেই যেন সে সবাইকে খুঁজে পায়—পায় সবার সান্নিধ্য—সবার মিষ্টি-মধুর গলার আওয়াজ।

স্বপ্নের চড়াই

শ্রীশুভ্রা ঘোষ

জানালার পাখিটাকে যেমনি নড়াই
টুক্ করে উঁকি দেয় ছোট্ট চড়াই—
হাতটা সরিয়ে নিই চমক লেগে—
ও পাশের পাখিটা কি পড়ল জেগে?
অথবা কি মুখ তুলে দাঁড়িয়ে চড়াই
ঠোঁট নেড়ে সাহসের করছে বড়াই?
ওকি ভাবে মনে মনে ভয় পেয়ে গেছি
কিচিমিচি সুরে তাই করে চেঁচামেচি!
এত বড় জীবটার ভয়ের কারণ
খুশিতে দেখায় কী যে ধরণ-ধারণ!
খড়ের কুটোর সাথে বাঁধায় লড়াই
ঘুম-ভাঙা স্বপ্নের আমার চড়াই।

টুং টাং টুং টাং টেলিফোনে পিয়ানোর মিষ্টি গৎ বাজছে তো বাজছেই। তুংকার ঘুম ভেঙে যেতেই গৎ বন্ধ হয়ে ঘণ্টি বাজতে লাগল।

রিসিভার উঠিয়ে তুংকা বলল: "আমি তুংকা, তুমি কে?"

জবাব এলো: "একটু দাঁড়াও এখুনি আসছি।" বলতে বলতেই টেলিফোনের রিসিভার তুংকার হাত থেকে ছিটকে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাল করে চোখ কচলে তুংকা দেখলো স্ট্যাণ্ডের ওপর কালো ওয়েলার ঘোড়া, তার ওপরে কালো রোগা সিঁটকে একটি লোক ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। পরনে মিস কালো স্যুট, প্রকাণ্ড মাথায় কালো গোল টুপি, পায়ে কালো জুতো, সরু সরু কালো প্লাষ্টিকের হাত আর কান, অবিকল টেলিফোনের রিসিভারের মতো।

তুংকা জিজ্ঞাসা করল: "তুমি কে? কাকে খুঁজছো?"

লোকটি চারিদিকে ফের তাকিয়ে: "স্যাভেজ কোথায়—কি করছে?" তুংকা জবাব দিল: "স্যাভেজ এখন মাংস-ভাত খেয়ে আরামে রোদ্দুরে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে।"

লোকটি: "স্যাভেজকে চট ক'রে বেঁধে এসো না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

তুংকা: স্যাভেজ খুব শান্ত কুকুর, কাউকে কিছু বলে না। তাছাড়া গোবিন্দ, যে আমাদের বাড়ীতে কাজকর্ম করে ওকে চেন দিয়ে বেঁধে দিয়েছে।

যেমন এই কথা শোনা লোকটি চট করে ঘোড়া থেকে নেমে এলো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলার ঘোড়া পক্ষিরাজ হয়ে আকাশে উড়ে গেল। লোকটি তুংকাকে বলল: "আমি যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলুম, স্যাণ্ডেজ আমার মুখ চেটে দিয়ে, কান চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। তাই তো তোমার সঙ্গে না দেখা করে চলে যেতে হ'ল।"

তুংকা বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল: "সব বুঝলাম, কিন্তু তুমি তো নিজের পরিচয় দিলে না? কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার আগে নিজের পরিচয় দিতে হয়, তাও বুঝি জান না?"

হাত কচলাতে-কচলাতে লোকটি উত্তর দিল: "স্যরি স্যার, লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান কালা হয়ে এসেছে; আর উত্তর দিতে দিতে বক্ বক্ করা অভ্যাস হয়ে গেছে। মাফ করবেন স্যার।"

চট্ করে হাত বাড়িয়ে তুংকার হাতটা নাড়া দিয়ে বলল: "আসুন স্যার, হাত মিলিয়ে নি, তারপর পরিচয় দিচ্ছি। দাঁড়ান, আগে সব কল ক্যান্সেল করে দি।" এই বলে লোকটি চট্ করে স্ট্যাণ্ডে লাফিয়ে উঠে বলতে লাগল: "হ্যালো, হ্যালো। টেলিফোন—লণ্ডন, ওয়াশিংটন, টোকিও, বোম্বাই, দিল্লী, কলি'র টেলিফোন কলিং, সব কল ক্যান্সেলড্—হ্যালো হ্যালো।"

স্ট্যাণ্ড থেকে ফের লাফিয়ে নিচে নেমে লোকটি বলল: "শুনলেন তো স্যার, আপনার এই অধম সেবকের নাম টেলিফোন। পিতার নাম কলিং বেল। ঠাকুরদা'র নাম টেলিস্কোপ। আদি নিবাস তেলিনিপোতা, বর্তমানে যত্রতত্র অর্থাৎ আমাকে যারা ভাড়া করে তাদের বাড়ী। আমরা তিন ভাই। বড়দাদা টেলিগরম, সব সময়েই ঠাণ্ডা ঘরে থাকেন। ছোটভাই টেলিভিসনের নামে ভয় পাবেন না, স্বভাব খুব ঠাণ্ডা। আমার একটি ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে আছে। আমরা তাকে ডিকটাফোন বলে ডাকি।"

তুংকা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর গ্রামোফোন তোমার কে হয়?"

টেলিফোন: "দাঁড়াও, একটু লজ্জা করে নিই।"

তুংকা: "লজ্জা আবার করা যায় নাকি?"

ইতিমধ্যে টেলিফোন নিজের বুকের কাছে একটা বোতাম টিপে দিতেই দু'গালে দুটো ফিকে গোলাপি আলো জ্বলে উঠল। সলজ্জভাবে টেলিফোন জাবাব দিল: "ইয়ে—গ্রামোফোন হ'ল গিয়ে ডিকটাফোনের মা।"

লজ্জার আভা নিভে যেতেই টেলিফোন বলে উঠল, "এই রে, আজেবাজে কথাতেই কতটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। আমি এসেছি তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে। আজ যে তোমাদের স্কুলের জন্মদিন, ভুলে গেছ নাকি?"

তুংকা : "ভুলবে কেন ? আজ তো সেই জন্যে আমাদের ছুটি। কিন্তু তোমাকে কখন আমি নিমন্ত্রণ করলাম ?"

টেলিফোন : "আজ তোমাদের ছুটি কোথায় ? স্কুলের সব দিদিমণি ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্কুল এখন রত্নাদিদির বাড়ীতে গিয়েছে। আজ জলসা হবে আর আজকের আসরে সভাপতি রত্নাদিদি। দাঁড়াও খবর দিই। রত্নাদিদির ফোন নম্বরটা কি ?"

তুংকা : "৪২২১৯৪। তুমি নিজে টেলিফোন হয়েও তোমার নিজের নম্বর মনে থাকে না ?"

টেলিফোন : "আমার ওপর থেকে তিন লাখ তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ মেট্রিকনির কথা মারতে কত সময় লাগতো বলো তো ? আর তুমি কত শীগগির নম্বরটা দিয়ে দিলে ?" এই বলে টেলিফোন গোল টুপিটা খুলে ফেলতেই তুংকা দেখতে পেল, টেলিফোনের মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা ডায়াল। টেলিফোনের ডায়ালটা বন বন করে ঘুরতে লাগলো। তুংকার মনে হ'ল যেন তার মাথা ঘুরছে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তুংকা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

(ক্রমশঃ)

দেশবন্ধু স্মরণে

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

মানুষের মত মানুষ হতে
　　যে সাধনা প্রয়োজন,
সেই সাধনায় ব্রতী ছিলে তুমি
　　হে চিত্তরঞ্জন।
দেশের দুঃখে বিগলিত প্রাণ
　　বিলাস-ব্যসন ত্যজি,
আর্তজনের সেবায় মাতিলে
　　ফুল-ভরা যেন সাজি।

কুসুমের মত কোমল হৃদয়
　　কর্মে বজ্রবীর,
পরাধীনতার শিকল ছিঁড়িতে
　　হয়েছিলে অস্থির।
দেশের মুক্তি দশের সেবায়
　　তোমার অশেষ দান,
"দেশবন্ধু"র নামেতে হৃদয়ে
　　তোমার অধিষ্ঠান।

প্রকৃতির খেলনা রেলগাড়ী

শ্রীতৃপ্তি রায়

রহস্যময়ী প্রকৃতির এক অভিনব আবিষ্কার খেলনা রেলগাড়ী। সম্প্রতি এই অপূর্ব জীবটির সন্ধান পাওয়া গেছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ক্যালিফোর্নিয়া নামক জায়গাটির চায়না-লেক অঞ্চলে। বছরের একটি বিশেষ সময়ে এই জীবন্ত রেলগাড়ীগুলির আবির্ভাব ঘটে রাত্রির অন্ধকারে মাটির ওপরে। অন্য সময়ে এদের দর্শন পাওয়া যায় না, কারণ এরা লুকিয়ে থাকে মাটির অভ্যন্তরে।

জীবজগতে পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গুবরেপোকা জাতীয় এক ধরণের পোকা আছে, যার বৈজ্ঞানিক নাম "ফ্রিক্সোথ্রিক্স" (Frixothrix)। এরা 'ফেঙ্গোডিডি' (Fengodidae) পরিবারভুক্ত। এদের সাধারণভাবে বলা হয় 'বিটল্' (Beetle)। এই বিশেষ বিটলগুলির শুককীট অর্থাৎ লার্ভাগুলি (Larva) জোনাকির মতো মৃদু ও নরম আলো বিকীরণ করে। লার্ভাগুলি দেখতে অনেকটা ঠিক রেল পোকার মতো, মেটে মেটে রঙের এবং ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা। পায়ের সংখ্যা অনেক, এই কারণে এদের সহস্রপদ (Multiped) বলা হয়।

এই লার্ভাগুলি চলার পথে কোন বাধা পেলে মাথার সামনে দপ্ করে জ্বলিয়ে দেয় এক-জোড়া লাল টকটকে আলো—'হুঁশিয়ার'। বাকী শরীরে জ্বলে ওঠে ১১ জোড়া সবজে হলুদ আলোকবিন্দু, যেন "জনতা-ভর্তি ট্রেনের সারিবদ্ধ কামরা"। অজানা বাধাকে ভয় দেখায় আর আত্মরক্ষা করে এরা এইভাবে। লার্ভাগুলি আবার একেকটি আলো আলাদা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এই অদ্ভুত রেলগাড়ীগুলি একটি পোকার জীবনের একটি ধাপ (Stage) মাত্র। কিছুদিন পরেই এগুলি রূপান্তরিত হয় গুটিপোকায়। গুটি থেকে নির্দিষ্ট দিনে বেরিয়ে আসে পূর্ণাঙ্গ বিটল্।

স্ত্রী বিটলগুলি কিন্তু মোটামুটি তাদের লার্ভারূপই গ্রহণ করে এবং মাটিতে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। পুং বিটলগুলি গ্রহণ পূর্ণ বিটল্ রূপে। মিলনের সময় স্ত্রী বিটল্গুলি মাটির ওপরে উঠে আসে এবং একাধিকবার মিলিত হতে পারে। অন্যদিকে পুরুষ বিটলগুলি একবার মিলনের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিলনের সময় স্ত্রী বিটলগুলির শরীর থেকে এক ধরণের মৃদু গন্ধ উৎসারিত হয় এবং পুরুষ বিটলদের আকৃষ্ট করে। পুরুষ বিটলগুলি মৃদু আলো বিচ্ছুরিত করে জোনাকি পোকার মতো দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। স্ত্রী পোকাগুলি একবারেই একসঙ্গে ছোট ছোট ডজন তিনেক সাদা সাদা ডিম পাড়ে।

প্রাণী-জগতে আলোক উৎপাদন সম্বন্ধে আমরা অনেক দিন অবহিত হলেও, ঠিক কিভাবে

এই আলো উৎপাদিত হয় তা অজানা ছিলো বহুদিন। সবচেয়ে প্রাচীন বা আদিম প্রাণী থেকে মৎস্য শ্রেণী পর্যন্ত সব শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই আলোক উৎপাদন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিশেষ ধরণের তাপহীন আলোকে বলা হয় 'ফসফোরেসেন্স' (Phosphorescence)। বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর জানা গেছে যে, জীবকোষে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়— 'লুসিফেরিন' (Luciferin) নামক একটি পদার্থের 'লুসিফেরেজ' (Luciferase) নামক একটি 'এনজাইম' (Enzyme) দ্বারা জারণের (Oxidation) ফলে। এই জারণের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয় নয়নমনোহর আলোটি। কিন্তু রেলগাড়ী-পোকা কি উপায়ে বিভিন্ন রঙের আলো প্রস্তুত করে, তা আজও অজানা। এই ধরণের জীবকোষ দ্বারা উৎপাদিত আলোর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে 'জোনাকী' পোকার আলো। অনেকেই হয়তো সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার মুখে দেখেছেন এক অপূর্ব নীলাভ সাদা আলোর রেখা। এই ধরণের আলোকে বলা হয় 'বায়োলুমিনেসেন্স' (Bioluminescence)।

ভাইফোঁটার দিন

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

ভাইয়ের কপালে দিলেম ফোঁটা
দিলেম ফোঁটা দাদার ভালে
এমন দিনের এমন ফোঁটা
ভুলবে না কেউ কোনকালে।

দিদির ফোঁটা, বোনের ফোঁটা
শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা
ভালোবাসার মনের ফোঁটা
শুধুই তা তো নয় কপালে।
প্রীতির তানে জীবন-গানে
বাজছে যে তা তালে তালে।

সকাল কিংবা বিকেল বেলা
আজকে তো নয় কোনই খেলা
আজকে শুধুই প্রীতির মেলা
দিনের মধ্যে সেরা সে দিন।

বছর ঘুরে আসবে বছর
বাজবে একটা দিনেরই স্বর
বোনের কাছে ভাইয়ের আদর
মধুর সে যে আনন্দ-বীণ।

যমের দুয়ারে দিলেম কাঁটা
কাঁটা দিলেম যমের দ্বারে
কেন এমন বুকের পাটা
কেই বা তাহা বুঝতে পারে।
ভাই যে আমার, আমারই ভাই
জগতে তার তুলনা নাই
যমের মতো অমর সে হোক
অনন্তকাল মৃত্যুহীন।
জ্বালুক সবার অন্তরলোক
আনন্দেরই বাজুক বীণ।
মধুরতার ছন্দে গাঁথা
আজকে তাইতো সুবর্ণ-দিন।

কাজের মাঝেই সারা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নথিপত্র উলটে একটি মোটা বই নিয়ে এক মনে কয়েকটি পাতা পড়ে চলেছিলেন নামজাদা উকিল শ্রীহরিশঙ্কর মজুমদার। কেস হাতে থাকলে উকিল বাবুর সঙ্গে বাইরের জগতের কোন সম্পর্ক থাকে না, সম্পর্ক থাকে শুধু কাগজ, কলম, লাল-নীল পেনসিল আর আইনের মোটা মোটা কেতাবের। বাড়ীতে কেউ দেখা করতে এলে অবশ্য তিনি কাজ করা বন্ধ করে খানিকটা কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তাহলেও মনের মধ্যে তাঁর তোলপাড় চলে কেসগুলি অর্থাৎ সে-সব কেস কি ভাবে লড়তে হবে সেই বিষয়ে। তাই অনেক সময় সকলের সব কথা তাঁর কানে যায় না এবং বেশ বোঝা যায়, অনেক কথার জবাব নেহাতই আন্দাজে দিয়ে থাকেন তিনি।

সেদিনও সন্ধ্যা বেলা এমনি কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন উকিলবাবু, এমন সময় তাঁর ঘরে ঢুকলেন শ্রীঅমূল্য ঘোষ। অমূল্য ঘোষও একজন নামকরা উকিল, তবে হরিশঙ্কর বাবুর মত নন এবং বয়সেও তিনি হরিশঙ্কর বাবুর চেয়ে কিছু ছোটো। তিনি আজ হরিশঙ্কর বাবুর বাড়ী এসেছেন তাঁর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

অমূল্যবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, "দাদার যে দেখছি, কোর্ট বাদে এই ঘর ছাড়া আর কোনো জায়গা নেই।"

হরিশঙ্করবাবু একটু হেসে বললেন, "কী আর করি বল?"

অমূল্যবাবু বললেন, "শুনুন, আমার বড় ছেলের বিয়ে, বৌভাত আসছে মঙ্গলবার, আসা চাই।" বলে একটি নেমন্তন্ন পত্তর হরিশঙ্কর বাবুকে দিলেন।

হরিশঙ্কর বাবু সেটি নিয়ে টেবিলের এক পাশে রেখে বললেন, "আবার পত্তর কেন, যাবো তো নিশ্চয়ই, তোমার ছেলের কত বয়েস হলো?"

অমূল্যবাবু তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন। কিন্তু জবাব শেষ হতে না হতেই মোটা বইটার যে জায়গাটা পড়ছিলেন, তিনি সেই জায়গাটা দেখিয়ে অমূল্যবাবুকে বইটা দিয়ে বললেন, "একবার পড়ো তো ভাই জায়গাটা, আর দ্যাখো তো এই পয়েন্ট্‌টার ঠিক জবাব হচ্ছে কিনা।" বলে তাঁর নথিপত্রের লাল দাগ দেওয়া একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

অমূল্যবাবু কিছুটা সময় দেখলেন এবং তারপর বললেন, "ঠিকই তো মনে হচ্ছে।"

আর যায় কোথায়! হরিশঙ্করবাবু এইবার আনন্দে উথলে উঠে বললেন, "আচ্ছা ভাই, বাঁদিকের শেলফটা থেকে ঐ কালো বইটা পাড়ো তো, তারপর ১২৩২ পাতায় দ্যাখো, ঠিক একই ব্যাপার কিনা।"

অমূল্যবাবু হরিশঙ্করবাবুর নির্দেশ মতো বইটি দেখছিলেন, এমন সময় অমূল্যবাবুর ড্রাইভার

এসে জানালে যে, গাড়ীতে যাঁরা আছেন তাঁরা বলছেন, তাড়াতাড়ি করতে; কারণ অনেক জায়গায় যেতে হবে। কাজেই অমূল্যবাবু "আচ্ছা দা দা আসি, যাবেন কিন্তু।" বলেই বিদায় নিলেন।

অমূল্যবাবু বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে হরিশঙ্করবাবু হাঁক দিলেন, "তিনকড়ি।" তিনকড়ি তাঁর মুহুরী। তিনকড়ি পাশেই কোথায় ছিলো, বাবুর ডাকে সামনে এসে বললে, "কী বলছেন?" তিমকড়ি আসতে তার হাতে অমূল্যবাবুর নেমন্তন্ন পত্তরটি দিয়ে

অমূল্যবাবু একটি নিমন্ত্রণপত্তর হরিশঙ্করবাবুকে দিলেন। পৃঃ৩৬৪

উকিলবাবু বললেন, "ঠিক দিনে মনে করিয়ে দেবে, বুঝলে।"

তিনকড়ি "আচ্ছা" বলে পত্তরটি নিয়ে চলে গেলো।

তারপর এলো সেই নেমন্তন্নের দিন। যদিও তিনকড়ির নেমেন্তন্ন ছিলো না, তবুও তিনকড়িকে সঙ্গে নিলেন হরিশঙ্করবাবু—ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে যে বড় বাড়ী ভাড়া করেছেন অমূল্যবাবু তা ঠিক চেনবার জন্যে।

তাঁর বাড়ী চিনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। বিয়ে বাড়ীর সামনে গাড়ী আসতে হরিশঙ্করবাবু নেমে গেলেন। ড্রাইভার আর তিনকড়ি গাড়ীতে বসে রইলো।

সাধারণতঃ বিয়ে বাড়ীতে হরিশঙ্করবাবুর খুব বেশী দেরি হয় না, কারণ নেমন্তন্ন বাড়ীতে কদাচিৎ তিনি সকলের সঙ্গে বসে খান। আজ কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, তবুও হরিশঙ্করবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

গাড়ীতে বসে বসে ক্রমশঃ ড্রাইভার আর তিনকড়ি যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, তখন ড্রাইভারকে বিয়ে বাড়ীতে ঢুকে খোঁজ করতে পাঠাল তিনকড়ি। খানিকটা পরে ড্রাইভার এসে জানাল যে, বাবু অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

ড্রাইভারের কথা তিনকড়ির বিশ্বাস হয় না। সে তাই নিজেই এবার বাবুর খোঁজ করতে এগিয়ে যায়। একটু এগুতেই তিনকড়ির দেখা হয় অমূল্যবাবুর মুহুরী কেদারের সঙ্গে।

কেদার তিনকড়িকে খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করে, কিন্তু তিনকড়ি বলে, "না, না, আমি এসেছি বাবুর খোঁজ করতে—বাবু কোথায়?"

কেদার বলে, "কেন, অনেকক্ষণ তো চলে গেছেন।"

তিনকড়ি আশ্চর্য হয় বলে, "চলে গেছেন! কার সঙ্গে?"

কেদার বললে, "বিনয়বাবু আর উনি তো এক সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।"

তিনকড়ি বললে, "সে কী. ওঁর নিজের গাড়ীতে তো ওঠেন নি!"

এরপর বিনয়বাবুকে টেলিফোন করতে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, একটা আইনের তর্ক করতে করতে আমার সঙ্গে গাড়ীতে চলে আসেন, আর আমি ওঁকে ওঁর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে এসেছি!" তারপর একটু থেমে বিনয়বাবু বললেন, "উনি যে ওঁর গাড়ীতে এসেছিলেন তাতো বললেন না, তাই ভাবলুম অন্য কারুর সঙ্গে হয়ত এসেছিলেন, আর আমি যাচ্ছি দেখে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন!" বলে উনি বেশ খানিকটা হাসতে লাগলেন।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত কেদার, তিনকড়ি আর হরিশঙ্করবাবুর ড্রাইভারকে খাওয়াবার বন্দোবস্ত করে।

ঠাকুমা

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুমা বুড়ি, থুড়থুড়ি ঐ
শনের নুড়ি চুল,
হাড়ের পরে চামড়াগুলো
ঝুলছে দোদুল দুল।

ধুকপুকে বুক স্বর সরে না
দাঁত নেইকো মুখে,
চোয়াল দুটো গেছে ভেঙে
আছেই বড়ো সুখে

সংসারেতে সং সেজে তাঁর
মিটেই গেছে সাধ,
থাকেন দূরে, পাছে কেহ
ঘটায় পরমাদ।

মেঠুড়ে

অ্যাটলান্টায় সদ্য সমাপ্ত মুষ্টিযুদ্ধে জোরি কোয়ারির বিরুদ্ধে কেসিয়াস ক্লে টেকনিক্যাল নক আউটে জয়ী হয়েছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাদের তালিকায় বর্তমানে ক্লের স্থান তৃতীয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাদের শীর্ষস্থানে আছেন জো ফ্রেজিয়ার। ফ্রেজিয়ার পঁচিশটা লড়ায়ের ভেতর বাইশটাতে নক আউট বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর পয়েণ্টের সংখ্যা ৮৮০। ফ্রজিয়ারের পর স্থান পেয়েছেন রকি মার্সিয়ানো—জোরালো ঘুষির জন্যে, যিনি 'ব্রুকটন ব্লক বাস্টার' নামে পরিচিত। মার্সিয়ানো উনপঞ্চাশটা লড়াইয়ের ভেতর তেতাল্লিশটাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক আউট করেছিলেন। মার্সিয়ানোর পয়েণ্টের সংখ্যা ৮৭৮। তৃতীয় স্থান অধিকারী কেসিয়াস ক্লের পয়েণ্টের সংখ্যা ৮০●। তিরিশটা লড়াইয়ের ভেতর ক্লে নক আউটে বিজয়ী হয়েছেন চব্বিশটা লড়াইয়ে। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত জো লুই যেহেতু নক আউটে বিজয়ী হয়েছেন, কমবার সে জন্যে পেয়েছেন চতুর্থ স্থান ৭৬১ পয়েণ্টে। জীবনের একাত্তরটা মুষ্টিযুদ্ধে জো লুই চুয়ান্নটাতে নক অউটে বিজয়ী হয়েছেন। সোনি লিষ্টন একান্নটার ভেতর ছত্রিশটাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূতলশায়ী করায় ৭০৬ পয়েণ্ট পেয়ে পঞ্চম স্থানে আছেন।

তৃতীয় স্থানে থাকলেও কেসিয়াস ক্লের শীর্ষস্থান পেতে যে বেশী দেরি হবে না, সাড়ে তিন বছর পরে জোরি কোয়ারীর সঙ্গে তাঁর লড়াই থেকে আভাস মিলেছে। পনের রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ের তৃতীয় রাউণ্ডেই ক্লের মুষ্টাঘাতে কোয়ারী জর্জরিত হন। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। কোয়ারীর অসহায় অবস্থা দেখে রেফারী লড়াই বন্ধ করে দিয়ে ক্লেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

টেলিভিশনে কোয়ারীর সঙ্গে ক্লের লড়াই দেখে বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই বলেছেন: ক্লের ঘুষির জোর আরও বেড়েছে। আমরা দেখছি তাঁর মনের জোরও আরো বেড়েছে।

ফুটবল:

দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে চারবারের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী মহীশূরকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ফেভারিট পাঞ্জাব এ বছর জাতীয় ফুটবলে জয়ী হয়েছে।

কয়েক বছর থেকেই পাঞ্জাব ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, লীডার্স ক্লাব এবং শিখ রেজিমেন্টাল সেণ্টার দলের ক্রীড়ানৈপুণ্যই তার প্রমাণ। জাতীয় ফুটবল জয়ের উপযোগী করে পাঞ্জাবকে গড়ে তুলেছেন খ্যাতনামা খেলোয়াড় জারনেল সিং। শুধু গড়ে তোলেন নি, নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্তও করেছেন।

সার্ভিসেস, রেলওয়ে এবং উনিশটা রাজ্য দল—মোট একুশটা দল এ বছরের জাতীয় ফুটবলে অংশ গ্রহণ করে। ডাবল লেগের সেমি ফাইনাল এবং অমীমাংসিত খেলা নিয়ে প্রথম দিনের ফাইনাল পর্যন্ত মোট ছাব্বিশটা খেলা হয়। এই ছাব্বিশটা খেলায় গোল হয়েছে একাশিটা।

গতবারের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা এবার সেমিফাইনালে পাঞ্জাবের কাছে পেনাল্টি কিকের নতুন নিয়মে হার স্বীকার করে। ডাবল লেগের সেমিফাইনালে বাংলা ও পাঞ্জাবের খেলা প্রথম দিন গোলশূন্য ও দ্বিতীয় দিন ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর, পেনাল্টি কিক দিয়ে খেলার জয়-পরাজয় মীমাংসা করা হয়। প্রথম পাঁচটা কিকের ভেতর পাঞ্জাব চারটে থেকে এবং বাংলা দুটো থেকে গোল করায় চূড়ান্ত ফলাফল হয় পাঞ্জাবের পক্ষে ৫-৩।

সেমিফাইনালে মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের দু'দিনের খেলাই হয় আকর্ষণীয়। প্রথম দিন মহীশূর দুটো গোল করে, বিরতির সময় ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা সত্বেও মহারাষ্ট্র দ্বিতীয়ার্ধে দুটো গোলই শোধ করে দেয়। দ্বিতীয় খেলায় মহারাষ্ট্রই প্রথম গোল করে এগিয়ে থাকে। মহীশূর গোল শোধ করে এবং শেষ সময়ে করে জয়সূচক গোল।

সাঁতার:

কয়েক দিন আগে বাঙ্গালোর জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। পয়েন্টের সামগ্রিক সংগ্রহে বাংলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও, মহারাষ্ট্র যেখানে পেয়েছে ২৮৫ পয়েন্ট বাংলা সেখানে পেয়েছে ১৬৮। তফাৎ অনেকখানি। বড় কথা হ'ল: জাতীয় সাঁতারের পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট আঠারোটা বিষয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হলেও, বাংলার নামের পাশে কোন রেকর্ড নেই।

জাতীয় সাঁতারে এবার সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের সপ্তদশী সাঁতারু গ্রিনিস হালমে। মহিলাদের আটটা স্বর্ণপদকের মধ্যে হালমে পেয়েছেন সাতটা স্বর্ণপদক—তিনটে বিষয়ে নতুন রেকর্ডের কৃতিত্ব সমেত। হালমে ছাড়া আর একজন মহিলাও এবারের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হলেন টিনও থাটার্ড। থাটার্ডও মহারাষ্ট্রের মেয়ে এবং তাঁরও বয়েস সতেরো। থাটার্ডও ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে আর ৪০০ মিটার ইনডিভিজুয়াল মেডলে রিলেতে নতুন রেকর্ড করেছেন।

সার্ভিস দলের সাঁতারু মহীন্দার সিং রাণাও সমান কৃতিত্বের অধিকারী। রাণাও ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রেকর্ড করেছেন।

জাতীয় সাঁতারে আঠারো বিষয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি অবশ্যই সাঁতারে আমাদের অগ্রগতির পরিচয়।

খুঁজে বার করো

ডিউক অব হুগল্যাণ্ড ছেলেমেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে খাবারদাবার টেবিলে সাজিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই একজন বিশালকায় রেড ইণ্ডিয়ান এসে দাঁড়াল তাঁদের টেবিলের সামনে। তাকে দেখেই ডাচেস ও দুই ছেলেমেয়ে ভয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো জঙ্গলের মধ্যে। ডিউকও ভয় পেয়ে গিয়ে শেষে বাইবেল পড়তে লাগলেন। কিন্তু ওরা তিনজন জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকোল, তোমরা খুঁজে বার করতে পারো কিনা দেখ।

শ্রীবিনয় বাগচী

বৃত্ত ও সংখ্যার খেলা
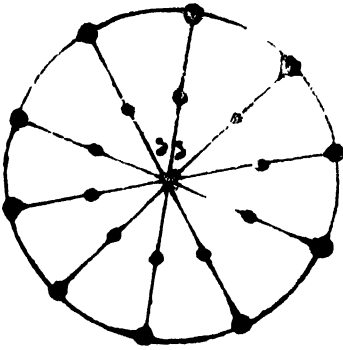
১। পাশের বৃত্তটির পাঁচটি ব্যাস। প্রতি ব্যাসে পাঁচটি করে সংখ্যা হবে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ১১, তাহলে বাকি ২০টি সংখ্যা এমন হিসাব করে বসাতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি ব্যাসের সংখ্যা পাঁচটির যোগফল ৫৫ হবে, কিন্তু এক সংখ্যা একাধিকবার বসবে না।

বর্গক্ষেত্রের অঙ্ক

২। পাশের বর্গক্ষেত্রটির চিহ্নিত স্থানগুলিতে এমন এক একটি সংখ্যা বসাও যাতে প্রতিটি বাহুরই সংখ্যা চারিটির যোগফল ছাব্বিশ হয়। এক সংখ্যা একাধিকবার বসবে না।
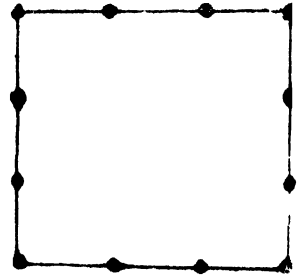
৩। অর্ধেক কঠিন তার অর্ধেক তরল,
চারটি অক্ষরে গড়া অতিব শীতল,
মাথায় পড়িলে তাহা ঘটে রসাতল।

শ্রীতাপস রায়

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। ভারতবর্ষ ২। আখ ৩। নাচা ৪। গোবর ৫। দেবতা ৬। হাজর
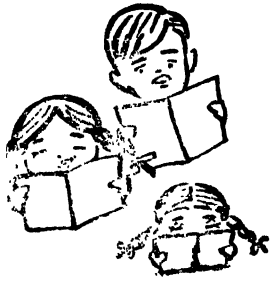
বিধাতার পরিহাস

নীলাঞ্জন ফিরে এসেছে বাড়ীতে। সমস্ত বাড়ীতে আনন্দের ঢেউ উঠেছে। মেনাক আজ কালেজ থেকে এসেছিল। নীলাঞ্জনের কাঁধে হাত দিয়ে বলে গিয়েছে যে, "নীলু, পুজোর ছুটি হবার আগেই তোকে কলেজে যেতে হবে কিন্তু।" সেজকাকুও দিল্লী থেকে এসেছিলেন। বৌদিও ভারী খুশি। দিদিও শ্বশুরবাড়ী থেকে এখানে এসে রয়েছেন কয়েক দিন। সত্যি ভীষণ আনন্দ হচ্ছে নীলাঞ্জনের।

আজ কলেজের একটি উৎসবের দিন। আজই গান করতে হবে তাকে। অশোক, অমিয়, সতু ওরা তো স্পষ্টই বলেছে, "নীলু নিশ্চিন্ত থাক, এবার রবীন্দ্র-সংগীতে তুই ফার্ষ্ট হবি।"

উৎসব শেষ হয়েছে, এবার পুরস্কার বিতরণ। নীলাঞ্জনই রবীন্দ্র-সংগীতে প্রথম হয়েছে। মইকে নাম এনাউন্স করা হচ্ছে। ধীর পদক্ষেপে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায় —তুলে নেয় প্রথমাধিকারীর পুরস্কার। উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে সহস্রের করতালিতে।

ঘুম ভেঙে গেল নীলাঞ্জনের। চোখ খুলেই দেখতে পেল, সে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। এতক্ষণ যা সব দেখছিল, সবই স্বপ্ন। বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হতে লাগলো তার। সে তো জানে, সে আর কোনও দিনও ভাল হবে না। তবু কেন সে ভাবে যে, সে আবার ভাল হয়ে যাবে? যেদিন বাবা কলকাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে বাবার কানে কানে কি সব বলেছিলেন, আর বাবার মুখটা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলো। সেদিনই তো সে বুঝেছিল যে তার খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। এরপর ক্যান্সার হাসপাতাল। তারপর সেখানেই তার থাকবার ব্যবস্থা করা হ'ল। ভাবতে অবাক লাগে, গলার একটা ছোট্ট কালো দাগ কি ভয়ানক—কেড়ে নিয়েছে তার বাঁচবার অধিকারটুকু!

ধীরে ধীরে বাড়ীর লোকের আসা-যাওয়াও কমে যেতে লাগলো। এখন শুধু আসেন মা। অনর্গল চোখের জল ফেলতে ফেলতে মিথ্যা আশ্বাস দেন তাকে—"নীলু তুই ভাল হয়ে যাবি।" নীলাঞ্জন বুঝতে পারে, এই আশ্বাসের কোনও অর্থ নেই। মায়েরা যেমন তাঁর বড় আদরের সন্তানের মৃতদেহকে চুম্বন করতে করতে বড় আশায় বলেন, "তুই আবার আমার হবি",—ঠিক তেমনি এই মিথ্যা আশ্বাস—"নীল তুই ভাল হয়ে যাবি।" কিছুক্ষণ পরেই মা উঠে যান। ক্যান্সার রুগীগুলোর অসহনীয় যন্ত্রণা আর কাতরানি সহ্য করতে পারেন না তিনি।

নীলাঞ্জন জানে সে আর ভাল হবে না, কোনদিনও বাড়িতে ফিরে যাবে না।
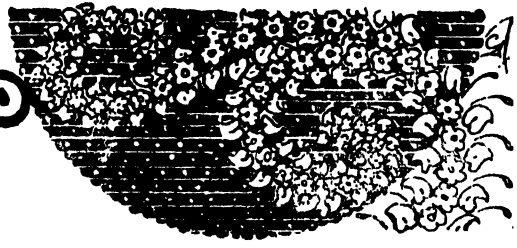
তোমরা তো এখন পরীক্ষা দিতে সমর্থ হওয়া আর না হওয়ার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছ। পরীক্ষা হয়ে গেলে মন কত হালকা হয়ে যায়। তবু তোমাদের দিকে তাকিয়ে মনে এই কথা বলি—পরীক্ষা নির্বিঘ্ন হোক।

তোমরা নিশ্চয় জানো এবছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৫০ তম ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শততম জন্মবর্ষ পূর্তি শুরু হয়েছে। এই দুটি নামের সঙ্গে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচয় হয় তোমাদের, তবে ভাল করে জানতে হলে ভাল করে পড়তে হবে—জানতে হবে বৈকি!

১৮২০ সাল। ইংরেজ সাম্রাজ্য তখন পাকাপোক্ত ভাবে ভারতের মাটিতে তার আসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে—রাজপুত, শিখ, আফগান, মারাঠী, মহীশূর—একে একে সকলেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতের রাজনীতিতে সেদিন কি গভীর হতাশার যুগ। রাজনৈতিক তমসা যখন আচ্ছাদিত করে রয়েছে ভারতভূমি, সেই যুগেই আবির্ভূত হলেন একের পর এক ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানরা—তাদের পুরোভাগে রামমোহন। রামমোহন যে দীপ প্রজ্জ্বলিত করে গেলেন, তারাই শিখায় সার্থকতম রূপে আলোকিত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিসত্তা। শৈশব ও বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছিল প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে। অনন্যসাধারণ প্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটির বয়স যখন উনিশ বছর—'বিদ্যাসাগর' রূপে সে যুগের পাণ্ডিত্যের শীর্ষস্থানটি অবলীলাক্রমে করায়ত্ত করে নিলেন—সেদিনও তাঁর সংগ্রামের অবসান ঘটেনি। প্রতিকূল ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-জয়ী পুরুষটি এবার সংগ্রাম ঘোষণা করলেন অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সামাজিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে। পরের দুঃখ দেখে যাঁর অন্তর উচ্ছলিত হ'ত মাতৃহৃদয়ের স্নেহধরায়, সেই মানুষটি ক্ষমাহীন

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখার শেষাংশ)

হঠাৎ অসহ্য চিৎকার শুনে চারিদিকে তাকায় সে। তিনতলা থেকেই বেশ দেখা যাচ্ছে, একতলায় একটা রুগী মারা গিয়েছে আর তার আত্মীয়-স্বজনরা চিৎকার ক'রে কাঁদছে।

পাশ ফিরে শোয় নীলাঞ্জন। কালো দাগটায় অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে, চোখ দুটো বোজে সে—শুনতে পায় কুটিল মৃত্যুর ভয়াবহ ধীর পদক্ষেপ।

শ্রীমিতা বসু

ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। পোশাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি বাঙ্গালী, স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু সমাজদেহের আধি-ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ, ধর্মের নামে অধর্মের প্রশ্রয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানবতার বিরোধিতা—এসবের বিরুদ্ধে আজীবন চালনা করে গিয়েছেন আপোষহীন সংগ্রাম। একদিকে তিনি দীনের বন্ধু, করুণার সাগর, অন্যদিকে তিনিই দুর্জয় পুরুষসিংহ। যা সত্য বলে জানতেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাধনা করে গিয়েছেন আমরণ। বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়েছে, আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়, তবুও পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে গেছেন বিনা দ্বিধায়। সরকারী কাজ-কর্মে লিপ্ত থেকেও গভীর নিষ্ঠা নিয়ে করে গেছেন সাহিত্যের সেবা। বাংলা-সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরিপূর্ণ সার্থকতায়। প্রাচীন আর বিদেশী সাহিত্য থেকে রত্ন আহরণ করে মাতৃভাষাকে করে গেছেন সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছেন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। স্ত্রীজাতির সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। ভাবতে বিস্ময় লাগে, কত ভাবে বহুমুখী প্রতিভা আর দরদী মনের স্বাক্ষর অঙ্কিত করে গিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে।

তাঁর পুণ্য-স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর মনে। ১৫০ তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মানুষের অন্তরে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় আর ভালোবাসায় তিনি যে আজও প্রতিষ্ঠিত আছেন—এই কথাই বার বার মনে হলো। নানা অসুস্থ আবহাওয়ার মধ্যেও বিদ্যাসাগর ও স্বদেশবাসীর অচ্ছেদ্য বন্ধন আরো দৃঢ়তর হবে। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা—

"দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব। তাঁহার মহান্ চরিত্রের যে অক্ষয় বট তিনি রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালীর তীর্থস্থান।"

চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু—

প্রাচীন পুঁথিপত্রে, কাব্যে, মহাকাব্যে পড়েছি আত্মত্যাগের কাহিনী, শ্রেষ্ঠদানের উপাখ্যান। নিজের দেহ আগুনে বিসর্জন দিয়ে দধীচি মুনি দেবতাদের সুযোগ দিলেন বজ্র তৈরী করতে। মহাবীর কর্ণ প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারতেন না—তাই প্রিয় পুত্র বিষকেতুকেও মৃত্যুর বেদীতে উৎসর্গ করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন নি। বুদ্ধশিষ্যা সুপ্রিয়া তার একমাত্র বাস—'বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে—ভূতলে'···। এ কাহিনীও আমরা জানি। বার বার পড়ি, আবৃত্তি করি—কিন্তু এসবই তো উপাখ্যান, বহুযুগ আগের ঘটনা।

কিন্তু কাব্য-মহাকাব্যের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে এমন ঘটনা সাম্প্রতিক কালে ঘটতে দেখা গেছে ১৯২৫ সালের ১৭ই জুন—দার্জিলিং থেকে যেদিন কোলকাতায় আনা হলো দেশবন্ধুর মরদেহ। শোকার্ত নরনারীর ভিড়—অন্তরে গভীর বেদনা, চোখে অবিরল ধারা—কত কাছের মানুষ ছিলেন চিত্তরঞ্জন—তাই কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছে তাঁর পরিচয় ছিল দেশবন্ধু রূপে। এরকম সার্থক নামের দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।

আইন-ব্যবসায়ী মহলে শীর্ষস্থানে ছিলেন ; সমাজে খ্যাতি ও মর্যাদার উচ্চতম আসন ছিল করতলগত। সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ-বিচরণ—অগণিত ভক্তের কণ্ঠে তাঁর নাম উচ্চারিত। লক্ষ্মী বেছে নিয়েছেন তাঁর বরপুত্র রূপে ; তবুও একদিন বিনা দ্বিধায় অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে এই প্রতিভাবান পুরুষটি এসে দাঁড়ালেন জনতার মাঝে—দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের পুণ্য ব্রত উদ্‌যাপনে। সর্বস্ব ত্যাগ করে এলেন —ব্যবসা, প্রতিষ্ঠা, অর্থ, বসতবাটী। ভবিষ্যতের ভাবনা এতটুকু বিচলিত করেনি তাঁকে। তাঁর একমাত্র ধ্যান ছিল স্বদেশ-মুক্তি। জনতার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন তিনি। পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সকলকেই আহ্বান জানালেন মুক্তিযজ্ঞে যোগ দিতে—আহ্বান জানালেন, দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে। সর্বত্যাগী এই মহামানবের আহ্বানে সেদিন সারা দেশ জুড়ে জাগলো দুর্বার প্রাণশক্তির বন্যা। স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু আবেশ তিনি সঞ্চারিত করে গেলেন স্বদেশবাসীর অন্তরে—অদূর ভবিষ্যতে তা দিয়েই রচিত হলো স্বাধীন ভারতের দৃঢ়ভিত্তি। দাশ সাহেব থেকে দেশবন্ধুর রূপান্তর, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। আজও ভারতবাসী সশ্রদ্ধ অন্তরে স্মরণ করে আধুনিক যুগের দধীচি এই মহানায়ক দেশবন্ধুর কাছে তাদের অপরিসীম ঋণের কথা।

"হায় চিরভোলা হিমালয় হতে অমৃত আনিতে গিয়া,
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্যুপরশ নিয়া।
ধরা আর তোমা ধরিতে পারে না, আজ তুমি দেবতার
নিয়ে যাও দেব মরু হুগলীর অর্ঘ্য নয়ন সার।"

[কাজী নজরুল ইসলাম]

তোমাদের জন্যে রইল শুভ-কামনা। তোমাদের—মধুদি'

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও
প্রভু প্রেস, ৩০, বিধান সরণি কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : '৬০ পয়সা
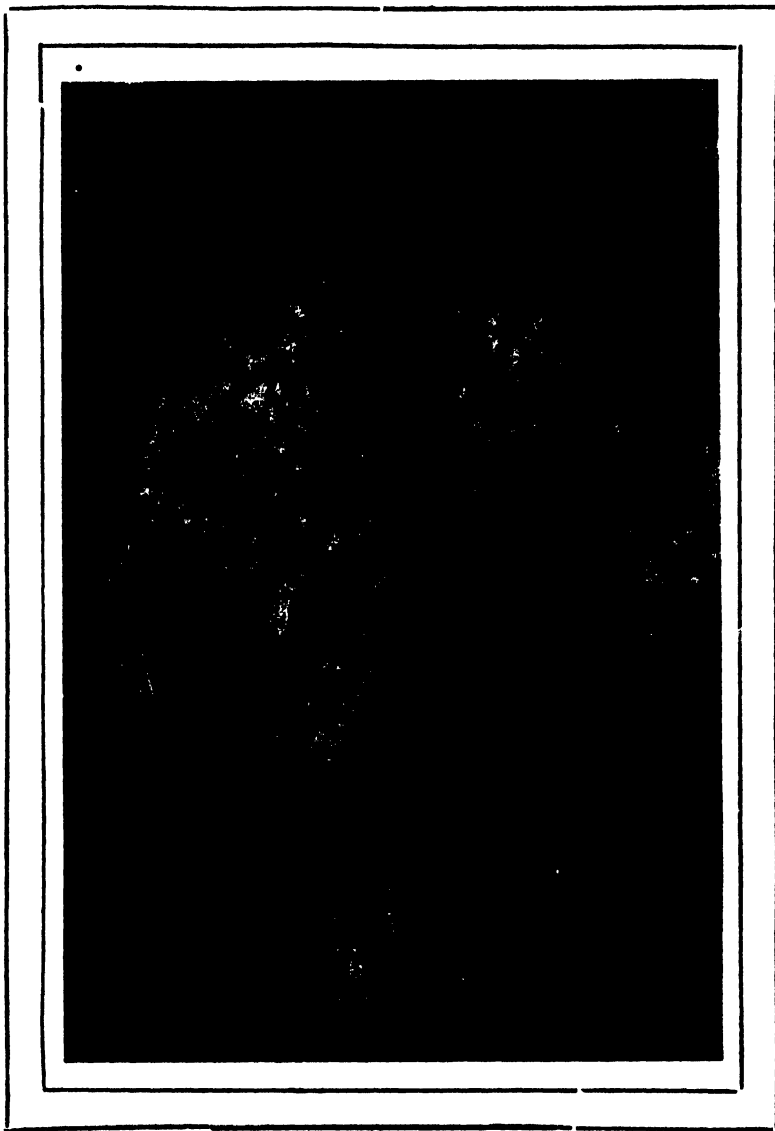
নটরাজ

(দক্ষিণ ভারত :: সপ্তদশ শতক)

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা *

৫১শ বর্ষ] পৌষ : ১৩৭৭ [৯ম সংখ্যা

বিবেক-শিলা দর্শনে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

বঙ্গ-ভারত-আরব যেথায়
একত্রিতির কেন্দ্র রচে,
ফেনিল ঊর্মি চপলোচ্ছ্বাসে
অর্ঘ্য সাজায় অসংকোচে,

যেখানে "সুনীল জলধি হইতে
উঠিল জননী ভারতবর্ষ",
তাহারি পুণ্য চরণ যেখানে
অর্ণবত্রয় করিছে স্পর্শ।

যেথায় কন্যাকুমারী তীর্থে
কুমারীকন্যা প্রতিষ্ঠিতা,
পরমাপ্রকৃতি যে পরম-ধামে
যুগ যুগ পতি-প্রতীক্ষিতা,

প্রকৃতি যেখানে রূপে অনন্যা,
রিক্তা পরমপুরুষাভাবে
সেখানেরি এক শিলাসনে বসি
একটি পুরুষ কি কথা ভাবে ?

ধ্যান সামাহিত দিব্য আনন
সুচারু ললাট, অয়ত আঁখি
তথাগত আজ হেথাগত হয়ে
নব অবয়বে বসেছে নাকি ?

ভারতেরি এক খণ্ডিত শিলা
উন্নত শির সিন্ধু জলে,
ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক
ভারতেরে হেরে কৌতূহলে।

জনক-জননী—জননী মা অয়ি
রবির ভুবনমোহিনী মাকে
চরণ প্রান্তে দেখিছেন বসি
জননীর রূপ মাধুরিমা কে ?

ভারতের সাথে ভারতবাসীরে,
জননীর সাথে সন্তানেরো,
কেমনে ঘোচাবে দুখ-দুর্দশা
ভাঙাবে নিদ্রা নিদ্রিতেরো ?

জড়তা এবং কুসংস্কারেতে
পঙ্গু মানব সচল হবে,
"ভারত আবার জগত সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন কখন লবে ?"

সন্ন্যাসী-চিতে সমাজ চিন্তা
যে শিলায় বলো সমুদ্ভূত
সেই বিবেকেরি মূর্তি বসাতে
ভারতবাসীই বিবেক-চ্যুত।

নানা অজুহাত, "মূর্তি দেখিতে
বিঘ্ন ঘটাবে ঊর্মিরাশি,
হেথা প্রকৃতির রূপ লাবণ্য
বিরাট এরূপ ফেলিবে গ্রাসি।"

যাহোক, অনেক বাধা-বিপত্তি,
বহু সংঘাত অতিক্রমি'—
যে শিলায় হলো প্রাণসঞ্চার
পুণ্য দিবসে তাহারে নমি।

খোঁড়া, কুঁজো, অন্ধের গল্প

(নেপালী গল্প)

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

নেপালে এক গাঁয়ে তিন বন্ধু বাস করতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল অন্ধ, একজন খোঁড়া, আর একজন কুঁজো।

তিন বন্ধুতে খুব ভাব ছিল।

তবে তারা খুব গরীব ছিল, কাজেই ভিক্ষে করে প্রাণ বাঁচাতে হতো।

একদিন তারা ভিক্ষে করতে বেরিয়ে একজন পথে কুড়িয়ে পেলো একটা লোহার মুখ-সূঁচলো শিক, একজন পেলো একটা কাঠ কাটবার বাটালি, আর কুঁজো যে, সে পেলো একটা হাতুড়ি।

জিনিসগুলো কুড়িয়ে পেয়ে তিন বন্ধুই খুব খুশি। যাক, দরকার মত কাজে লাগবে।

ভিক্ষে করে আর দিন চলে না দেখে, একদিন তিন বন্ধুতে মিলে ঠিক করলো, না ভাই, এভাবে আর চলে না। চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি, দেখি যদি আমাদের ভাগ্য ফেরে।

বেশ, তাই চলো।

তিন বন্ধু আর দেরি না করে নিজেদের টুকিটাকি জিনিসপত্র আর পড়ে-পাওয়া ঐ যন্ত্র-গুলো নিয়ে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

বেশ কিছুদূর গিয়ে তারা পৌছলো একটা বনের ধারে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে, বিশ্রাম করে, এবার ঢুকলো তারা গভীর বনে। অবশ্য খুব সাবধানেই চললো তারা। বাঘ, ভালুক বা দৈত্য-দানার তো অভাব নেই বনে।

বনের মধ্যে খানিকটা দূর ঢুকতেই খোঁড়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ ছাখো, গাছের ফাঁকে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে!

কুঁজো ভাল করে দেখে বললো, তাই তো!

অন্ধ বললো, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, তবে যদি সত্যিই বাড়ি হয়, তবে চলো, ওখানেই রাতটা কাটানো যাবে।

খোঁড়া বললো, সেই ভাল। আমার পা-টাও ব্যথা করছে।

কিন্তু কুঁজো আমতা-আমতা করে বললো, কিন্তু এই বনের মধ্যে বাড়ি কেন? ভাল করে দেখে-শুনে তবে ঢোকা দরকার। বেশ, চলো একটু এগিয়ে দেখি।

তিনজনে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়িটার কাছে গিয়ে দেখে, বিরাট একটা চারতলা বাড়ি। যেন প্রাসাদ। অথচ বাইরে থেকে লোকজন কাউকেই দেখা গেল না।

তখন তারা সাহস করে বাড়ির সদর দরজার কাছে এলো। দেখলো দরজাটা খোলা!

খোলা যখন, তখন ঢোকাই যাক। যা থাকে বরাতে।

এমন সময় কোথেকে একটি ছাগল এসে হাজির হলো তাদের সামনে। এই বনের মধ্যে ছাগল এলো কোথা থেকে? আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

খোঁড়া বললো, ভেবে লাভ কি? ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন হয়তো আমাদের পেট ভরাবার জন্যে। আজকে দিব্যি ফিষ্টি হবে।

কুঁজো বললো ভাবিত হয়ে: আমি ভাবছি, আমরা না কারোর ফিষ্টি হয়ে যাই। যাক, বেঁধে তো নিই ছাগলটাকে।

ছাগলটার গলায় দড়ি বেঁধে, তারা তখন তাকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকলো গিয়ে বাড়িটার মধ্যে।

গিয়ে দেখে বাড়িটায় অনেক ঘর। অথচ ঘরে কেউ নেই। তারা পরে পা টিপে টিপে দোতলায় গেল, তেতলায় গেল, চারতলাতেও গেল। না, কোথাও কেউ নেই।

তখন কুঁজো বললো, দাঁড়াও, নীচের সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

অন্ধ বললো, এই প্রাসাদটাও বোধ করি ভগবানের দান।

খোঁড়া বললো, তা হতে পারে।

তিন বন্ধুতে এবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলো। খোঁড়া বললে, ছাগলটাকে মারা যাক। ফিষ্টি বেশ জমবে।

কিন্তু কুঁজো বললো, না থাক। এখন ফিষ্টি করবার সময় নয়। আগে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করি, তারপর না হয় গৃহ-প্রবেশের খাওয়া হবে।

এই কথা বলতে-বলতেই হঠাৎ তাদের কানে এলো, সদর দরজায় ধাক্কা আর সেই সঙ্গে ভীষণ হুংকার: দরজা বন্ধ কেন? কে আমার বাড়িতে? শীগ্গির দরজা খোল্!

ঐ হুংকার শুনেই তো তিন বন্ধুর পিলে চমকে গেল। তারা তাড়াতাড়ি নীচের সদর দরজার পেছনে এসে দেখে নিলো, দরজাটা ভাল করে বন্ধ আছে কিনা।

হ্যাঁ আছে! তারপর দরজার গর্ততে উঁকি মেরে দেখলো, এক বিরাট দৈত্য। ভাঁটার মত তার দুটো চোখ, মুলোর মত দাঁত, কুলোর মত কান, আর মাথায় দুটো শিং।

এই, খোল্ শীগ্গির দরজা! আবার হুংকার। আবার দরজায় ধাক্কা।

কী ভাগ্যিস! ঠিক সেই সময় ছাগলটা ব্যা-আ-আ করে চেঁচিয়ে উঠলো। ছাগলটাও ভয় পেয়েছিল।

কিন্তু ছাগলটার ডাক শুনে দৈত্যটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। এমনতর ডাক তো সে শোনেনি কখনো। এ আবার কোন জন্তু রে বাবা!

দৈত্যটা তখন চীৎকার ক'রে বললো, বটে! তোর্ আওয়াজটা তো দেখছি অদ্ভুত! আচ্ছা, কত জোরে তুই চিমটি কাটতে পারিস দেখি তো?

'কুঁজো বললো ভাবিত হয়ে: আমি ভাবছি, আমার: না কারোর পিষ্টি হয়ে যাই।' পৃ. ৩৭৮

বলেই দৈত্য তার একটা আঙুল দরজার পাল্লার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া ভেতর থেকে ছুঁচলো শিকটা দিলো তার আঙুলে বিঁধিয়ে।

উঃ! গেছি রে বাবা!—বলেই দৈত্য তাড়াতাড়ি তার আঙুলটা টেনে নিলো। দিখে অঝোরে রক্ত পড়ছে!

দৈত্যটা যন্ত্রণায় নিজের আঙুলটা চুষতে চুষতে বললো, আচ্ছা, আমার আর একটা হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছি গর্তে! দেখি, তুই কত জোরে ঘুষি মারতে পারিস হাতে! দেখবো তোর জোর!

দৈত্য অন্য হাতটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেই কুঁজো এবার জোরসে মারলো হাতুড়ির এক ঠোকর!

বাপ রে, মা রে!—বলে দৈত্য প্রায় কেঁদে উঠলো। পরে ভাবলো, কী এমন জীব যার গায়ে এত জোর! আমার চাইতেও জোর!

দেখতে হচ্ছে তো!—

দৈত্য তার ভাঁটার মত একটা চোখ ঐ গর্তে লাগিয়ে যেই দেখতে গেল, অমনি সেই সুঁচলো শিক দিয়ে খোঁচাটা দিলো তার চোখটা খুঁচিয়ে। দৈত্যের চোখটাই গেল নষ্ট হয়ে।

ভয়ে দৈত্য আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি সে ছুটলো দৈত্য-পাড়ায়। সেখানে গিয়ে সে কেঁদে কেঁদে সব খবর জানালো। তখন আর সব দৈত্যরা বললো, চল্ সব, যাই সেখানে।

সেখানে দল বেঁধে এসে দৈত্যরা ঠিক করলো, একজনের পিঠে আর একজন উঠে, চারতলার ছাদ দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাবে তারা!

বাড়ির মালিক দৈত্যটা ভয় পেয়েছিল আগেই। সে বললো, আমি নীচেয় থাকি, তোমরা বরং পিঠে উঠে উঠে বাড়ির মধ্যে যাও।

বেশ। তাই হোক।

ওদিকে তিন বন্ধু ভাবলো, আর ভয় নেই। দৈত্যটা পালিয়েছে, আর আসবে না। তাই এবার ছাগলটাকে কেটে মজা করে খাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

তিনতলার ঘরে তারা গোলপাতা পেতে তাতে রুটি আর পাঁঠার মাংস সাজিয়ে নিলো। আর শুরু হলো হইহই হাসি-গল্প!

ততক্ষণে দৈত্যরা মালিক-দৈত্যের পিঠে চড়ে, তার উপর আর একজন চড়ে, এমনি করে প্রায় তেতলার ঘরের কাছে গিয়ে পড়েছে!

এমন সময় ঘরের মধ্যে থেকে শোনা গেল, অন্ধ বলছে, আমি ভাই তলার মাংসটা খাবো।

যেই কথাটা কানে গিয়েছে একেবারে নীচেয় মালিক-দৈত্যের কানে, সে ভাবলো, ঐ রে, তলায় আমি আছি, তাহলে আমার মাংসই তো খেতে চাচ্ছে!

ব্যস্! আর কথা নেই। তার ঘাড় থেকে অন্য দৈত্যদের ফেলে দিয়ে দে ছুট্ একেবারে! আর অন্য সব দৈত্যরা তখন এ-ওর ঘাড়ের উপর পড়ে গিয়ে থেঁতলে সবাই গেল মরে!

হঠাৎ ধড়াস-ধড়াস শব্দ শুনে তিন বন্ধু তেতলার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, অনেকগুলো দৈত্য বাড়ীর নীচেয় মরে পড়ে আছে!

তখন তারা ঠিক করলো, আর এ বাড়িতে থাকা নয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে তারা বাড়িটা থেকে পালিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত করলো।

বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় হঠাৎ খোঁড়া আর কুঁজোর নজরে পড়লো সিঁড়ির তলায় একটা ঘর। ঘরটায় কি আছে দেখতে গিয়ে দেখে, সোনা, রুপো, হীরে আর পান্নার যেন সব পাহাড়! পাশাপাশি সব সাজানো!

দেখে তো তাদের চক্ষুস্থির।

আর দেরি না করে যে যতটা পারলো থলে করে, পুঁটলি বেঁধে, কাঁধে নিয়ে চললো তারা শহরের দিকে।

শহরে এসে তারা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো। রাত্রিটা ওখানেই থাকবে। নিজেরাই রান্না করে খাবে।

কিন্তু ঐ ধনরত্নের জন্যেই তিন বন্ধুর মধ্যে দু'জনের মনে কুবুদ্ধি এসে জুটলো। খোঁড়া আর কুঁজো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো, অন্ধটা তো সোনা-রুপো-জহরত কিছুই দেখতে পায় না, কাজেই ওর ভাগটা আমরাই নেবো। আর আজ ওর রান্নার সঙ্গে বিষধর সাপ কেটে তারই ঝোল-রুটি খাওয়াবো।

তাই ঠিক হলো। বিষধর সাপও একটা পাওয়া গেল। সাপের নরম মাংসের ঝোল খেয়ে তো অন্ধ খুব খুশি! বললো, বাঃ, এমন নরম মাংস তো খাইনি কখনো?

শুনে খোঁড়া আর কুঁজো বললো, ও এক রকমের মাংস। খেলে গায়ের জোর হবে!

কিন্তু আশ্চর্য! গায়ের জোর হোক না হোক—ঐ সাপের মাংস খেয়ে অন্ধের চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো।

কে লাফিয়ে উঠলো, আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি!

যা বাব্বা! এক করতে আর এক!

অন্ধ সাপের মাংস দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললো, তোমরা আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিলে?

না, না। তারা বললো, তোমার চোখে দৃষ্টি আনবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছিলাম।

তাদের কথায় সে বিশ্বাস করে খুশিই হলো।

পরদিন তারা সে হোটেল থেকে বেরিয়ে, সারা দিন হেঁটে, সন্ধ্যাবেলায় আর একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো।

এবার আগের অন্ধ আর খোঁড়া পরামর্শ করলো, রাত্রে কুঁজোকে মেরে তার ভাগের সোনা রুপো যা আছে সব নিজেরা নেবে।

রাত্রে কুঁজো যখন ঘুমুচ্ছিলো, তখন আর দুই বন্ধু গিয়ে তার কুঁজের উপর দমাদ্দম কিল ঘুঁষি চালাতে লাগলো—যাতে মারের চোটে কুঁজো মরে যায়।

কিন্তু এবারও শাপে বর হলো।

মারের চোটে কুঁজোর পিঠের কুঁজ গেল বসে। কুঁজো সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

এবার কুঁজো তার দুই বন্ধুকে সন্দেহ করতে তারা বললো, আরে রামও! আমরা তোমার ভালর জন্যেই ঐভাবে কুঁজেতে মেরেছি! দেখো তো, কেমন সোজা হয়ে গেলে!

শুনে সোজা-হওয়া কুঁজো খুব খুশি!

তারপরের দিন তারা তিনজনে হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যেবেলায় আর একটি হোটেলে গিয়ে উঠলো।

এবার ষড়যন্ত্র করলো দৃষ্টি ফিরে পাওয়া অন্ধ আর কুঁজো। ঠিক করলো, খোঁড়াকে মেরে ফেলে তার ধনরত্ন তারা ভাগ করে নেবে।

রাত্রে খোঁড়া যখন ঘুমোলো, তখন আর দু'জন চুপি চুপি গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে মারলো দু'ঘা খোঁড়ার দুই খোঁড়া পায়ে।

হাতুড়ির মারের চোটে খোঁড়ার পা আরো না ভেঙে বরং হাড়গুড়ো ঠিকমত সোজা হয়ে গেল। খোঁড়া লাফ দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আর আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো।

তারপর বললো, তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমার তাতে উপকারই হলো। কাজেই তোমাদের উপর আমার কোন রাগ নেই।

সে আরো বললো, আমরা সবাই এখন ভাল হয়ে গেছি ভগবানের ইচ্ছেয়। তাছাড়া ধনরত্নও যথেষ্ট পেয়েছি। এখন কেন আর মিছে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। বরং চলো সবাই দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসার-ধর্ম করিগে!

ঠিক বলেছো!

তিন বন্ধু মনের আনন্দে ফিরে এলো দেশে।

নানক

শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জ চৌধুরী

দেবতার লীলাভূমি পুণ্য-পীঠস্থান
সভ্যতার আদিকেন্দ্র শান্তির নিধান,
কত মহামানবের পদধূলিপূত
মহামহীয়সী এই সোনার ভারত।
ধর্মের গ্লানিতে যবে ভরিল এ দেশ
ধর্মের প্রদীপ হাতে নাহি ভয়-লেশ—
নামিয়া আসিল এক পুরুষ প্রধান
নানক নামেতে খ্যাত সাধক মহান্।

সুপবিত্র শিখধর্ম করিয়া গঠন
দিকে দিকে প্রচারিল ধর্মের বচন—
জাতিভেদ ধর্মভেদ অলীক অসার
শুনিল সকলে এই শুভ সমাচার।
আজি ভারতের বুকে অধর্মের বাস
মানুষে মানুষে ভেদ নানা অবিশ্বাস;
চারিদিকে হানাহানি শান্তি কোথা নাই
তোমার বাণী আজিকে শুনিবারে চাই।

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের নতুন কর্তা মাঝারি বয়সের এবং মাঝারি গড়নের মানুষ। খুব রোগা, মুখখানি ছোট্ট। নাকে-চোখে বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। দু'জনে যখন কথা বলছিলাম, লক্ষ্য করছিলাম চোখ দুটি খুব তীক্ষ্ণ। কথা বলবার সময় অন্তর্ভেদী দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন পড়ে নিতে চান অন্যের মনের গুহ্যতম চিন্তাগুলি। সকলের বোঝবার মত করে বেশ অবিচলিত স্বরে বুঝিয়ে দিলেন উনি কী চান। আমার তো ওঁর সম্বন্ধে ভালই ধারণা হ'ল। ষ্টেশনের ব্যাপারে সব কিছু জানবার উৎসাহ, আর চটপট সব শুনে নিতে চান। আমি যখন বেরিয়ে আসছি, তখন কোন ভূমিকা না করেই বল্লেন, "আমি জানি আপনিই ল্যাম্পোর সবচেয়ে প্রিয়জন ; তা' সে কোথায় ? আমি ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"আমি ওকে এখনও দেখিনি আজ। বোধ হয় রোজকার মত ট্রেন-ভ্রমণে গিয়েছে।" আমি জবাব দিলাম। এমন সময় ষ্টেশনে একটা ট্রেন ঢুকছে দেখে ভাবলাম ঐ ট্রেনে হয়ত ও আছে। আপন মনেই বল্লাম, "তবে রে হতভাগা, কোথায় লুকিয়ে আছিস এতক্ষণ ? নতুন কর্তার সঙ্গে তোকে যে দেখা করতে হবে ! ভগবানের দোহাই, চেষ্টা কর যাতে তোর ওপরে ওঁর ধারণা ভাল হয়।"

ল্যাম্পোর ঝগড়াটে স্বভাব আমি ভাল করেই জানতাম। জানতাম, আমার আপিসে

কোন অচেনা লোককে ও মোটেও বরদাস্ত করবে না। তাই চাইছিলাম কর্তার সঙ্গে ওর প্রথম দর্শনটা আপিস-ঘরের বাইরে হোক, যাতে কোন বিরূপ ধারণা না হতে পারে।

.সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা যখন নতুন কর্তার সঙ্গে টাইম-টেবিল সম্বন্ধে আলোচনা করছি, এমন সময় শ্রীমান্ ল্যাম্পোর প্রবেশ! আমাদের কারো দিকে দৃকপাত না করে সটান নিজের কোণটিতে গিয়ে ও শুয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ কখন নতুন ষ্টেশন মাষ্টারকে দেখতে পেলো। তৎক্ষণাৎ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেই কান দুটো একটু কাত করলো। মুখমণ্ডল ভীষণাকার, পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখব্যাদন। ঠিক যেন একটা নেকড়ে বাঘের মত দেখাচ্ছিল তখন ওকে। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখি, ও চীফের কাছে এগিয়ে এসে ওঁর চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওঁকে শুঁকলো। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওঁর আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করল। তারপর যেন কোন্ যাদুবলে ওর ভয়ংকর চেহারা, খাড়া খাড়া লোম, মুখের ভাব সব আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমি একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। যাক, সব ভালভাবেই সুসম্পন্ন হ'ল তাহলে।

ষ্টেশন মাষ্টার সেখানেই দাঁড়িয়ে ওকে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে আদর করছিলেন, আর আমি প্রাণপণে ল্যাম্পোর বীরত্ব ও সাহসিকতার কীর্তি-কাহিনীর বিবরণ দিয়ে চলেছিলাম! ল্যাম্পো লেজ নেড়ে নেড়ে জানিয়ে দিল, নবাগতর চালচলন ও পছন্দ করেছে। বুঝলাম চীফ-সাহেব সত্যিই জানোয়ার, বিশেষ করে কুকুর পছন্দ করেন। আবার এও দেখা গেল যে, ল্যাম্পোর অন্তর্দৃষ্টি ল্যাম্পোকে ভুল সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়নি।

তারপর ক'দিনই লক্ষ্য করেছি যে, ল্যাম্পো যখনই এক্সপ্রেস গাড়ীর ডাইনিং-কারের দিকে খাবার খেতে ছুটে যায়, চীফ-সাহেব তখনই নিজের আপিসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব দেখতেন। তাঁর চেহারায় বিস্ময় ও আনন্দের ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠত। দু'জনের মধ্যে বেশ সহৃদয় ভাব জন্মেছিল। ল্যাম্পো প্রায়ই ওঁর সঙ্গে ঘুরত। দেখতাম, যেখানেই চীফ চলেছেন, সেখানেই পেছনে চলেছে ল্যাংবোট ল্যাম্পো।

প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে দেখা যেতো, চীফের বাড়ীর দরজার কাছে ল্যাম্পো দাঁড়িয়ে আছে। তারপর তাঁর সঙ্গে তার আপিসে আসত। দেখা গেল চীফের পরিবারের সকলের সঙ্গেই ও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে চীফের স্ত্রী ওকে খুব কুকুর ভালবাসতেন। অতএব ল্যাম্পো দিনের মধ্যে যতবারই ওঁর বাড়ীতে উপস্থিত হতো, (এক-একটি ট্রেন যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে), প্রত্যেকবারই ও খানিকটা করে চিনির ডেলা ও আদর পেত। ও বাড়ীতে একটা মাদী কুকুর ও চারটে বিড়াল ছিল। ল্যাম্পো তাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুভাবেই থাকত। যদিও বেড়ালের সঙ্গে ওর চিরকালই আদায়-কাঁচকলায়, এবং তাদের সঙ্গে দাঙ্গা করবার জন্ম ও সদাই

ইচ্ছুক। কিন্তু এর বেলায় সে বুঝেছিল যে, এরা হ'ল বিশেষ শ্রেণীর, (কারণ চীফ-সাহেবের বিড়াল) এদের সঙ্গে একটু বিশেষ ব্যবহার প্রয়োজন। অতএব ওদের সম্বন্ধে ও সব সময়ে খুব নির্লিপ্ত থাকত—যেন ওদের দেখতেই পায়নি এবং ওদের ধারে-কাছে ঘেঁষত না।

ল্যাম্পোর প্রতি চীফ-সাহেবের ভালবাসা যে কত গভীর তার নিদর্শন আমি অল্পদিনের মধ্যেই পেলাম। সে দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের সন্ধ্যা। বেজায় শীত। ষ্টেশন থেকে দেখা যাচ্ছে সাদা মুকুট-পরা অদ্রিরাজের চূড়া। তার ওপরে চন্দ্রমার শীতল কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। ট্রেনগুলো সেদিন খুব দেরিতে আসছিল। ইঞ্জিন, বগি, মালগাড়ী প্রভৃতির ভিড়ে আমরা একেবারে হিমসিম খাচ্ছি। যাত্রীরা কান পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ট্রেন থেকে উঠছে নামছে। কনকনে হাওয়া তাদের মুখের ওপরে ঝাপ্টা মারছিল।

ল্যাম্পো এতক্ষণ দু'নম্বর প্ল্যাটফরমের ওপরে অপেক্ষা করছিল, কতক্ষণে একটা শান্টিং ইঞ্জিন সরে গিয়ে লেভেল-ক্রসিংয়ের পথ ছেড়ে দেবে। যে মুহূর্তে ইঞ্জিনটা সরে গেল, ল্যাম্পো লাফিয়ে চল্ল লাইন পেরিয়ে। লাইনের মাঝখানে যেতেই ও বুঝতে পারল, ঐ লাইনের ওপরে একটা গাড়ী আসছে। তখন আর পেছোবার জো নেই এবং এগুবারও অবস্থা নেই। ইঞ্জিনটা এল। ল্যাম্পো তার তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। চারদিক থেকে ভীত, সন্ত্রস্ত ধ্বনি—ল্যাম্পো চাপা পড়েছে। ইঞ্জিনের ব্রেক, চাকার কর্কশ আওয়াজ, সবই যেন ভয়ংকর রকম অশুভের ইঙ্গিত মনে হচ্ছিল। ট্রেনটা থামা মাত্র আমরা ইঞ্জিনের দিকে ছুটে গেলাম। ভয়ে আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছিল। এখনই না জানি চোখের সামনে কী দৃশ্য দেখতে হবে! আমরা গেলাম, অনেক খুঁজলাম, কিন্তু ল্যাম্পোর চিহ্নমাত্র নেই! সকলে রীতিমত হতভম্ব! আশ্চর্য হলাম, কী ব্যাপারে! মনে আবার আশার সঞ্চার হ'ল। সমস্ত কোচগুলোর নীচে দেখলাম। কোন লাভ হ'ল না। শেষে দেখলাম, ইঞ্জিনের চাকার গায়ে ল্যাম্পোর কিছু রক্ত-মাখা লোম আটকে আছে। আশা বাড়তে থাকল। যদিও আমাদের বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না তখনও। কারণ আমরা সবাই স্বচক্ষে ল্যাম্পোকে ইঞ্জিনের নীচে যেতে দেখেছি।

অনেকরকম জল্পনাকল্পনা চল্ল, কী হতে পারে তাই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ল্যাম্পোর এই নাটকীয় অন্তর্ধানের পরিসমাপ্তি মধুর হয়েছিল। ল্যাম্পো যখন দেখেছিল আর পালাবার পথ নেই, তখন ও দুই লাইনের মাঝখানে, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, এর দরুন ট্রেনটা ওর ওপর দিয়ে যেতে পারবে না, লাইনের ওপর দিয়ে যাবে। ইঞ্জিনের ব্রেকে লোম দেখে বুঝলাম ও সম্পূর্ণ অক্ষত নয়। আন্দাজ করলাম, গাড়ীটা চলে গেলে ও উঠে ভয়ে এবং উত্তেজনায় মাঠের দিকে ছুটে পালিয়ে গেছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমরা যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।

কিন্তু পরে মনে হ'ল কুকুরটা যদি বেশী রকম জখম হয়ে থাকে, তবে হয়ত রক্তপাতেই মরে যাবে। আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেও তার টিকিটির সন্ধান পেলাম না। সেদিন চীফ-সাহেব ছিলেন না। হাসপাতালে নিজের অসুস্থ ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলেন। উনি রাত্রে ফিরতে আমরা সব ইতিবৃত্ত ওঁকে জানালাম। উনি মুখে কিছু বল্লেন না বটে, কিন্তু ওঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল যে, উনি বেশ বিচলিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে উনি একাই বেরিয়ে গেলেন।

গুরু কুচির বরফ পড়ছিল। বিস্তৃত সাদা পর্দার ভেতর দিয়ে একটা লণ্ঠনের আলোর ঝলক এক-একবার আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেক দেরিতে চীফ-সাহেব ফিরলেন। লণ্ঠনটা রাখলেন। গায়ের ওপরের বরফগুলো ঝেড়ে ফেল্লেন, তারপর কিছু না বলে চুপচাপ চলে গেলেন।

এত খোঁজখুঁজির পুরস্কার তিনি অবশ্য পরের দিনই পেয়েছিলেন। সকালে নীচে নেমে সামনের দরজার কাছে দেখেন, প্রতীক্ষারত ল্যাম্পো। দেখলেন, ল্যাম্পো ভিজে সপসপ্ করছে। বরফের তলে লোমগুলো একাকার। শরীরের জায়গায়-জায়গায় ক্ষত এবং বেশ ভয় পেয়েছিল। যাক্ বেঁচে তো আছে! (ক্রমশঃ)
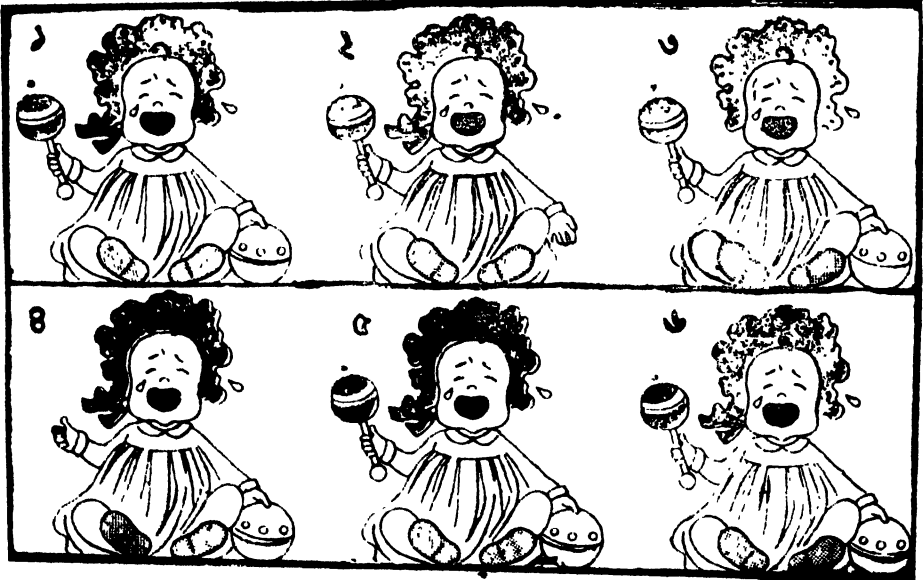
উপরে প্রায় এক রকমের দেখতে ছ'টি ছবি আছে। কিন্তু ছ'টির মধ্যে দু'টি একেবারেই একরকম। সে কোন্ দু'টি তোমরা দেখে ঠিক বার করতে পার কিনা দেখ।

রাম-রাবণের যুদ্ধ

শ্রীশিশির মজুমদার

ওদের মা-বাবা, জেঠামশাই-জেঠিমা সবাই যাবে বাইরে। যাবার সময়ে বারবার করে তাঁরা বলে গেলেন—তোমরা সবাই লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। একটুও দুষ্টমি করবে না। ঠাকুমাকে একদম জ্বালাতন করবে না। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে যেন কোন নালিশ না শুনি।

ওরা সবাই এক সঙ্গে মাথা নেড়েছিল। তাঁর সামনে সবাই ওরা ভাল হয়ে থাকবে।

ঠাকুমা শুধু বলেছিলেন—হ্যাঁ, তবেই হয়েছে! ওরা হবে লক্ষ্মী! তোরা একবার বাড়ির বাইরে যানা, তখন ওরা এক-একজন এক-একটি হনুমান হয়ে যাবে।

ঠাকুমার একথা শুনেও এতটুকু রাগ করেনি—আন্তু, মান্তু, বানু, বিশু আর ছোট্ট পানু। মনে মনে শুধু একটু হেসেছিল সকলে।

যখন সকলে চলে গেল। ঠাকুমা রাস্তার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ডাকলেন—এই সকলে তোরা আমার ঘরে এসে পাখার তলায় বসে খেলা কর। আমি তাহলে শুয়ে শুয়ে তোদের দিকে নজর রাখতে পারব।

সে কথার ওরা কোন জবাবই দিল না।

ঠাকুমা—কি রে তোরা আসবি না?

ওরা সকলে এক সঙ্গে—না ঠাকুমা, আমরা সকলে লক্ষ্মী হয়ে এ ঘরে বসে খেলা করব।

ঠাকুমা—ঝগড়াঝাটি করবি না?

ওরা—না ঠাকুমা।

ঠাকুমা—বেশ, তবে থাক ও ঘরে।

ঠাকুমা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। রামায়ণখানা হাতে তুলে নিয়ে দু'চার লাইন পড়লেন। দু'বার তাঁর হাই উঠল। ঘুমে চোখ জুড়ে আসতে লাগল। বই নাবিয়ে রেখে উনি পাশ ফিরে শুলেন। একটু পরেই বানু চুপি চুপি সে ঘরে একবার উঁকি মেরে দেখেই ছুটে গিয়ে দলের সকলকে খবর দিল।

বানু—ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়েছে রে।

বিশু—বাঃ, আয় তাহলে এবারে আমরা রাম-রাবণের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি।

আন্তু সবার বড়। সে সকলের দিদি। সে বলল—কে তাহলে রাম হবে?

বিশু—আমি হব রাম।

বানু—বাঃ, আমি বড় না, আমি হব রাম। তুই ছোট, তুই হবি লক্ষ্মণ।

ছোট্ট পানু—আমি হব বিল হনুমান। আমার একটা ল্যাজ লাগিয়ে দাও না দাদা।

মান্তু খুব শান্ত মেয়ে। সে বলল—তাহলে কে হবে রাবণ ?

তাই তো একথা তো কেউ ভাবেনি। এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

আন্তু—বিশু, তুই হ রাবণ। আর মান্তু হবে লক্ষ্মণ।

বিশু রাগ করে বলল—কক্ষনো না। আমি কি দুষ্টু যে আমি হব রাবণ! তুই রাবণ হ দিদি। তুই সবার সঙ্গে ঝগড়া করিস। তুই ঠিক রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবি।

আন্তু ভীষণ রেগে গিয়ে বলল—এক থাপ্পড় লাগাব তোকে। আমি ঝগড়াটি আর তুই কি? হবে না রাম-রাবণের যুদ্ধ। অন্য খেলা খেলব আমরা।

রাম হতে পারবে না ভেবে বাসু খুব চিন্তায় পড়ল। একটু ভেবেই বলল—তুই কি বোকা রে বিশু। দিদি রাবণ হলে সুপ্পনখা হবে কে ? সুপ্পনখা (সূর্পণখা) না হলে তো যুদ্ধই হবে না! তারচে তুই রাবণ হ। আমরা তাহলে ভীষণ যুদ্ধ করতে পারব।

বোকা হতে বিশু কখনও রাজী নয়। তাছাড়া যুদ্ধ হবে না শুনে তাড়াতাড়ি বলল—বেশ আমিই তাহলে নয় রাবণ হব ; দিদি হবে সুপ্পনখা! তাহলে আরম্ভ হয়ে যাক যুদ্ধ।

বাসু—বেশ, হয়ে যাক আরম্ভ।—রে রে দুরাচার রাবণ, তুই তো রাক্ষস, কড়মড় করে খাস মানুষের মাংস আর হাড়। আজ তোকে মারিয়া করিব খুন!

আন্তু—বাঃ, সুপ্পনখা এলোই না, আর অমনি অমনি যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল! এমন রামায়ণ তো কখনও শুনিনি!

বাসু—চলে আয় ওরে বেটা সুপ্পনখা। নাক কান তোর কুচি কুচি করি কাটিব ধনুকে!

বিশু—খবরদার! খবরদার রে রাম। মুখ সামলে কথা বলবি তুই। নাকে কানে হাত দিয়ে দেখ একবার দিদির—নানা—সুপ্পনখার। কি ভীষণ কাণ্ড বাধাই আমি তাহলে।

আন্তু—রামায়ণ না ফামায়ন! কিছু হচ্ছে না। তোরা দুটো যা বুদ্ধু, তোদের দিয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ হবে না হাতি হবে! চল রে মান্তু আমারা পুতুল খেলি গিয়ে ও-ঘরে।

পান্থ—হুপ্ হুপ্ হুপ্—আমি বিল হনুমান হয়েচি, ও থাকুমা দেখবে এসো না। হুপ্ হুপ হুপ্।

বাসু ও বিশু একসঙ্গে—এই বোকা ছেলে, ঠাকুমাকে ডাকছিস কেন! তাহলে যুদ্ধটুদ্ধ হবে না। চুপ কর।

পান্থ—হুপ্ হুপ্ হুপ্, আমি বিল হনুমান। এক লাফে ছোমুদ্দর পার হয়ে যাব। হুপ হুপ হুপ্।

আন্তু—থামলি বোকা ছেলে। আবার প্রথম থেকে আরম্ভ কর।…এটা বেশ ভীষণ বন। সেই যে কি বন যেন…ঠিক তেমনি। বাঘ আছে, সিংহ আছে, গরিলা আছে…

পান্নু—উত পাখি নেই দিদি ?

মান্তু—আছে সব আছে। হাতি, গণ্ডার, ইঁদুর, বেড়াল সব। আর আছে স্থূপনখা ভীষণ পাজী। হিংসুটে। রাম-লক্ষণকে দু'চোখে দেখতে পারে না। দেখে হিংসেয় বাঁচে না!

আন্তু—সব জানিস তুই! চুপ করলি। আমি বলে স্থূপনখা, আমাকে বলতে দিবি না?

পান্নু—বা লে—! তোমলাই ছব কথা বলবে! আল হলুমান কিছু বলবে না। হুপ্ হুপ্ হুপ্…

আন্তু—এই হুপ্ হুপ্ হুপ্—চুপ করলি! · এখন আগে স্থূপনখা বলবে।…হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মান্‌ষের গন্ধ পাঁউ। এই জঙ্গলে আবার মানুষ এল কোথা থেকে!…তাদের আমি ধরে ধরে খাঁউ।

বান্নু—তবে রে হতচ্ছাড়ি স্থূপনখা, আয় আয় এই দিকে আয় দেখি একবার!—মুণ্ডুটা তোর আমি…

মান্তু—বা রে, লক্ষণ থাকতে রাম বলবে কেন আগে? তুই বল না দিদি স্থূপনখা, আমি ঠিক বলিনি? রাম না কাম! কিচ্ছু জানে না, খালি চিৎকার করে।

বান্নু—এই স্থূপনখা রাক্ষসী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? লক্ষণের শক্তিশেল করে দেত তুই। তারপরেই ভীষণ যুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে। রাম হারে, কি রাবণ হারে! কোথায় গেলি তুই দুরাচার রাবণ?

বিশু—এই তো এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু তোর বড় আসপদ্দা বেড়েছে রে রাম। এক ঘুষিতে তোর নাক ফাটিয়ে দেব যখন, তখন বুঝবি মজা!

পান্নু—হুপ্ হুপ্ হুপ্—আমি বিল হনুমান। আমিও যুদ্ধ কলবো লাম-লাবণের ছঙ্গে।

আন্তু—খবরদার বলছি, কেউ এখন তোরা যুদ্ধ করবি না। আগে স্থূপনখার নাক কান কাটা হোক, তারপরে যুদ্ধ হবে সুরু। হাঁউ মাঁউ খাঁউ, আমি তবে আগেই লক্ষণকে ধরে খাঁউ।

মান্তু—এই দিদি স্থূপনখা, তুই কি আমাকে সত্যি কামড়ে দিবি নাকি?

আন্তু—না কামড়ালে তোকে খাব কেমন করে।

মান্তু—ও রে বাবা রে! আমি তাহলে আর লক্ষণ-টক্ষন হতে পারব না। এই দিদি স্থূপনখা ছাড় আমাকে। আমার লাগে না বুঝি?

বাসু—তবে রে রাক্ষুসী সুপ্পনখা, ছাড় বলছি লক্ষ্মণ মান্তকে। নইলে লাগাব তোকে এক মস্ত কিল। তখন কিন্তু তুই কাঁদতে পারবি না।

বিশু—লাগা দেখি কিল, দেখি কত সাহস রে তোর রাম! জেঠামশাই এলে বলে দেব না! অমন ভীতু কাপুরুষ লক্ষ্মণকে এই বনে কে আনতে বলেছিল তোকে?

আন্তু—আমি যদি নাই কিছু করি, যুদ্ধ তবে সুরু হবে কেমন করে?

বিশু—ঠিক বলেছিস্ তুই দিদি সুপ্পনখা। দে কামড়ে লক্ষ্মণ ভীতু কাপুরুষটাকে। দেখি রাম কি করতে পারে!

বাসু—বীর হনুমান এক লাফে খাটের উপরে একটা বালিস এনে দে তো তাড়াতাড়ি। দেখি তারপর কত যুদ্ধ করতে পারে দুরাচার রাবণ!

বিশু—দাঁড়া তবে রে পাপিষ্ঠ রাম! আমিও তাহলে একটা বালিস আনি আগে। তারপর দেখাব মজা!

পানু—আমি তাহলে দুতো বালিচ আনব দাদা?

বিশু—তাই তবে আন। উঠে যা খাটের উপর শীগ্গির তুই।

পানু—হুপ্ হুপ্ হুপ্, আমি বিল হনুমান। আমিও তাহলে কিন্তু যুদ্ধ কলব লাম-লাবণের ছঙ্গে।

আন্তু—হাঁউ মাঁউ খাঁউ। এবারে তাহলে আমি লক্ষ্মণকে খাঁউ।

মান্তু—ও ঠাকুমা, শীগ্গির এসো। দেখনা দিদি কি করছে।

বাসু—কোন ভয় নেই রে ভাই লক্ষণ। আমি রাম আছি না দাড়িয়ে। থাক দেখি তোকে এক কিলে তাহলে ওর ফাটাব পিঠ।

মান্তু—ও ঠাকুমা, এসো না শীগ্গির।

আন্তু—এই আমি খেলাম তোকে!

লক্ষ্মণকে কামড়ে দিতে গেল সুপ্পনখা। সঙ্গে সঙ্গে রাম লাগাল এক বিরাশি-সিকা ওজনের কিল। কিল খেয়ে কঁকিয়ে উঠল সুপ্পনখা।

আন্তু—উঃ! তুই যে আমাকে মারলি রে বড়! বড্ড বাড় বেড়েছে রে তোর!

বিশু—তবে রে দুরাত্মা রাম, এত স্পর্ধা তোর! এক ঘুষিতে আজ তোর ফাটাইব নাক প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ চাই!

বাসু—তুই যদি মারিস্ আমাকে, তাহলে কিন্তু তোর ভাল হবে না!

বিশু—মারিবো তো, নিশ্চই মারিবো! তুই কেন আগে তবে মারতে গেলি ওকে প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ চাই!

ঘুষি পাকিয়ে বিশু এগিয়ে গেল রামের দিকে। বাসু পিছোতে লাগল।

বাসু—খবরদার বলছি—খবরদার!

বিশু—কচু পোড়া খবরদার! সাহস থাকে তো আয় হয়ে যাক লড়াই। এই আমি চালালাম ঘুষি।

চট্ করে এক পাশে সরে গেল বাসু। ফস্‌কে গেল ঘুষিটা।

বাসু—তবে রে রাবণ! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! দাঁড়া তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি মজা!

বিশু—চলে আয় তাহলে, কেন পালাস ভয়েতে? যুদ্ধ তবে হয়ে যাক শুরু!

বাসু—হয়ে যাক শুরু!

বিশু আর বাসুতে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একবার এ নীচে তো, অন্য বার ও। খুশিতে পানু খাটের উপরে হুপ্‌ হুপ্‌ হুপ্‌ করে লাফাতে লাগল।

আভু—এই ছাড়—ছাড় বলছি! এখুনি ঠাকুমা আসলে বুঝিয়ে দেবে মজা!

বিশু—কক্ষনো ছাড়িব না ওকে, তাতে যাই হয় হোক!

বাসু—আমিও ছাড়ব না আজ—আসুক ঠাকুমা…

মাভু—ও ঠাকুমা, তুমি শীগ্‌গির এসো। এখানে ভীষণ মারামারি সুরু হয়ে গেছে। এসো শীগ্‌গির।

চেচাতে চেঁচাতে মাভু ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

পানু—ভিষণ যুদ্ধ হচ্ছে নালে দিদি। কি মজা হুপ্‌ হুপ্‌।

আভু—চুপ কর পাজী ছেলে! ঠাকুমা এলে বুঝিয়ে দেবে মজা!

বাইরে ঠাকুমার গলা শোনা গেল—তখনি বলেছিলাম এসব দস্যিদের সামলান আমার কাজ নয়, তা কে শোনে আমার কথা! দু'দণ্ড চোখ বুজেছি এর মধ্যেই খুনোখুনি! বলি পাজী হতচ্ছাড়ার দল—আজ দেখাচ্ছি তোদের মজা!…

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ থেমে গেল। বাসু ও বিশু দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি জামার ধুলো ঝাড়তে লাগল। যেন কিছুই হয়নি। ওরা দু'জনেই তখন হাঁপাচ্ছে।

দরজার দিকে তাকিয়ে সভয়ে পানু বলল—থাকুমা! ঘরে ঢুকলেন ঠাকুমা।

অন্ধকারের পর আলো

শ্রীরমণীমোহন পাল　　উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইতিমধ্যে তাঁরা পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। লিলির মায়ের কথা শুনে রজত বললে, 'আমি সব চেয়ে ধনী হলুম কি ক'রে ?'

লিলি বললে, 'এটা বুঝতে পারলে না রজত'দা। রত্নভাণ্ডারের আবিষ্কারক হচ্ছ তুমি। কাজেই এ সমস্তের মালিকও তুমি।'

রজত মহা আপত্তি জানিয়ে বললে, 'সে কিছুতেই হতে পারে না ড্যাডি। আমি আপনাদের আশ্রয়ে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার নামে জমি কেনা চলবে না।'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'তুমি তোমার ভাগ্যবলে রত্নাগার আবিষ্কার করেছ। ওতে আমাদের কোন অধিকার থাকতে পারে না। সুতরাং জমিটা তোমার নামে ছাড়া আর কার নামে কেনা হবে বল।'

রজত মলিন মুখে বললে, 'বাপ-মাকে হারিয়ে আপনাদের মধ্যেই বাপ-মায়ের স্নেহ ফিরে পেয়েছি। এখন আপনারাই আমাকে পর করে দিচ্ছেন। তাই লোকে বলে, অর্থই সব অনর্থের মূল। রত্নাগার আবিষ্কারে আমারই বেশী ক্ষতি হ'ল দেখছি।'

মিঃ পিয়ার্সন রজতের একখানা হাত সস্নেহে ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'মন খারাপ করো না

রজত। আমরা তোমাকে পর করেও দিচ্ছি না, আর অর্থ তোমার কোন ক্ষতি করতেও পারবে না। তুমি রত্নাগারের মালিক হতে ভয় পাচ্ছ কেন? অর্থ কি কেবল বিলাসিতাই আনে? নিঃস্বার্থ ব্যক্তির অর্থ অশেষ কল্যাণসাধন করে। এ পৃথিবীতে অর্থের প্রয়োজন কত? ঐ অর্থ দিয়ে তুমি লোকের কত উপকার করতে পারবে। দু'তিন বছরের মধ্যে রেলপথ বসাবার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাব। যে অল্পকাল আমি ভারতবর্ষে কাটিয়েছি তাতে জনসাধারণের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, নানা প্রকার রোগ, অশিক্ষা প্রভৃতি আমাকে পীড়িত করেছে। ভগবানের দয়ায় আজ যখন তুমি প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছ, তখন ঐ অর্থ দিয়ে নানা স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস, গ্রামের সংস্কার, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য প্রভৃতি কত কী করতে পার। অর্থের দাস না হয়ে অর্থকে ভগবানের দান মনে করে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করে যাবে। তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।'

রজত মিঃ পিয়ার্সনের কথায় খুশি মনে বললে, 'বেশ, আমি নিতে রাজি আছি। তবে আপনার ও আমার যুক্ত নামে জমিটা কিনতে হবে।'

মিঃ পিয়ার্সন অগত্যা সম্মত হলেন।

তারপর জমির চৌহদ্দী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সম্বন্ধে তাঁরা যখন আলোচনায় রত ছিলেন, তখন একটা প্রচণ্ড শব্দে তাঁরা চমকিত হলেন। তাঁদের পায়ের তলায় মাটিও ভূকম্পনের ন্যায় কেঁপে উঠলো। শব্দটা পাহাড়ের উপর থেকে এসেছিল বলে মনে হ'ল। কি ঘটেছে তা জানবার জন্য সকলে দ্রুত পাহাড়ের কাছে ফিরে এলেন। পাহাড়ে উঠে দেখেন, যে গুহা-পথ দিয়ে রজত ও লিলি কিছু পূর্বে হীরে এনেছিল, সে পথ ওপরের রাশি রাশি পাথর চাপা পড়ে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। সকলে এই আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। রজত ও লিলি ভিতরে থাকার সময় দুর্ঘটনা ঘটলে কি সর্বনাশই না হ'ত—এই কথা চিন্তা করে তাঁরা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

লিলি বললে, 'পাথর ধসে পড়ার শব্দ হওয়ার আগে রিভলবারের আওয়াজের মত একটা শব্দ আমার কানে গিয়েছিল।'

সে-কথা সমর্থন করে রজত গুহার মুখ ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'ড্যাডি, শীগ্‌গির আসুন। এখানে একটা লোক পাথরের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে।'

এবার অনেকেই পাহাড়ে উঠে এসেছিল। মিঃ পিয়ার্সন কয়েক জনকে গুহার মুখ পরিষ্কার করার আদেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তারা পাথর সরিয়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ একজন লোককে বার করে নিয়ে এল। রজতরা বিস্মিত হয়ে দেখলে যে, সে আর কেউ নয় মদন।

সেদিন সকালে মদন আর কৈলাসকে মিঃ পিয়ার্সন বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে কিছু অর্থ

দিয়ে বিদায় করেছিলেন। তাকে এই রকম অবস্থায় গুহা-মুখে পড়ে থাকতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। মদনের দেহে তখনও প্রাণ আছে বলে বোধ হ'ল। রজতের সঙ্গে জলের বোতল ছিল। তা থেকে জল নিয়ে মদনের মুখে-চোখে দিয়ে শুশ্রূষা করায় তার জ্ঞান ফিরে এল।

রজতের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বললে, 'পাপের ফল ফলতে চলেছে, রজতবাবু।'

মিঃ পিয়ার্সন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে কি করতে এসেছিলে মদন?'

এক ঢোঁক জল খেয়ে মদন মৃদুস্বরে বললে, 'আর বেশীক্ষণ বাঁচব না বুঝতে পারছি। সব কথাই বলছি সাহেব। আজ সকালে আপনি আমাদের ছেড়ে দিলেন। দেশেই ফিরে যাচ্ছিলুম। কৈলাস লোভ দেখালে। সে বললে, আপনারা নাকি রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন, দেশে ফিরে যাবার আগে সেখান থেকে কিছু নিয়ে যেতে হবে। আপনারা পাহাড়ের দিকে যেতে আমরা দু'জনে বনের আড়াল দিয়ে লুকিয়ে এসে একটা গাছে চড়ে সব দেখছিলুম। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে রজতবাবু ও মিস্ লিলিকে দেখতে পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে তাদের আবার দেখা গেল। তারা আপনাদের কি যেন দেখাতে লাগলো। রোদ্দুর পড়ে সেগুলোকে চকচক করতে দেখে কৈলাস বলে উঠলো ওগুলো হীরে ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা বুঝলুম, পাহাড়ের ওপরে কোন গুপ্তস্থানে হীরের খনি আছে। আপনারা পহাড় থেকে নামতেই আমরা অন্য রাস্তা ধরে সেখনে পৌছলুম। তারপর অল্প অনুসন্ধান করতেই গুহাটা দেখতে পেলুম। গুহা-পথে কিছুদূর যেতেই অসংখ্য হীরে দেখে আমাদের চোখ ঝলসে গেল। এমন সময়ে হঠাৎ সামনে এক বিরাট পাইথান এসে হাজির। কৈলাস আসবার সময় আপনাদের ঘর থেকে একটা রিভলবার যোগাড় করে এনেছিল। সে পাইথনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে। গুলিটা পাইথনের মাথায় না লেগে পিঠে লাগলো। ক্রুদ্ধ পাইথনটা আমাদের দিকে তেড়ে এল। কৈলাস পালাতে পালাতে গুলি ছুড়তে লাগলো। আমি আগে থেকেই পালিয়েছিলুম। গুহার মুখের কাছে আসতেই মনে হ'ল যেন সমস্ত গুহাটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। তারপর আর কিছু জানি না।'

একটানা অনেকগুলো কথা বলে মদন হাঁপিয়ে পড়লো। তারপর রজতের কাছ থেকে একটু জল খেয়ে চুপ করে পড়ে রইলো।

রজত জিজ্ঞাসা করলে, 'কৈলাসের কি হ'ল জান?'

মদন বহুকষ্টে বললে, 'সে আমার পিছনে ছিল। কজেই সে গুহা থেকে বেরোতে পারেনি।' —তারপর তার বাকরোধ হয়ে গেল, সে আর কথা কইতে পারলে না।

লিলি জানতে চাইল, 'কিন্তু এত পাথর ধ'সে পড়লো কেন ড্যাডি?'

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'রিভলবারের গুলি ছোড়ায় যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা

গুহার গায়ে আঘাত লেগে সারা গুহাটা কেঁপে ওঠে। ফলে ওপর থেকে আলগা পাথর ধসে নীচের গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে।'

এই সময়ে মদন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

রজত ম্লানমুখে বললে, 'ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমরা পাইথনের কবলে পড়িনি। এ অভিশপ্ত পাহাড় নিয়ে আর কাজ নেই। আমরা যা পেয়েছি, তাই যথেষ্ট।

মিঃ পিয়ার্সন বললেন, মনে কুসংস্কার এনো না রজত। পাইথন তোমার দুষ্টগ্রহকে ধ্বংস করে নিজেও পাথর চাপা পড়ে মরেছে। সুতরাং তোমার ভাগ্য এখন সুপ্রসন্ন।'

তারপর তাঁরা মদনের সৎকারের ব্যবস্থা করে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

সমাপ্ত

ইহুদি মেনুহিনের নেহেরু লাভ

দিল্লী বিমান বন্দরে মেনুহিনের সম্বর্ধনায় গ্রামোফন কোম্পানীর মিঃ দুবে ও মিঃ গৌতম

প্রখ্যাত এইচ-এম-ভি-শিল্পী ও বিশ্ব বিশ্রুত বেহালা বাদক ইহুদি মেনুহিন গত ৪ নভেম্বর নয়া দিল্লীতে এসেছিলেন ১৯৬৮ সালের নেহরু পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। আন্তর্জাতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শিল্পীর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী ডায়না এবং ভগ্নী হেপজিবা। পালাম বিমান বন্দরে গ্রামফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে শিল্পী পরিবারকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। দিল্লীতে নানারকম পোস্টারে ও বিপণি-সজ্জায় তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। গ্রামফোন কোম্পানীর জাতীয় রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রী ডি. কে. দুবে মেনুহিন-পরিবারকে দিল্লী থেকে বোম্বে নিয়ে যান। বোম্বেতেও তাঁদের বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়।

৪ নভেম্বর ত্রিমূর্তি ভবনে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি. ভি. গিরি এক লক্ষ টাকার নেহেরু পুরস্কার এবং একটি অভিজ্ঞান-পত্র মেনুহিনকে প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

তিনটি হাঁচি

ডঃ প্রদোষচন্দ্র রায় চৌধুরী

একদিন জীন একটা গাছে উঠে রান্না করার কাঠের জন্য একটা বড় ডালে বসে সেই ডাল-টাই কাটতে আরম্ভ করল। জীন খুব বোকা ও হাদা। তার বোকামির জন্য সবাই তাকে "হাদা জীন" বলে ডাকে। সে তার জন্য মোটেই বিরক্ত হয় না, বরং দাঁত বের করে হাসে। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে, সে জন্য প্রায়ই তাকে মুস্কিলে পড়তে হয়।

'তুমি এর আগে কখনও গাছে উঠে তার ডাল কেটেছ?'

জীনের গাধা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় এক বুড়ো ঘোড়ায় চড়ে সেখান দিয়ে যাবার সময় জীনকে ডেকে বলল, "ওহে বাবু, তুমি এর আগে কখনও গাছে উঠে তার ডাল কেটেছ?" খুব বিরক্তির সঙ্গে জীন উত্তর করল, "জানো, সারা জীবনে আমি যত কা

কেটেছি সে সব একত্র করলে একটা বড় জঙ্গল হয়ে যাবে।" বুড়ো বলল, "আমার তা মনে হয় না।" "কেন ?" বলে জীন চীৎকার করে উঠল।

বুড়ো হেসে বলল, "যে ডালে বসেছ সেই ডাল কাটলে ডালের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মাটিতে পড়ে যাবে।" খুব রাগের সঙ্গে জীন বলে উঠল, "যাও বুড়ো, তুমি বিদেয় হও। বেশ বুঝতে পারছি তুমি গাছের ডাল কাটা সম্বন্ধে কিছুই জানো না।"

বুড়ো চলে গেল। জীন খুব জোরে জোরে ডাল কাটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মড়মড় করে ডাল ভেঙে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে জীনও মাটিতে পড়ে গেল। জীন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ভাল করে দেখল যে তার হাত-পা কিছুই ভাঙেনি, কেবল একটু ছড়ে গেছে। তখন সে মনে মনে ভাবল, "সত্যি, বুড়ো লোকটি অনেক কিছু জানে। সে বলে গেল যে ডাল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মাটিতে পড়ে যাব। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার কাছ থেকে ভবিষ্যতের কয়েকটা খবর জেনে নি।" এই ঠিক করে সে গাধায় চড়ে বুড়োকে ধরার জন্য খুব জোরে চলল।

অনেক দূরে গিয়ে সে দেখল, বুড় এক গাছের নীচে ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম করছে। তখন সে তার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি তো খুব সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। আমি আপনাকে দু-তিনটে প্রশ্ন জিগেস করতে চাই।" বুড়ো জিগেস করল, "তুমি কি করে বুঝলে যে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি ?" উত্তরে জীন বললে, "আপনি বললেন যে আমি গাছের ডাল কাটলে, সেটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মাটিতে পড়ে যাব। আর ঠিক তাই হয়েছে।"

বুড়ো হেসে বলল, "তাই নাকি। আচ্ছা তুমি প্রশ্ন করতে পার। আমি কিন্তু মাত্র একটার উত্তর দেব।" জীন বলল, "তাই হোক। আমি মাত্র একটা কথাই জানতে চাই। সেটা হচ্ছে আমি কবে মারা যাব ?" বুড়ো লোকটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "সেটা খুবই সোজা। তোমার গাধা যেদিন তিনবার হাঁচবে, সেদিনই তুমি মারা যাবে।" এই বলে সে তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

জীন ভাবল, "আমার গাধা কখনো হাঁচে না, সুতরাং আমি অনেক বছর বেচে থাকব।" সে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি মনে বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

সবাই জানে যে গাধারা সত্যি খুব বোকা, তাদের বুদ্ধি ব'লে কিছু নেই। কিন্তু তারা ভীষণ গোঁয়ার—তাদের যা করতে বলা হবে তারা ঠিক তার উল্টো করবে। তাদের হাঁটতে বললে কিছুতেই নড়বে না, থাম্বার মতন দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা দরকার, তখন তারা গুটগট করে হাঁটবে। গাধারা সত্যি-সত্যিই সহজে হাঁচে না। কিন্তু যখন তার গাধা অনেক দিন পরে হাঁচবে ভেবে জীন খুব নিশ্চিন্ত ও খুশি মনে

বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, তখন গাধাটা হঠাৎ "হাঁচ্চো" করে খুব জোরে একটা হেঁচে ফেলল। জীন তো ভয়ে কাঠ। তার সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। সে ভয়ে অস্থির হয়ে গাধার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে দু'হাতে গাধার দুটো নাক প্রাণপণে চেপে ধরল। একবার হাঁচলে একটু পরে আবার হাঁচি হয়। নাক চেপে রাখলে হাঁচি বন্ধ হয়ে যায়। নাক অনেকক্ষণ ধরে রাখার পর, যখন বিপদ কেটে গেছে সে বুঝতে পারল, তখন জীন নাক ছেড়ে গাধার সঙ্গে সঙ্গে হাটতে লাগল। তাহলে এর পরে হাঁচি এলে সে সহজেই আটকাতে পারবে।

আধ ঘণ্টা হাটার পর ওরা এক মাঠে এল। সেখানে মস্ত বড় গমের ক্ষেত। সুন্দর ফসল হয়েছে দেখে জীনের খুব আনন্দ হ'ল। সে গাধার হাঁচির কথা ভুলে দু'হাত গাছগুলোর উপরে বোলেচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ গাধাটা আবার "হাঁচ্চো" করে উঠল। জীন তাড়াতাড়ি তার টুপি দিয়ে গাধার নাকটা চেপে ধরল, আর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "সর্বনাশ!" দুটো হাঁচি হয়ে গেল। সর্বনেশে দুটো হাঁচি হয়ে গেল, আর মাত্র একটা হাঁচি হলেই আমি মরব! হায় হায়, আমার মতন দুঃখী আর কে আছে? সেই বুড়োটা নিশ্চয় শয়তান নিজে! সে শুধু ভবিষ্যৎ বলে না, সে আমার গাধাকে দিয়ে হাঁচাচ্ছে, আমার গাধাকে যাদু করেছে!"

ভয়ের চোটে গাধার নাক খুব জোরে চেপে ধরাতে গাধার দম বন্ধ হয়ে আসল। সে জীনকে খুব জোরে লাথি মেরে ফেলে দিল। জীন উঠে দুটো গোল পাথর নিয়ে বোতলের মুখে যেমন ছিপি লাগায়, তেমনি গাধার দুই নাকে ভরে দিল। ভাবল, গাধা হাঁচতে পারবে না।

কিন্তু তার কপাল খারাপ। হঠাৎ "হাঁচ্চো" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাধার পাথর দুটো বন্দুকের গুলির মতন ছিট্‌কে এসে জীনের গায়ে লাগল। জীন চীৎকার করে উঠল, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, আমি মরে গেছি—একেবারে মরে গেছি!" ব'লে তাড়াতাড়ি সে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

তোমরাই বল, মরা মানুষ কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?*

*সুইজারল্যাণ্ডের রূপকথা থেকে।

কুমুদরঞ্জন স্মরণে

শ্রীবন্দনা চট্টোপাধ্যায়

প্রাণ পেল যে পল্লী-গাথা
তোমার যাদু-স্পর্শে,
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর গান
জেগেছিল নব হর্ষে।

পল্লী-মায়ের কোল-জোড়া ধন
তোমারে বরণ করি,
আজিকে তোমার মহাপ্রয়াণে
বার বার তোমা স্মরি'।

দেশদ্রোহীর পরিণাম

শ্রীমোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ সোনার দেশ। সেখানকার মাটিতে নাকি তাল তাল সোনা পাওয়া যায়। সুদূর সমুদ্রপারের দেশে এই ধরণের বিচিত্র-সংবাদ লোকমুখে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানকার নানা জাতির মধ্যে ভারতে আসার প্রতিযোগিতা বেড়েই চলেছিল। সোনার লোভেই ভারতে এসেছিল পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী আর ইংরেজ। উদ্দেশ্য, ভারতের সোনায় নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করা। যখনকার কথা বলছি, তখন ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসী জাতিই সবচেয়ে শক্তিশালী বলে নাম করেছে এবং ভারতে বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য এদের মধ্যে চলেছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এই সূত্রে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যখন ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে লড়াই শুরু হ'ল, তখন তার ঢেউ ভারতের উপকূলে এসে পৌছুতেও খুব বেশী বিলম্ব হ'ল না। তখন ভারতের ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল কলকাতা, আর ফরাসীদের ছিল চন্দননগর।

কলকাতায় ইংরেজরা খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তাই মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ওদের বেশ সুনজরে দেখেন নি। নিজের রাজ্যে তাদের শক্তি যাতে না বাড়ে এই উদ্দেশ্যে নবাব সহসা সসৈন্যে তাদের আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। তবে ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অসম সাহসিক কর্মী খ্যাতিমান রবার্ট ক্লাইভ কিন্তু তাতে একেবারে দমে যাননি। তিনি সুকৌশলে নিজেদের প্রভাব ও সম্মান অনেক পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলেও এ দেশে যাতে লড়াই না হয়, ইংরেজ ও ফরাসী জাতির মধ্যে সদ্ভাব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, চতুর ক্লাইভ চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর রেনডের সঙ্গে আগে থেকেই এইরূপ একটি প্রস্তাব করে রেখেছিলেন। মিঃ রেনডেরও তাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু ক্লাইভই শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে, অবশেষে ক্লাইভ অতর্কিতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফরাসীদের আক্রমণ করে বসলেন। একদিকে ওয়াট্সন জলপথে সমস্ত জাহাজ ও নৌ-সৈন্য নিয়ে, অন্যদিকে স্বয়ং ক্লাইভ নিজ সৈন্য নিয়ে স্থলপথে চন্দননগর অবরোধ করলেন। নয়দিন ঘোরতর সংগ্রামের পর ভাগ্যলক্ষ্মী অবশেষে ক্লাইভের গলাতেই পরিয়ে দিল বিজয়মাল্য।

কথিত আছে, ফরাসীদের এই পরাজয়ের মূলে ছিল জনৈক ফরাসী কর্মচারীর বিশ্বাস-ঘাতকতা। ফরাসী গভর্ণর লড়াই-এর পূর্বে গঙ্গা গর্ভে বহু নৌকা ডুবিয়ে রেখেছিলেন। ইংরেজদের জাহাজ যাতে আসতে না পারে, তার জন্যে নদীর প্রায় সমগ্র অংশটুকুই রুদ্ধ করেছিল। শুধু নিজেদের সুবিধার জন্যে এক জায়গায় একটু খালি পথ মুক্ত রাখা ছিল। মাত্র একজন ফরাসী কর্মচারী ছাড়া এ পথের সন্ধান আর কারও জানা ছিল না। একদিন ফরাসী গভর্ণর রেনডের সঙ্গে

এই কর্মচারীর কোন কারণে মতের গরমিল হয়। গভর্ণরের ব্যবহারে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলো এবং রাগে, দুঃখে ও জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, নিজেদের দল ছেড়ে সেই ফরাসী যুবক ইংরেজদের দলে এসে মিলিত হয়। ধূর্ত ক্লাইভ অখুশি তো হলেনই না, বরং তাকে সাদরে ডেকে এনে সাগ্রহে আপন সৈন্যদলে নিযুক্ত করে নিলেন। ফরাসী সন্তানটির বুকের আগুন তখনও নেভেনি। এই সৈনিকই একদিন নদীগর্ভের গোপন ক্ষুদ্র পথের সন্ধান জানিয়ে দিল ক্লাইভকে। ফলে ফরাসীদের পক্ষে ইংরেজ নৌ-বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব হ'ল না। ক্লাইভ অনায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন।

অতঃপর একদিন ইউরোপের লড়াই থামলো এবং ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ এলো। কিন্তু সেই ফরাসী সৈনিকটি আর নিজের দলে ফিরে গেল না। ইংরেজদের অধীনেই কাজ করতে লাগলো সে।

দিন যায়। খুব সুনাম হয় তার কাজে। ক্রমে জীবনে আসে সুখ-ঐশ্বর্য, আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য। এই সুখের দিনে তার মনে পড়লো বৃদ্ধা পিতাকে। তাই নিজের উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ পিতাকে খুশি করার জন্যে ফ্রান্সে সে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত অর্থই তার কাছে আবার ফিরে এলো। তার সঙ্গে এলো একটি চিঠি। তার মর্ম হ'ল: যে পুত্র বিশ্বাসহন্তা, দেশের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন, এবং স্বজাতির প্রতি কর্তব্যজ্ঞানহীন সে বিত্তবান হলেও তার প্রেরিত অর্থ গ্রহণ করতে তার পিতা ঘৃণা বোধ করে!

পিতার এই অর্থ প্রত্যাখ্যানের ভাষা পুত্রের বুকে বজ্রের মতো কঠোর হয়ে বাজলো। সে যে ভুল করেছে, অন্যায় করেছে, একথা কোনদিন তার মনে হয়নি। আজ এতদিন পরে তার বাবা যেন চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিলেন। একটি নতুন চেতনা জাগলো তার মনে। দেশাত্মবোধ, স্বজাতি-প্রীতি ও আত্মসম্মান যে মহামূল্যবান বস্তু, এতকাল পরে যেন সে নতুন করে তা উপলব্ধি করলো। নিজের বিশ্বাসঘাকতার কথা মনে করে তার সমস্ত অন্তরাত্মা লজ্জায়, ঘৃণায় ও অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে উঠলো! মনে হ'ল—ছি, ছি, জেদ ও রাগের বশে কী অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিয়েছে সে! এ অপরাধ করার আগে তার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অনুতাপের তীব্র দহনে তার জীবন হয়ে উঠলো বিষাদ ও বিষময়। এই যন্ত্রণায় হাত এড়াতে একদিন এই হতভাগ্য ফরাসী যুবক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো। ভাগ্যহীন যুবক ভেবেছিল মৃত্যু ছাড়া তার কৃত অপরাধের আর বুঝি যোগ্যতর কোন শাস্তি ছিল না। তাছাড়া হয়তো তার মনে হয়েছিল, একবার মরণ-সমুদ্রে ডুবতে পারলে তার কথা আর মনে রাখবে কে? কিন্তু সে জানতো না, নির্মম ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। তার বুকের খাতায় সবকিছুই সে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখে। তাই তার বৃদ্ধ পিতার চিঠির মর্মটুকু আজও

অম্লান হয়ে আছে ইতিহাসে : টেরেনো, তোমার পিতা দরিদ্র হলেও দেশের শত্রু নয়। তুমি তোমার পিতার কুপুত্র। তুমি স্বজাতিদ্রোহী।

টেরেনো মৃত্যুবরণ করে নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, কিন্তু তবু দেশবাসীর কাছে সে ক্ষমা পায়নি। আমাদের দেশেও এমনি অজস্র টেরেনোর ছড়াছড়ি, কিন্তু দেশ ও কাল কি এদের কোনদিন ক্ষমা করবে?

খাইখাই

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মনের মতন খাবারটি চাই নইলে কিছুই খান না,
ভোরে উঠেই ভাবেন খোকন কখন হবে রান্না!
পেঁয়াজ-মুড়ি—আদার কুচি?—
মোটেই বাছার নেই অরুচি!—
দই চিঁড়ে আর চাটিম কলা পেলে কিছুই চান না।

হিং-কচুরি, মশ্‌লা আলু—হাজার রকম বায়না;—
খেতেই হবে—মিলবে যাহা বাংলা থেকে চায়না!
বইটি নিয়ে গোমড়া মুখে
থাকেন বসে মনের দুখে,—
আঁকের বেলায় ভ্যাঁক্ ক'রে তাঁর হবেই সুরু কান্না।

ডজন ডজন 'লজেন' সাবাড়,—এম্নি ছেলে দস্যি!
হ্যাঁচ্চো ক'রে হাঁচেন নিয়ে ডিবেয় থেকে নস্যি।
আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে
দিতে আমায় বলেন রে রে!—
যা' চাই যাদুর তক্ষুনি চাই, নইলে বাঁচে প্রাণ না।

পারিনে তা'র উঠতে এঁটে,—ছেলে তো একতোল্লা,
নিম্‌কি-গজা খেয়েই বলেন, "আন্ রে রসগোল্লা!"
কেবল খাওয়া, এবং খেলা,
যায় কেটে তার সারা বেলা;
লুচির গন্ধ পেলে খোকন ভুলেও শুতে যান না!

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দুই

কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তুংকা দেখল, সে স্কুলের লনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর পাশেই বেবি ক্লাস। ওপাশে ক্লাস ওয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে রিংকু দিদি, ভ্রমর আরো অনেকে। তুংকাকে দেখেই বেবি ক্লাস ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল।

তুংকা জিজ্ঞাসা করল : "তুমি কাঁদছ কেন ?"

বেবি ক্লাস ফোঁপাতে ফোঁপাতে উত্তর দিল : দেখ না', ওয়ান ক্লাস আমাকে ভেঙাচ্ছে। বলছে—"গো টু জেল।" তুমি রিংকু দিদিকে একটু বলে দাও না—যেন ওর ক্লাসকে মানা করে।

বেবি ক্লাসের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ক্লাস ওয়ান বলতে লাগল :

"বেবি ক্লাস—
এম-এ পাশ,
বি-এ ফেল
গো টু জেল।
গো টু জেল
গো টু জেল
গো টু জেল।"

বেবি ক্লাস আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। রিংকু দিদি ক্লাস ওয়ানকে বকতে লাগলো। এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে টেলিফোন সেখানে হাজির। মুখের সামনে লাউড-স্পীকার লাগিয়ে ঘোষণা করে চলেছে: "চিংড়ি পাওয়া গেছে, চিংড়ি পাওয়া গেছে। সব ক্লাস শীগগির লনের ওপাশে জমা হও।"

ঝগড়া আর কান্না ভুলে ক্লাস ওয়ান আর বেবি ক্লাস লনের ওপাশে ছুটল। টেলিফোন, তুংকা ও রিংকুও তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল।

লনের ওপর ছোট একটা চিংড়ি মাছ ঘাসের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করছে আর তাকে ঘিরে সব ক্লাসরুম দাঁড়িয়ে। টেলিফোন লাউড-স্পীকারে ঘোষণা করল: "এবার নাচ শুরু হবে।" সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ক্লাসরুমগুলি নাচতে আরম্ভ করল।

"হোয়াট ইজ দিস্?
চিংড়ি ফিশ্!
তুই ও খাস্—
আমায় দিস্
পচে গেলে—
ফেলে দিস।"

নাচ চলতে লাগল আর চিংড়িও রাগে ফুলতে লাগল। ফুলতে ফুলতে চিংড়ির মাথা বেবি ক্লাসের মাথা ছাড়িয়ে উঠল।

"ভারী আস্পর্ধা হয়েছে আমাকে খাবি। পচে গেলে ফেলে দিবি। দাঁড়া দেখাচ্ছি!" এই বলে বেবি ক্লাসকে ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরতেই বেগতিক দেখে টেলিফোন আবার ঘন্টি বাজিয়ে লাউড-স্পীকারে চেঁচিয়ে উঠল: "চিংড়ির নাচ এখন শেষ, এবার ঘরে চল।" বলতে বলতেই চিংড়ি ছোট্ট হয়ে মিলিয়ে গেল ঘাসের মধ্যে। ক্লাসরুমরা দৌড়ুতে দৌড়ুতে হল-ঘরের চারধারে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

তিন

বাইরে থেকে তুংকা দেখল হলঘর একদম ভরতি। একধারে দিদিমণিরা দাঁড়িয়ে, অন্য দিকে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা। সকলের সামনে ধবধবে সাদা পোশাক-পরা বড়দিদিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু হলঘরে পা দিতে-দিতেই সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। দেওয়ালের ঘড়িটার পেণ্ডুলাম জোরে জোরে দোল খেতে খেতে বলে চলেছে:

"লিখনা পড়না সাড়ে বাইশ,
স্কুল বহি মে নাম লিখাইস্
লিখনা পড়না সাড়ে বাইশ
লিখনা পড়না সাড়ে বাইশ।"

কাগজ খাতা নোটবুক পালাচ্ছে, পেছনে ছুটছে কলমের ঝাঁক, আর তাদের পেছনে পেছনে কালির দোয়াত। মনের আনন্দে দোয়াতরা আকাশে ডিগবাজি খাচ্ছে। আকাশে লাল আর কালো রঙের প্রলেপ। ফাউন্টেন পেন ছুটতে ছুটতে রত্নার কাছে হাজির হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: "রত্না দিদি, আমি তোমার জন্য আজকে অনেক ভাল ভাল ভাষণ কলমের মধ্যে ভরে রেখেছি। দেখ পছন্দ হয় কি না?"

একটু প্যাঁচ ঘোরাতেই ফরফর আকাশের গায়ে অনেক লেখা বেরিয়ে এল, তুংকা পড়তে লাগল: "আমাদের আদরের স্কুল, আমি আর আমার ভাইবোনেরা তোমাকে খুউব ভালবাসি। আজ তোমার জন্মদিনে তোমার জন্য আমরা রাত জেগে মালা গেঁথেছি।"

এমন সময় কোণ থেকে রেডিও চেঁচিয়ে উঠল: "রত্না দিদি, এদিকে এসো, এদিকে।"

রেডিওর গলার স্বর শোনা মাত্রই ফাউন্টেন পেন লেখাটা ফের খাপের মধ্যে পুরে নিয়ে এক কোণে গিয়ে ভাবতে আরম্ভ করল। রেডিও ততক্ষণে রত্নাদি'র পাশে এসে বলতে আরম্ভ করেছে: "ফাউন্টেন পেনের কথায় ভুলো না রত্না দিদি। লেখাপড়ার যুগ অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন দেখাশোনার যুগ; এসো তোমার মাথায় দু'নম্বর ভাষণ ভরে দিই।"

"প্যারে ভাইয়েঁ। ঔর বহনো,

পূজ্য স্কুলকা জন্মদিবস কা সুনীত অবসর পর…"

ততক্ষণে হলঘরের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ডেস্ক সব লাফালাফি, চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। গোলমাল দেখে রেডিও ভাষণ থামিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে মুখ ঢেকে বসে রইল। কি শুনি কি হয় বলা যায় না। কিছুক্ষণ পরে হেড্‌মিস্ট্রেসের চেয়ার ডায়াসের ওপর উঠে প্রস্তাব করল:

"আজ স্কুলের জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের নাচ হবে—যারা এ প্রস্তাবে রাজী আছ একবার মেঝের ওপর পা ঠোকো।" বলতে বলতে ডেস্কের কাচের দোয়াতখানি লাফিয়ে মেঝের ওপর পড়ল। মেঝে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল, কাচ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে চেঁচিয়ে উঠল: "এই ছুটির দিনে ভাল করে ঘুমোবারও উপায় নেই! তুংকা, রিংকু, পম্পু, বেবি, ভ্রমর দোয়াত ভাঙছে কেন? দিদিমণিকে বলে দেব।"

তুংকা : "বা রে, আমরা কোথায় দোয়াত ভাঙলাম। দোয়াত তো নিজেই মাটিতে পড়ে ভেঙে গেছে।"

ততক্ষণে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ. ডেস্ক সকলেই চেঁচাতে আরম্ভ করেছে : "আসুন মিস স্লোর, আসুন, এখন টুইস্ট নাচ হবে।"

মিস স্লোর : "ওসব একেলে টুইস্ট নাচ আমার জানা নেই। যদি তাণ্ডব নাচ নাচো তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে নাচতে পারি।"

অমনি টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ডেস্ক, বুক-স্ট্যাণ্ড সবাই উদ্দাম নাচ আরম্ভ করল, আর তার সঙ্গে গান ধরল :

"আজকে স্কুলের জন্মদিন।
নাচব সবাই তা ধিন ধিন।
মনের সুখে গাইব গান,
দিল্লী থেকে বর্ধমান।"

তুংকার চোখের সামনে থেকে রত্নাদিদি, রিংকু, দিদিমণিরা সরে যেতে লাগল, চারিধার ঘুরতে লাগল। একসময় হুড়মুড় করে তুংকা মেঝের ওপর পড়ে গেল। (ক্রমশঃ)

আজব কাণ্ড

শ্রীসুলেখা হাণ্ডে

আরে আরে একি একি
আজগুবি সবি দেখি
কোথা গেল হাতিটার মুণ্ড!
সিংহের শিং দুটো—
কাল কাল ফুটো ফুটো
কোথা থেকে এল তার শুণ্ড!
ভালুকের চার পায়ে
বুকে পিঠে সারা গায়ে
এত রং হ'ল বল কেমনে?
ক্যাঙারুটা এক মনে—
দড়ি দিয়ে জামা বোনে
পিছে তার দড়ি চোবে বামনে॥

ঘোড়াটার ঝাড়ু মাথা
এক ঠ্যাং-এ ধরে ছাতা
এক মনে করে যায় চিন্তা;
গাধাটার একি হ'ল—
ঘাস খেতে ভুলে গেল
থালা ভরে খায় ও যে পান্তা!
ছুঁচো, প্যাঁচা, কচ্ছপে
বসে এক কুল ঝোঁপে
চুপচাপ খেলে যায় বিন্তি।
তেলে ফেলে মাছখানা—
বই হাতে ব্যাঙছানা
আনমোনে নেড়ে যায় খুন্তি॥

নটরাজের রূপকথা

শ্রীমতী সুধা বসু

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো মূর্তি হোল শিবের। মহেনজোদড়োতে পশুপতি শিবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ওখানকার দুই একটি নারীমূর্তিকেও পণ্ডিতরা জগন্মাতার মূর্তি বলে মনে করেন।

তারপরে কয়েক শ' বছরের মধ্যেও যে আর দেবতার মূর্তি হয়েছিল এমন কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। পৌরণিক যুগে যখন মূর্তি গড়ে পূজা করার নিয়ম হোল, তখন কিন্তু তা ইচ্ছে মত তৈরী করা যেত না। প্রতিটি দেবদেবীর মূর্তির জন্য ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন সব ধ্যানমন্ত্র রচনা করে দিলেন। সেই অনুসারে সব মূর্তি প্রতিমা তৈরী হতে লাগলো। শিবের মূর্তির জন্যও নানারকম ধ্যানমন্ত্র রচিত হয়েছিল। শিবের প্রধানতঃ দুটি রূপ—একটি শান্ত, আর একটি ভয়ংকর বা রুদ্র। শিব মূলতঃ দ্রাবিড় জাতির দেবতা। তাই দক্ষিণ ভারতে শিবের আরও নানারকম মূর্তির প্রচলন হয়েছিল খুব পুরানো কাল থেকেই।

শিবের নানা মূর্তির মধ্যে নটরাজ রূপটিই সকলের কাছে খুব প্রিয়। দক্ষিণ ভারতের মত আর কোথাও এ মূর্তি তৈরী হয়নি। প্রাচীনকালে তা তৈরী হয়েছে পাথরে ও শিলাফলকে। তারপরে মধ্যযুগ থেকে তৈরী হচ্ছে পঞ্চলৌহ বা ব্রোঞ্জে। ধাতুতে গড়া দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তি শিবের ভক্ত পূজারীদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস ও ধ্যানের ধন তো বটেই, তাছাড়া মূর্তি হিসেবেও এর খ্যাতি জগৎজোড়া। এই মূর্তি সারা বিশ্বের কলা রসিক ও সুন্দরের পূজারীদের কাছে বিস্ময় ও আনন্দের উৎস। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর ওগুস্ত রঁদা বলেছেন যে, ভারতের নটরাজ মূর্তির দেহভঙ্গী ও হাতের মুদ্রার মত সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

নটরাজের রূপ বর্ণনা আছে নানা শিল্পশাস্ত্রের গ্রন্থে। দক্ষিণ ভারতের একখানি গ্রন্থের নাম 'কোইল পুরাণম্'। তামিল ভাষায় 'কোইল' কথাটির অর্থ মন্দির। এই পুঁথিখানিতে নটরাজের রূপ সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। তা হোল : শিব একবার ছদ্মবেশে দশ হাজার ঋষির এক যজ্ঞসভায় গিয়ে হাজির হন। ঋষিরা তাঁকে আক্রমণ করলেন। আর যজ্ঞের আগুন থেকে তাঁরা ভয়ংকর একটা বাঘ সৃষ্টি করেন। বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়লো শিবের উপরে। তিনি তখন মৃদু হেসে বাঘটাকে ধরে ফেললেন, আর নখ দিয়ে অনায়াসে ওর চামড়া ছাড়িয়ে সেটিকে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। ঋষিরা আবার যজ্ঞে আহুতি দিলেন। এবারে বেরোল বিকট এক সাপ। দেবতা ওটিকেও সহজভাবে গলায় জড়িয়ে নিজমূর্তি ধরে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। তারপরে যজ্ঞের আগুন থেকে বেরিয়ে এল বেঁটেখাট বীভৎস রূপের এক দানব। ওটিকে শিব পায়ের তলায় চেপে, তার পিঠের উপর দাঁড়িয়েই নেচে চললেন অবিরাম গতিতে।

তাঁর সেই অদ্ভুত অলৌকিক নৃত্যের প্রধান দর্শক হয়ে এলেন দেবতারা। শিবের সেই নৃত্য নিয়েই রচিত হয়েছিল নটরাজ মূর্তির ধ্যান। এই ধ্যানও আছে নানা রকমের। তাঁর নৃত্যের ভঙ্গী ও হাতের মুদ্রারও অর্থ রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। তাঁর পায়ের তলায় যে দানবটি চাপা পড়ে রইল, সেটি হচ্ছে জগতের সব অন্যায় ও কু-ভাবের প্রতীক। বাঘ ও সাপটিকে মেরে তিনি নিজের দেহে ধারণ করলেন। তার মানে হোল: পৃথিবী থেকে সমস্ত হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, কুটিলতাকে বিনাশ করে তিনি সৎ, সুন্দর, কল্যাণ ও শান্তি এনে দেবেন। এই ভয়ংকর রুদ্ররূপে তিনি অমঙ্গলকে নাশ করেন; আবার শান্ত শিব হয়ে সব সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন। ডমরু বাজিয়ে সকলকে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন করেন; পবিত্র অগ্নিদ্বারা সব বিশুদ্ধ করেন। তাঁর চারটি হাতের উপরের দুটিতে আছে ডমরু ও অগ্নিশিখা। নীচের দু'খানি হাতে একটি উঁচু করে অভয়-মুদ্রার ভঙ্গীতে তিনি মানুষকে অভয় দিচ্ছেন। আর একটি হাতে বরদ-মুদ্রা, হাতটি নীচু করে বিশ্ববাসীকে বর দান করছেন। মাথার দু'পাশ দিয়ে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। আলোর শিখা শোভিত বিরাট একটি চক্রমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি নৃত্য করছেন। এবারের মৌচাকের সামনের ছবিটি দ্রষ্টব্য।

আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি অবিরাম নৃত্য করে চলেছেন বটে, কিন্তু সেদিকে তাঁর যেন কোন খেয়ালই নেই। একেবারে নির্বিকার। অথচ তাঁর এই নৃত্যের মধ্যে দিয়েই তিনি সৃষ্টির কাজ, রক্ষণ, পালন ও ধ্বংসসাধন—সব করছেন। হাত পা কাজ করে চলেছে, কিন্তু মুখে-চোখে তার কোন প্রকাশ নেই। সারা মুখে স্থির শান্তভাব। কিছুতে যেন মন নেই। এই একটি মূর্তিতেই শিবের রুদ্র ও শান্ত দু'টি ভাব এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই নটরাজ মূর্তিকে এত আকর্ষণীয় করেছে।

নটরাজের নৃত্যলীলায় আর একটি বিশিষ্টতা হচ্ছে যে, এর মধ্যে ভারতীয় জীবনের অপূর্ব শৃঙ্খলা বোধ, সংযম ও প্রাণছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরক্ষার অনন্তলীলা; সাধারণ নৃত্যলীলা নয়।

ব্যথার ব্যথী

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

নিদাঘ তাপে হেরিয়া ধরার দগ্ধ ধূসর কায়া,
কহিল গাছেরা, 'দিতে পারি মাগো একটু স্নিগ্ধ-ছায়া।'
তখনি সূর্য ঝলসি উঠিল দিগন্ত নভস্তল,—
'ভয় নাই মাগো' বক্ষ আবরি' কহিল শষ্পদল।

গ্রামোফোন কোম্পানী আয়োজিত ছোটদের জন্য লং প্লে রেকর্ড 'ঠাকুরমার ঝুলি'র একটি প্রেস কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত শিল্পী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক অতিথিবৃন্দের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে। ডান দিক থেকে প্রথমে আছেন শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পাশেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

টেনিদা'র তিরোধান

শ্রীসন্তোষকুমার দে

বাংলা-সাহিত্যে টেনিদা-কে টেনে এনেছিলেন বিশুদা—'মৌচাকে'র পাতায় আবির্ভাব হয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা শিশু-সাহিত্য। এজন্য তিনি নানা প্রসঙ্গেই বিশু মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণ স্বীকার করেছিলেন যে, তিনিই তাঁকে শিশু-সাহিত্যের দরবারে আহ্বান করে এনেছিলেন।

টেনিদা'র স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অকালে চলে গেলেন। তোমাদের পরম প্রিয় সেই টেনিদা' চরিত্রটি আর নতুন করে তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না। এ যে কত গভীর দুঃখের কারণ তা বলে বোঝানো যাবে না।

তবে তোমরা শুনে সুখী হবে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মৃত্যুর ঠিক আগের দিন নিজের লেখা দু'টি কবিতার আবৃত্তি নিজের কণ্ঠেই রেকর্ড করে রেখে গেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে কবিতা লিখতেন তাও বোধহয় তোমরা জানো না—সেই জন্য রেকর্ডে যে কবিতা দু'টি আবৃত্তি করে গেছেন, এখানে তা তুলে দিচ্ছি। এর মধ্যে "স্বপ্ন" কবিতাটি হয়তো এখনি তোমরা

ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারবে না, কিন্তু "রবীন্দ্রনাথকে" কবিতাটি তোমরা যদি মুখস্থ করো এবং আবৃত্তি করো, তবে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এবং তোমাদের প্রিয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হবে।

কবিতা দু'টি এই :

স্বপ্ন

বাইরে আকাশ স্তম্ভিত ছিল বীত-বর্ষণ মেঘে
কোথাও ছিল না হাওয়া
রাত্রিটা যেন শ্মশানের ধারে বসেছিল এলোচুলে
ঘুম ছিল নিশি-পাওয়া।
সেই স্বপ্নটা ঘুরে ঘুরে এল—বার বার তিনবার
একটি নাটক তোলে আর ফেলে—একই যবনিকা তার
গ্যালারী কাঁপিয়ে অদৃশ্য কারা বলছিল : 'এনকোর'
—কুয়াশায় মুখ-ছাওয়া।
রাত্রিটা ছিল শ্মশানের কূলে একা বসে চুপচাপ
চকিতে উঠল জ্বলে
খ্যাপা সূর্যটা নেকড়ের মতো কোথা থেকে দিল ঝাঁপ
উত্তাপ-মণ্ডলে।
পাদ-প্রদীপের হিংস্র শিখায় চোখে লেগে যায় ধাঁধা
ক্ষণ-বিভ্রম বিহ্বল করে—কিছু আলো, কিছু আঁধা
কোন্ মরুভূমি—কোন্ লাল বালি—সাহারা কিজিলকুম্
তার বুকে কারা চলে!
লাল বালি-ছাওয়া কোন্ মরুভূমি, জানি না তো তার নাম
চলে যায় চারজন
কাঁধে বয়ে নিয়ে কার শবদেহ, নির্বাক নতমুখ
শিথিল সঞ্চরণ।
রুক্ষ কঠিন গ্র্যানিটের এক উদ্ধত প্রহরায়
শবযাত্রীরা বাধা পায় পথে—বারে বারে থম্‌কায়—
গ্যালারী কাঁপিয়ে অদৃশ্য হাতে অশ্রুত করতালি :
'সাবাস বন্ধুগণ!'

একটি নাটক শেষ হয় নাকো—যবনিকা ওঠে পড়ে :
গ্র্যানিটের প্রহরায়
শবযাত্রীরা বারে বারে আসে—বারে বারে থেমে যায়
নিষেধের সীমানায়।
কোন্ সে স্বর্গ—কোন্ মরুভূমি—কার শবদেহ বয়ে :
চিরকাল এই ক্লান্ত যাত্রা—চিরন্তনের লয়ে
মৃত্যু কি তবে মুক্তি পাবে না—তারো কোথা নেই ছুটি
সমাধির নিরালায় ?
বাইরে আকাশে স্তম্ভিত ছিল বীত-বর্ষণ মেঘ
নিশি-পাওয়া ছিল রাত
একবার নয়—স্বপ্ন নাটকে ঘুরে ঘুরে তিনবার
মৃত্যুর অপঘাত।
হে মহাজীবন, তুমিই একাকী রৌদ্র-দহন নও
আলো-ছায়া-নদী-নারী-ভালোবাসা সুধার পাত্র বও
ভরে দাও তবে শিরা-উপশিরা তোমার করুণ প্রেমে
বাড়িয়ে দিয়েছি হাত ॥

রবীন্দ্রনাথকে

স্রোতের সেতারে বাজে দিনান্তরে সুর :
গৈরিক গঙ্গায় বোট চলে
তিন পাহাড়ের ছায়া সন্ধ্যার তারাকে ছুঁতে চায়
দিয়াড়ার ঘরে ঘরে প্রদীপের শিখাগুলি কাঁপে
'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পড়ি কৈশোরের বিমুগ্ধ আবেগে
তোমাকে প্রথম পাই রক্ত-আলো তরঙ্গিত জলে।
যৌবনের রাত্রি আসে চৈত্র-গন্ধে বিধুর উদাস :
কোথায় নিঃসঙ্গ বাঁশী বাজে :
'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা'—
অগণ্য নক্ষত্র পটে অসীম সত্তার দীপায়ন
আমার জীবন ভরে, হে বিরাট তোমার সঞ্চার।
উদ্বেল প্রাণের ঝড়—মিছিলের উত্তাল-জনতা :
বাধা বন্ধ মৃত্যু ভাঙে—ইতিহাস অমোঘ স্বাক্ষরে—
আমার রক্তের তালে গুরু গুরু তোমার মন্দিরা :
'ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, উর্ধ্বে তোলো শির।'

শ্রীরঞ্জিৎকুমার ভট্টাচার্য

১। তিন অক্ষরে আমি হই
পতঙ্গ বিশেষ;
সংগীতে আমার ভাই
খ্যাতি আছে বেশ।
শেষ অক্ষর ছাড় যদি
ভুল হবে তবে,
আদ্যাক্ষর ছেড়ে দিলে
যমের বাড়ি যাবে।

২। প্রাণীর শরীরে আছে
কম কিংবা বেশী
প্রথম দু'অক্ষরেতে
হয় এক জাতি;
শেষ দু'অক্ষরে এক
পশুর দেখা পাই
তিন অক্ষরে নাম কিবা
বলো দেখি ভাই?

৩। প্রথম ছাড়া রইল পেটে,
তেতো লাগে যোগ্য খেতে।
মধ্য যদি ছাড় তুমি,
ভাসিয়ে চলে জমাজমি।
অন্ত ছেড়ে দেখবে চেয়ে
পর্বতটি আছে ছেয়ে।
বলতে পার নামটি কি?
বরপক্ষের সেইটি ফি।

৪। 'মলম' নামটি জেনো
ওষুধের হয়;
উল্টে তারে লিখলেও
ঠিক সোজা রয়।
বলো দেখি ওষুধটি
কিবা আছে আর;
উল্টোলেও সেই নাম
থেকে যায় তার?

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

(১) ১, ৬, ১১, ১৬, ২১; ২, ৭, ১১, ১৫, ২০; ৩, ৮, ১১, ১৫, ১৯; ৪, ৯, ১১, ১৩, ১৮; ৫, ১০, ১১, ১২. ১৭। (২) উপরে: ৫, ১২, ৩, ৬ নীচে: ৮, ১, ১০, ৭ বাঁয়ে: ৫, ১১, ২, ৮ ডাইনে: ৬, ৯, ৪, ৭। (৩) নারিকেল।

মেঠুড়ে

এশিয়ান গেমস

৯ই ডিসেম্বর থেকে ব্যাংককে ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস শুরু হয়। এশিয়ান গেমসকে এশিয়ান অলিম্পিক বললে ভুল হয় না, কেন না অলিম্পিকেরই আদর্শে ১৯৫১ সাল থেকে এশিয়ার এই চতুর্থ বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা। এর আগে ১৯৫৪ সালে মানিলায়, ১৯৫৮ সালে টোকিওতে, ১৯৬২ সালে জাকর্তায় এবং ১৯৬৬ সালে ব্যাংককে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের এশিয়ান গেমসে এশিয়ার আঠারোটা দেশের প্রায় আড়াই হাজার প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। এবারের অংশ গ্রহণকারী দেশগুলো হ'ল: বর্মা, কাম্বোডিয়া, সিংহল, হংকং ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইস্রাইল, জাপান, মালয়েশিয়া, জাতীয়তাবাদী চীন, নেপাল, পাকিস্থান, ফিলিপিনস, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং তাইল্যাণ্ড।

খেলাধূলোর বিষয় তেরোটি। যেমন—অ্যাথলেটিকস, ফুটবল, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ, সুটিং, সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটার পোলো, সাইক্লিং, মল্লযুদ্ধ, ব্যাডমিন্টন, ভারোত্তোলন, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি।

খেলাধূলোয় এশিয়ার সর্বাগ্রগণ্য দেশ জাপান। এবার জাপান থেকে দু'শ বাইশজন ক্রীড়াবিদ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করেন। ভারত থেকে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য ভারতীয় হকি ও ফুটবল দল, মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লযোদ্ধা ও অ্যাথলীটরা গিয়াছিলেন।

ব্যাংককের ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস বারো দিন ধরে চলে। প্রতিদিনই স্বর্ণপদক এবং কোনো না কোনো রেকর্ড সৃষ্টির খবর আমরা জানতে পেরেছি। জাপান যতো স্বর্ণপদক এবং সে দেশের প্রতিযোগীরা যত রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন, এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী আঠারোটা দেশের আর কোনো দেশের প্রতিযোগীরা তা পারেন নি।

এবার সংক্ষেপে কয়েকটি প্রতিযোগিতার ফলাফল লিখছি। আগামী সংখ্যা "মৌচাক"-এর খেলাধূলা-র পাতায় তোমরা বিস্তৃত খবর জানতে পারবে।

তাইওয়ানের ভি চেঙের দুর্ভাগ্য দৌড়ের তিনটে বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েও এশিয়ান গেমসে তিনি একটার বেশী স্বর্ণপদক পাননি। চেঙের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় না দিতে পারার কারণ: পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরা। পায়ে তাঁর আগেই চোট ছিল। ওই অবস্থার মধ্যে তিনি ১০০ মিটার দৌড়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। পরে ২০০ মিটারের সেমি-ফাইনালে নতুন রেকর্ড করেছেন।

ভারতের যোগীন্দর সিং লোহার গোলা ছোঁড়ায় এবং পারভিন কুমার ডিসকাস ছোঁড়ায় স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

হকি ফাইনালে পাকিস্থান ভারতকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন।

ভারতীয় ফুটবল দল শেষ দিনে জাপানকে ১—০ গোলে হারিয়ে ব্রোনজ পদক পেয়েছে।

এশিয়ান গেমসে জাপান ৭৪টি স্বর্ণ, ৪৭টি রৌপ্য, ২৩টি ব্রোনজ পদক এবং ভারত ৬টি স্বর্ণ ৯টি রৌপ্য, ১০টি ব্রোনজ পদক পেয়েছে।

মোটর দৌড়

তেহরান থেকে ঢাকা পর্যন্ত দ্বিতীয় এশিয়ান হাইওয়ে মোটর র‍্যালিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ভারতের প্রতিযোগী নাজির হোসেন, দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন মার্কিন প্রতিযোগী নর্মান বার্নেস, তৃতীয় স্থান পাকিস্থানের মহম্মদ সানাউল্লা।

তেহরান থেকে ঢাকা পর্যন্ত পথের দূরত্ব ছিল ৬৭০০ কিলোমিটার। ন-দিনব্যাপী এই মোটর দৌড় গতিবেগের পাল্লা নয়, সময় ও গতির মধ্যে সামঞ্জস্যের সমন্বয়ে সহনশীলতার প্রতিযোগিতা। চার হাজার আড়াইশো মাইল পথের মাঝে ছিল উনিশটা চেক পয়েন্ট। ওই চেক পয়েন্ট নির্দিষ্ট সময়ের পরে পৌঁছলেও পয়েন্ট কাটা গেছে, আগে পৌঁছলেও পয়েন্ট কাটা গেছে। তাছাড়া গুপ্ত চেক পয়েন্টেও পরীক্ষা করা হয়েছে গাড়ির গতিবেগ ঠিক আছে কিনা। নাজির হোসেনের ট্রাম্প হেরাল্ড গাড়ীর পয়েন্ট কাটা গেছে সবচেয়ে কম ৭০ পয়েন্ট, দ্বিতীয় নর্মান বার্নেসের ১১০ পয়েন্ট এবং তৃতীয় সানাউল্লার ২১০ পয়েন্ট।

এই মোটর দৌড়ের পরিকল্পনা ইউনাইটেড নেশানস ইকনমিক কমিশন ফর এশিয়া ও ফার ইস্ট-এর ই. সি. এ. এফ. এ। পরিচালনা সম্মেলিতভাবে ইরান, আফগানিস্থান, ভারত, পাকিস্থান ও নেপাল-এর। উদ্দেশ্য: এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলোর বন্দর ও রাজধানীর মধ্যে সড়ক পথের সমন্বয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সৌহার্দ্যস্থাপন।

বাষট্টিখানা গাড়ি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত উনপঞ্চাশখানা গাড়ি ঢাকায় শেষ সীমায় পৌঁছয়। ভারত থেকে বাইশখানা গাড়ি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

ক্রিকেট

ব্রিসবেনে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ছ-টা টেষ্ট সিরিজে পাঁচটা খেলা এখনও বাকী। পার্থে হবে দ্বিতীয় টেষ্ট।

প্রথম ইনিংসে বিল লরি মাত্র চার রান করলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে তিনিই ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার বিপদত্রাতা। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ৮৪ রান করে অষ্ট্রেলিয়ার পতন রোধ করেছেন। শেষ দিনের খেলায় দু দু'বার ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরির ক্যাচ ধরতে পারেন নি। দুটো ক্যাচের একটা ধরতে পারলে ইংলণ্ডের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হ'ত।

এ খেলায় ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। অষ্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান কিথ স্ট্যাকপোল ডাবল সেঞ্চুরি এবং ডগ ওয়াল্টার্স সেঞ্চুরি করেছেন। সামগ্রিক বিচারে প্রথম টেষ্টে ইংলণ্ডের কৃতিত্বই বেশী। যে অষ্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ৪১৮ রান করেছিল, ইংলণ্ডের বোলাররা সেই অষ্ট্রেলিয়ার শেষ সাতটা উইকেট ফেলে দেয় মাত্র ১৫ রানের মধ্যে। এটা প্রথম ইনিংসের কথা। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার শেষ পাঁচটা উইকেট পড়েছে ২১ রানের মধ্যে। তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের বড় রানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে আরম্ভ করে সেই রান পার হয়ে যাওয়াও ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

অষ্ট্রেলিয়ার কিথ স্ট্যাকপোলের ২০৭ তাঁর জীবনের বড় ইনিংস। ডগ ওয়াল্টার্স এবার নিয়ে আটটা টেষ্ট সেঞ্চুরি করলেন। ১৯৬৫ সালে এই ব্রিসবেন মাঠেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি জীবনের টেষ্ট খেলায় সেঞ্চুরি করেছিলেন। স্ট্যাকপোলের এটি তৃতীয় এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি। ফাস্ট বোলার হিসেবে ইংলণ্ডের কেন সাটলওয়ার্থ দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৭ রানে পাঁচটা উইকেট নিয়ে যোগ্যতা দেখিয়েছেন।

হকি

নেহরু হকি প্রতিযোগিতার বয়েস মাত্র সাত বছর হলেও এই প্রতিযোগিতা এর ভেতরই ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগিতার সমমর্যাদা লাভ করেছে। শুরু থেকেই ভারতের শক্তিশালী দলগুলো এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আসছে। এবার অল ইণ্ডিয়া পুলিস দল ফাইনালে বিজয়ী হয়ে নেহরু ট্রফি লাভ করেছে। নর্দার্ন রেলের সঙ্গে প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোল শূন্য ভাবে শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে একটামাত্র গোল করে অল ইণ্ডিয়া পুলিস দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। জয়সূচক গোলটা হয় অতিরিক্ত সময়ের শেষ ভাগে।

সম্পাদক : শ্রীসুধিপ্রিয় সরকার
শ্রীসুধিপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
প্রভু প্রেস, ৩০, বিধান সরণি কলিকাতা-৬ হইতে
মূল্য : '৬০ পয়সা

রাশিয়ার একটি মৃগ-পালন ক্ষেত্রে পালয়িত্রীকে
মৃগশিশুদের প্রাতঃরাশ পরিবেশন করতে দেখা যাচ্ছে।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা *

৫১শ বর্ষ] মাঘ : ১৩৭৭ [১০ম সংখ্যা

মরু ও শাঁখ

শ্রীবিশ্ববন্দ্যোপাধ্যায়

মেঠো পথে আসি-যাই রোজ
সোজা গিয়ে তারপরে বাঁক
সেথা দেখি পোড়ো এক ভিটে
রোদে রোজ পুড়ে হয় খাক।

মরা গাছ মরা বাহু মেলে
রোজ শুনি কিশলয়ে ডাকে।
ও পথে কি গেছো কোনোদিন,
শুনে কভু দেখেছো কি তাকে ?

মরু মাঠ পথ জনহীন
পথচারী আমি শুধু তায়
রোজ দেখি ভাঙা সেই ভিটে
তারই কাছে মরা গাছটায়

পাখি কবে বেঁধেছিলো বাসা
সেটা আজো রয়ে গেছে ঠিক।
মরা ডাল, তুলনা মরুর ;
নীড়, মরু-মায়ার প্রতীক।

ত্যক্ত সেই নীড়টুকু ছাড়া
কোমলতা কিছু সেথা নাই,
উষরের মাঝে কমনীয়
নীড়-রচনার মায়াটাই।

ছায়া নেই, একফালি ছায়া—
সেই মরা গাছটার তলে
সেখানেই বসি তবু রোজ
খর বৈশাখ শিরে জ্বলে।

সেই মরু-মরা-তরুতলে
পড়ে থাকে ভাঙা এক শাঁখ
সাগরের স্মৃতি বুকে নিয়ে
অসহায়, মূঢ়, হতবাক্।

সাগরের স্বপ্ন দ্যাখে ও কি ?
আঁধি ওড়ে, দুপুরে লু চলে
সাগরের তলে জন্ম যার
মরু কেন তার চোখে জ্বলে ?

হাওয়া আসে, আগুনের ঝড়—
ওর মুখ বেদনা-করুণ।
ওর দশা দেখলেও লাগে
কী যে এক পিপাসা দারুণ।

ওর জীবনের ক'টি পাতা
একে একে যেন ওল্টায়
মরু ঝড়ে ; প'ড়ে দেখি সব
কাঁটা বেঁধে খুশি মনটায়।

কারা ওকে এনেছিলো হেথা
চলে গেছে তারা কোন্ দিকে
তাদের যাওয়ার পথ চেয়ে
ও কি আজো আছে অনিমিখে ?

কোন্ সংসারে ছিলো ওই
কারা ওকে দিয়ে গেছে ফেলে
কাটালো সে কতো উৎসব
সে হিসাব আজকে না মেলে।

কতো মধু বিবাহের রাত
ভ'রে দিতে সে গেয়েছে গান
কতো রাঙা ঠোঁটের চুমোয়
হলো উচাটন তার প্রাণ।

কতো মিঠে মুখের আস্বাদ
পেলো টানা ঘোমটার তলে
সোনা-খচা সেই সব হাত
ওকে আর নেবে নাকি তুলে ?

কতো দেবতার উপচারে
পূজাঘরে পেয়েছে সে মান
কতো দেউলের দেহলীতে
বরাবর ছিলো তার স্থান।

জলধির সুগভীর নাদ
ওর বুকে ছিলো পুঞ্জিত—
সেই সব দিন হলো গত,
স্মৃতি আছে, সুখ ভুঞ্জিত।

ধূসরিত আজ ধূলি 'পরে ;
ওর সারা প্রাণের প্রণাম
ছুঁতে পারে নাকি দেবতারে
ভাগ্য ওর হলো এত বাম ?

সাগরের জলতলে ওর
ছিলো ঘর আত্মীয়-স্বজন,
মানুষ এনেছে ওকে হ'রে—
স্বার্থপর তার প্রয়োজন।

ভাবি হায়, পৃথিবী নিষ্ঠুর,
ছোট বায়ু, প্রমত্ত, উধাও—
ফিরে চাই, কানে যেন আসে—
'ওগো মোরে সাগরে নে' যাও।'

সাগরে কে নিয়ে যাবে তোকে ?
ব'লে মরু-ঝড় হা হা হাসে।
আমাদের খোকা তাকে নিয়ে
পুকুরের জলে দিয়ে আসে॥

মাকড়সা

শ্রীমণীগোপাল চক্রবর্তী

গল্পে আছে—পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গেরা একবার সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল যে, মানুষ বড় নিষ্ঠুর প্রাণী। এজন্য বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবার সময় একমাত্র মাকড়সাই বলেছিল, "হুজুর, মানুষের মত এমন নিরীহ প্রাণী আর নেই। আমি কত রকমের ছোট-বড় জাল পেতে রাখি, কিন্তু কখনও মানুষকে সে জালে পড়তে দেখিনি।"

মাকড়সা বহুজাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত। বনে-জঙ্গলে, ঘরের কোণে, আনাচে-কানাচে প্রায়ই আমরা মাকড়সার জাল দেখতে পাই। জাতি হিসাবে এদের সরু-মোটা এবং ছোট-বড় জাল বুনবার পদ্ধতিও আলাদা। এরা আকাশে-বাতাসে এবং জলে-স্থলে বিচরণ করে। জলের উপর দিয়ে দৌড়ে বেড়ায় এমন মাকড়সাও দেখা যায়।

মাকড়সার চেহারা কতকটা অক্টোপাশের মত। এদের চার জোড়া সরু সরু পা এবং চার জোড়া চোখ। দুই এক শ্রেণীর বিষাক্ত মাকড়সা ছাড়া আর সব মাকড়সাই তাদের জালে নানারকম কীট-পতঙ্গ ধরে আমাদের উপকারই করে।

স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস মাকড়সার কাছেই অধ্যবসায় শিক্ষা পেয়েছিলেন। শোনা যায়, হজরত মহম্মদ যখন পালিয়ে মদিনায় এক গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁর শত্রুরা ঐ গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে ওখানে কেউ নেই মনে করে চলে গিয়েছিল। পরোক্ষভাবে সেদিন মাকড়সা মহম্মদের জীবন রক্ষা করেছিল।

মাকড়সা কিন্তু অন্যান্য কীট-পতঙ্গের মত দলবদ্ধ হয়ে বাস করে না। বনে-জঙ্গলে মস্ত জাল পেতে বসে থাকে যে বড় আকারের মাকড়সা সেও একা, আবার ঘরের কোণে সূক্ষ্মজাল বুনে ব'সে থাকে যে মাকড়সা—তাকেও দেখা যায় একান্ত একা! পরিবারবর্গ নিয়ে এরা বাস করে না। জাল পেতে এরা একপাশে চুপ করে ওত পেতে থাকে। শিকার জালে পড়লেই ওরা টের পায়। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করে এবং তার রক্ত চুষে খায়।

আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে প্রায় এক বুক উঁচুতে এক রকম বড় মাকড়সা জাল বুনে ওত পেতে বসে থাকে। এই জাল বুননির মধ্যে যথেষ্ট এঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধি আছে। মাকড়সাটি প্রথমে সুতো দিয়ে একটা ত্রিভুজের মত করে নেয়। তারপর ঐ ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু স্থির করে তার সঙ্গে টানা দিয়ে নেয় অনেকগুলি। সব শেষে বৃত্তের মত করে কতকগুলি চট্‌চটে সুতো ঘুরিয়ে নেয় ঐ ত্রিভুজের মধ্যে। হঠাৎ বাতাসে ওটা ছিড়ে যাওয়ার উপায় নেই। এরা টানার উপর দিয়ে জাল বুনবার সময় পিছনের পায়ের সাহায্যে

সুতো জড়াতে আরম্ভ করে। জালের মাঝখানে ইংরেজী একস্ (X) চিহ্নের মত এক বা একাধিক চিহ্ন করে নেয়।

মাকড়সার মেয়েরাই জাল বোনে। জালের কর্ত্রীও সে। রাত্রিবেলায় যে সব কীট-পতঙ্গ উড়ে বেড়ায়, তারাই এদের জালে ধরা পড়ে। অন্য মাকড়সাও এই জালে ধরা পড়লে তার রক্ষা থাকে না—তার ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষে খেয়ে ফেলে।

মরা কীট-পতঙ্গ ওদের জালে ফেলে দিলেও ওরা কখনও তা খায় না।

এক রকমের বড় মাকড়সা তুলট কাগজের মত একটা আবরণের মধ্যে এ কসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। এই ডিমের থলি বা আবরণটাকে দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্র আকারের লিলি বিস্কুটের মত। মাকড়সাটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পেটের তলায় করে এই থলিটা ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়। থলির ডিম ফুটে যথাসময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চা বেরিয়ে আসে। তারপর তারা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও একটা উঁচু জায়গায় উঠে ওরা সুতো ছাড়তে আরম্ভ করে এবং সেই সুতোর সাহায্যেই বাতাসে ভর করে 'ছত্রী সেনার' মত দূর-দূরান্তে চলে যায়। এই সব ছত্রী মাকড়সার সুতোই বাতাসে জড় হয়ে আকাশ-পথে উড়ে যায়।

আয়নার বায়না

শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়

তারা আঁকা লাল ঘুড়ি
প্লাসটিক্ লাটটু,
খোকনের চাই আর
ছোট্টুর টাট্টু ;
যত বসে দোল খাও
আরও জোরে দুলবে,
ছোট্টু যে উদ্ভট
বায়নাটা তুলবে।

কি বায়না ? কিনে দাও
একখানা আয়না,
ইচ্ছে ছাড়া যে মুখ
যাতে দেখা যায় না।
মামা গেছে লণ্ডনে
দিদি কোন বিদেশে,
ছোট্টুর খুশি হলে
আসে এক নিমেষে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে তুংকা চোখ খুলল। টেলিফোন মাইকে বলছে : "মিঃ কেইন, মিঃ কেইন, শীগগির আসুন।"

পাশের দরজা দিয়ে একটা বেত লাফাতে লাফাতে হলঘরে ঢুকে চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, বেঞ্চ, ফ্লোর সকলকে এলোপাথাড়ি মেরে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। পিন-কুশন্ থেকে একটা পিন ঝনঝন করে পড়ল।

"এইরকম পিন ড্রপ সাইলেন্স থাকা চাই নইলে…" ব'লে বেতগাছা আবার পাশের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তুংকা দেখল টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ডেস্ক, কাগজ, কলম সব নিজের নিজের জায়গায় ফিরে চুপচাপ বসে আছে। দিদিমণিরা, রত্না দিদি, রিংকু দিদি আর সব ছেলেমেয়েরাও লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

টেলিফোন রত্না দিদিকে কি জিজ্ঞাসা করল। রত্না দিদি উত্তর দিল :

"প্রথম পিরিয়ড—ভূগোলের পরীক্ষা,
দ্বিতীয় পিরিয়ড—ইতিহাস,
তৃতীয় পিরিয়ড—অঙ্ক,
চতুর্থ পিরিয়ড—বাংলা।"

ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল, "বা রে! আজ তো স্কুলের জন্মদিন— আজ ছুটি। পরীক্ষা হবে কি করে?"

রত্না দিদি হাসিমুখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল: "তোমাদের পরীক্ষা হবে কেন? আজ তো দিদিমণিদের পরীক্ষা। মালী স্কুলের কাছে নালিশ করেছে যে, তার গাছের লঙ্কা তুলে দিদিমণিরা পড়ার সঙ্গে মিশিয়ে তোমাদের চোখ থেকে জল বের করায়। কর্পোরেশন নোটিশ দিয়েছে, স্কুলের জলের পাইপ খুলে নেবে। স্কুল তাই ঠিক করেছে, দিদিমণিরা কিরকম পড়ায় তার পরীক্ষা আজ নেওয়া হবে।"

টেলিফোনে মাইকে ডাকতে লাগল: "মিস ভূগোল, মিস ভূগোল।"

পাশের টেবিলের ওপর রাখা গ্লোবটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। দূরে গণ্ডগোল শোনা যেতে লাগল: "ভূগোল, তালগোল, মাথা গোল।"

গণ্ডগোল মিলিয়ে যেতে গ্লোবের ওপর থেকে এক মোটাসোটা ভদ্রমহিলা ধপ করে নীচে লাফিয়ে নামলেন। নেমেই ডেস্ক থেকে ম্যাপ পয়েন্টার তুলে নিয়ে ভূগোলের দিদিমণিকে বকতে আরম্ভ করলেন: "তুমিই বুঝি আমার নাম ভূগোল রেখেছ? তোমার মতন সিড়িঙ্গে নই, তাই আমাকে গোল বলে গালাগাল দাও। আর বাংলা ক্লাসের যত চ্যাংড়া ছেলেরা আমাকে যা-তা বলে। আমার মাথা গোল? মাথা গোল তোমার। তুমিই একটি আস্ত ভূগোল। শীগগির তোমার নাম বল, আমরা নাম বদলাবদলি করব।

শুনে ভূগোলের দিদিমণির মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। মুখ থেকে কোনও কথা বার হ'ল না।

বেগতিক দেখে রত্না বলল: "দিদিমণির নাম মিস সুস্মিতা সেন।"

শুনে ভূগোল বলল: "বেশ, বেশ, আজ থেকে আমার নাম হলো সুস্মিতা, আর তোমাদের দিদিমণির নাম ভূগোল। যারা যারা এ প্রস্তাব মানতে রাজী আছ, হাততালি দাও।"

ভয়ে ভয়ে সকলে—এমন কি দিদিমণি পর্যন্ত হাততালি দিয়ে সম্মতি জানাল। মিস ভূগোল ওরফে সুস্মিতা, ম্যাপ পয়েন্টার পৃথিবীর ম্যাপের পাশে দাঁড় করিয়ে গর্ব ভরে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিতে লাগল।

কিন্তু গোল বাধল ম্যাপ পয়েন্টার রাখার পর। ভুংকা দেখল, ম্যাপ পয়েন্টার বেয়ে ম্যাপের ওপর থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা নেমে আসছে। তাদের ডান হাতে প্ল্যাকার্ড; তাতে শহর, দেশ, নদী, হ্রদ, পাহাড় ইত্যাদির নাম।

"এস, এস, নাম বদল করি।" বলতে বলতে ম্যাপের ছেলেমেয়েরা, স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের প্ল্যাকার্ড তাদের হাতে দিয়ে, ম্যাপ পয়েন্টার বেয়ে ফের ম্যাপের

মধ্যে মিলিয়ে গেল। অবাক হয়ে তুংকা দেখল, ম্যাপে শহর, নদী ইত্যাদির নাম বদলে স্কুলের ছেলেমেয়েদের নাম ছাপা হয়ে গেছে। আর তাদের হাতে ম্যাপের দেশ, শহর নদীর নাম। তুংকার হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা আছে দুর্গাপুর, আর দুর্গাপুরের জায়গায় ছাপা রয়েছে তুংকা। বেনারসের নাম হয়েছে রিংকু, হিমালয়ের নাম রত্না আর ম্যাপের ওপর লেখা স্নিগ্ধতার মানচিত্র।

ভূগোল ওরফে স্নিগ্ধতা—দিদিমণির দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তুমি কেমন পড়াও তার পরীক্ষা নিতে হবে। খগেন, খগেন। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের মালী খগেন হলঘরে হাজির হলো—হাতে একরাশ ধানি লঙ্কা। ভূগোল, দিদিমণিকে হুকুম দিলেন: "ভূগোল, তুমি সব লঙ্কাগুলো খেয়ে নাও, তারপর পড়াতে আরম্ভ করবে।"

একটা লঙ্কার একটু করে খেতে খেতে দিদিমণির চোখ থেকে জল বেরুতে লাগল। দিদিমণির ছোট্ট রুমাল চোখের জলে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করতে লাগল। দেখে বোধহয় ভূগোলের দয়া হলো।

বললেন: "আচ্ছা, এবারের মত মাপ করলুম। কিন্তু এবার থেকে যেন আর কখনও না শুনি, তুমি ছেলেমেয়েদের পড়ায় ঝাল দাও।

ভূগোলের উদ্দেশে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার ঠুকে দিদিমণি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: "রত্না, তুমি বলো তো হিমালয় কিসের জন্য বিখ্যাত?" ভূগোল আবার তেড়ে উঠলেন: "হিমালয় আবার কিসের জন্য বিখ্যাত? হিমালয়ের জন্য কি বিখ্যাত, তাই জিজ্ঞেস কর।"

রত্না দিদি উত্তর দিল: "হিমালয়ের জন্যে চা, পাইন, বন, বরফ আর তুষারমানব বিখ্যাত।"

ভূগোল বললেন: "রত্না তো ভাল মেয়ে। ওকে প্রশ্ন করে কি লাভ। রিংকুকে জিজ্ঞাসা কর তো।"

শুনেই রিংকু কেঁদে ফেলল। রিংকুকে কাঁদতে দেখে রত্না দিদি জিজ্ঞাসা করল, "রিংকু তুমি কাঁদছ কেন?"

রিংকু উত্তর দিল: "কচুরীর জন্যে মন কেমন করছে।"

শুনে ভূগোল খুব খুশী:, "না, তোমার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি আছে দেখছি—যাও শীগগির কাশীর কচুরী গলি থেকে হিঙের কচুরী বানিয়ে দাও আর তার সঙ্গে…"

ভ্রমর বলল: "পারে পেঁড়া।"

বেবি: "সিলাওয়ের খাজা।"

মিত্রা: "বর্ধমানের সীতাভোগ।"

সংগীতা: "জয়নগরের মোয়া।"

রত্না : "আর সবশেষে চকোলেট আইক্রীম।"

দিদিমণি মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন : "কিন্তু এত পয়সা কোথা থেকে পাওয়া যাবে?"

ভূগোল বললেন : "তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। সমস্ত খনি তো আমার, ট্যাঁকশালকে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। এখুনি টাকা পয়সা তৈরী করে দেবে। তোমরা মিঃ অর্থনীতিকে খালি একটু বুঝিয়ে বলো যাতে আপত্তি না করেন।" ভূগোল এই বলে আবার গ্লোবের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। ফের শোনা যেতে লাগল : "ভূগোল, তালগোল, মাথা গোল।"

পাঁচ

গোলমাল শেষ হবার আগেই টেলিফোন ঘোষণা করল : "এবার ইতিহাসের পালা।"

সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল, ঘোঁড়া, হাতী, রথ, প্লেন, ট্যাঙ্ক ও কামানের শব্দ।

রেডিও সুর করে চেঁচিয়ে উঠল : "ইতিহাস কাটে ঘাস আকাশে।"

সঙ্গে সঙ্গে কানে কলম, চোখে পুরু লেন্সের চশমা-পরা একজন লোক হাতে ধামা নিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে দৌড়তে লাগলেন। আকাশে হট্টগোল বাড়তে লাগল। গোছা গোছা সবুজ ঘাস আকাশ থেকে ঝপ্‌ঝপ্‌ করে ধামার ওপর পড়তে লাগল। ভদ্রলোকটি ঘাসের গোছার ওপর এলোপাথাড়ি কলম চালাতে লাগলেন, আর একটু পরেই সেই ঘাসের গোছা মোটাসোটা ইতিহাসের বইয়ে বদলে যেতে লাগল। বইগুলো রত্নার হাতে দিয়ে তিনি ছুটে হলঘরের বাইরে চলে গেলেন। আকাশ থেকেও ঘাস পড়া বন্ধ হলো।

ঘোড়া, হাতী, রথ, প্লেন, ট্যাঙ্কের শব্দ মিলিয়ে যেতে আকাশবাণী থেকে শোনা যেতে লাগল : "হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার—ইতিহাস আসছেন, ইতিহাস আসছেন!" বলতে বলতেই ইতিহাসের প্রবেশ।

পরনে মিলিটারী ইউনিফর্ম। ডান হাতে স্টেনগান, বাঁ হাতে বরশা, ডান কাঁধে ধনুক, বাঁ কাঁধে তূণের মধ্যে তীর। কোমরে বেল্ট—পিস্তল-তলোয়ার,—গুলতি ও আরও রকমারি অস্ত্র। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়িতে পাখীর পালক গোঁজা। এক-একটা পালকে বছরের নাম লেখা— ১০৬১, ১৭৫৭, ১৮৫৭, ১৯১৭, ১৯৬৩ ইত্যাদি।

গট্ গট্ করে হলঘরে ঢুকেই ইতিহাসের টীচার নমিতাদি'র দিকে তাকিয়ে বাঁজখাই কণ্ঠে হাঁক ছাড়লেন : "তুমিই ইতিহাস পড়াও? সন্দেশের ইতিহাস বলে তো?"

নমিতাদি মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন : "সন্দেশের ইতিহাস তো এখনও লেখা হয়নি।"

ইতিহাস: "আমি ইতিহাস প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, আর তুমি বলছো সন্দেশের ইতিহাস লেখা হয়নি—তুমি কিছু জানো না। অরভালি বল তো?" শুনেই ভ্যাঁক ক'রে কেঁদে ফেলে নমিতাদি দৌড়ুতে সুরু করলো। দৌড়ুতে দৌড়ুতে একেবারে বাইরে।

রত্না, রিংকু, তুংকা সকলে মুখ কাঁচুমাচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কে জানে এবার কার পালা। ততক্ষণে ইতিহাস সাজ-পোশাক খুলতে আরম্ভ করেছে। বুট, পট্টি, পাগড়ি খুলে, অস্ত্রশস্ত্র আলাদা ক'রে, বেশ হাসি হাসি মুখে ইতিহাস ধপ্ ক'রে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। মিষ্টি চেহারা, তুংকার মনে হ'ল, অনেকটা মনোজ কাকুর মতো। চেয়ারে বসেই ইতিহাস হো হো ক'রে হাসতে হাসতে বলল: "দিদিমণিকে কেমন তাড়ালুম দেখলে? কতক্ষণ ইউনিফর্ম পরে থাকা যায় বলো তো?—যাক্, এসো সন্দেশ খাওয়া যাক্। ওহে গবেষক সব ছেলেমেয়েদের সন্দেশ দাও।

রত্না বলল: "বা রে, সন্দেশ তো বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা বলেছে, যারা সন্দেশ তৈরি করবে আর খাবে তাদের সকলের জেল হবে।"

ইতিহাস: "১৯৬৬ সালে সন্দেশ খেলে জেল হবে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সন্দেশ খেলে কিছু হবে না। গবেষক আমরা এখন ১৯৬৩ সালে চলে যাচ্ছি, সন্দেশ বার করো।" ব'লে ইতিহাস ১৯৬৩ সালে লেখা একটা পালক মাথার পাগড়ি থেকে বার ক'রে, দোয়াতের মধ্যে গুঁজে দিল। ততক্ষণে গবেষক রত্নার দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমাকে যে বইগুলি দিয়েছি তার তৃতীয় খণ্ডটা বার করো তো?"　　　　(ক্রমশঃ)

পূজো

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এলো, সরস্বতী পূজো;
　বলে, সেক্রেটারি কেলো,
ধমকে-ধামকে, লুকিয়ে দেখিয়ে
　　হাজার টাকা তোল'।

নেবেও চেয়ে ভিক্ষা,
　ভুলোর সঙ্গে দিতে হবে
　　বিসর্জনে টেকা।

শুনে, ভুলো মুচকি হাসে,
　বলে; দেখবি কেলো কাজে,
বেশি নয়, ঠিক একটি বোমা
　ব্যাণ্ডওলাদের কেলব মাঝে।

সেথা, সরস্বতী সাজেন,
　দেখে, বিষ্টু-নারায়ণ
বলেন, পূজোর লোভে যাচ্ছ, কিন্তু
　প্রাণটা বড় ধন।

পূজোর, সে তো অনেক দিনই
　ওরা বাজিয়েছে বারোটা
তবু, দাঁড়িয়েছিল এসে—
　শেষে বিসর্জনের ঘটা।

এবার, কেলো-ভুলোর পণ
　ঘটার সঙ্গে বোমা কাটা,
　　প্রাণটা যাবে বিসর্জন।

সীমান্ত যখন জেগে ওঠে

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

পাহাড়ের গা-বেয়ে ঝরঝর করে ঝর্ণার জল নেমে আসছে নীচে, অনেক নীচে সমতল ভূমিতে। চারদিকে গভীর নীরবতা। তৃষ্ণার্ত বলাকার সিং অঞ্জলি ভরে খানিকটা জল পান করে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত দুটো ভাল করে মুছে নেয়। বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। সূর্যের শেষ ম্লান রশ্মি পাহাড়ের চূড়া রাঙা করে তুলছে।

বলাকার রাইফেলটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে এগিয়ে চলে। পেট্রোল পার্টির অন্যান্য জোয়ানরা সেখানে ওর জন্য প্রতীক্ষা করছে। বলাকারের ভারী বুটের শব্দ পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যায় দূর থেকে দূরান্তরে। আরো গজ ত্রিশেক বাকি। হঠাৎ পাহাড়ের ওপাশ থেকে রাইফেলের গর্জন ভেসে আসে। বলাকার পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে সঙ্গীদের দিকে। দু'একটা পাথরের নুড়ি ওর বুটের চাপে ছিটকে গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের নীচে। আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। বলাকার একটা পাথরের আড়ালে বসে প'ড়ে অটোমেটিক রাইফেলটা শক্ত হাতে চেপে ধরে। পাকিস্থানী ফৌজের মুহুর্মুহুঃ আক্রমণে পাহাড়ের গভীর নির্জনতা বারবার ব্যহত হয়। জোয়ানরাও পাল্টা জবাব দেয়। গর্জে ওঠে ওদের হাতের অটোমেটিক রাইফেলগুলো। গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম।

বলাকারের রাইফেলটা একটানা অগ্নি উদ্‌গিরণ করে চলে। রাইফেলের নল বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে নিয়ে পুনর্বার রাইফেলের ট্রিগার টিপে ধরে। ভাল করে দূরের জিনিস আর দেখা যায় না। সূর্য বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে— পাহাড়ী কালো রাত চতুর্দিকে জেঁকে বসে। ধীরে ধীরে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসে। জোয়ানরা সেই নিকষ কালো অন্ধকারেই গুলী চালিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডাও বাড়তে শুরু করে। দেহে ভারী গরমের জামাকাপড় থাকা সত্বেও গা শিরশির করে ওঠে মাঝে মাঝে। গোলা-গুলীর শব্দ চতুর্দিকে যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে।

বলাকার সিং রাইফেল চালানোর ফাঁকে পাথরের আড়াল ছেড়ে আরো একটু অগ্রসর হয় সঙ্গীদের দিকে। মাঝে মাঝে ওদের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—ডোণ্ট স্টপ্। ফায়ার অ্যাণ্ড ফায়ার এগেন।—ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশ হাওয়ায় ভেসে আসে। আরো কয়েক গজ অগ্রসর হতে পারলে অবশিষ্ট জোয়ানদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে বলাকার সিং। কিন্তু অন্ধকারে আর বেশী অগ্রসর হতে সাহস করে না সে। বিপদ যে-কোন কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর উপর। এক হাতে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পাঞ্জাবী তনয় বলাকার সিং। আর ওর ডান পাটা শক্ত করে রাখে সামনের একটা পাথরের গায়ে। অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে বলাকার তার ভারী রাইফেলটা আবার চালাতে থাকে। আজ যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে ও। বার বার পাহাড়ের শক্ত দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে গর্জে চলে বলাকারের অটোমেটিক রাইফেলখানা।

পাহাড়ের ওপাশ থেকে পাকিস্থানী ফৌজের ভারী মর্টারগুলোরও কোন বিশ্রাম নেই।

বুম-বুম-বুম। মর্টারের একটা গোলা অকস্মাৎ বলাকার সিং-এর সামনে এসে পড়ে। ওর সামনের পাথরটা চক্ষুর নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যায় গোলার প্রচণ্ড আঘাতে।

বলাকার সিং ছিটকে পড়ে এক পাশে। তারপর ওর দীর্ঘ শরীরটা পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে নীচে। নীচে গড়িয়ে পড়ে আহত বলাকার আর্তনাদ করতে থাকে। ওর সবুজ রঙের সোয়েটারটা ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। দীর্ঘ সময় ওর কোন জ্ঞান ছিল না। ঝরনার জল যে স্থানে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে, বলাকার সিং ঠিক সেই জায়গায় এসে পড়েছিল।

জলের সংস্পর্শে খানিকক্ষণ থাকার পর বলাকার লুপ্ত জ্ঞান এক সময় ফিরে আসে। বলাকার পাশে হাত দিয়ে দেখে—রাইফেলটা ওর উধাও। সম্ভবতঃ পাহাড়ের উপর পড়ে রয়েছে। অন্ধকারেই বলাকার সিং উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। মর্টারের গোলার আঘাতে ওর একটা পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এতক্ষণ সে কোন টেরই পায়নি। আবার একবার উঠার চেষ্টা করে, কিন্তু এবারো সে উঠতে পারে না।

ধীরে ধীরে এক সময় কখন কাশ্মীরের ছাম উপত্যকায় ঊষার আলো ফুটে ওঠে। ভোরের সূর্য কিরণে পাহাড়ের চূড়ায় পুঞ্জিভূত তুষারের বুকে লক্ষ মাণিক জ্বলে ওঠে।

গোলা-গুলীর আওয়াজ আর শোনা যায় না। সারারাত রক্তক্ষরণে বলাকারের বলিষ্ঠ শরীর দুর্বল হয়ে আসে। মনে মনে চিন্তিত হয়ে ওঠে ও। মা-বাবা, ভাই-বোনকে চিরজীবনের মত আর হয় তো দেখতে পাবে না। শুষ্ক রণাঙ্গনে বলাকারের মত একজন অতি সাধারণ জোয়ানের খোঁজ আর কে রাখে। বলাকার ঘ'ষে ঘ'ষে খানিকটা সরে আসে। অবসন্ন দেহটা ওর যেন আর চলছে না। পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। ওয়াটার-বটল্‌টার ছিপি খুলে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দেয়। জলপান করে বলাকার পুনরায় যেন শক্তি ফিরে আসে। কোমর থেকে ধীরে ধীরে পিস্তলটা টেনে বের করে নেয় সে। এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন। পিস্তলটা ভাল করে একবার পরীক্ষা করে নেয়। গুলী লোড করাই আছে।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। পিস্তলটা ভাল করে তুলে ধরতে পারে না বলাকার। ওর হাতে দুটো কাশ্মীরের তুষার-জমা ঠাণ্ডায় নিঃসাড় হয়ে গেছে।

—হল্ট্। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকায় বলাকার সিং। মাসকেট হাতে কয়েকজন পাকিস্থানী ফৌজ।

আজ আর ওদের হাত থেকে কোন মুক্তি নেই। মৃত্যু অনিবার্য। ওর সহযোগী জোয়ানরা কে-কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ভারতীয় জোয়ানরা এখনো বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছে না। প্রতিপদে ওদের পিছু হোটতে হচ্ছে। আর কোন দেরি নয়। বলাকার সিং এক দিকে কাত হয়ে গিয়ে পিস্তলের ট্রিগারে আঙুলের চাপ দেয়। পিস্তল গর্জে ওঠে নিমেষের মধ্যে। অব্যর্থ লক্ষ্য। দেখতে দেখতে একজন সৈনিক আর্তনাদ করে শক্ত পাথুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পর পর আরো কয়েকটা গুলী ওর পিস্তল থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বেশীক্ষণ ওদের প্রতিহত করে রাখতে পারে না বলাকার সিং। হঠাৎ পাশ থেকে একটা গুলী এসে লাগে ওর বুকে। ফিন্‌কি দিয়ে তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে আসে ক্ষত স্থান থেকে। বলাকারের প্রাণহীন দেহ একপাশে লুটিয়ে পড়ে।

পাকিস্থানী ফৌজদের কয়েকজন তখনও বলাকারের মৃত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে। মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে ওরা বীর জোয়ানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়। সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি বলাকারের মুখের উপর প'ড়ে ওকে আরো যেন সুন্দর করে তুলেছে।

ঝড়ের পরে

ইফতেখার হোসেন

সাগর দ্বীপের ছায়ায় ডোবা বনের সজন পাখীরে—
কিসের খোঁজে কোথায় ওড়ো? সজল কেনো আঁখিরে।
ঈশান কোণের আকাশ ছোঁয়া পাঁকুড় গাছের মাথাতে
ছানারা সব ঘুমিয়ে ছিলো খড়ের নরোম কাঁথাতে,
আলুথালু চুলের বসন সাগর থেকে কি এসে—
হাওয়ার কাঁধে জলের কোলে ভাসিয়ে গেলো নিয়ে সে,
মায়ের কাঁথা, বাবার পুঁথি পুরলো জলের ঝুলিতে
খুকুর ফিতে উড়িয়ে নিলো বৌকে হাওয়ার ডুলিতে।
আকাশ-ভরা কোথায় তারা? পিদ্দুম জ্বালা জোনাকী।
কাজল পেড়ে মেঘের শাড়ী চোখের জলে বোনা কি।*

* দক্ষিণ বাংলার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় স্মরণে।

অপূর্ব বিচার

(রুশ দেশের রূপকথা)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন আগে রুশ দেশের এক গ্রামে দুই ভাই থাকত। এক ভাই খুব বড়লোক, আর একভাই তেমনি গরিব। বড়লোক ভাইয়ের সুখের সংসার; গরিব ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোনো রকমে এক টুকরো রুটি পায় কি পায় না।

'দেখে সে মারলে ঘোড়াকে এক চাবুক।'—পৃঃ ৪২৮

সেবার দেশে ভয়ানক শীত পড়েছে। ঘরে আগুন পোহাবার কাঠ ফুরিয়ে গেছে দেখে গরিব ভাই খুব চিন্তায় পড়ল। আগুন ঘরে না থাকলে শীতে হাত পা জমে সে দেশে মানুষ মরে যায়, তাই গরিব ভাই কুড়ুল নিয়ে বনে গেল। বনের গাছ কেটে সে অনেক কাঠ জড়ো করলে, কিন্তু আনবে কি করে? তার স্লেজ গাড়ী একটা ছিল বটে, কিন্তু ঘোড়া ছিল না। অন্য সময় দু'চারখানা করে কাঠ কাঁধে করেই আনত সে, কিন্তু সারা শীতকালটা সামনে, এখন বেশী কাঠ জমা না করলেই নয়। একটা ঘোড়া পেলে তার স্লেজ গাড়ীতে জুতে কাঠগুলো টেনে আনা যেত। সে তার বড়লোক ভাইয়ের বাড়ী গিয়ে বললে,

"দাদা, তোমার ঘোড়াটা আমার একবার ধার দেবে? আমি কতকগুলো কাঠ বন থেকে আনব। বড়ো শীত।"

বড়লোক দাদার গরিব ভাইকে দেখেই মুখখানি তোলো হাঁড়ির মতো হয়েছিল, ঘোড়া ধার চাওয়াতে সে মোটেই খুশি হ'ল না। অথচ সামান্য এটুকু সাহায্য না করলে ভাইকে লোকে কি বলবে? তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তার ঘোড়া একটা এনে দিল, আর বলল, "দেখ, বেশী ভার চাপিয়ে যেন ঘোড়াটাকে জখম কোরো না। আর রোজ রোজ এরপর ধার চাইতে এস না। আজ এটা, কাল সেটা, দিতে দিতে আমাকে ফতুর করে দেবে তুমি, শেষে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে আমাকে। সেটি যেন না হয়।"

গরিব ভাই ঘোড়া নিয়ে তো চলল, বাড়ী এসে দেখে স্লেজের সঙ্গে ঘোড়াকে জোতবার জোয়াল বা দড়ি কিছুই নেই তার। দাদার কাছে চাইতে যেতে সাহস হ'ল না, সে তো দেবে না বলেই দিয়েছে! অগত্যা স্লেজটা ঘোড়ার ল্যাজের সঙ্গে বেঁধে সে বনে চলল। স্লেজে কাঠ বোঝাই দিয়ে ফেরবার সময় একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে হঠাৎ স্লেজটা আটকে গেল। গরিব ভাই অত লক্ষ্য করেনি। গাড়ী এগোচ্ছে না দেখে সে মারলে ঘোড়াকে এক চাবুক। তেজী ঘোড়া চাবুক খেয়ে লাফিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার ল্যাজটা ছিঁড়ে স্লেজের সঙ্গে রয়ে গেল, আর রক্তের স্রোত বইল। গরিব ভাই অনেক কষ্টে তখনই ঘোড়াটার কাটা জায়গাটা বেঁধে বড়লোক ভাইয়ের কাছে গেল সেটা ফেরত দিতে। না বুঝে অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইলে।

বড়লোক ভাই তো রেগে আগুন। বললে, "ওসব চালাকি চলবে না, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। না পারো তো চলো আদালতে।"

গরিব ভাইয়ের খাবার পয়সা জোটে না, সে ক্ষতিপূরণ দেবে কোথা থেকে? অগত্যা দু'ভাইয়ের মধ্যে মামলা রুজু হ'ল। বড়লোক ভাই আর গরিব ভাই আদালতের সমন পেয়ে শহরে চলল।

শহর কি কাছে? যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, রাস্তা আর ফুরোয় না। এদিকে গরিব ভাই ভাবছে, "ধনীর সঙ্গে গরিবের মামলা লড়া মানে, পালোয়ানের সঙ্গে একটা রোগা-পটকা লোকের কুস্তি লড়া। আদালতে আমি নিশ্চয় দোষী প্রমাণিত হ'ব। কি করা যায়?

ঠিক সেই সময় তারা একটা সেতুর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। সেতুর দু'ধারে কোনো বেড়া নেই, নীচে নদীর জল জমে বরফ হয়ে আছে! সেই বরফের উপর দিয়ে একজন বণিক তার স্লেজ হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, তার বুড়ো রুগ্ন বাবাকে শহরে ডাক্তার দেখাতে। গরিব ভাই হঠাৎ পা পিছলে সেতু থেকে নীচে পড়ল। পড়বি তো পড়, সে সোজা পড়ল সেই বুড়োর ঘাড়ে। বুড়ো

সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। বণিক তো রাগে দুঃখে কি করবে ভেবে পায় না, শেষ পর্যন্ত সেও আদালতে গিয়ে গরিব ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করবে ঠিক করলে। তখন তারা তিনজনে চলল শহরে।

গরিব ভাইয়ের তখন তো ভয়ে মাথা খারাপ হবার যোগাড়! সে ভাবলে, "আগের মামলায় যদিই বা রক্ষা পেতুম, এবার আর রক্ষা নেই। আমি ইচ্ছে করে বুড়োকে মারিনি সে-কথা কে বিশ্বাস করবে?"

সে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখে পথের ধারে বেশ বড়ো একটি পাথরের নুড়ি। গরিব ভাই তাড়াতড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে তার কোটের পকেটে রেখে দিল। ভাবলে, "ফাঁসি তো হবেই আমার, একটা খুনের জন্যে ফাঁসি না হয়ে দুটো খুনের জন্যে হলে ক্ষতি কি? বিচারক যদি ঠিক বিচার না করেন, তবে এই পাথর ছুঁড়ে তাঁর মাথা ফাটাব, তাকে মেরে মরব!"

শেষ পর্যন্ত তারা আদালতে পৌছোল। গরিব ভাইয়ের বিরুদ্ধে এখন দুটো মামলা। জজ বিচার আরম্ভ করেই নানারকম জেরা করতে লাগলেন তিনজনকেই। ততক্ষণে গরিব ভাই পকেট থেকে পাথরটা বার করে একটা কম্বলের টুকরোয় জড়িয়ে হাতে ধরে রেখেছে আর ফিসফিস করে বলছে:

"বিচার করো, কর্তা, যেন বিচারে ভুল না হয় দেখো। সঙ্গে করে তোমার জন্যে কি এনেছি খেয়াল রেখো।" একবার, দু'বার, তিনবার। বিচারক মশাইয়ের কানে গেল কথাটা। লোকটি একটু লোভী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, "লোকটা বোধহয় একতাল সোনা এনেছে আমাকে দেবার জন্য।" একটু পরে আর একটু আশাটা কমিয়ে বললেন, "যদি অত বড়ো একতাল রুপো হয় তা'হলেই বা মন্দ কি? তারও দাম কম হবে না!" তিনি রায় দিলেন:

"ছোটো ভাই যখন লেজসুদ্ধ ঘোড়া ধার নিয়েছে, তখন তাকে লেজসুদ্ধ ঘোড়াই ফেরত দিতে হবে বড়ো ভাইকে। যতদিন ঐ ঘোড়ার আবার লেজ না গজায়, ততদিন ঘোড়াটা ছোট ভাইয়ের কাছে থাকবে, লেজ উঠলে বড়ো ভাইকে দিয়ে আসবে।" ওদিকে বণিকের বাবাকে মেরে ফেলার শাস্তিস্বরূপ বিচারক রায় দিলেন, "সেই সেতুর ওপর থেকে বণিক লাফ দিয়ে পড়বেন, নীচে বরফ-জমা নদীর ওপর, স্লেজ গাড়ীতে গরিব ভাই বসে থাকবে। সে যে ভাবে বণিকের বাবার ঘাড়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেছিল, বণিককে তেমনি ভাবে গরিব ভাইয়ের ঘাড়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলার অধিকার দেওয়া হ'ল।"

এই বলে বিচারক উঠে পড়লেন। তখন বড়লোক ভাই পড়ল মুস্কিলে। তার ঘোড়া

না হলে কাজের ক্ষতি হবে, লেজ না থাকলেও ঘোড়াটা নিত্য বোঝা টানতে পারবে, তাই সে বললে, "ঐ ঘোড়াই আমাকে ফেরত দাও, লেজ দরকার নেই।'

• গরিব ভাই বললে, "উঁহু সে হয় না। বিচারকের হুকুম আমাকে মানতেই হবে।" বড়ো ভাই অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষ পর্যন্ত ত্রিরিশটি রুবল্ গুণে নিয়ে গরিব ভাই বড়লোক ভাইকে মুক্তি দিলে।

ওদিকে বণিকেরও বিচার শুনে চক্ষু চড়ক গাছ! সেতুর ওপর থেকে লাফ দিতে হবে ভাবতেই তাঁর বুক ধড়ফড় করতে আরম্ভ করেছে। যদি আসামী না মরে তিনিই পড়ে মরে যান! বললেন, "যা হয়ে গেছে; তা হয়ে গেছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করছি তুমি বাড়ী যাও। আমি প্রতিহিংসা নিতে চাই না।"

গরিব ভাই বললে, "সেটি হচ্ছে না মশাই। আদালতের রায় মানতেই হবে।" শেষ পর্যন্ত বণিক তাকে একশ'টি রুবল ঘুষ দিয়ে মিটমাট করলে।

তারা চলে আসছে এমন সময় জজ সাহেব গরিব ভাইকে ইশারা করে ডাকলেন। বললেন, আমার জন্য কি যেন এনেছ বলছিলে?"

গরিব ভাই তখন কম্বল থেকে পাথরটা বার করে দেখিয়ে বললে, "আপনি আজ যদি সুবিচার না করতেন, তবে এই পাথর ছুঁড়ে আপনাকে খুন করতুম!"

বিচারক মাথা হেঁট করে ঘরে ফিরলেন। মনে মনে বললেন, "যে ভাবে বিচার করেছি তা ঠিকই হয়েছে। লোকটা কোনও অপরাধই ইচ্ছে করে করেনি, দৈবাৎ হয়ে গেছে। আমি যদি অন্য রকম রায় দিতুম, তাহলে আমাকে আজ আর বাঁচতে হ'ত না!

তখন যে-যার বাড়ীর পথ ধরলে। গরিব ভাই যাবার পথে বেয়াড়া সুরে গলা ছেড়ে গান ধরলে মনের আনন্দে।

কত দূর

শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী

কত দূর কত দূর?
সোনামুখী গ্রামখানা
কত দূর? আর কত হাঁটি।
যদি হাঁটো টিপ্ টিপ্
টিপিস্ টিপিস্ টিপ্
সোনামুখী দশ ক্রোশ খাঁটি।

যদি হাঁটো টিম্ টিম্
নিম্ ঝিম্ নিম্ ঝিম্
তা'হলেও সমান কথাটি।
যদি হাঁটো চট্‌পট্
ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্
সোনামুখী এক ক্রোশ খাঁটি।

যদি হাঁটো হন্‌হন্
তনমন প্রাণপণ
এই হেথা এই হেথা গাঁটি

মূল ইতালীয় লেখক

এলভিও বারলেত্তানি

অনুবাদ করেছেন

শ্রীপ্রণতা দে

ভবঘুরে কুকুর ল্যাম্পো

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

।। টেলিভিশন তারকা ।।

আমরা চীফের নামে রেখেছিলাম, 'পশু-সখা'। নামটি ওঁর স্বভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছিল। যে-কোন রকম জন্তু জানোয়ার উনি ভালবাসতেন। তার মধ্যে বিশেষ করে কুকুর ও বেড়াল। ল্যাম্পোর প্রতি ওঁর স্নেহের যে প্রকাশ ছিল, তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক।

কয়েক জন হীনমনা ব্যক্তি এখন আমায় ব্যঙ্গোক্তি করে যে, ল্যাম্পো আমার চেয়ে চীফকে বেশী পছন্দ করে। আমি কিন্তু কখনই এমন ভাব দেখাই নি যে, আমি ল্যাম্পোর ষোলোআনা মালিক বা আমাকে ও সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে। বরং আমি খুশীই হতাম, যদি আর কেউ ওর ভাল চাইত এবং ও তার প্রতিদান দিত।

দিনের পর দিন যায়, বুঝতে পারি ল্যাম্পো এবারে বুড়ো হয়েছে। আজকাল সব ডাইনিং কারগুলোর সামনে ও ছোটে না। ট্রেনে বেড়ানো অনেক কমিয়ে দিয়েছে। যখন যায়, সেও কম দূরত্বের পথের যাত্রায়। বেশীর ভাগ সময় ঝিমিয়ে আর ঘুমিয়ে কাটায়। আজকাল বেড়াবার সময়ও কম। কারণ দিনের মধ্যে অনেকখানি সময় ওর আমার বাড়ীতে, নয় ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে কাটে। এরপর ওঁর এবং আমার আপিসে তাঁদের মাকুর মত ঘোরা-ফেরা করে। নির্দিষ্ট সময়ে আমার বাড়ীতে হাজিরা দিতে ভোলে না, তারপরই তাড়াতাড়ি চীফের বাড়ীতে চলে আসে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাজারে যেতে হবে যে!

ল্যাম্পো সত্যিই বড় ভাল কুকুর। কারুকে অনাদর বা তাচ্ছিল্য করে না। যে দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে, সে কর্তব্যে অবহেলা করে না। বোধ হয় এই সব কর্তব্যকর্মগুলির জন্যই ও ট্রেনে বেড়ানো কমিয়ে ফেলেছে। তবুও মানতেই হয় ল্যাম্পো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সেটা স্পষ্ট বোঝাও যায়। তাই বলে ওর খ্যাতি কিন্তু কমেনি। তখনও কাগজে নিবন্ধ বেরুচ্ছে—ল্যাম্পোর নতুন নতুন কেরামতি ও অভিযানের কাহিনী। এই সব গল্প আমাদের এতই জানা ছিল যে, আমরা ক্রমেই এ বিষয় নির্লিপ্ত হয়ে গেলাম। আমাদের একঘেয়ে লাগত এগুলো। আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে আরও কিছু লোমহর্ষক এবং উত্তেজক ঘটনা দরকার।

কিন্তু একটা জিনিসের অভাব ল্যাম্পোর ছিল। ওর রেলযাত্রা থেকে অবসর গ্রহণের আগে ওর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ওকে একটা কিছু সম্মানে ভূষিত করা উচিত।

তা' সে বছর নভেম্বর মাসে এই রকম একটা সম্মানে ও স্বীকৃতি লাভ করল। আমাদের ষ্টেশনে সেদিন শ্রীযুক্ত "X" ব'লে ইটালীয়ন টেলিভিশনের এক অফিসর এলেন। আজেবাজে না বকে তিনি প্রথমেই শুরু করলেন, ইটালীয়ন টেলিভিশনের কর্তারা ল্যাম্পোর কীর্তিকাহিনী শুনে ওর ওপরে একটা ফিল্ম তুলতে চান, যেটা টেলিভিশন প্রোগ্রামেও প্রতিফলিত করা হবে।

আমরা শ্রীযুক্ত "X" মহাশয়ের সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম যে, ল্যাম্পোকে আমরা ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এবং আর যা যা সাহায্য প্রয়োজন তা সবই করব। প্রথমতঃ টেলিভিশনের লোকদের ষ্টেট রেলওয়ে বিভাগ থেকে এ বিষয় অনুমতি পাবার জন্য কতকগুলি প্রচলিত নিয়মাবলীর কাজ করতে হবে। এই ব্যাপারগুলি বুঝিয়ে, অনুমতি পেলে তবেই ফিল্ম তোলা যেতে পারে। ঠিক হ'ল যেদিন এবং যখন ছবি তোলা হবে তার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ভদ্রলোক আমাদের টেলিফোনে জানাবেন।

এই বিশেষ ঘটনাটি আমাদের ভেতরে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করল। আমাদের কৌতূহল বেড়েই চলেছে। কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকতে পারছি না আনন্দের আতিশয্যে। আমরা সেই বিশেষ দিনটির অপেক্ষায় আছি, আর ল্যাম্পোর সম্বন্ধে কেমন ধারা-ভাষ্য হবে টেলিভিশনে সেই গল্প করছি।

খবরের কাগজওয়ালারা তো ইন্টারভ্যু হবে এই খবর পেয়েই কাগজে বড়বড় শিরোনামায় নিবন্ধের পর নিবন্ধের বন্যা বইয়ে দিল—"টি. ভি-তে ল্যাম্পো", "টি. ভি. তারকা ল্যাম্পো" ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগেই আমরা একদিন টেলিফোন পেলাম দু'দিনের মধ্যে টি. ভি-র টেকনিশিয়ান, অপারেটররা সব আসছে ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে। আমরা যেন তাদের জন্য সকাল ন'টা নাগাদ ল্যাম্পোকে তৈরি রাখি।

যাক, প্রতীক্ষা করবার অনিশ্চয়তার অবসান হ'ল।

এবারে মস্ত একটা কাজ তালাচাবি দিয়ে ল্যাম্পোকে আটকে রাখা। যদিও আজকাল ও লম্বাপথের যাত্রা অনেক কমিয়ে ফেলেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে যদি মাথায় একবার সে ভূত চাপে তো টি. ভি. তোলার গুড়ে বালি পড়বে! অতএব ষ্টেশনময় হুকুমদারী হ'ল—যেনতেনপ্রকারেণ (দরকার হলে বলপ্রয়োগে) ল্যাম্পোকে ষ্টেশনের মধ্যেই নজরবন্দী করে রাখতে হবে।

যদিও ল্যাম্পো এ সব কথা কিছুই জানত না, তবুও কেমন যেন বুঝতে পেরেছিল, কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটতে চলেছে। দেখত ওকে আদর করা হচ্ছে, পিঠ চাপড়ানো হচ্ছে, তবুও আগের চেয়ে চারিদিকে যেন বাধার বেড়া। ও এটা একেবারেই পছন্দ করত না। ও চাইত মুক্ত স্বাধীন জীবন। কাজেই বাধার ইঙ্গিতেই ও সট্‌কে পালাবার ধান্দায় ছিল। প্রত্যেকবারই আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ ওর পেছন পেছন গিয়ে ওকে আটকে নিচ্ছিলাম। সারাদিন তো এই ভাবে চোখে চোখে রাখা গেল, কিন্তু বিশেষ দিনের ঠিক আগের সন্ধ্যে বেলাতে কেমন করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে রোম এক্সপ্রেসে চড়ে ও চলে গেল আমাদের সব ইজ্জত ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে।

সেদিন ক্যাম্পিগ্‌লিয়া ষ্টেশনে নতুন যারা ছিল (আগের কিছু যারা জানত না) তারা বিমূঢ় হয়ে ভাবছিলো—কী রে বাবা! কোথায় এসে পড়েছি? এটা কী রেলওয়ে ষ্টেশন, না F.B.I, না স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড? আমাদের দৌড়দৌড়ি ব্যস্ততায় হুল্লোড় পড়ে গেছে। অনবরত টেলিফোন হচ্ছে ক্যাম্পিগ্‌লিয়া থেকে গ্রসেটো, গ্রসেটো থেকে কিভিটাভেচ্চিয়া, সেখান থেকে রোম। বলা হচ্ছে: "যদি কেউ ল্যাম্পোকে দেখে থাকেন, দয়া করে তাকে জীবন্ত ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে পাঠিয়ে দিন, সবচেয়ে প্রথম ট্রেনে।" কিন্তু ল্যাম্পোর নো-পাত্তা! কোন ষ্টেশনে কেউ তাকে দেখেনি। যে ট্রেনগুলি ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে আসছিল তাদের খানতল্লাসী হ'ল, কিন্তু সব বৃথা—ক্রমে সন্ধ্যে হ'ল, অন্ধকার হ'ল গাঢ়।

ল্যাম্পোকে টেলিভিশনে দেখবার আশা আমাদের বিলীন হ'ল।

পরের দিন খুব সকালে আমি ক্যাম্পিগ্‌লিয়াতে গেলাম। সেদিন আমার ডিউটি ছিল না। কিন্তু কথা দিয়েছিলাম যে আমি টি. ভি. অপারেটরদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব; দরকার মত সাহায্য করব। আকাশটা সেদিন ধূসরবরণ ছিল। মাঝে মাছে আকাশে সূর্য একটু-আধটু উঁকি মারছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই মেঘের পেছনে আবার হারিয়ে যাচ্ছিল। ষ্টেশনে যাত্রীরা ছাড়াও, বেকারের দল, দর্শকের দল, আর ছোট ছেলেদের ভিড় জমেছিল টেলিভিশনের ছবি তোলা দেখবার জন্য। যে ট্রেনে টেলিভিশনের লোকদের আসবার কথা, সেই গাড়ীর বাঁশী শোনা গেল। কিছুরই

ত্রুটি ছিল না—কেবল নায়ক ছিল নিরুদ্দেশ! কিন্তু তারপরেই কী হেরিনু? হঠাৎ দেখলুম, গ্রসেটো থেকে আগত একটি মালগাড়ী থেকে নামছেন আমাদের ল্যাম্পোরাম! সোজা অমোদের দিকে এগিয়ে এসে হেঁয়ালি বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন বললে—এই তো, ঠিক সময়ে এসে গিয়েছি!”

আটটা নাগাদ সবাই ঠিক জায়গায় দাঁড়ালো। একটি ছোট ভূমিকার পর যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক লাগানো হ'ল। এবার অপারেটাররা ল্যাম্পোর অভ্যাস প্রভৃতির বিষয় আমার কাছে বিশদ জানতে চাইল। আমি বল্লাম, ওরা শুধু ল্যাম্পোকে অনুসরণ করে চলুক তাহলেই সব জানতে পারবে। আমি একটু দূরে সঙ্গে সঙ্গে থাকলাম যা'তে কখনও দরকার হলে কিছু করতে পারি।

বাউণ্ডুলে ল্যাম্পোটা এবার আর আমাদের বোকা বানাতে পারেনি।

(ক্রমশঃ)

তুচ্ছ

শ্রীমৃণালকৃষ্ণ দেব

বিশাল অরণ্য মাঝে আমি ক্ষুদ্র তৃণ
কোনরূপে ধরি প্রাণ অতি যে নগণ্য।
চিরদিন অবহেলা লাঞ্ছনার মাঝে—
কেটেছে জীবন মোর ব্যর্থ যত কাজে।
দীর্ঘ-বৃক্ষ অন্তরালে আমি থাকি ঢাকা
মোর 'পরে চলে নিত্য ভব-রথ চাকা।
ধরিত্রীর তুচ্ছতম বস্তু এক আমি
মোর তরে কারো চিত্তে স্থান নেই জানি।
জানি আছে চন্দ্র সূর্য এই ধরা মাঝে
কিন্তু ঘন অন্ধকার মোর চিত্তে রাজে।
তবে জানি মোর তরে আছে কোন কবি
যার কাব্যে আঁকা রবে মোর এই ছবি।

মুদ্রায় প্রতিকৃতি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সম্প্রতি আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতি সংবলিত মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। তোমরা নিশ্চয় তা দেখেছ এবং কৌতূহল বোধ করেছ। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ইদানীং কালে অবশ্য দেশের অনেক বিখ্যাত ও গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির আসল ছবি ডাকটিকেটে ছাপা হয়েছে এবং আজকালও হচ্ছে। কিন্তু কারও প্রতিমূর্তি আঁকা মুদ্রার প্রচলন ইতিপূর্বে করা হয়নি। নেহরু এবং গান্ধীর মুদ্রাই প্রথম।

এ যুগে বছর কয়েক আগেও আমাদের দেশে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের মূর্তি আঁকা মুদ্রা বাজারে চালু ছিল, ইদানীংও বাজারে রাজা ষষ্ঠ জর্জের মূর্তি দেওয়া মুদ্রা দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতের নিজস্ব মুদ্রা—তিনটি সিংহমূর্তির ছবি দেওয়া মুদ্রা প্রচলিত হয় এবং আজও তা চলছে।

ভারতে প্রতিমূর্তি সংবলিত মুদ্রা সর্বপ্রথম ইস্যু করা হ'ল ১৯৬৫ সালে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রতিমূর্তি দেওয়া মুদ্রা। এক টাকা ও আট আনা মূল্যের মুদ্রা। তারপরে ১৯৬৮।৬৯ সনে মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকা মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছে। এর মধ্যে দশ টাকা মূল্যের মুদ্রাও আছে। তাছাড়া বিভিন্ন মূল্যের কারেন্সি নোটগুলিতেও মহাত্মার প্রতিমূর্তি ছাপান হয়েছে।

এ স্থলে বলা যেতে পারে যে, ১৯০৬ সনের ভারতীয় মুদ্রা আইন অনুসারে আমাদের দেশে এতকাল এক টাকার অধিক মূল্যের মুদ্রা তৈরি করা নিষিদ্ধ ছিল। কিছুদিন হ'ল ঐ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তাঁর ফলেই এখন মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেওয়া দশ টাকা মূল্যে মুদ্রা ইস্যু করা সম্ভব হয়েছে।

এই ধরণের প্রতিমূর্তি দেওয়া মুদ্রা প্রচলনের উদ্দেশ্য হ'ল বিশেষ কোনো ব্যক্তির স্মৃতি জাগরূক রাখা; যাতে করে তাঁর কর্মজীবন ও কীর্তি-কাহিনী জানতে জনসাধারণ উৎসুক হয়।

এসব ক্ষেত্রে অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মুদ্রা চালু করাই বাঞ্ছনীয়; কেন না তাতে প্রচার বেশি হতে পারে এবং অধিক সংখ্যক লোক ওটা রেখে দিতেও পারে।

সাধারণতঃ রৌপ্য কিংবা অন্য কোন ধাতু (অ্যালয়) এই সকল মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতে সমুদ্রগুপ্ত, কনিষ্ক প্রভৃতি সম্রাটদের আমলে নানা দেবদেবী ও পশুপাখির মূর্তি আঁকা মুদ্রার প্রচলন ছিল।

ইতিহাসে আমরা তো কত কত হোমরা-চোমরা লোকের—রাজা-মহারাজা, যোদ্ধা প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত পড়ে থাকি। তাঁদের কীর্তি-কাহিনী পড়ে আনন্দ পাই। ঔৎসুক্য জাগে আমাদের

মনে। কত দিগ্বিজয়ী বীর ও কুশলী যোদ্ধার বীরত্ব-কাহিনী আমাদের মনে রোমাঞ্চ জাগায়। ধর্ম-নেতা বা মহাপুরুষদের জীবন-কথা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই। অনেকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়েছেন; কেহ বা চেহারা পাল্টে দিয়েছেন পৃথিবীর, মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের। তাই আমাদের মনে সাধারণতই কৌতূহল জাগে ঐ সকল বিরাট প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা দেখতে সত্যি কী রকম ছিলেন, কেমনতর ছিল তাঁদের আসল চেহারা, মুখাবয়ব? অবশ্য বইয়ের পাতায় ওঁদের অনেকের আলেখ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি সত্যিকারের আসল চেহারা কিনা অনেক ক্ষেত্রেই তা আমরা জানি না। অদ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষ জুলিয়াস সীজারের যে গম্ভীর মূর্তি বইয়ের পাতায় দেখা যায়, সে কি ওঁর সত্যিকারের চেহারা? দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের কিংবা সেনাপতি নেপোলিয়নের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তাঁদের চেহারা কি সত্যি সত্যি ওরকম ছিল?

আমরা জানি বইয়ের ছবিতে অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এখানে এমন কতকগুলি প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল যা একেবারে খাঁটি; এগুলো মনের থেকে বা কল্পনা করে আঁকা হয়নি। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ রাজারাণী, যোদ্ধা, দিগ্বিজয়ী বীর, কবি, দার্শনিক প্রভৃতি কর্মবীরদের ছবি এসব। এগুলো হ'ল আসল চেহারার ছবি, নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মুদ্রা ও মেডেল থেকে। সুতরাং সন্দেহের কোনো কারণ নেই। এটা তো জানা কথা, মুদ্রা বা মেডেলে প্রতিমূর্তি ছাপ দেবার পূর্বে সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে। যা হোক, এই ছবিগুলি দেখে আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে।

চিত্র-পরিচিতি

জুলিয়াস সীজার—(খৃস্টপূর্ব ১০০-৪২ সন)·প্রাচীন রোমের রাজনীতিবিদ। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ।

নিউটন—(১৬৪২—১৭২৭) ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পদার্থ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ; মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কারক।

রাণী ভিক্টোরিয়া—(১৮১৯—১৯০১) ইংলণ্ডের রাণী। শাসনকার্যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

নিরো—রোমের সম্রাট। তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে। কথিত আছে রোম নগর যখন আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছিল, তখন তিনি প্রাসাদে বসে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। (৩৭—৬৮ খৃস্টাব্দ)।

নেপোলিয়ন—(১৭৬৯—১৮২১) ফরাসী সম্রাট। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনানায়ক।

এডমণ্ড হ্যালি—ইংরেজ জ্যোতির্বিদ। সব চেয়ে বড় ধূমকেতুর আবিষ্কারক—হ্যালির ধূমকেতু। ইনি আঁক ক'ষে বলেছিলেন, প্রতি ৭৫ বৎসর পরে পরে এটা আকাশে দেখা দেবে।
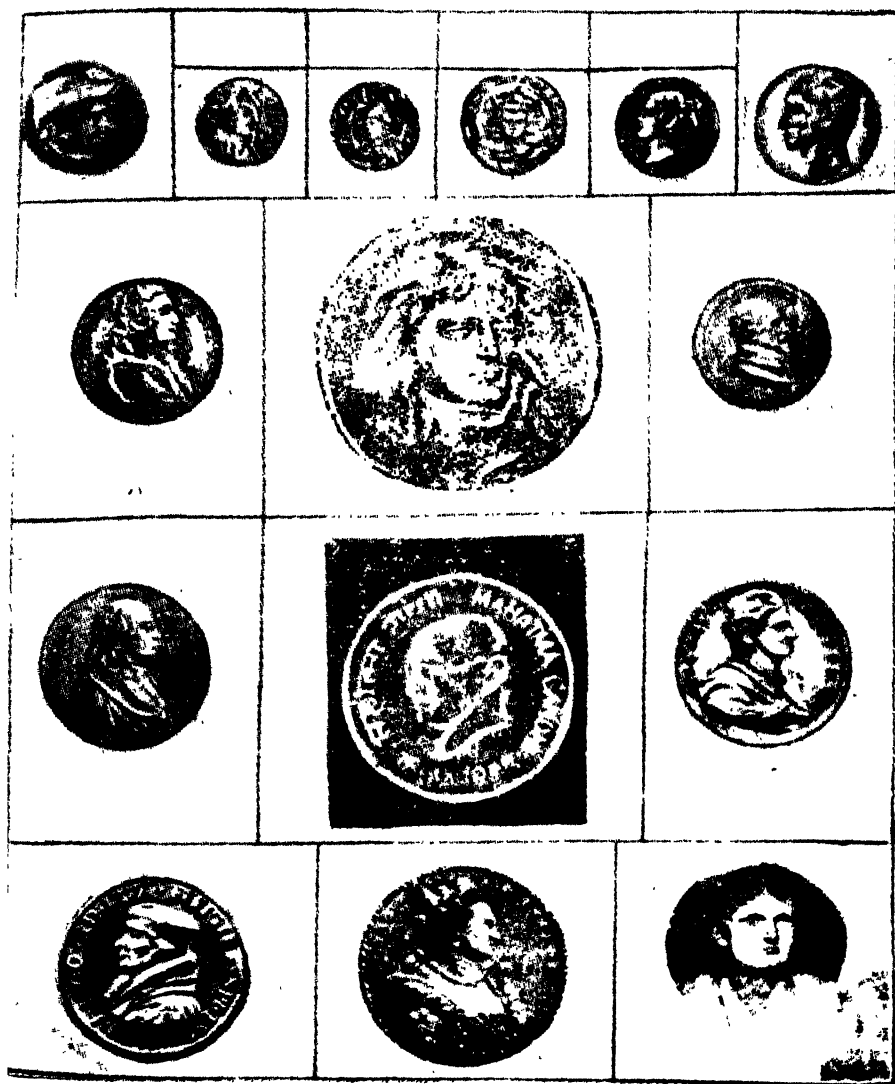
চিত্র-পরিচিতি

১ম লাইনে বাঁ দিক থেকে, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, অ্যালফ্রেড দি গ্রেট, ক্যানিউট, পঞ্চম হেনরী, রাণী ভিক্টোরিয়া, জুলিয়াস সীজার। ২য় লাইনে বাঁ দিক থেকে, এডমণ্ড হ্যালি, নেপোলিয়ান, টমাস বাড়লি। ৩য় লাইনে বাঁ দিক থেকে, জন মিলটন, মহাত্মা গান্ধী, আইজাক নিউটন। ৪র্থ লাইনে বাঁ দিক থেকে, ইরাজমাস, রাণী এলিজাবেথ, নিরো। চতুর্দশ

আলফ্রেড দি গ্রেট—ইংলণ্ডের প্রথম রাজা। (৮৪৯—৮৯৯ সন) ইংলণ্ডের ইতিহাসের একজন মহৎ ও শ্রদ্ধেয় রাজা।

ক্যানিউট—ইংলণ্ড, নরওয়ে ও ডেনমার্কের ক্ষমতাশালী রাজা (৯৯৫—১০৩৫) খৃষ্টাব্দ।

পঞ্চম হেনরি—ইংলণ্ডের রাজা। (১৩৮৭—১৪২২) কুশলী যোদ্ধা, এঁরই সম্পর্কে সেক্সপিয়রের প্রসিদ্ধ নাটক 'হেনরি দি ফিফথ'।

আলেকজাণ্ডার—খৃষ্টপূর্ব ৩৫৬—৩২৩। গ্রীসের রাজা। দিগ্বিজয়ী বীর, ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

জন মিল্টন—বিখ্যাত ইংরেজ কবি। ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপিয়রের পরেই এঁর স্থান। বিখ্যাত কাব্য 'প্যারাডাইস লষ্ট'।

রাণী এলিজাবেথ—ইংলণ্ডের রাণী (১৫৩৩—১৬০৩) এঁর রাজত্বকালে বৃটেনের সর্বাধিক উন্নতি হয়েছিল। এঁর সময়েই সেক্সপিয়র, বেকন, স্পেন্সার প্রভৃতি গুণীজ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাব।

চতুর্দশ লুই—ফ্রান্সের রাজা। (১৬৩৮—১৭১৫) এরাজত্বকালে শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য সব দিক দিয়েই ফ্রান্সের উন্নতি হয়েছিল।

ইরাজমাস—ওলন্দাজ দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক। পেশা শিক্ষকতা। তখনকার দিনের সকল গুণী জ্ঞানী লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল (১৪৬৯—১৫৩৬)।

টমাস বডলি—ইংলণ্ডের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী —'বডলিয়ান লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠাতা।

সয়াবিন

সতীন্দ্রনাথ লাহা

(১)

নিধিরাজ হালদার
বড়'দা সে কাল্‌দার।
বাড়ি তার খালধার,
কারবারি ডাল্‌দার,
বেশ পয়া ভাল্ তার,
রঙ দুধে-আল্‌তার॥

(২)

দুধ্ ছুটে শিশুকে
পড়েছিল অসুকে।
বলেছিল বিশুকে,
বসে আছ কি সুখে ?
কাছে থেকে এ দুখে,
গ্যাখো গিয়ে নিধুকে॥

(৩)

নিয়ে এল ডাক্তার,
'লেক্‌চারি' বাক্ তার।
সদা উঁচু নাক তার।
কতো যেন 'কালচার'!
লিখে দিলে 'মিক্‌চার'।
তবে, বাঁচা 'লাক্' তার॥

(৪)

কেটে গেল কিছুদিন···
সেরে ওঠে দিন দিন।
কাঁড়া গেল সঙ্গিন।
কথা কয় স্বর ক্ষীণ।
বলেছিল বহুদিন—

(৫)

তারপর একদিন,
বিধ্ কুটে দেখি 'সিন'—
কিনে আনে টিন্ টিন্....
তাতে নাকি 'সয়াবিন্'।
তাই খেয়ে কিছুদিন,

(৬)

সবে বলে ব'লে দিন্
কোথা সেই 'সয়াবিন্'
নিধু বলে, টাকা দিন
বদলেতে এই নিন—
নিধিরাজ সয়াবিন।

চুম্বুক আর সীতার গল্প

শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য

ছোটমামা অনেকটা গরম কেটলির ফুটন্ত জলের মতো। সব সময়ে টগবগ করছে। কাল রাত দুটো পর্যন্ত যাত্রার আসরে—সেখানে মামা-ভাগনে দু'জনে মিলে রাম-সীতার পালা দেখেছে। তারপর বাড়ী ফিরে গরম লেপের ভেতর মুখ ঢুকোনোর সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের ঘন অন্ধকার। অমনি চোখে গভীর ঘুম। সেই ঘুম থেকে কেউ কখনো সকাল দশটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে? কিন্তু ছোটমামা অদ্ভুত! নিজে কোন্ ভোরে উঠেছে কে জানে। এদিকে সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই হরিপদকেও ডাকাডাকি।

হরিপদর তখন মধ্যরাত্রি। স্বপ্ন দেখছে। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলেছে। সীতার করুণ কান্না একদিকে, অন্যদিকে মামার হাঁকডাক অচেতন মনের উপরে রাবণের হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো। ঘুম ভেঙে গেল হরিপদর।

ছোটমামা বললো, গেট আপ, আর দেরি নয়। সকাল দশটায় বিদ্যামন্দির। সায়েন্স একজিবিশন চলছে, কাল সকাল থেকে প্রোগ্রাম করে রাখলাম, ভুলে গেলি।

না, ভোলেনি হরিপদ। সায়েন্স একজিবিশন—সে ভুলবার নয়। কিন্তু ঘুম ধরে গেলে তখন আর মনের উপরে হাত থাকে না। তা ছাড়া কাল রাতে দেখা সীতার কান্না এখনও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তৈরী হলো হরিপদ।

বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয় বিদ্যামন্দির। হরিপদ মামার হাত ধরে সোৎসাহে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললো। বাঁশের খুঁটিতে লাল শালু জড়িয়ে তৈরী গেট। তাতে কাটা কাগজে তৈরী 'স্বাগতম' সাঁটা। সবাই দল বেঁধে চলেছে। হরিপদ মামাকে নিয়ে সেই দলের সঙ্গে মিশে গেলো।

এবার সেই প্রদর্শনী আর অবাক চোখ মেলে চারিদিকে তাকানোর পালা। সারি সারি টেবিল—প্রতিটাতেই রাজ্যের বৈচিত্র্য। কত মডেল, কত যন্ত্রপাতি, চোখ-ঝলসানো ব্যাপার, কিন্তু সব ছাপিয়ে হরিপদর মনকে যা সবচেয়ে বেশী নাড়া দিল, যন্ত্রের সাজসজ্জায় তার তেমন জাঁকজমক ছিল না।

হরিপদর মনটা এমনিতেই একটু নরম প্রকৃতির। তারপর গত রাতে দেখা সীতার কান্না হরিপদর মনকে আরও করুণ করে তুলেছিলো। সেই করুণ মনে আরও মোচড় পড়লো।

একই রাম, সীতা আর দশানন রাবণ—গতকাল রাত্রে যা ফুটেছিল মানুষের অভিনয়ে, আজ এখানে সেই চিত্রটিই মাটির মূর্তিতে। রাম রাবণ এক সঙ্গে, একই মূর্তির মধ্যে, পিঠোপিঠি আছে তারা। অন্য আর একটি মূর্তি, সেটি সীতার—কাঠের ফ্রেমে সুতোয় ঝুলোনো।

আহা, সীতার মুখখানি যেন করুণার প্রতিমূর্তি। সেই প্রতিমূর্তিটির সামনে রাবণের মূর্তিটাকে যখন এগিয়ে আনা হচ্ছে, তখন সীতা মুখ ঘুরিয়ে পিছু ফিরছে, বোঝাই যাচ্ছে যে, রাবণকে সে পছন্দ করছে না। কিন্তু যখন নিয়ে আসা হচ্ছে রামের মূর্তি, তখন সীতা রামের মুখোমুখি, এগিয়ে আসছে রামের দিকে।

আবেগে হরিপদ স্থান কাল পাত্র ভুলে গেল। সে চীৎকার করে উঠলো, বাস্তবিক এ ভগবানের খেলা। তা না হ'লে মাটির মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার।

ছোটমামা চাপা কণ্ঠে বললো, হরিপদ। শুধু নাম ধরে ডাকা, কিন্তু তাই যথেষ্ট। হরিপদ চুপ। বাকি কথা হরিপদর পেটের মধ্যেই রয়ে গেল।

কী ব্যাপার?

চারিদিকে শত চক্ষু—সবাই হরিপদকে লক্ষ্য করছে। তার ওপর মামার ধমক—সরল হরিপদ এ সবের কোনো মানেই বুঝতে পারলো না।

কিন্তু ধমক যখন খেয়েছে তখন আর কথা বলার উপায় নেই। এখন হাত ধরে শুধু দেখা আর শোনা। সেই দেখা শোনা শেষ করে হরিপদ একজিবিশনের বাইরে বেরিয়ে এলো মামার সঙ্গে সঙ্গে।

এবার কথা বলা। হরিপদ আড় চোখে তাকালো মামার দিকে।

ছোটমামার মুখে মুচকি মুচকি হাসি।

কি হলো বুঝতে পারলি না?

হরিপদ চুপ।

মাটির মূর্তিতে কখনো প্রাণসঞ্চার হয়?

হরিপদ বললো, কেন হবে না?

মামা অবাক, সে কি, কি ভাবে হবে বল্?

হরিপদর মার-প্যাঁচ নেই, কথায় সে সোজা উত্তর দিলো, পুজোর সময়ে সবাই বলে যে, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

মামা হাসলো, বললো, সেটা অন্য ব্যাপার। তাছাড়া ঠাকুর-দেবতা সেখানে এমন ভাবে নড়াচড়া করেন না। এখানে যা দেখলে সেটা একেবারেই বিজ্ঞানের কারসাজি।

হরিপদ চ্যালেঞ্জ করলো—এমন ভাবে তাকালো।

মামা বুঝাতে শুরু করলো, চুম্বক জানিস, চুম্বক, যা লোহাকে আকর্ষণ করে। এই রকম দুটো চুম্বক চাই। লম্বা চুম্বক—যাকে বলি দণ্ড চুম্বক। এই চুম্বকের দুটি প্রান্ত। একটা

উত্তর মেরু আর একটা দক্ষিণ মেরু। একটা চুম্বকের উত্তর মেরু সব সময়ে আকর্ষণ করে অন্য চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে। তাই-ই নিয়ম। সেই নিয়মের উপরে ভরসা করে তোর ভাষায় এই ভগবানের খেলা। গর্দভ কোথাকার!

একটা চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ ধরে সীতার মূর্তিটাকে তার উপরে আটকাতে হবে। ধর, সীতার মুখ

'এখানে যা দেখলে সেটা একেবারেই বিজ্ঞানের কারসাজি।' পৃ: ৪৪

চুম্বকের উত্তর মেরুর দিকে। তা'হলে সীতা আকর্ষণ করবে দক্ষিণ মেরুকে। তা'হলে অন্য চুম্বকটার দক্ষিণ মেরুর দিকে রামের মুখ, উত্তর মেরুর দিকে রাবণ। ব্যাস, খেলা সম্পূর্ণ।

এখন যেই তুমি রামকে নিয়ে আসছো সীতার দিকে, তখন দক্ষিণ মেরুর সামনে উত্তর মেরু, অর্থাৎ পরস্পরের আকর্ষণ। কিন্তু যেই রামের বদলে রাবণ, অমনি উত্তর মেরু উত্তর মেরুরই মুখোমুখি—বিজ্ঞানে এদের সহ-অবস্থান চলে না। ফলে, কাঠের ফ্রেমে সুতোয় ঝুলোনো সীতা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সাধারণ বিজ্ঞানের কৌশল। মাটির মূর্তিতে প্রাণ-সঞ্চার নয়।

কি! মাথায় ঢুকলো?

রূপকথা থেকে নাটক : রূপবদল

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

গভীর রাত। কিছু আগেই বিষ্টি হয়ে গেছে খুব ঝমাঝম। হঠাৎ থপ থপ থপ এবং রাজকুমারীর দরজায় হাজির এক সোনাব্যাঙ। ঠক্ ঠক্ ঠক্—ঠোকা মারে, বলে টেনে টেনে ব্যাঙ-মোটা গলায়—

দরজাটা খোলো রাজকুমারী, গেঙর গেঙর! রাজকুমারীর ঘুম ভাঙে হঠাৎ—

"আঃ, ঘেঙর ঘেঙর করে কে? ঘুমুতে দেয় না!"

"রাজকুমারী দরজা খোলো। আমি এসেছি, দরজাটা খোলই না। নইলে কি শেষে জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকব। গেঙর গেঙর!"

রাজকুমারী দরজাটা খুলেই পিছিয়ে যায় দু'পা—"ওমা, এ যে বড় একটা সোনাব্যাঙ!"

কিন্তু রাজকুমারী আর কিছু বলবার আগেই সেই ব্যাঙটা কিনা সোজা ঢুকল গিয়ে রাজকুমারীর ঘরে, তারপর একটি লাফে উঠে বসল রাজকুমারীর পালক-আঁটা আরাম-কেদারাটায়।

"ওমা, আমার বসবার জায়গায় কিনা ব্যাঙ। বেরো, বেরো বলছি। কী সাহস, রাজ-কুমারীকে ভয় খায় না!"

"আমাকে চিনতে পারছ না, রাজকুমারী!"

"না না, চিনব কিনা তোকে—আ মরণ! এখনি বেরো বলছি, বেরো! নইলে—নইলে পিটিয়ে বার করব!"

রাজকুমারী একটা ছড়ি তুলে নেয় দেয়াল থেকে—সোনায়-মোড়ানো, হীরেয়-জড়ানো ছড়ি। ব্যাঙটা কিন্তু ভয় খায় না। সে বরং আর একটি লাফে সোজা বসে গিয়ে রাজকুমারীর বিছানাটিতেই। এবং সেখান থেকেই বলতে থাকে গেঙর গেঙর—

"আঃ, চটো কেন রাজকুমারী, এই রাতে বর্ষায় ভিজে ভিজে এলাম, একটুখানি বসিই না তোমার ফুটফুটে নরম গরম বিছানায়। মনে পড়ে, আমিই তোমার হীরের আংটি খুঁজে দিয়েছি, গভীর জল থেকে তুলে দিয়েছি। সেই পাহাড়ের পাশে ঝর্ণার জলে আংটি পড়ে গিয়েছিল তোমার হাত থেকে। আংটি খুঁজে না পেয়ে তুমি কাঁদছিলে। মনে পড়ে? তারপর বলেছিলে আমাকে—আংটিটা তুলে দিলে যা চাই, তাই দেবে। তা, এখন তোমার বিছানায় একটু শুতেই না হয় দাও। আর আমার গায়ে বিছিয়ে দাও তোমার গায়ের ঐ রেশমী চাদরখানা।"

—ব্যাঙটি অমনি কিনা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রাজকুমারীর মাথার বালিশটার উপর, সামনের হাত দু'খানা বাড়িয়ে রাখল চাদরটা নেবার জন্যে।

তার সেই চিৎপটাং মূর্তি-দেখে রাগে জ্বলে ওঠে রাজ-কুমারী, দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ কামড়ে ধরে রাখে, তারপর বলে ওঠে চেঁচিয়ে—

"না, না, যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর তোর কোনো কথাই শুনব না। নাম্, আগে নাম্, আমার বিছানায় কিনা একটা ব্যাঙ! আমি কী করি এখন, ইস্, বালিশে বিছানায় কী নোংরা, কী কাদার দাগ!"

'ব্যাঙটা হয়ে গেল এক অপরূপ রাজকুমার'। পৃঃ ৪৪৩

"তা জুতোটা তো পায়ে চড়িয়ে আসিনি। সেই পাহাড় থেকে বিষ্টিতে ভিজে ভিজে এতটা পথ হেঁটে তবেই না দেখা করতে হ'ল। কই, তুমি তো আর তোমার কথা মতো দেখাই করলে না। গুণে গুণে ষোলটা দিন পার হয়ে গেল। বলেছিলে, দেখা করবে সেই পাহাড়ের তলায় ঝর্ণার ধারে, পাথরটার পাশে। আমি ব্যাঙ বলে বুঝি কথা রাখতে নেই?"

রাজকুমারীর আর তো সহ্য হয় না, চেঁচিয়ে ওঠে—

"নে, নে, এই তোর আংটি! যা। এক্ষুনি বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে।"—

রাজকুমারী সঙ্গে সঙ্গেই আংটিটা খুলে দেয়—দেয়, অর্থাৎ কিনা ছুঁড়ে দেয় ব্যাঙটার মুখের উপর! তবু তো নড়ে না ব্যাঙটা, বরং গোল গোল চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত করে দেখতে থাকে রাজকুমারীর রাগে লাল মুখখানি—আর আলগোছে বলে—"রাজকুমারী, আমাকেই তাড়িয়ে দিচ্ছ? একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি?"

"কী বাড়াবাড়ি করছি আমি? আমার বাবা রাজামশাইও এমন কথা বলতে পারত না!"

—রাজকুমারী রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে তার সোনায়-মোড়ানো হীরেয়-জড়ানো ছড়িখানি শক্ত হাতে ধরে, পেটাতে-পেটাতে ব্যাঙটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রুপো-বাঁধানো মেজের উপর।

আর অমনি কিনা ব্যাঙটা হয়ে গেল এক অপরূপ রাজকুমার। রাজকুমারী তো অবাক, মুখে কথা সরে না—এ ব্যাঙ যে ব্যাঙ নয়, রাজকুমার!

রাজকুমার একটুখানি হেসে বলে—"আংটিটা খুঁজে দিলাম আমি, আর আমাকেই কিনা দূর দূর। তা, তোমার আঙুলের আংটি তো আমাকেই দিয়ে ফেলেছ—ছুঁড়েই দিয়েছ যদিও। এখন, তোমার আংটি আবার তোমাকেই দিচ্ছি—আংটি বদল হ'ল তো, কি বলো?"

রাজকুমার আংটিটা মেজে থেকে তুলে নিয়ে পরিয়ে দেয় রাজকুমারীর নরম আঙুলে।

রাজকুমারী মাথাটি নিচু করে ছিল এতক্ষণ, এবারে রাঙা মুখখানি তুলে ব্যাঙকুমারের দিকে একবার তাকিয়েই আবার মুখ নামাল।

অমনি ভোর হ'ল, রাঙা আলো ফুটল। বাজনা বেজে উঠল সারাটা রাজপুরীতে।

নেতাজী

শ্রীবেনু গঙ্গোপাধ্যায়

অজ্ঞাতবাস ঘুচুক এবার
হে বীর, সব্যসাচী।
জন্মতিথিতে তোমারে স্মরিয়া
সারা দেশ উঠে নাচি।
অমিত বীর্যে ওঁকৃত প্রাণে
এলে ইম্ফলে জয় অভিযানে
গণ জাগরণে জাগায়ে দিয়েছে
সুপ্তিমগন প্রাচী।
আজাদী সৈন্য মুক্তির তরে
মরিয়া রহিল বাঁচি।

নেতাজী, তোমার অভয় তূর্য
ঘুচাতে অমঙ্গল,
ভীম-ভৈরব সুরে ডাক দিল,
'চল্‌রে দিল্লী চল্‌"
মুক্ত কেতনে মুক্তির গান
শৃঙ্খল ভেঙে করে খান খান
'জয় হিন্দ' রবে তপ্ত শোণিত
শিরায় উঠিল নাচি।
স্বাধীনতা এলো, তুমি তো এলে না,
হে বীর সব্যসাচী।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণে

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুমুদ-বিদায়ে

শ্রীনৃপেন আকুলি

'শতদলে' কেবা অর্ঘ্য সাজাবে বাণীর চরণতলে,
'বনতুলসী'রে কে দেবে আদর? কাঁদিছে চোখের জলে!
'উজানি'র বুকে নেই কোন সুর, নূপুর হয়েছে ভগ্ন,
'একতারা' তার ছিন্ন আজিকে, ধূলিতলে শোকে মগ্ন।

'বনমল্লিকা' ঝরে ম্লান মুখে, তূণীরও বিষাদময়,
'রজনীগন্ধা' ব্যাথায় ক্ষুণ্ণ, নিরানন্দেতে রয়।
'স্বর্ণসন্ধ্যা' কালোমেঘে ঢাকা তোমারি গভীর দুখে,
ব্যথিত 'অজয়' কলগীতিহীন দুঃসহ ভাঙা বুকে।

তুমি ছিলে এক প্রকৃতি পূজারী, তোমার পূজার দান—
বঙ্গবাণীর চরণেতে রবে চিরকাল অম্লান।
ভালোবেসে তুমি ঋণী করে গেলে অপরিশোধ্য ঋণে
নয়নের জলে জানাই প্রণতি আজি এ বিদায় দিনে।

কবি-প্রণাম

শ্রীঅজিতকুমার সু

খাঁ খাঁ করে আজ অজয়ের তীর,
কুনুরের কূল কাঁদে;
কোগ্রামে আজ ঝরায়ে শিশির
কাঁদে আকাশের চাঁদে।
লতাপাতা সব শুকায়ে দুলিছে,
প্রাণহীন গ্রামবাসী—
তাহাদেরই কথা কহিতে যে তুমি
তাহাদের ভালবাসি।
'টুনির মা'য়ের সমব্যথী হয়ে
হৃদয়ে কাঁদিবে কেবা,
মরমী কে ছিল তোমার মতন
বেদনা বুঝিবে যেবা!
'শতদলে' আর রচিবে কে শোভা
ভারতী চরণতলে,
'বনমল্লিকা', 'বনতুলসী'তে
তুমিই পূজিয়াছিলে।
আর কে বাঁধিবে 'ভাঙন-ধরা
অজয় নদীর বাঁকে'
নিরালা কুটীর, কবি সে কুমুদ,
প্রণাম করি যে তাঁকে।

তিন অধ্যায়

নর্দমার ঐ ধারটায়
জন্মেছিল একটা আম গাছ
শিশুকাল থেকেই তার কচি মূলটা,
সে ছড়িয়ে দিয়েছিল নর্দমার উপর।
নালাটা করেনি মানা;
বঞ্চিত করেনি তাকে পচা জল থেকে
বরং আরামই পেয়েছিল
তার শীর্ণ মূলগুলোর আকর্ষণে।

* * *

তারপর গাছটার এল কৈশোর।
নালার মনে হ'ল আকর্ষণটা যেন
বেড়েছে একটু—
কিন্তু ক্ষতিকর নয় ভেবে সয়ে গেল
সেটা।

* * *

আস্তে আস্তে এল তার যৌবন।
কচি মূলগুলো
পরিণত হ'ল সবল শিকড়ে।
ফাটিয়ে ভেঙে ফেললে নালাটাকে—
আনল তার শিকড়ের কঠিন মুষ্টিতে
—বোধহয় খাদ্যলাভের আশাতেই।

শ্রীসুগত হাজরা

কি খাবে?

ঘুরি-বাজারে—
পাটনার পাট পাবে
সিমলার সিম খাবে,
ধানগাঁ'র ধান নিও
হাজারে ও হাজারে।
চাকদার চাটনিতে
সবকিছু ভুলে যাই,
মিহিজামে জাম খেয়ে
পেট করে আইঢাই।
বর্ধমানেতে লোকে
মানকচু নিয়ে বসে,
কচুপোড়া খাও তবে
সবকিছু খেয়ে শেষে।

শ্রীসত্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—

অদ্ভুত ছেলে

নাম তার চঞ্চল
গায়ে দেয় কম্বল,
পোস্তর বড়া খেলে
হয় তার অম্বল।
খায়নাকো ভাত ডাল
খায়নাকো মাছ-ঝাল,
মণ্ডা মিঠাই দিলে
বলে ওটা খাব কাল।

শ্রীবিবেক রায়

ভগবান যীশুর উপদেশ

শ্রীমঙ্গলময় দত্ত

আরবের উত্তরে ইহুদিদের দেশ প্যালেস্টাইন। তার মধ্যে গ্যালিলি একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে একটি নগণ্য ছোট গ্রাম—ন্যাজারথ। এই গ্রামে ছুতোরের ঘরে দরিদ্র ইহুদি মায়ের গর্ভে ভগবান যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।

ইহুদি জাতি অতি প্রাচীন। ধর্মই ছিল তাদের জীবনে সর্বস্ব। আমাদের দেশে যেমন জাতিভেদ আছে, তেমনি ইহুদিদের মধ্যেও জির্ড ও জেন্টাইলে ভেদ ছিল। যে মন্দিরে—জির্ড উপাসনা করবেন, সেই মন্দিরে জেন্টাইলের প্রবেশ ছিল না। জেন্টাইল অশুচি, জেন্টাইলের মধ্যে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই—ইহুদিদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

যখন ভগবান যীশু জন্মগ্রহণ করেন, তখন শুধু ইহুদিদের দেশে নয়, চারিদিকে ধর্মের ক্রিয়াকর্ম, বাইরের আচার-বিচার নিয়ে সবাই মেতে উঠেছিল। ধর্মের সার কথা নয়, ধর্মের আবরণই একমাত্র লক্ষ্য ছিল সকলের।

এই সময় ইউরোপে রোমের প্রতাপ। বড় বড় জাতি তার পদানত। রোমেরও কোন ধর্ম ছিল না। সব অধীনস্থ জাতির ধর্ম রোমে এসে ভিড় করেছিল। রোমের ছিল কেবল ইঁট আর কাঠ, কেবল সৈন্য বা রণসজ্জা। ইহুদিদেরও প্রাচীন ধর্মে গ্লানি ঢুকেছে—নানা বাহ্যিক আচার-বিচারে জীর্ণ হয়ে এসেছে। ইহুদিরা জেনেছিল ত্যাগ, দয়া, শুচিতা, ভক্তি প্রভৃতি বাহিরের জিনিস। বিশেষ দিনে দান করতে হয়, বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তি করতে হয়, বিশেষ স্নানের দ্বারা শুচি হতে হয়—সমস্তই বাইরের আচার। মোট কথা, স্নান, উপবাস, দান-ধ্যান, দেবতাকে খুশি করার জন্য পশুবলি ইত্যাদিই ছিল ধর্ম। যীশু কিন্তু উল্টো কথা বললেন। যীশু বললেন, সমস্ত পাপের মূল ভিতরে। ভিতর থেকে দয়া জাগলে দয়া, আচার-গত দয়া তো দয়া নয়। ভিতর থেকে ভক্তি জাগলে তবেই ভক্তি, বাহিরে ভক্তি দেখিয়ে কি হবে? ভিতর থেকে অশুচিতা দূর করলেই পবিত্র হওয়া যায়। স্নান করলে শুচি হবে কেমন করে? বাহিরের ত্যাগে তো স্বার্থ যায় না। সব চেষ্টাকে ভিতরের দিকে ফেরাও, ভিতরে পরিপূর্ণ হও।

দুই একটি ছাড়া যীশুর শিষ্যদের মধ্যে ভদ্রলোক কেউ ছিল না। যত জেলের দল তার চারদিকে এসে জড় হ'ত। এই সরল-প্রাণ জেলেদের কাছেই তিনি ধর্মের কথা বলতেন। যীশু বলেছিলেন, শিশুর মত সরল না হলে সত্যকে পাওয়া যায় না। এরা সেই শিশু ছিল। যীশুর ভক্তদের মধ্যে সাইমন্ ও পিটার দুই ভাই, দুই জেলে।

ইহুদিদের বড় বড় অন্ধ সংস্কার সত্যের পথে এক অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। যীশুখৃষ্ট এখানে

আঘাত করলেন। বললেন, ঈশ্বর যখন সকলের অন্তরে অন্তরে রয়েছেন, অন্তরের পরিপূর্ণতার মধ্যেই তাঁর প্রকাশ হবে, তখন ধর্ম জির্ড-এর, জেন্‌টাইলের নয়, এ কথা তো বলা চলে না। প‍ুরপূর্ণ যে কোন লোক হতে পারে। এ যে চাইলেই হয়। এর জন্য কুল দরকার হয় না, ধন দরকার হয় না, বিদ্যারও দরকার হয় না। সকলের মধ্যে যে সত্য-দয়া-ধর্মে পরিপূর্ণ মানুষটি রয়েছে, কেবল সাধনার দ্বারা তাকে উপলব্ধি করতে হয়।

যীশুর উপদেশ যে কয়েকটি আছে, ত: তাঁর শিষ্যরা তাঁর মৃত্যুর পর সংগ্রহ করেছিলেন। উপদেশগুলি নিতান্তই সরল। পৃথিবীতে বালকও সে কথা সহজে বুঝতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "যারা দীন, তারা ধন্য, স্বর্গরাজ্য তাদের। যারা অপরাধের জন্য অনুতাপ করে তারাই সান্ত্বনা পায়। যারা নম্র, তারা সকলকেই জয় করে। ভাল হবার জন্য যাদের তৃষ্ণা, যাদের ক্ষুধা, তাদের সে ক্ষুধা মিটবে। যারা অন্তঃকরণের ভিতর থেকে শুদ্ধ হয়েছে, চিত্তে কোথাও মল রাখেনি, ঈশ্বরকে তার দেখতে পায়। যারা শান্তিস্থাপন করেছে, তারাই তাঁর প্রকৃত সন্তান। যারা সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য, নির্যাতন সহ্য করছে, তারাই স্বর্গের অধিকারী।"

স্বর্গরাজ্য বলতে বিশেষ কোন জায়গা বুঝায় না। যীশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—স্বর্গরাজ্য কোথায়? তিনি বলেছিলেন—তোমার অন্তরে। ভিতর থেকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেই যে স্থানটি আমাদের চিত্তের চারদিকে সৃষ্ট হয়ে উঠে, সেইটিই স্বর্গলোক, অথবা সত্যলোক। ভগবান যীশুর সমস্ত উপদেশ এই। আর এই সহজ কথাটিই জগত ভুলতে বসেছিল। এই চিরন্তন সত্যটিই আচ্ছন্ন হয়েছিল—মানুষের মধ্যে একে জাগাবার জন্যেই ভগবান যীশুর আবির্ভাব।

শীত-সকালে

শ্রীত্রিদিবকুমার রায়

সকাল সকাল যায়না ওঠা
বাপ্‌রে কি শীত কন্‌কনে।
হেই ভগবান, ধরছি পায়ে
রোদ এনে দাও চনমনে।

হেই ভগবান, না হয় তুমি
দাও জেঠুকে পাঠিয়ে কোথায়,
ন্যাপ্‌লা হাবু জ্বালছে আগুন
একছুটে যাই বকুলতলায়।

পেল্লায় এক চাদর গায়ে
তবু ভীষণ পাচ্ছে শীত,
শীত পালাবে এই আশাতেই
কাঁপছি তবু গাইছি গীত।

গন্‌-গনানো আগুন পেলে
সেঁকবো পা-হাত আচ্ছা করে,
হেই ভগবান, দিচ্ছি কথা—
পড়ার আগেই ফিরবো ঘরে।

বলতে পারো ?

সবজান্তা

১। বলতে পারো সাধারণতঃ কোন্ গাছের কাঠ ক্রিকেট খেলার ব্যাট তৈরী করতে ব্যবহার করা হয় ?

২। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট খেলা লর্ডস্ ক্রিকেট মাঠে হয়। বল তো এ মাঠের 'লর্ডস্' নামকরণ কেন হ'ল ?

৩। বল তো ক্রিকেট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী কে করেছিলেন ?

৪। তোমরা নিশ্চয় বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রণের নাম শুনেছ। ১৮০৫ সালে একবার তিনি লর্ডস মাঠে ক্রিকেট খেলতে নামেন। তার বিপক্ষেও দু'জন নামকরা লোক ছিলেন। বলতে পারো তাদের নাম ?

৫। ক্রিকেট খেলায় সরকারী টেষ্ট ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী কে ? তার রান সংখ্যা কত ?

'বলতে পারো'র উত্তর

১। 'উইলো' গাছের কাঠ।

২। ইয়র্কশায়ারের অধিবাসী থমাস লর্ড ক্রিকেট খেলার জন্য ঐ মাঠ ঠিক করায়, তাঁর নামানুসারে ঐ মাঠের নামকরণ হয় 'লর্ডস্'।

৩। হ্যাম্‌ব্লেডন ক্লাবের জন্ স্মল সেনর।

৪। ইটন এবং হ্যারো।

৫। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারফিল্ড সোবার্স। সর্বোচ্চ রান ৩৬৫।
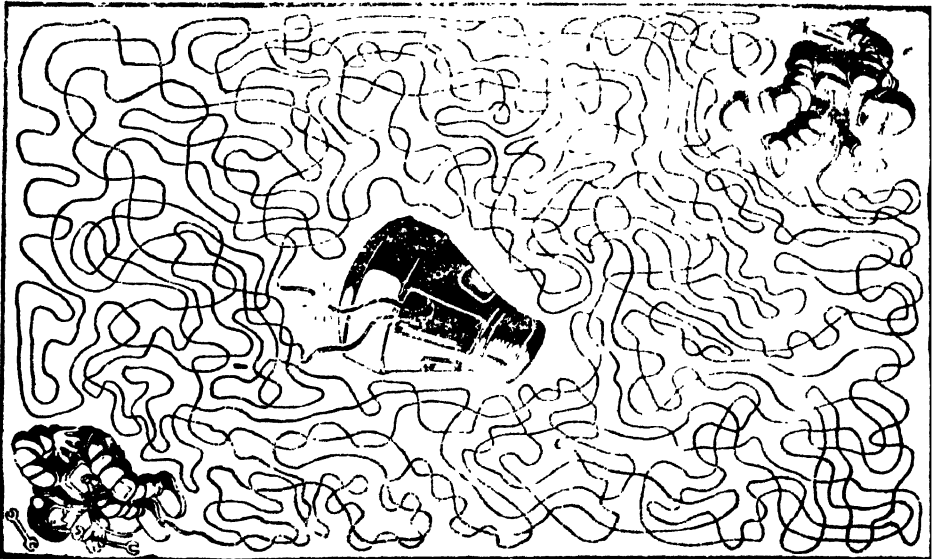
নভশ্চর দু'জন পুরুষ

১। নীচের এই ছ'টি লাইনে সাতজন ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম লুকোন আছে, তোমরা সেই নামগুলি বার করতে পার কিনা দেখ।

গরমেতে কেউ খুশি, কেউ বড় ম্রিয়মাণ
গলার বাতাস খুলে কী মশাই ছাদে যান?
নীচের মাদুরে যদি রাতে কেউ শুতে চায়,
কলসীতে জল আছে, গুড় আছে মালসায়।
কার রে এ খঞ্জনি? মশাই কি গান গান?
দুনিয়ার গঞ্জিকা আপনি একাই খান?

কুমারী শেফালী ও পূরবী ভট্টাচার্য (ভাটপাড়া)

২। সংস্কৃত করো নায় তবু না চলিবে—
জননীর ভারে শুধু নৌকা ডুবিবে;
জননী দুহিতা দুই মিলাইয়া পাই
অতি ঘোর তুফানেও পারে চলে যাই!
একের ভারে ডোবে নৌকা, দুয়ের ভায়ে চলে,
এ রহস্যের ভেদ তুমি কর বুদ্ধিবলে!

৩। আদ্য বর্গে বসি আমি সাকার হয়ে থাকি
বল্‌লে পাতে বসে যাই অপেক্ষা না রাখি;
তুরীয় বর্গের আগে সাকার হয়ে এসে
বস্‌লে পাশে, পাতে চোখের জল পড়ে শেষে!
দুয়ে মিলে কে যে মোরা, এবার বল ভাই,
তা না হলে খেতে-শুতে সোয়াস্তি যে নাই!

শ্রীমমতা সিংহ (বীরভূম)

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। ভ্রমর ২। মগজ ৩। নগদ ৪। সালসা

মেষ্টুপড়

এশিয়ান গেমস

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস-এর আঠারোটি দেশের প্রায় দু' হাজার প্রতিযোগীর তেরো রকমের খেলাধূলোয় বারোদিন ধরে প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতি খেলাধূলোর ক্ষেত্রে এশিয়ার আরেক ধাপ অগ্রগতি। দু একটা বিষয় ছাড়া প্রায় সব বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অ্যাথলেটিকসে, সাঁতারে, ভারোত্তোলনে, রাইফেল চালনায়, সাইকেল চালনায় প্রতিযোগীরা রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এশিয়ার সবচেয়ে উন্নতিশীল জাপানের জয়-জয়কার সব রকমের খেলাধূলোয়। বাকী সতেরোটি দেশের প্রতিযোগীরা যেখানে তেষট্টিটা সোনার পদক পেয়েছেন, সেখানে শুধু জাপানের প্রতিনিধিরাই পেয়েছেন সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জপদক মিলিয়ে সবসুদ্ধ চুয়াত্তরটা। এবার সাঁতারের আঠাশটা স্বর্ণপদকের মধ্যে জাপান পেয়েছে পঁচিশটা, বাকী তিনটে দক্ষিণ কোরিয়া।

ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন জাপানের সতেরো বছরের স্কুলের ছাত্রী যোশিমা নিশিগাওয়া। তিনি একাই সাঁতারে পাঁচটা স্বর্ণপদক পেয়েছেন। যদিও অ্যাথলীট বিশারদরা তাইওয়ানের চি চেংকে 'এশিয়ান অ্যাথলীট অব দি ইয়ার' নির্বাচিত করেছেন, তথাপি চি চেং-এর চেয়ে নিশিগাওয়ার কৃতিত্ব কিছু কম নয়।

পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সিংহলের দূরপাল্লার দৌড় বীর জুলিয়ান রোসার। রোসা পাঁচ ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এবার এশিয়ান গেমসে একটাই বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারোত্তোলনের ব্যান্টম ওয়েটের প্রেসে হাঙ্গেরীর আই ফোলডির বিশ্বরেকর্ড (১২৫ কিলো) ভেঙে ইরাণের মহম্মদ নাসিরি ১২৫·৫ কিলো ভার তুলেছেন।

অ্যাথলেটিকসে জাপানের পরই ভারতের স্থান। সংগ্রহ চারটি সোনা, পাঁচটি রুপো ও

ব্রোঞ্জপদক। এর মধ্যে স্বর্ণপদকের অধিকারী যোগীন্দার সিং, পারভিন কুমার ও মহীন্দার সিং গিলের নতুন রেকর্ড করারও কৃতিত্ব রয়েছে। অ্যাথলেটিকসের বাকী স্বর্ণপদকের অধিকারিণী চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কমলজিৎ সাঁধু। কমলজিতই একমাত্র ভারতীয় মহিলা যিনি এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ডেকাথলনে এস. জি শেঠীর রৌপ্যপদক লাভও নিঃসন্দেহে ভারতীয় অ্যাথলীটের স্বর্ণদ্যুতি।

১৯৬৬ সালে যে পাকিস্তান ব্যাংককে ভারতের কাছে হকিতে তার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ হারিয়েছিল, চার বছর পরে সেই ব্যাংককেই ভারতকে হারিয়ে শুধু হৃতগৌরবই পুনরুদ্ধার করেনি, পাকিস্তান এখন বিশ্ব-হকির অজেয় যোদ্ধা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবারের ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর দ্বিতীয় অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে একটা গোলে যেভাবে ভারত হার স্বীকার করেছে, তাতে খেলোয়াড়দের দোষ দেওয়া চলে না। বরং তিন তিনবার ভারতীয় খেলোয়াড়দের গোলে হিট করা বল গোল পোষ্টে লেগে ফিরে আসায় ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিচয় মিলেছে। এবারের এশিয়ান গেমসে পাকিস্তান শুধু একটা বিষয়েই অর্থাৎ এই হকিতেই একমাত্র স্বর্ণপদক পেয়েছে।

ফুটবলে ভারতের ব্রোঞ্জপদক লাভ অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। যদিও এশিয়ান গেমস-এর মোট ছ-টা খেলার মধ্যে ভারতকে জাপানের কাছে এবং সেমি ফাইন্যালে বার্মার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে, তবুও তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় আবার জাপানকেই হারিয়ে ভারত ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। ভারত সেমি ফাইনালে বার্মার কাছে হার স্বীকার করলেও কোনো অংশে খারাপ খেলেনি। তা ছাড়া শক্তিশালী ইন্দোনেশিয়াকে ৩—০ গোলে পরাজিত করেছে ফুটবলের উন্নত কলা-চাতুর্যের পরিচয়ে। এই খেলায় ভারতের প্রতিটি খেলোয়াড় বিশেষ করে সুধীর কর্মকার, নাইম, সি. প্রসাদ, শ্যামা থাপা ও মগন সিং খুবই ভালো খেলেছেন।

এশিয়ান গেমস থেকে ওয়াটার পোলো খেলায় ভারত রৌপ্যপদক নিয়ে এসেছে। ভারতের ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়রা যে ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানের কাছে ৪—২ পরাজিত হয়েছেন সেটা তাঁদের কৃতিত্বেরই পরিচয়। জাপানের সঙ্গে ভারত প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং দুটো গোল খেয়েছে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যেই।

টেবল টেনিস

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে জাতীয় এবং ইন্টার অ্যাসোসিয়েশনের টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। দীর্ঘ এগার বছর পরে কলকাতায় টেবল টেনিসের জাতীয় প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হ'ল। এখানে শেষবার জাতীয় টেবল টেনিসের খেলা হয়েছিল ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, ইডেন উদ্যানেই। সেবারের চেয়ে এবারের আয়োজন ছিল অনেক ব্যাপক এবং আকর্ষণীয়। কেন না, অনেক বেশী রাজ্যদল এবং অনেক বেশী খেলোয়াড় এবারের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া এবার উদ্যোক্তা'দের আমন্ত্রণে জাপানের বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়রাও অংশ নিয়েছিলেন। এতকাল ইণ্টার অ্যাসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন রাজ্য দলই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো। এবার রেলওয়ে স্পোর্টস বোর্ড, পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ, স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস, সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতিও ইণ্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগী ছিল।

দশদিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলে। দুটো সেসনে (সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা) ইডেনের আটটা টেবলে এই প্রতিযোগিতা একসঙ্গে চলে। এবারের জাতীয় টেবল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রেলওয়ের জি. জগন্নাথ ফাইনালে গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ন অন্ধ্রের মীরকাশিম আলীকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করে। পরাজয়ের জন্যে মীরকাশিম নিজেই বেশী দায়ী—প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্রীড়াশৈলী সত্ত্বেও। যখন মীরকাশিমের স্ম্যাশিং বারবার ভুল হচ্ছে, পয়েণ্ট জমা হচ্ছে জগন্নাথের নামের পাশে, তখনও ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় তাঁর খেলার প্রকরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অবশ্যই মীরকাশিমের হাতের মারের মধ্যে টপ স্পিন প্রশংসার দাবী রাখে, কিন্তু টপ স্পিনের কাউণ্টার হিসেবে জগন্নাথের ব্যাক স্পিন ছিল খুবই কার্যকরী। প্রথম গেমে মীরকাশিমই ১৯—১৫ পয়েণ্টে এগিয়ে ছিলেন এবং যেভাবে খেলছিলেন তাতে মনে হয়েছিল গেমটি তাঁর হাতের মধ্যে। কিন্তু জগন্নাথ ২০—২০ পয়েণ্টে ডিউস করে সেই গেম নিয়ে নেন। পরের গেমে জগন্নাথ ২১—১০ পয়েণ্টে জয়ী হন। তৃতীয় গেমেও মীরকাশিমের হতাশজনিত খেলায় জগন্নাথের ২১—১৯ পয়েণ্টে গেম লাভ সর্বপ্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান।

জাতীয় টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের মেয়ে কাইটি চার্জম্যান শুধু তাঁর চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মানই ধরে রাখেন নি, গতবারের মতন এবারও পেয়েছেন ত্রিমুকুটের সম্মান। ফাইনালে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন মহীশূরের উষা সুন্দররাজকে অতি সহজে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে সিঙ্গলস জয় করেছেন, ডাবলস জিতেছেন নিজ প্রদেশের নায়রেৎ মৌলাকে সঙ্গী করে খেলে। তারপর মিক্সড ডাবলস জিতেছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ফারুক খোদাইজির সঙ্গে খেলে।

টেবলের ওপর ঝড় তুলতে জাপানীদের জুড়ি নেই। অবাক লাগে জাপানী খেলোয়াড়দের হাতের কণ্ট্রোল দেখে। বিদ্যুৎ গতির বলকে আলতো স্পর্শে বাগে রাখা যে কতখানি শক্ত

তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ওঁদের কাছে ওই ধরণের মার যেন সহজাত ক্রীড়াশৈলীর অন্তর্ভুক্ত।

কোনো, কোণ্ডো ও নিশি এই তিনজন জাপানী খেলোয়াড় এবার জাতীয় টেবল টেনিসের খেলায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনজনের ভেতর মিৎসুরু কোনো নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এবং একবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন। কোণ্ডোর খেলার বিশেষত্ব—টেবলের সাত-আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে তিনি বলের মোকাবিলা করেন। কোনো এবং নিশি খেলেন টেবলের কাছে। প্যারালেল সিঙ্গলসের ফাইনালে কোনো এবং নিশির খেলা দেখে দর্শকরা তাঁদের মনের আশা মিটিয়ে নিয়েছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডাবলসের ফাইনাল খেলাও দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে।

নতুন অধিনায়ক

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্যে ভারতের নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বোম্বাইয়ের তিরিশ বছর বয়েসী ন্যাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার।

ওয়াদেকার স্কুল-জীবনে ক্রিকেট খেলেন নি। কলেজের দ্বিতীয় বছর থেকে ক্রিকেট ব্যাট হাতে ওঠে এবং ওই বছর থেকে আন্তঃ কলেজ এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলতে আরম্ভ করেন। ১৯৫৮—৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে ওয়াদেকারের ক্রিকেট জীবনের দ্বিতীয় বছরে এক স্মরণীয় কীর্তি হ'ল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ৩২৪ রান যা এতদিন রেকর্ড হিসেবে ছিল। গত ৫ জানুআরি পুনাতে দক্ষিণ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ৩২৭ রান করে বোম্বাই-এর এক ছাত্র সুনীল গাভাসকার এই রেকর্ড ভেঙেছেন। টেস্ট খেলায় তিনি প্রথম সুযোগ পান ১৯৬৬ সালে। এ পর্যন্ত একুশটা টেস্টে রান করেছেন ১৩৬৬। সেঞ্চুরি মাত্র একটা—১৯৬৭-৬৮তে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। আশা করব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ওয়াদেকারের সফল নেতৃত্বে ভারত ক্রিকেটের নষ্ট সুনাম পুনরুদ্ধার করবে।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও প্রভু প্রেস, ৩০, বিধান সরণি কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : '৬০ পয়সা

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা *

৫১শ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৭৭ [১১শ সংখ্যা

মৌচাকের মৌমাছি

শ্রীবিমল দত্ত

মৌমাছি গো মৌমাছি
চাক-ভরা মৌ যুগিয়ে রাখো
টাট্‌কা ফুলের, তাই বাঁচি
মৌমাছি গো মৌমাছি।

বানবাদাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
ফুল ফুটে রয় মৌ-ভরা
গুন্‌গুনিয়ে যাও ছুটে ভাই
নাও লুটে মৌ নাও ত্বরা।

বাতাস—পাথার সাঁতরে এসে
মৌচাকে মৌ রাখছ ঠেসে
মোম দিয়ে ঘর তৈরী করে—
নয় সোজা কাজ, মশ্‌করা
মোম দিয়ে ঘর তৈরী করে
মৌ-ভরা !

কত সে ফুল গন্ধ মধুর
রূপ-গরবী রং-ঝরা—
সবুজ পাতার রংমহলের
বেগমবাহার মন-ভরা।

ঘোমটা খোলা ফুল-বধূদের
স্নিগ্ধ মুখের মৌ-চুমি
দৌড়ে এসে নিজের দেশে
রাখো সে মৌ মন খুশি।
মাটির বুকের লক্ষ কোষের
চোলাই করা রসের ফুল
পাতায় পাতায় উঠছে ফুটে
সন্ধ্যা ভোরে দোদুল-দুল।

সে ফুল ভরে হাতড়ে ঘেঁটে
মৌ খুঁজে নাও বেজায় খেটে—
নিদ্‌মহলের সিঁদ্‌কাটা চোর
মৌমাছি মৌচাকের বৌ
শিশু-কিশোর মনের দোরে
রোজ হেঁকে যাও টাট্‌কা মৌ
মৌমাছি মৌচাকের মাছি—
পশরা-ভরা টাট্‌কা মৌ।

(১) হাতুড়ি-মুখো হাঙর (২) ম্যাকো হাঙর (৩) স্যাণ্ড শার্ক বা বালি হাঙর (৪) টাইগার শার্ক বা বাঘ হাঙর (৫) নীল হাঙর (৬) সাদা হাঙর।

সাগরের বিভীষিকা

শ্রীঅলোককুমার সেন

প্রকৃতি তাঁর অনুপম শোভায় ভরিয়ে দিয়েছেন এই পৃথিবীকে। তাকে সাজিয়েছেন ফুলের মালায়, নদীর কলতানে, পাখির কাকলিতে—তার দিগন্তপ্রসারিত সুনীল জলধির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে। সাগর যেন বিশ্বমাতার কণ্ঠহার। কিন্তু আজ আমরা কবির কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে যাব না নীলসাগরের অতল তলে, আমরা দেখব তার ভয়াবহ রূপের ছবি, শুনব তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মৃত্যুদূতের কাহিনী।

"সাগরের বিভীষিকা"র কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় হাঙরের কথা। এরাই হলো সমুদ্রের সবচেয়ে বড় শয়তান। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে রত হাঙররা হারাচ্ছে তার বিশাল চেহারা। জীবাশ্ম অর্থাৎ শিলীভূত প্রাণীর (fossil) দেহ থেকে জানা গেছে যে, হাজার দশেক বছর আগে একশো ফুট লম্বা হাঙর মনের সুখে বাস করতো সাগরের বুকে। আজ পঞ্চাশ ফুট লম্বা হাঙরও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে ধরণী থেকে; সেদিন সাগরের বুকে আর শোনা যাবে না মৃত্যুদূতের পদধ্বনি।

শুনলে তোমরা অবাক হবে যে, মানুষ-খেকো হাঙর হলো মাছেদেরই জাতভাই। বিজ্ঞানীরা তাকে ফেলছেন, "কোমল অস্থিবিশিষ্ট মাছ"-এর গোষ্ঠীতে। এরা ধরায় আসে আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে। হাঙররা হলো প্রাচীনতম মেরুদণ্ডী প্রাণী। মাছেদের আত্মীয় হলেও এরা কিন্তু পাঁচ-ছ'টা খোলা কান্‌কো দিয়ে শ্বাস নেয়। এদের শরীরে বাতাস-ভরা থলি বা পটকা থাকে না। আবার হাঙরের আঁশে থাকে সরু সরু কাঁটা। এ জাতীয় আঁশকে বলে, 'প্লাকয়েড' আঁশ।

এবারে ক'টি বিশেষ জাতের হাঙরের গল্প শোন। প্রথমে বলি শান্তশিষ্ট স্বভাবের হোয়েল শার্কের কথা। এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় ষাট ফুট ও ওজনে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড হয়ে থাকে। এত

বড় মাছ পৃথিবীতে আর নেই। তবে দেখতে বিশাল হলে কি হবে, হোয়েল শার্কের খাদ্য হচ্ছে ছোট ছোট জলজ প্রাণী, মানুষ খাবার কথা এরা চিন্তাই করতে পারে না।

এদেরই মত নিরীহ হলো 'ব্যাস্কিং শার্ক' বা 'রোদ-পোহানো হাঙর'। এরা মুখ খুলে ভেসে বেড়ায়, আর শামুক, ঝিনুক ও পোকামাকড় ধরে খায়। এরা লম্বায় হলো প্রায় চল্লিশ ফুট।

সবচেয়ে হিংস্র হাঙরের নাম 'হোয়াইট শার্ক,' নাবিকরা যাকে বলে 'সাদা শয়তান'। এরাই হলো সত্যিকারের বিভীষিকা। ভাগ্য ভালো, শুধু গরম দেশ ছাড়া এই সাদা হাঙররা আর কোথাও থাকে না।

দৈত্যের মত দেখতে 'হ্যামার শার্ক'ও কিছু কম ভয়ংকর নয়। এরা হলো পাকা সাঁতারু। সাগরের এক জাতীয় হাঙরের সঙ্গে বাঘের দেহের সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানীরা তাই এই হাঙরকে 'টাইগার শার্ক' বলেন। এদের গায়ে থাকে লম্বা লম্বা দাগ। লম্বায় এরা প্রায় তিরিশ ফুট হয়ে থাকে। 'বাঘা হাঙর' হলো খুব লোভী প্রকৃতির। কখনো কখনো এরা অন্য হাঙরকেও খেয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

হাঙর-জগতের রাজার নাম 'ব্লু-শার্ক' বা 'নীল হাঙর'। এদের পেটের দিক বরফের মত ধবধবে সাদা, আর পিঠের রঙ ঘন নীল। সুনীল জলরাশির মধ্যে ব্লু-শার্কের চলাফেরা দেখার মত দৃশ্য। তা' বলে ভেবো না যে এরা হলো শান্ত স্বভাবের, মানুষ খেতে নীল হাঙররাও ভারী পটু।

গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার রাজ্যে তিমি-খেকো হাঙর দেখা যায়। পঁচিশ-ছাব্বিশ ফুট লম্বা এই হাঙররা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায় আর বিরাট তিমি দেখলেই তাকে আক্রমণ করে। তাই তিমিরা সতর্কতার সঙ্গে এদের এড়িয়ে চলে। 'থ্রেসার শার্কের' বৈশিষ্ট্য হলো তার ল্যাজ। সেটা দেখতে আমাদের অতি পরিচিত শেয়াল পণ্ডিতের ল্যাজের মতো। তাই অনেকে এদের 'শেয়াল হাঙর'ও বলে থাকেন। অদ্ভুত আকৃতির ল্যাজ পেয়ে এরা বিশেষ সুবিধের অধিকারী হয়েছে। ল্যাজের তাড়নায় সমুদ্রের ছোট বড় মাছকে এক জায়গায় জড়ো করে আহার করাই এদের স্বভাব।

হিংস্র প্রকৃতির নরখাদক 'ম্যাকো শার্ক' বাস করে অষ্ট্রেলিয়ার আশেপাশে আর 'স্যাণ্ড শার্ক' বা বালি হাঙরের বাসস্থান হলো প্রশান্ত মহাসাগর। আট দশ ফুট লম্বা 'নার্স শার্ক' বা 'ধাত্রী হাঙর' ঘোরাফেরা করে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঞ্চলে। এরা খুব গোবেচারী নিরীহ জাতের প্রাণী। ওদেশের লোকেরা এদের নিয়ে আবার খেলা করে। সমুদ্র-স্নানের সময় কেউ কেউ 'ধাত্রী হাঙরের' পিঠে চড়ে বেশ কিছুদূর বেড়িয়ে আসে। তবে গভীর জলে ঐ হাঙর ডুব দেবার আগেই তার পিঠ থেকে লাফিয়ে না পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

হাঙরের গল্প শুনে তোমরা ভাবছ যে তারা হলো শুধু মানুষ-খেকো প্রাণী। কিন্তু আমরাও তার কম শত্রু নই। প্রতি বছর এক লক্ষ হাঙরকে হত্যা করা হয় মানুষের নানা কাজে। পৃথিবীর কোন কোন দেশের লোকেরা হাঙরের মাংস খায়। এদের চামড়ায় তৈরী হয় ব্যাগ আর ওয়াটার প্রুফ। তেলে পাওয়া যায় ভিটামিন আর নানা রোগের ওষুধ। পাখনা থেকে পাই আঠালো জিলেটিন।.

এবার শোনো হাঙরের চেয়েও ভয়ংকর রাক্ষুসে পিরান্‌হা মাছের কথা। এরা বাস করে দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে। ব্রাজিলের আমাজন ও সানফ্রান্‌সিসকো নদীতেও এদের দেখা যায়। একশ পাউণ্ড ওজনের মাছকে খেতে এরা সময় নেয় মাত্র এক মিনিট। তাহলেই বুঝতে পারছ যে কি সাংঘাতিক এদের হিংস্রতা। তবে এরা দেখতে কিন্তু নিতান্ত ভালো-মানুষের মতো। মাত্র এক ফুট লম্বা পিরান্‌হাকে দেখে কেউ হয়ত কল্পনাই করতে পারবে না যে, এরা কত ভয়ংকর। সাধারণতঃ পিরান্‌হারা ছোট ছোট মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। বিশালকায় তিমি বা হাঙররাও এদের সভয়ে এড়িয়ে চলে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা প্রশংসনীয় সাহস দেখিয়ে রাক্ষুসে মাছ শিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের মৎস্যাগারে সতর্কতার সঙ্গে এদের পালন করা হয়।

সিলভার ডলার (Silver Dollar) নামের পিরান্‌হা উদ্ভিদভোজী। আফ্রিকায় প্রাপ্ত Characid ও Phago জাতীয় মাছেরা এদের নিকট আত্মীয়। তবে এরা ক্ষিপ্রতা ও সাঁতারে খুব দক্ষ নয়। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, এই মানুষখেকো মাছের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী নয়; তবে এরা ছড়িয়ে আছে শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় সাগরে।

সাগরের আর একটি বিভীষিকা হলো তিমি মাছ। তোমরা নিশ্চয় জান মাছ বললেও এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। উত্তর মহাসাগরে দলবদ্ধভাবে তিমিরা বাস করে। অন্যান্য সাগরেও এদের দেখা মেলে।

তিমিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নীল তিমি। বেশ কয়েক বছর আগে এক অতিকায় নীল তিমির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দৈর্ঘ্য একশো আট ফুট আর ওজন প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড। কিন্তু সাধারণ তিমিরা এতো বড় হয় না।

সার্ক তিমির দৈর্ঘ্য হয় বত্রিশ ফুট। এদের শাবকরাই প্রায় পনেরো ফুট লম্বা। আশি ফুট লম্বা নীল তিমির পেটে ষোল হাজার পাউণ্ড ওজনের বাচ্চা পাওয়া গেছে। ভাবলে অবাক লাগে যে, কি করে তিমিরা এতো ভার নিয়ে চলাফেরা করে, তাই না? আসলে জলচর বলেই তাদের পক্ষে এই ভার বহন করা সম্ভব হয়।

তিমি শিকার এক শ্রেণীর মানুষের বিশেষ ব্যবসা। প্রতি বছর শিকারীর হাতে প্রাণ দিতে হয় বেশ কয়েক হাজার তিমিকে। এজন্য তারা হয়ত সবই বসুমতী থেকে বিলুপ্ত হতো, যদি না দ্রুত বংশবৃদ্ধি তাদের বাঁচিয়ে রাখতো।

সাগরের বিভীষিকাদের ইতিহাস নির্ণয়ে কত সন্ধানীর জীবন হয়েছে বিপন্ন; তবুও তাঁরা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে রেখে গেছেন চিরস্মরণীয় অবদান। কত বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে শোনা যায় 'সমুদ্র শয়তান'দের কত অশ্রুত কাহিনী। আজ জীববিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও তাঁরা সমগ্র মানব জাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন।*

*বিভিন্ন হাঙরের ছবিগুলি লেখক কর্তৃক অঙ্কিত।

ভোটটা কি মা?

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভোট' দিতে যে বলছে হেঁকে—
ওটা কি? মাগো, বল্।
পড়িনি আমি এখনো ওটা,
হবে কি ফলটল!
'কোট' পরেছি, পরেও আছি—
গায়ে দেবার জামা।
'খোট'—বায়না, জানতুম না,
বললে ছোটোমামা।
'গোট' দেখেছি—খোকা দামুর
কোমরে ছিল পরা।
'ঘোঁট' পাকানো—তাও শুনেছি
মানে—জটলা করা।
'চোট' তো লাগে খেলাধুলোয়
প'ড়ে গেলেও লাগে।

'ছোট্' বললে ছুটি আমরা—
কে বুড়ি ছোঁয় আগে।
'ঠোঁট' দুটোকে কে না জানে,
'নোট' চিনেছি দেখে।
'বোট' জেনেছি—ইংরেজীতে
নৌকো চড়ে লেকে।
'মোট' গাট তো বাইরে গেলে
বাঁধতেই হয় আগে।
'ভোট'-টা কি তা দেখিইনি তো
দিতে কেমন লাগে।
চাঁদা তো নেয় বারোয়ারির
পুজোর হিড়িক এলে।
ওরা কারা, মা, কেনো চেঁচায়
করবে কি তা পেলে!

রোমানভ বংশের শেষ বংশধর

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

বেশীদিন আগেকার ঘটনা নয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। হিটলারের মদমত্ত হুংকারে সারা ইউরোপ কম্পমান। এদেশেও জল্পনা-কল্পনা চলেছে হিটলারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে। সমুদ্র-পথে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতের উপকূলবাসীরা সন্ত্রস্ত।

গোয়ার অনতিদূরে মালাবার উপকূলে সমুদ্রের ধারে গাছপালাঘেরা অতি সাধারণ একটি কুটির। সামনে ঝুলছে একখানা সাইনবোর্ড। তাতে বড় বড় হরফে লেখা—গ্রা গ্র্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল হোটেল। ওটা যে একটা হোটেল তা সহজেই বোঝা যায় ঐ সাইনবোর্ডের ওপর নজর পড়লে। নামটার সঙ্গে হোটেলের সঙ্গতি নেই এতটুকু। হোটেলঘরটি যেমন আড়ম্বরহীন, সাজসজ্জাও তেমনি অকিঞ্চিৎকর। গোটাকয়েক পুরোনো টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের ওপর সাদা চাদর পাতা। তবে পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ত্রুটি নেই কোনরকম। কোথাও এতটুকু ধূলো-বালি নেই, চারিধার ঝকঝকে তকতকে। ও অঞ্চলের পুরোনো বাসিন্দারা বলে, একসময় ঐ কুটিরে নাকি লোকজন বাস করত। তবে কোথায় যে তারা চলে গেছে সে খবর কেউ রাখে না। হোটেলের মালিক আলেক্সি নামে পরিচিত। নিকটবর্তী কফি এস্টেট থেকে মাঝে মাঝে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা আসত সমুদ্রে মাছ ধরতে। দিনের শেষে ঐ হোটেলে এসে উঠত তারা। হোটেলের দিলখোলা বুড়ো মালিকের সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেত। আলেক্সি ওখানে কতকাল রয়েছে, কীভাবে এসেছে আর কোথা থেকেই বা এসেছে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না কেউ। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যেসব ইউরোপীয় দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছে, তাদের চেহারা যেমন, আলেক্সির চেহারাটাও অনেকটা সেইরকম। লম্বা-চওড়া বিরাট দেহ, রোদে-ঝলসানো তামাটে রঙ, মাথায় পাতলা সাদা চুল, লম্বা অসংস্কৃত দাড়ি, খালি পা, পরনে একটা জারসি ও পুরোনো আধময়লা ট্রাউজার।

হোটেলে ঢোকবার মুখে গাছের ছায়ায় একখানা পুরোনো বেতের চেয়ারে তাকে বসে থাকতে দেখা যেত। সব সময়ই মনে হত যেন কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ সেরে এসে সে বিশ্রাম করছে ক্লান্তদেহে। আলেক্সি বলত, সে জাতিতে রাশিয়ান, অভিজাত বংশে জন্ম তার। সে যে রুশ দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে কেউ কেউ বলত, সে নাকি আসলে সিরিয়ান—বোম্বাই শহরে যখন ট্যাক্সি প্রথম চালু হয়, তখন সে ছিল একজন ট্যাক্সিচালক। স্মাগলার সন্দেহে পুলিস তার পিছনে লাগে বলে গা-ঢাকা দেয় সে। আলেক্সি স্বভাবত স্বল্পভাষী। তবে বেশী পরিমাণে দেশী মদ পেটে পড়লে সে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠত। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে গল্প করত—জারের আমলে রাশিয়ার রাজ-

দরবারের বিচিত্র কাহিনীর কথা। গল্প ভালোই জমত, শ্রোতারা শুনত আগ্রহের সঙ্গে। ঐ সময় রাশিয়ায় যে সব গণ্যমান্য লোক ছিল, তাদের জীবনের অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী সে বর্ণনা করত রসালো ভাষায়। শ্রোতারা তার কথা বিশ্বাস করছে কি করছে না, এ নিয়ে সে মাথা ঘামাত না এতটুকু। নিজের মনেই যেন সে গল্প বলে যেত, বিশ্বাস করা না করা শ্রোতার ইচ্ছা। এমনি গল্প বলার সময় একদিন সে বলে, সে হচ্ছে রোমানভ বংশের শেষ বংশধর, আর সেই থেকে খরিদ্দারদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ নামে তাকে সম্ভাষণ করত কৌতুকচ্ছলে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল, আলেক্সিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলল, ও ডুবে গেছে সমুদ্রের জলে। কিন্তু কীভাবে ডুবল তা কেউ সঠিক জানে না। আবার কেউ কেউ বলল, ওকে কারা মাঝরাতে হোটেলে এসে ধরে নিয়ে গেছে জোর করে। প্রতিবেশীরা আলেক্সিকে ভালবাসত। তাদের মধ্যে জনকতক তখন সমুদ্রতীরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। নিকটবর্তী দেফোলি গ্রামের জেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা যেটুকু জেনেছিল, তার বেশী জানা যায়নি আজ পর্যন্ত। আইডেনফেলস্ নামে একখানা জার্মান বাণিজ্যজাহাজ ঐ সময় যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সমুদ্রের নিরপেক্ষ অঞ্চলে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তখন তাকে মারমাগোয়া বন্দরে অন্তরীণ করা হয়। একদিন ঐ জাহাজের কয়েকজন নাবিক গোপনসূত্রে খবর পেল, একখানা ইউ-বোট ও অঞ্চলে আসবে দু'একদিনের মধ্যেই এবং গভীর রাত্রে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে সমুদ্রতীর থেকে কিছু দূরে। চারজন নাবিক ও একজন নিম্নপদস্থ অফিসার মতলব করল, তারা এই সুযোগে বন্দর থেকে পালিয়ে ফিরে যাবে স্বদেশে। দেশী নৌকো করেও বন্দর থেকে বেরুনো অসম্ভব, কেন না বন্দর কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে তাদের ওপর। তাছাড়া বন্দরের বাইরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলোও টহল দিচ্ছে সর্বক্ষণ। রাতের অন্ধকারে স্থলপথে সীমান্ত অতিক্রম করে ওরা দিনের বেলা লুকিয়ে রইল পাহাড়ের ধারে। তারপর রাত হলে তারা পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হ'ল আলেক্সির হোটেলে। হোটেলটা দেফোলি গ্রামের উত্তর দিকে।

এর পর যা ঘটে সেটা অনুমানসাপেক্ষ। কারণ হোটেলে আলেক্সি তখন একা, অন্য কেউ সেখানে ছিল না। শুধু জানা যায়, শেষ রাত্রে পাঁচজন লোককে নিয়ে আলেক্সি নিকটবর্তী গ্রামে ঢুকেছিল নৌকোর সন্ধানে। অত রাত্রে গ্রামের পথে অচেনা লোকদের দেখে স্থানীয় কুকুরগুলো এমন চেঁচিয়েছিল যে গ্রামের অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। গ্রামে তখন তিনখানা নৌকো ছিল। ওরই মধ্যে একখানার মালিক ধনরাজ নামে এক জেলে। ধনরাজের নৌকোটা তেমন মজবুত ছিল না, তাছাড়া ওর তলাকার কাঠে ফুটো থাকায় সমুদ্র-পথে বেশী দূর

'কুকুরগুলো এমন চেঁচিয়েছিল যে, গ্রামের লোকের ঘুম ভেঙে যায়।'—পৃ ৪৬২

যাওয়ার ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ধনরাজ ছিল অলস প্রকৃতির লোক, নৌকোটা মেরামত করবে বলে রোজই ভাবত, কিন্তু করে উঠতে পারেনি। ঐ ফুটো নৌকো নিয়ে সে মাছ ধরতে যেত খাঁড়িতে, তবে সব সময় ডাঙার কাছে থাকত পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই ভয়ে। আলেক্সি ঐ নৌকোখানাই পছন্দ করল আর ভাড়া বাবদ ধনরাজের হাতে গুঁজে দিল একশো টাকা। তার কাছে ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা, বাকী পঞ্চাশ যোগাড় করল সঙ্গীদের কাছ থেকে। ভোর হতে তখনও ঘণ্টা তিনেক বাকী। নৌকো ওরা নামালো খাঁড়িতে, তারপর চলল সমুদ্রের দিকে। এর পর ওদের আর কেউ দেখেনি।

এই হ'ল মোটামুটি ঘটনা। এখন যে যেমন খুশী এর ব্যাখ্যা করতে পারে। এমন ভাবা যেতে পারে, আলেক্সি ছিল সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক। যে দেশ তাকে এতকাল আশ্রয় দিয়েছে তার স্বার্থের খাতিরে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতেও দ্বিধা করেনি সে। ঐ পাঁচজন জার্মান যখন মাঝ রাতে তার হোটেলে চড়াও হয়, তখন সে বুঝতে পেরেছিল ওদের মতলব ভালো নয়। হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ওরা চলে যাবে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে আর যাবার আগে তাকে হত্যা করবে নিশ্চয়ই পাছে ওরা চলে যাবার পরই সোরগোল করে সে ওদের পালানোর পথে বিঘ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায়। আলেক্সি ওদের সঙ্গে তাই বন্ধুত্ব জমিয়ে ওদের সাহায্য করার অছিলায় গ্রামের মধ্যে নিয়ে যায় নৌকোর সন্ধানে। ধনরাজের নৌকো যে বিপদ ঘটাতে পারে এটা জেনেই সে ঐ নৌকোটাকে ভাড়া করেছিল এবং জার্মানরা যাতে কোনরকম সন্দেহ না করে সেজন্য নিজেও নৌকোয় উঠেছিল ওদের সঙ্গে। আবার এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে, দীর্ঘকাল এদেশে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওর মন এবং স্বদেশে ফেরার এ সুযোগটা ছাড়তে

পারেনি। সে সময় জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার শান্তি চুক্তি হয়েছে, কাজেই জার্মান জাহাজে আশ্রয় পাওয়া কঠিন হবে না তার পক্ষে। তৃতীয় একটা সম্ভাবনাও রয়েছে এবং কেউ কেউ হয়তো ওটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। আলেক্সি হয়তো ছিল শত্রুপক্ষের গুপ্তচর এবং ঐ পাঁচজন জার্মানকে সে-ই হোটেলে আমন্ত্রণ করেছিল ইউ-বোট করে গোপনে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। ধনরাজের নৌকোটা যে ফুটো ও সমুদ্র-পথে যাওয়ার অনুপযোগী তা সে জানত না মোটেই।

দিন কয়েক পরেই আলেক্সি ও তার সঙ্গীদের মৃতদেহ সমুদ্রের কাছাকাছি এক জায়গায় ভাসতে দেখা গেল এবং নৌকোটারও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের ধারে। কিন্তু এর ফলে নতুন কোনো তথ্য জানা গেল না। ব্যাপারটা রহস্যাবৃত রয়ে গেল, যেমন রয়ে গেল আলেক্সির ঐ দাবীটা—রোমানভ বংশের শেষ বংশধর সে।

—

এল ফাল্গুন

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য

এল আজ ফাল্গুন
(করে) মৌমাছি গুনগুন
ফুলে ফুলে ভরা ঐ
গাছপালা, হৈ চৈ।

করে সবে, জড়তার
লেশ সেই, দখিনার
মনোরম ছোঁয়াতে
মন সব নোয়াতে।

শান্তির নান্দীর—
বাণী ঐ তান ধীর।
পাখীদের কাকলি
উঠে যেন কি বলি।
এল ফাল্গুন আজ
(ভাই) বনে মনে নব সাজ।

উট ও শেয়ালের গল্প

শ্রীঅতীন মজুমদার

এক শেয়াল আর এক উট—দু'টিতে খুব বন্ধুত্ব। এক নদীর ধারে পাশাপাশি ডেরা বেঁধে তারা থাকে। যেখানে যায়, এক সঙ্গে যায়। কেউ কারুর কাছছাড়া বড়-একটা হয় না। এমনিভাবে দিন তাদের বেশ ভালভাবেই কেটে চলেছে।

একদিন শেয়াল উটকে বলল—বন্ধু, তুমি তো আখ খেতে খুব ভালবাস। যদি নদীর ওপারে যাও, অনেক আখ খেতে পাবে—যাবে?

নদীর ওপারে আখের ক্ষেত আছে বুঝি?—উট বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,—তা' কোন্ দিকে আছে? আমি তো কোনোদিন দেখিনি।

আছে—আছে।—শেয়াল বেশ ভারিক্কি চালে বলল,—চোখ বন্ধ করে রাখলে কি কিছু নজরে পড়ে! চোখ খুলে রাখতে হয়, তবে সব কিছুই দেখা যায়। আমাকে ওপারে নিয়ে চল, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

বেশ চল।—উট শেয়ালকে পিঠে করে নিয়ে নদীর জলে নামল। তারপর সাঁতারে ওপারে গেল।

ওপারে গিয়ে শেয়াল উটের পিঠ থেকে নেমে, তাকে নদীর পার থেকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে একটা বড় আখের ক্ষেত দেখিয়ে বলল,—এই দেখ! এবার মনের সুখে যত পার খাও। আমি ততক্ষণ নদীর পারে গিয়ে মাছ খাই।—এই বলে শেয়াল চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর শেয়াল মাছ খেয়ে নদীর পার থেকে ফিরে এসে দেখে, উট তখনও এক মনে আখ খেয়ে চলেছে। তাই দেখে শেয়ালের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। সে মজা করার জন্যে আখের ক্ষেতের মধ্যে নাচ, গান, হল্লা জুড়ে দিল।

শেয়ালের নাচ-গান-চীৎকারে ক্ষেতের মালিক লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে এল। শেয়াল তাই দেখে, দে ছুট!—একেবারে সোজা নদীর পারে এসে চুপটি করে ভালমানুষের মত বসে রইল।

ক্ষেতের মালিক শেয়ালকে খুঁজে না পেয়ে, আর সামনেই উটকে দেখে, তাকে লাঠি দিয়ে খুব করে পেটাল। পিটুনী খেয়ে উট পড়ি-কি-মরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। তারপর নদীর পারে এসে শেয়ালকে দেখতে পেয়ে, তাকে পিঠে করে নিয়ে ওপারে যাওয়ার জন্যে নদীতে নামল।

নদীতে নেমে উট শেয়ালকে বলল,—আচ্ছা, তুমি অমন করে নেচে-গেয়ে হল্লা জুড়ে দিলে কেন বল তো?

মনে মনে হেসে শেয়াল জবাব দিল,—কি করি বল? ছোটবেলা থেকেই খাওয়ার পর নাচা আর গান গাওয়া আমার অভ্যেস। ওরকম না করলে আমার আবার হজম হয় না!

কথাটা শুনে উট কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল,—বাঃ, তোমাতে-আমাতে দেখছি অনেক কিছুই মিল আছে। আমারও খাওয়ার পর ঠিক ঐ রকমই করা অভ্যেস। নইলে আমারও হজম হয় না।—এই বলে সে নদীর বুকে নাচ-গান সুরু করে দিল।

শেয়াল নদীর জলে পড়ে যাবার ভয়ে চীৎকার করে উঠল, আরে-আরে একি করছ? আমি পড়ে যাব যে!—

কি করব বন্ধু, ছোটবেলা থেকেই যে খাওয়ার পরে এটা করা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।—উট আরো জোরে নাচতে আর গান গাইতে লাগল।

শেয়াল তাকে থামতে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু উট তার কথায় কান দিল না।

শেষ পর্যন্ত শেয়াল উটের পিঠে থেকে পড়ে নদীর জলে ডুবে মারা গেল।*

* একটি উপকথা অবলম্বনে।

চুনকাম

প্রফুল্লচন্দ্র বসু

জুৎসই নয় জাতে, সেই খুঁৎ ধরে,
বজ্জাত বলিয়া বাবু জুতো পেটা করে
নিচু জাত চরণেরে। ধৈর্য হারা হয়ে,
চরণ দেখায় পা খানিক বাড়ায়ে!

বাবু রেগে বলে, "তোর এত দুঃসাহস,
উঁচু জনে দিবি নিচু পায়ের পরশ।"
চরণ উত্তরে কয়, "পা দেখানু কৈ?
পা দিয়ে পালাব আমি সেই কথা কই।"

গল্প বলিয়ের গল্প শোন

শ্রীরমেশ দাস

অনেক কাল আগের কথা। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের মত প্রাচীন সভ্য একটি দেশে একজন ক্রীতদাস ছিল। ছোটবেলা হতে ক্রীতদাস বালকটি বাপ-মা ছাড়া হয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকতো, মনিব-বাড়ির নানা কাজের চাপে তার অবসর বলতে কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক্রীতদাস বালকটি নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে নিজের মনে কি যেন সব বলতো। পশু-পাখী দেখলে তাদের দিকে তাকিয়ে প্রাণঢালা হাসি হাসতো। গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতের সঙ্গে কতকালের যেন তার পরিচয়—এমনি ভাবে তাদের নিয়ে সে করতো আনন্দ।

মানুষের সংসারে তার এই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে ক্রীতদাস বালকটির মনিবের ভাবনা হলো একে নিশ্চয়ই দৈত্য-দানা ভর করেছে!

দেখতে দেখতে ধনী মনিব দেশ-বিদেশ হতে নানা সাধু-সন্তকে এনে ক্রীতদাস বালকটির উপর ভর-করা দৈত্য-দানাকে হটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ও মা! যত সাধু-সন্ত দৈত্য-দানা হটাবার জন্য বালক ক্রীতদাসটির নিকট এলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই গম্ভীর মুখে ক্রীতদাস বালকটির চিকিৎসার কাজকর্ম ফেলে তার মনিব-বাড়ি হতে চলে যেতে লাগলেন! এরকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে মনিব বেচারা একজন বৃদ্ধ সাধুকে ধরে বললেন—"আচ্ছা সাধুবাবা, আপনাদের এ কেমন কাণ্ড! দৈত্য-দানা হটাতে এসে নিজেরাই ভয়ে ভয়ে পালাচ্ছেন! বলুন, আমাদের এখন উপায় কি হবে?"

ক্রীতদাসের মনিবের কাতর আবেদন শুনে বৃদ্ধ সন্তপুরুষ স্মিত হেসে বললেন—"দেখ বাবা, তোমার এই ক্রীতদাস ছেলেটি যে-সে ছেলে নয়। একে দৈত্য-দানা ধরেনি। এ ঈশ্বর প্রেরিত গল্পকার। কালে এর অমূল্য গল্প শুনে জগৎবাসী অশেষ উপকৃত হবে।"

দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। ক্রমে দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর, এমনি ক'রে কয়েক বছর পর পর পার হয়ে গেল। ক্রীতদাস ছেলেটির মনিব ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন তাঁর এই ক্রীতদাস বালকটি আর পাঁচটা বালকের মত নয়। কেমন যেন তার প্রকৃতি! তার চলন-বলন অন্য পাঁচটি ক্রীতদাসের মত নয়।

ফুল ফুটলে যেমন গন্ধ ছড়ায়,—আসে মধুকর ও মধুকরীরা, তেমনি করে ক্রীতদাস বালকটিকে ঘিরে পাড়ার ছেলে-বুড়ো এসে জমায়েত হতে লাগলো তার মনিব-বাড়িতে। পাড়ার ছোটরা তার মুখে গল্প শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। বড়রা গল্প শুনে ভাবতো এইটুকু দুধের ছেলে, অত জ্ঞান-বুদ্ধির গল্প বলে কি করে! বড়দের মনেও ক্রমে দৃঢ়

ধারণা হলো এই ক্রীতদাস বালকটি নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্ট স্বর্গের দেবতাদের একজন হবে। তাঁরা সবাই মিলে ক্রীতদাস বালকটির মনিবকে একদিন ধরে বললেন, "দেখ ভাই, তুমি তোমার এই ক্রীতদাস বালকটিকে দিয়ে আর ক্রীতদাসের কাজ করিও না—ও যে-সে বালক নয়! স্বর্গের সাপভ্রষ্ট দেবতা! তুমি ওকে সত্বর ছেড়ে দাও! নইলে এ পাড়া এবং দেশের অকল্যাণ হবে!"

পাড়ার বড়দের অনুরোধ এবং নিজের বিবেকের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস বালকটির মনিব তাঁর বালক ক্রীতদাসকে চিরদিনের জন্য ক্রীতদাসের কাজ হতে মুক্তি দিলেন।

দয়ালু মনিবের কাছ হতে দাসত্বের বন্ধন-মুক্তির পর, কৃতজ্ঞচিত্তে বালক ক্রীতদাস তার মনিবের পদচুম্বন করে মুক্ত পৃথিবীর বুকে একাকী পড়লো বেরিয়ে।

দেখতে দেখতে বালক কৈশোর অতিক্রম করে পৌছলেন যৌবনের কিনারায়। ইতিমধ্যে সমগ্র গ্রীস দেশে তাঁর সুখ্যাতি পড়লো ছড়িয়ে। ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ সবার কাছেই তাঁর মজার মজার গল্প খুব আদর পেতে লাগলো। তবে তাঁর গল্প শুনে সবাই যে তাঁকে তারিফ করতো তা বলা চলে না।

কারণ তাঁর রহস্য-ভরা গল্পের মধ্যে এমন সব অন্যায় কাজের বিরুদ্ধ ইঙ্গিত থাকতো যে, যা শুনে দেশের মানুষ অন্যায়কারীদের, অত্যাচারীদের সহজে চিনে ফেলতে লাগলো। অনেক দুষ্ট চরিত্রের লোক একত্র হয়ে পরামর্শ করলো—এই ভাবে যদি মুক্ত ক্রীতদাস যুবকটি আমাদের দোষগুলো লোকের সামনে গল্প করে তুলে ধরতে থাকে, তা'হলে আমাদের আর দু'মুঠো ভাত করে খেতে হবে না। যে করেই হোক এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে।

মুক্ত ক্রীতদাস যুবকটি যৌবনের মধ্য গগনে যখন এসেছেন, তখন তাঁর খ্যাতির শেষ নেই। গ্রীসদেশের গণ্যমান্য লোকেরা আদর করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তার উপদেশ মিশানো গল্প শোনে। ক্রমে গ্রীক পণ্ডিতরা তাঁকে সেরা গল্প বলিয়ে বলে স্বীকার করলেন।

কথায় বলে ভাল লোকেরও শত্রু থাকে। ইতিমধ্যে বার তিনেক গল্প বলিয়ে মুক্ত ক্রীতদাসকে হত্যার প্রচেষ্টা হয়ে গেছে।

সদানন্দময় আধ-পাগলা এই গল্প বলিয়ে মানুষটি। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয় হতে অনেক দূরে তাঁর দৃষ্টি গেছে চলে। তাই দুষ্ট লোকদের চরিত্র সংশোধনের জন্য নানা মূল্যবান উপদেশ-পুর্ণ গল্প বলে অনেক চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু হায়! যাদের মনে হিংসার আগুন জলছে, তাদের সেই আগুন মনকে কিছুতেই তাঁর মূল্যবান রূপক গল্প ঠাণ্ডা করতে পারলো না।

একদিন দুপুর বেলা একটি ওক্ গাছের তলায় ক্লান্ত দেহে বসে আছেন গল্প-বলিয়ে সেই আধ-পাগলা মুক্ত ক্রীতদাস মানুষটি। অদূরে একটি অনুচ্চ নীল পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৃষ্টি তাঁর।

আকাশ কালো মেঘে ছাওয়া। হাসি-মাখা মুখে অদূরের নীল পাহাড়ের চূড়াকে কি যেন বলছেন তিনি। মেঘের গর্জন শুনে হাতে তালি দিচ্ছেন। এই আনন্দময় মুহূর্তে একদল দুষ্টলোক তাঁর কাছে এসে বললো—"ওহে গল্প-বলিয়ে বন্ধু, ঐ যে অদূরে পাহাড়ের চূড়াটি দেখতে পাচ্ছো চলোনা আমরা সবাই ওখানে যাই। সুন্দর পাহাড়টির চূড়ায় বসে আমরা তোমার অনেক গল্প শুনে আনন্দ পাবো—দুষ্টুমি সব দেব ছেড়ে। বিলকুল ভালমানুষটি হয়ে যাবো—বুঝলে হে ভায়া!"

আধ-পাগলা আপন-ভোলা গল্প-বলিয়ে মুক্ত ক্রীতদাস ওদের কথা মত পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আনন্দিত মনে গল্প বলা শুরু করলেন। নিজের সমস্ত সেরা গল্প বলতে লাগলেন তিনি। গল্প বলার সময় তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোন হুস থাকতো না। এমন একটা তন্ময় মুহূর্তে দুষ্ট লোকেরা গল্প-বলিয়ে মুক্ত ক্রীতদাসকে পাহাড়ের চূড়া হতে ঠেলে নীচে দিল ফেলে। ঝড় উঠলো! আকাশ-কাঁপানো শব্দে মেঘ-গর্জন হলো শুরু। প্রবল বেগে নামলো জল। মৃত আধ-পাগলা মুক্ত ক্রীতদাসের দেহটাকে পাহাড়ের পাদদেশ হতে দূর সমুদ্রের দিকে পবিত্র বৃষ্টিধারা বয়ে নিয়ে চললো। এমনি করে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬৬০ সালে পৃথিবীর বুক হতে একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে নিষ্ঠুর মানুষ হত্যা করেছিল! কিন্তু ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, তাঁর মৃত্যুর পর ২৬০০ বৎসর নানা ভাবে পার হয়ে পৃথিবীর মানুষের সভ্যতা এগিয়ে এসেছে—কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষ ঐ মহান্ গল্প বলিয়ে মুক্ত ক্রীতদাসটির নাম ও তাঁর নীতিগল্প আজও ভোলেনি।

দেশে দেশে তার ঐ সব রূপক ও নীতিগল্প নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে মানুষের মনে নীতি-বোধকে জাগ্রত রেখেছে। এই গল্পের যাদুকর মানুষটি আর কেউ নয়, গ্রীসদেশের ঈশপ্। যার নীতিগল্পকে আমরা 'ঈশপ ফেবলস্' বলে জানি। মাত্র চল্লিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন।

তাঁর বলা একটি গল্প বলে আজকের কথা শেষ করি।

এক কৃষকের ধান ক্ষেতে বক এসে প্রতিদিন ধান নষ্ট করে। কৃষক রেগে গিয়ে বকদের ধরবার জন্য জাল পাতলো। দুষ্ট বকেরা জালে পড়লো ধরা। বকগুলোর সঙ্গে একটা সারস পাখিও ছিল। সারসেরা ধান খায় না, মাছ, ব্যাঙ এই সব খায়।

সারস চাষার কাছে মিনতি করে বললো—"ভাই চাষী আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ধান নষ্ট করতে আসিনি, বকদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম বেড়াতে।"

চাষা সারসের কথা শুনে হেসে বললো, "তা' হতে পারে। কিন্তু ভাই আমি যখন দুষ্ট বকদের সঙ্গে তোমায় ধরেছি, তখন বকদের মতই তোমাকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।"

সারস দুঃখিত মনে বললো—"এটা কি তোমার ঠিক কাজ হবে চাষী ভাই?"

চাষা হেসে বললো—"নিশ্চয়ই, মন্দ লোকদের সঙ্গে থাকলে তার মন্দ ফল ভোগ করতেই হয়।"

শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাদা মলাট দেওরা মোটা বই বার করে রত্না গবেষকের হাতে দিল। হাতের চাপে মলাট টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ছেলেমেয়েদের দিতে দিতে গবেষক বললেন : "১৯৬৩ সালে তৈরি চমৎকার কড়াপাকের সন্দেশ। সব খেয়ে ফেল।" ব'লে নিজেও এক টুকরো মুখে পুরে দিল। তুংকা রিংকুর তো মনে হ'ল এমন সুস্বাদু জিনিস আগে কখনও খায়নি।

তুংকা বলে উঠল : "থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ ইতিহাস আর মিঃ গবেষক।"

গবেষক বললেন : "আরে, এখন তো সবে সুরু—আসল সন্দেশ রয়েছে বই-এর মধ্যে।"

বই-এর ওপর কলম দিয়ে আঁচড় কাটতে ধবধবে সাদা সন্দেশ ধামার ওপর পড়তে লাগল। রত্না সকলকে সন্দেশ পরিবেশন করল।

সন্দেশ খাওয়ার পর রত্না ইতিহাসকে বলল : "মিঃ ইতিহাস, সন্দেশের জন্যে তুংকা আপনাকে আগেই ধন্যবাদ দিয়েছে। আমরাও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন—দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

ইতিহাস : "আমাকে তো রোজ হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। তোমার মতন মিষ্টি মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে কি আর আপত্তি থাকতে পারে ?"

রত্না : 'আচ্ছা, মিঃ ইতিহাস, আপনি ওরকম সাজে কেন বেরিয়েছিলেন, নমিতাদিকে বকুনি দিয়ে কেন তাড়ালেন, পোশাক কেন খুলে ফেললেন আর আমাদের সন্দেশই বা কেন খাওয়ালেন ?"

ইতিহাস : "বাপ রে বাপ, তুমি যে একদম জেরা করতে আরম্ভ করে দিলে। তুমি তো ভাল রচনা লেখ। ইতিহাসের আত্মকথা তোমাকে জানাচ্ছি।

"অনেক অনেক বছর আগে আমি তখন তুংকার মত ছোট। তুংকা যেমন গল্প শুনতে ভালবাসে, আমিও সেইরকম গল্প শুনতে ভালবাসতুম। মা, দিদিমা, ঠাকুমা, দাদামশাই, ঠাকুরদাদা এমনকি অঙ্কের মাষ্টারমশাইকেও গল্প বলার জন্য বিরক্ত করতুম। আমাদের বাড়ী থেকে কিছুদূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক ঋষি তপস্যা করতেন। ভীষণ রাগী। চোখ খুললেই তাঁর চারধারে দাউ দাউ করে আগুন জলত। শুনতাম তিনি ত্রিকালজ্ঞ; সব কিছুই জানেন। তবে ভয়ে তাঁর কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করত না। কিন্তু যে লোক সব কিছু জানেন তাঁর কাছ থেকে গল্প শোনার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। একদিন ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত জোড় করলাম। বসে আছি তো বসেই আছি। কত দিন, মাস, বছর পার হয়ে গেল তার ঠিক নেই। হঠাং ঋষির চোখ খুলল। আমি ভয়ে চোখ বুঝলাম। ঋষির গলা শুনতে পেলাম : "তুমি আমার ধ্যান ভাঙিয়েছ, ভাবছিলুম তোমাকে ভস্ম করে দেব। কিন্তু দেখলাম তোমার মনে কোনও খারাপ ভাব নেই, সেই জন্য তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কি বর চাও বলো ?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : "গল্প।"

তিনি বললেন : "তিন কাল নিয়ে আমি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি, তাই অতীত কাল তোমায় দিলুম। অতীতের সঙ্গে প্রয়োজন মতো মশলা মিশিয়ে কারি, কোর্মা, খিচুড়ি যা ইচ্ছে বনোনোর অধিকার তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু গলাটা আর মাথাটা বাঁচিয়ে চলো। গল্প পছন্দ না হলে কার হুকুমে কখন কোতল হয়ে যাবে বলা যায় না।"

সেই থেকে আমি পুরোনো দিনের গল্প বানিয়ে চলেছি। প্রথম প্রথম রাজারাণী, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প বলতুম। তোমাদের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব খুশি হতো।

কিন্তু বড়রা বলল : "ছাই গল্প।"

রাজসভায় বিচার হলো, আর হুকুম হলো : "কেবল রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রেসিডেন্ট এইরকম বড় বড় লোকদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে। না হলে—"কোতল।" কতবার যে কোতল হতে হতে বেঁচেছি তার ঠিক নেই। সেই অবধি বড়দের কাছে, মিলিটারি পোশাকে রাজা, মহারাজা, মন্ত্রীদের গল্প শোনাই। দিন, কাল, বছর, তারিখ ভুলে যাওয়ার

ভয়ে মাথায় পালক গুঁজে রাখি। আর তোমাদের মতো ছোটদের পেলে এইসব মিলিটারী পোশাক খুলে ঠাণ্ডা হয়ে আসল গল্প বলি।"

ওপরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ইতিহাস ছেলেমেয়েদের বলল: "সকলে দাঁড়াও, হাত জোড় করে প্রণাম করো। ঐ দেখ, তোমাদের প্রধাম মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আজ ইতিহাসের মিলিটারী পোশাক খুলে দিয়ে স্বর্গে যাচ্ছেন। আজ আমিও স্বাধীন। হয়তো আর সং সাজতে হবে না।"

আকাশে পুষ্পক রথের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে বৃষ্টির ফোঁটা ফুল হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। একটা ছোট নীল রেখা আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল। তুংকা, রিংকু, রত্না সকলেই কিছুক্ষণ হাতজোড় করে অভিভূতের মত তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে ঘোর কাটলে দেখা গেল, ইতিহাস, গবেষক আর তাদের সাজ সরঞ্জাম কিছুই নেই।

রত্না বলল: "শাস্ত্রীজী কিছুদিন আগেই স্বর্গে গেছেন। তার হুকুমেই ইতিহাস বদলাতে আরম্ভ করেছে। এস, তাঁকে আমরা প্রণাম করি। হাত জোড় করে নেহেরুজী ও শাস্ত্রীজীর ফটোর উদ্দেশ্যে সকলেই প্রণাম জানালো। এর পরেও ছেলেমেয়েরা বেশ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্লাসরুম, টেবিল, চেয়ার সকলেই শান্ত। দেয়ালে টাঙানো লাল বাহাদুরের ফটোর ওপর স্বর্গের জ্যোতি।

তারা শুনতে পেল, নেহরুজী ও শাস্ত্রীজী বলছেন: "আজ তোমাদের ছুটি। যাও, তোমরা সকলে খেলা করো। আমরা তোমাদের মধ্যেই আছি।" বলতে বলতে নেহরুজী আর শাস্ত্রীজীর ফটো থেকে আলোর রেখা তুংকা, রিংকু, রত্না ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল।

তুংকার মনে হলো যেন সে অনেক অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। সূর্য, তারা পেরিয়ে তার মাথা আকাশের গায়ে উঠে যাচ্ছে। তুংকার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। পাশের ডেস্ক আঁকড়ে সে চোখ বুজল।

ছয়

চোখ তুলে তুংকা দেখল চোখে চশমা এঁটে অঙ্কের দিদিমণি একটা তক্তপোশের ওপর বসে পরীক্ষার খাতার ওপর পেন্সিল দিয়ে গোল গোল গোল্লা এঁকে যাচ্ছেন। তাঁর আদরের ক্ষেমি ঝি পাশে একটা স্টোভে কড়ায় রস গরম করছে, আর খাতা থেকে গোল্লাগুলো চিমটি দিয়ে তুলে তুলে রসের মধ্যে ফেলছে। দেখতে দেখতে গোল্লাগুলো ফুলে ফুলে বেশ বড় বড়

রসগোল্লা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেমি ঝি তুংকাকে হাতা দিয়ে একটা প্লেটে দুটো রসগোল্লা দিয়ে বলল: "চট করে রসগোল্লা খেয়ে নাও তুংকা।"

তুংকা রসগোল্লা খেতে আরম্ভ করল। ততক্ষণে রিংকু, পম্পু, বেবি, ভ্রমর সকলেই হাজির।

"ক্ষেমিদি আমাকে রসগোল্লা দাও, আমাকে রসগোল্লা দাও—আমাকে দাও।"

রত্না সকলকে বারণ করতে লাগল: "চুপচাপ সকলে লাইন লাগিয়ে দাঁড়াও, তবেই ক্ষেমিদি রসগোল্লা দেবে।"

ক্ষেমিদি রসগোল্লা দিতে দিতে বলল: "আজ দিদিমণির মেজাজ ভীষণ খারাপ, অঙ্কের বই চুরি গেছে। তাই সকলের খাতায় গোল্লা বসিয়ে যাচ্ছে। খাতা তোমাদের বাবা মার কাছে গেলে তোমরা বকুনি খাবে, তাই ভাবলুম গোল্লাগুলো উঠিয়ে নিয়ে তোমাদের জন্য রসগোল্লা তৈরী করেছি। কেমন হয়েছে?"

হাত চাটতে চাটতে সকলে বলল: "চমৎকার, ক্ষেমিদি আর একটা দাও না?"

চেঁচামেচি শুনে দিদিমণি কপালে চশমা তুলে হাঁক দিলেন, "ক্ষেমি, কি হচ্ছে? অত গোলমাল কিসের?"

ক্ষেমি উত্তর দিল: "কিছু না দিদিমণি, ছেলেমেয়েরা তোমাকে দেখতে এসেছে।"

দিদিমণি: "দেখতে এসেছে, চেঁচামেচি করছে কেন? ওদের চুপ করে বসতে বলো, না হলে প্রত্যেক প্রশ্নে একটা বদলে দুটো করে গোল্লা দেব।"

এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে টেলিফোন হাজির। এক্ষুণি ভীষণ লড়াই হয়ে গেছে। অঙ্কের বইরা আসছে, তোমরা সব ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়াও।

বলতে বলতে একে একে প্রথমে পাটিগণিত, তারপরে জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি পরের পর সারি বেঁধে ঘরে ঢুকল। মলাট কাটা, পাতা ছেঁড়া, দেখলেই বোঝা যায় সদ্য যুদ্ধ থেকে তারা আসছে।

রত্না আদর করে পাটিগণিতের মলাটে হাত বুলোতে বুলোতে বলল: "আহা কে তোমার এমনি ভাবে মেরেছে?"

পাটিগণিত: "আর বলো না রত্নাদি, সব দোষ তোমাদের মাষ্টারদের। নিজের ইচ্ছা মতো সবকিছু করবে, আর কেউ কিছু বললেই অমনি চোখ রাঙাবে। ওদের জন্যেই তো আজ আমাদের এই দশা!"

বলতে বলতে মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ, পায়ে পটি বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সাত ঘরে ঢুকলো, হাতে লম্বা লাঠি। পেছনে পাঁচ এবং অন্যান্য সংখ্যারা ঘরে ঢুকে তারা লম্বা লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে সাত, তার পাশে পাঁচ, নয় ছয় তিন চার আট।

তুংকা বলল : "এক, দুই কোথায় ?"

সাত উত্তর দিল : "যুদ্ধের পর এক আর দুইকে দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হয় শূন্য তাদের ধরে নিয়ে গেছে।"

এ কথা শুনেই আট ফোঁপাতে লাগল।—"বা রে, শূন্য খাট পেতে ঘুমোতে পারব বলেই তো আমি সকলের শেষে থাকতে রাজী হয়েছি। শূন্য কেন বেইমানি করে এক আর দুইকে নিয়ে গেছে ?"

রুণা : "তোমাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ কেন হয়েছিল ? আর যুদ্ধে কে জিতল আর কেই বা হারল তা তো জানতে পারলুম না ?

সাত : মানুষরা, বিশেষ করে তোমাদের মাষ্টার আর দিদিমণিরা খুব খারাপ। আমরা কেমন নিজের খেয়াল-খুশীতে গাছ, পাখি, ফুল তারাদের মধ্যে মিলিয়ে ছিলুম। তোমরা সেখান থেকে আমাদের বার করে নিয়ে এসে কাউকে এক, কাউকে দুই তিন নাম দিলে। তাতেও কোন ক্ষতি ছিল না। তোমাদের দিদিমণিরা হুকুম দিল প্রথমে থাকবে এক, তারপরে দুই, তারপরে তিন, চার এইরকম আর কি! তোমরা সব কাজ ভোট নিয়ে করো, কিন্তু আমাদেরও ভোট দেবার অধিকার দাও না। তাই তো এই যুদ্ধ। নাটকীয় ভঙ্গীতে সাত বলে উঠল, কি ঘন ঘোর যুদ্ধ !"

দুই বললো : "আমার জায়গা সকলের আগে, আমি যদি শূন্য ছেড়ে দিই তবে না এক হয় ?"

এক বললো : "বা রে, আমার সঙ্গে শূন্য যোগ করলে তবেই দুই হয়।"

এমন সময়ে শূন্য এসে দু'হাতে এক আর দুই-এর কান ধরে বলল : "আগে শূন্য, তারপর কিছু নেই।" বলে তাদের টানতে টানতে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন আট খাট পেতে ঘুমুচ্ছে। আমরা যুদ্ধ থামিয়ে ভোট নিয়ে নিজের নিজের জায়গা ঠিক করে নিলুম। এবার থেকে আমরা এই ভাবেই থাকব।

আট আবার ফোঁপাতে লাগল : "আমার খাট কই ? আমি কোথায় শোব ?"

সাত আটকে ধমক দিল : "শোবার সময় অনেক পাবে, এখন বিচার হবে, সাক্ষী দিতে হবে।"

শোনামাত্র আট জোরে কেঁদে উঠল। গোলমাল দেখে টেলিফোন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ঘোষণা করতে লাগল : "এবার বিচার হবে। সব চুপ।"

রুণা জিজ্ঞাসা করল : "কার বিচার হবে ?"

সাত বলল : "তোমাদের অঙ্কের দিদিমণির।"

রুণা : "আর বিচারক কে হবে ?"

টেলিফোন : "কেন, রুণা ।"

রুণা : "বা রে আমি বিচারের কি জানি ? বিচার করতে অনেক জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয়। শুনেছি, চুল না পাকলে বিচার করা যায় না।"

সাত : "ঘাবড়াবার কিছুই নেই। বিচার তো নিজেনিজেই হয়, আর বিচারকরা বসে থাকে। তুমি কেবল চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকবে।"

হঠাৎ ঘরের চেহারা বদলে গেল। ঝকঝকে এজলাস, মঞ্চে চেয়ারের ওপর রুণা। কাঠগড়ায় অঙ্কের দিদিমণি। উকিলের বেঞ্চে, টেলিফোন, রেডিও, ট্রানজিস্টার আরও অনেকে। সাত, পাঁচরা ছাড়াও ক, খ, গ, ত্রিভুজ, বিন্দু, পিরামিড, আরও অনেকের ভিড়ে এজলাস ঘর ভরতি। এক তুংকা, রিংকু, ভ্রমর, পম্পুরা দাঁড়িয়ে। ক্ষেমিদি কেবল নির্বিকার ভাবে সকলকে রসগোল্লা পরিবেশন করে চলেছে। আধখানা রসগোল্লা খেতে খেতে আট নাক ডাকাতে আরম্ভ করল।

এমন সময়ে টেলিফোন বলে উঠল : "মিঃ কলিং বেল, এবার প্রথম সাক্ষী ডাকুন।"

চকচকে কালো পোশাকে, মাথায় সাদা টুপি মিঃ কলিং বেল হাঁক দিলেন : "ভারত সরকার বনাম অঙ্কের দিদিমণি, প্রথম সাক্ষীর দল হাজির ?"

পাটীগণিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাত, পাঁচরা এক সঙ্গে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল।

টেলিফোন : "ইয়োর অনার। দেখুন এঁদের অবস্থা, যার জন্যে আসামী দায়ী।"

পাটীগণিত : "এক, দুই আর শূন্য পাটীগণিত থেকে হারিয়ে গেছে !"

চার, আটের মুখ থেকে আধখানা রসগোল্লা বার করে নিজের মুখে পুরে দেওয়া মাত্র আট চিৎকার করে কেঁদে উঠল : "আমার রসগোল্লা শূন্যে চলে গেছে।"

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন : "কি হয়েছে, আট কাঁদছে কেন ?"

টেলিফোন : "দিদিমণি ওকে যে গোল্লা দিয়েছে সেই দুঃখে ও কাঁদছে।"

রুণা : "হয়েছে, এবার অন্য সাক্ষী ডাকা হোক।" বলতে বলতে সাত পাঁচ সকলে পাটীগণিতের পাতার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাটীগণিত বিচারককে নমস্কার করে কাঠগড়ার বাইরে নেমে এল।

দ্বিতীয় সাক্ষী এক চৌবাচ্ছা। তাতে ওপারে একটা নল আর নীচে দুটো ফুটো। ওপরের নল দিয়ে জল আসে, আর দুটো ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। চৌবাচ্ছায় এক ফোঁটাটাও জল নেই।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠেই চৌবাচ্ছা কাঁদতে লাগল : "দোহাই ধর্মাবতার, জল রাখবার জন্য কত কষ্ট করে তৈরী হলাম। একটা নলও তৈরী করা হ'ল, কিন্তু দিদিমণির হুকুম যদি নল দিয়ে এক ঘণ্টায় চৌবাচ্ছা ভরে যায়, তা হলে ফুটো দিয়ে আধঘণ্টায় খালি করতে হবে। একটা ফুটোয় হ'ল না ব'লে জবরদস্তি দুটো ফুটো করিয়ে দিয়েছে।"　　　　(ক্রমশঃ)

মুক্তি

*

শ্রীমঞ্জিল সেন

টুটুল হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, "দেখ, দেখ মা, কেমন সুন্দর সব পাখি। পাখিওলাকে ডাকব মা, একটা পাখি আমি পুষব।"

মা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন একটা পাখিওলা রঙবেরঙের পাখি নিয়ে যাচ্ছে। ময়না, টিয়া, শালিখ আরও কত কি!

মা বল্লেন, "পাখি পোষা কি ভাল! খাঁচায় বন্দী থেকে ওদের কত কষ্ট হচ্ছে। বনের পাখি বনেই ভাল, খাবার খুঁজে বেড়ায়। মনের আনন্দে গান করে। খাঁচার মধ্যে দেখ ওরা কেমন মনমরা হয়ে আছে। কোন আনন্দ নেই।"

টুটুল কিন্তু অতশত বোঝে না। সে পাখির জন্যে বায়না ধরে। মা অগত্যা পাখিওলাকে ডাকেন। অনেক বাছাবাছি দরদস্তুরের পর খাঁচাসমেত একটা টিয়া পাখি দু' টাকায় কেনা হ'ল। টুটুলের আনন্দ আর ধরে না। সে তার বন্ধুবান্ধবকে ডেকে এনে গর্বের সঙ্গে তার পাখি দেখাতে লাগল। পাখিটার গায়ের রঙ কি সবুজ, ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল আর বাঁকানো, ঠিক যেন খাপে ঢাকা ছোট্ট একটা বাঁকা তরোয়াল। গোল গোল কালো দুটো চোখের চারপাশে আবার লাল একটা বৃত্ত, ঠিক যেন রবারের পুতুলের চোখ। টিয়াটা কিন্তু বড্ড অস্থির, খাঁচার মধ্যে সব সময়ই ছটফট করছে। সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড যে বসবে তা যেন পাখিটার কুষ্ঠীতে লেখা নেই। তার ওপর কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। টিয়াটা দেখতে কেমন সুন্দর, কিন্তু গলার স্বরটা সেই তুলনায় বিচ্ছিরি। ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ, কানে যেন তালা লেগে যায়। প্রথম দিন মার কথামত টুটুল একটা পাত্রে ছোলা ভিজিয়ে খাঁচার মধ্যে রেখে দিল। সবাই সরে যাবার পর পাখিটা ছোলা খেতে লাগল। খাওয়াটা দেখার মত। ধারালো ঠোঁট দুটো দিয়ে এক-একটা ছোলাকে কেমন কায়দায় খুট্ করে চাপ দিচ্ছে আর খোসাটা অক্ষত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। টুটুল প্রথমে ভেবেছিল টিয়াটা বুঝি ছোলাগুলোকেই ফেলে দিচ্ছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই সে দেখতে পেল যে খোসার ভেতর সাদা অংশটুকু নেই। খোসাটাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না যে ওর ভেতরে শাঁসটা পাখির পেটের মধ্যে চলে গেছে। অবিকল অবিকৃত অবস্থায় খোসাটা প্রত্যেক কামড়ের সঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে। টুটুল ভাবল ভারী মজা তো!

এর মধ্যে আবার একদিন পাখিটা বিদ্রোহ করে বসল। ছোলাতে মুখই দিল না। টুটুল মহা সমস্যায় পড়ে গেল, তার মাও চিন্তিত হলেন। কে একজন পরামর্শ দিল ছাতু মেখে দাও, খাবে। সেই কথামত দোকান থেকে ছাতু আনা হ'ল। মা জলের সঙ্গে ছাতু মেখে গোল গোল করে পাকিয়ে দিলেন। কিন্তু হা হতোস্মি! পাখিটা ছাতুর দিকে ফিরেও চাইল না।

টুটুল মহা ফাঁপরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাও। টুটুলের বাবা মন্তব্য করলেন পাখি মহাত্মা গান্ধীর মত মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। টুটুলের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এল। তাদের পাশের বাড়ীতে দত্তদের মস্ত বাগান। সেই বাগানের পেয়ারা গাছে যখন পেয়ারা পাকে, তখন দুটো টিয়াকে সেই গাছে এসে বসতে সে দেখেছে। কেমন দু' পায়ের নখ দিয়ে গাছের সরু ডাল আঁকড়ে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে পাকা নরম পেয়ারা ঠুকরে ঠুকরে তারা খায়। টুটুল একটা পাকা পেয়ারা আধখানা করে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। পাখিটা কয়েকবার লাফালাফি করল, তারপর টুটুল একটু সরে যেতেই পেয়ারাটাকে ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগল। টুটুলের খুব আনন্দ হ'ল। যাক্ বাবার কথা ঠিক হয়নি। একদিন টুটুল একটা ছোট পাকা কলা খাচার মধ্যে পুরে দিল। ওমা! পাখিটা এক পায়ের নখগুলি দিয়ে গোটা কলাটাকে তুলে ধরে আর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে দিব্যি সেটা খেতে লাগল। টুটুল ছুটে গিয়ে তার মাকে ধরে আনল। তিনি পাখির কাণ্ড দেখে তো হেসেই খুন।

বেশ কয়েক দিন কেটে গেছে। টুটুল কত চেষ্টা করে টিয়াটাকে কথা শেখাতে,কিন্তু যত বারই সে তার কাছে গিয়ে বলে, "রাধা-কৃষ্ণ", পাখিটা ততবারই চীৎকার করে ওঠে, "ট্যাঁ, ট্যাঁ, ট্যাঁ।"

সেটা ছিল উনিশ শ' বেয়াল্লিশের আগষ্ট মাস। ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। মহাত্মা গান্ধী বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু করেছেন। চারদিকে আইন ভঙ্গ ও দমননীতি চলছে। বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠেছে। টুটুলের বাবা ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তিনিও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একদিন পুলিশ এসে বাড়ি থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। বাবাকে এইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়ায় টুটুল মনে বড় আঘাত পেল। সে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। মাকে সে একদিন জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মা, বাবাকে কি জেলখানায় আটকে রেখেছে?"

মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন তার ব্যাথাটা কোথায়। তিনি তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ, বাবা।"

টুটুল বল্লে, "বাবা জেলখানা ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। তাই না?" মা ঘাড়টা ছোট্ট একটু হেলিয়ে তার কথায় সম্মতি জানালেন।

টুটুল কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর আপন মনেই যেন বলে উঠল, "ঠিক টিয়াটার মত।" মার মুখেও যেন একটা মলিন ছায়া পড়ল। তিনি কোন কথা বল্লেন না।

দু'দিন কেটে গেছে। পাখিটা ইতিমধ্যে আবার অনশন শুরু করেছে। টুটুল এসে তার মাকে বল্ল, "মা। ভেবে দেখলাম টিয়াটাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ওর চারপাশে কত পাখি

উড়ে বেড়াচ্ছে আর ও বেচারী বন্দী হয়ে ছোট্ট একটা খাঁচায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছে। এ জন্যেই বোধ হয় ও সবসময় মনমরা হয়ে থাকে। ভাল করে খায় না।" মা মলিন হাসলেন।

টিয়াপাখির বন্দীদশার মধ্যে দিয়ে টুটুল যে তার বাপের কথাই ভাবছেন সেটা বুঝতে তাঁর কষ্ট হ'ল না। তিনি বল্লেন, "সে তো ভাল কথা। বনের পাখি বনেই ভাল।"

টুটুল খাঁচাটাকে মাটিতে নামিয়ে দরজাটা খুলে দিল। পাখিটা যথারীতি খাঁচায় হাত দেওয়ামাত্র লাফালাফি শুরু করেছে, আর ট্যাঁ ট্যাঁ করে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। টুটুল একটু দূরে সরে দাঁড়াল। পাখিটা কিছুক্ষণ খাঁচার মধ্যে ছটফট করল, কিন্তু তখনও বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল না। অনেক দিন বন্দী দশায় থেকে স্বাধীনতার স্বাদটুকুও বোধহয় ও ভুলে গেছে। তারপর একসময় টিয়াটা খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরিয়েই কিন্তু টিয়াটা যেন দিশাহারা হয়ে গেল। ছোট্ট খাঁচার পরিধি থেকে উন্মুক্ত পৃথিবী বিশাল পরিসরে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কয়েকবার সে ছোট্ট ছোট্ট লাফ মেরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল। তারপর হঠাৎ উড়ে শিউলি গাছের একটা ডালে বসল। গাছ থেকে সে কয়েকবার ঘাড় বেঁকিয়ে খাঁচাটাকে দেখল। বোধহয় ভাবল পুরোনো আস্তানায় আবার ফিরে যাবে কিনা। তারপর একসময় সবুজ ডানা দুটো মেলে দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে অসীম দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

টুটুল খাঁচাটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর গুনগুন করে গেয়ে উঠল—আমার মুক্ত আলোয় আলোয় এই আকাশে···।

মামলা খারিজ

শ্রীশিশির ভট্টাচার্য

বনবেড়ালের
পিসশাশুড়ী
শোন বেড়ালের মা
নাতির বিয়েয়
রেঁধেছিলো
হুতুমথুমোর ছা।

হুক্কাহুয়া
জান্‌তে পেরে
দায়রায়
সোপর্দ করে,
বনবেড়ালের
তিনটে ফিস
মামলা খারিজ
ও ডিসমিস।

মূল ইতালীয় লেখক

এলভিও বারলেত্তানি

অনুবাদ করেছেন

শ্রীপ্রণতা দে

ভবঘুরে কুকুর ল্যাম্পো

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

॥ পাকা অভিনেতা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ল্যাম্পো ডাইনে-বাঁয়ে দু'বার দেখে সোজা চার নম্বর প্ল্যাটফরমে চলে গেল। ক্যামেরা ফেরানোর আওয়াজে প্রথমে ওর একটু সন্দেহ হ'ল। যেন একবার অপারেটরদের ভালো করে দেখে নিল। বুঝে নিল ও কিছু নয়। তাই বেশ অহংকারের চালে একটা ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রথমশ্রেণীতে উঠে একটা সীটে জাঁকিয়ে বসল। অপারেটর যতক্ষণ ক্যামেরা চালাচ্ছিল, আমরাও তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়লাম। গাড়ীর অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ী পিওম্বিনোর পথে পাড়ি দিল।

জানালা দিয়ে ল্যাম্পো মুখ বাড়িয়ে দেখছিল খোলা মাঠের জল-ভরা জমি, ন্যাড়া গাছ প্রভৃতির দৃশ্য। দু'চারবার তাচ্ছিল্য-ভরা দৃষ্টিতে ও মেশিন-ধরা লোকটার দিকে তাকালো, তারপর উঠে একটা সীটের নীচে লুকিয়ে পড়ল। এক সেকেণ্ড পরেই টিকিট-কালেকটর ঢুকল ঐ কামরায়। তার চকচকে পালিশ-করা ধারীদার টুপি মাথায়। দেখলাম, এই দৃশ্যটি ভাল করে তুলতে পেরে অপারেটরের মুখে তৃপ্তির হাসি।

ট্রেনটা থামতেই দরজা খুলে গেল আর গার্ডের গলা শোনা গেল: "পিওম্বিনো টারমিনাস।" সবচেয়ে প্রথমে নামলো ল্যাম্পো। ও বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল গেটের দিকে। হলের ভেতর দিয়ে দৌড়ে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে একেবারে আমার বাড়ীর দিকে চল্ল। যদিও

রাস্তার দু'ধারে লাইন করে দাঁড়ানো গাছগুলি খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু ল্যাম্পো দাঁড়ালো না। ও জানত স্কুলের সময় হয়ে গেছে, এখন আর এক মুহূর্তও নষ্ট করবার নয়। আমার বাড়ীর সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল আমার মেয়ে। তারা পরস্পরকে অভিবাদন জানালো, তারপর একসঙ্গে চল্ল। মির্ণা আগে আগে হাঁটছিল বেশ সুন্দর ভঙ্গীতে। ওর সোনালী চুলের 'পনিটেল'টা ঘাড়ের ওপরে দুলছিল। আর ল্যাম্পো চলছিল ওর পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর গা ঘেঁষে ঘেঁষে।

ফোটোগ্রাফাররা পেছনে অনুসরণ করছিল আর বলছিল অদ্ভুত, আশ্চর্য, অভূতপূর্ব !

ওরা যখন স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছল, সেখানকার বাচ্চা মেয়েরা যারা ল্যাম্পোকে জানত, তারা ওকে ঘিরে নিয়ে পিঠ চাপড়ে আদর করল। এবারে ক্লাসের ঘণ্টা বাজল। মির্ণা ও তার বন্ধুরা ভেতরে চলে গেল। ল্যাম্পো তখন ষ্টেশনের দিকে চল্ল। এবার ল্যাম্পো প্রত্যেকটি গাছের কাছে থামছিল। এখন ও যা-ইচ্ছে করতে পারে। ওর সকালের ডিউটি ও যথাযথ সেরে নিয়েছে। আমরা সবাই ল্যাম্পোর সঙ্গে ট্রেনে করে ক্যাম্পিগলিয়াতে ফিরে এলাম। সেখানে আরও কতকগুলি রি-টেক এবং সাধারণ দৃশ্য নেওয়া হ'ল। যাত্রীরা এতক্ষণ কৌতুহল ও আনন্দসহকারে সব দেখছিল।

যতক্ষণ এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম (যেটা সবচেয়ে সেরা দৃশ্য হবে), ততক্ষণ অপারেটররা ল্যাম্পোর অনেকগুলো নানা ভঙ্গীর ও অবস্থার ছবি তুলে ফেল্ল। যেমন : যাত্রীদের মধ্যে, শান্টিংয়ের লোকের সঙ্গে, বা যারা মাল ওঠানো-নামানো করছিল তাদের সঙ্গে এবং আমার ঘরে যখন ল্যাম্পো বিশ্রাম করছিল তখনকার। ওরা আমার সঙ্গে ল্যাম্পোর একটা ছবি তুলতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি তাতে আপত্তি করলাম। বল্লাম, আমার মেয়ের সঙ্গে যে ওঁরা ল্যাম্পোর ছবি তুলেছেন, তাতেই আমি খুশী।

সেদিনকার সকালবেলার হাল্কা রোদ শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'ল। জল-ভরা কালো মেঘে চারিদিক ছেয়ে গেল। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি আসন্ন। কাঁটায়-কাঁটায় যথাসময়ে এক্সপ্রেস গাড়ী ষ্টেশনে ঢুকল। ল্যাম্পোও ঠিক সময়ে ডাইনিং-কারের দিকে দৌড়ল। রাঁধুনী নিয়মানুযায়ী রান্নাঘর থেকে টুকরো-টাকরা ছুঁড়ে দিল ওরদিকে। সমস্ত দৃশ্যগুলি বেশ বিশদভাবে তোলা হচ্ছিল। এমন সময় বৃষ্টি এ'ল ঝেঁকে। ফটোগ্রাফাররা আমার আপিসে এসে আশ্রয় নিলেন। ওঁদের শরীর ভিজে একাকার। কিন্তু ওঁরা ভারী খুশী। একজন অপারেটর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলেন, আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিলেন, "নিজের চোখে না দেখলে তো আমি এসব বিশ্বাসই করতুম না।"

অন্যজন বল্লেন, "বেড়ে আশ্চর্য কুকুর, সত্যি !" দু'জনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে ল্যাম্পোকে চাপড়ে আদর করলেন তাঁরা।

তারপর বার বার আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁরা বিদায় নিয়ে একটা প্রায় ছাড়বো-ছাড়বো গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। ওঁদের একজন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "আর একবার আপনাদের কুকুরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—ওকে যত্ন করে রাখবেন। ও একজন আসল অভিনেতা—না, অনেক অভিনেতার চেয়ে সেরা!" ওঁরা হাত নেড়ে 'গুড্ বাই' জানিয়ে গেলেন, আমরা খুশীতে হাসলাম।

আপিসে ফিরে এসে দেখি ল্যাম্পো ঘুমে অচেতন। ওর পক্ষে একটা গভীর ঘুমেরও একান্ত প্রয়োজন ছিল। সত্যিই ও অনেক চলচ্চিত্র অভিনেতার চেয়ে ভালো অভিনেতা। ওর কোন দোষে কোন ছবির রি-টেকের প্রয়োজন হয়নি। যে ছবিগুলো আবার নতুন করে তুলতে হয়েছিল, তার জন্য টেকনিক্যাল ব্যাপার দায়ী। লোকগুলি আমাদের বলেছিলেন যে, পরের যে কোন তিনটির একটি রবিবারে শিশু-মহলের প্রোগ্রামে 'বিশ্ব পর্যটক' এই নাম দিয়ে এটা টেলিভিশনে দেখানো হবে। ল্যাম্পোকে টেলিভিশনে দেখবার জন্য আমাদের উৎসাহের অবধি ছিল না। রেলওয়ের সব লোকেরা সপরিবারে পরের রবিবারে তাদের টেলিভিশান সেটের সামনে জড়ো হ'ল। যাদের নিজেদের বাড়ীতে টেলিভিশন নেই, তারা ই. এন্. এ. এল. 'হলে' অথবা কোন বন্ধুর বাড়ী বা কোন 'বারে' চলে গেল দেখতে। আমি সেই রবিবারে কোন বেড়াবার প্রোগ্রাম রাখলাম না (সাধারণতঃ রবিবার গিয়ে থাকি) এবং নিজেদের গ্রামের ফুটবল ম্যাচে ইচ্ছে করেই গেলাম না। ল্যাম্পোকে টেলিভিশনে দেখতে বাধা হতে পারে, এমন কোন কাজই আমি করব না। আশে-পাশে আমার যত দূর বা নিকট আত্মীয়স্বজন আছেন, সকলকে জানিয়ে দিলাম রবিবারের প্রোগ্রামে ল্যাম্পোসহ মির্ণাকে যাতে তাঁরা দেখতে পান। প্রথম দু'টি রবিবারে আমরা হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেলুম। অতঃপর তৃতীয় রবিবারে আমরা সেই বহু প্রতীক্ষিত দৃশ্য দেখতে পেলাম। মির্ণাটা তো আনন্দে প্রায় আধ-পাগলার মত হয়ে গিয়েছিল। আমি ও আমার স্ত্রীও কম উৎসাহী নই। খানিকটা তো আমাদের মেয়ে মির্ণাকে দেখতে পাবো বলে, তাছাড়া ল্যাম্পোর জন্যে তো বটেই। এছাড়া মির্ণার দু'জোড়া দিদা-দাদু তো তাঁদের ছোট্ট নাতনীকে টেলিভিশনে দেখে আবেগে চোখে জল! ঘরের মধ্যে এত কথা, এত উত্তেজনা যে, টেলিভিশনের ধারাভাষ্য একবর্ণও আমার বোধগম্য হ'ল না। এদিকে প্রধান তারকা অভিনেতা ল্যাম্পো অজ্ঞতার আশীর্বাদে কিছু না জেনে ঘুমে নিমগ্ন হয়ে রইল।

এই হ'ল আমাদের ল্যাম্পো একটা সামান্য বর্ণসংকর কুকুর। কে জানে কোথা থেকে একদিন এসেছিল ক্যাম্পিগলিয়াতে, যে পরে খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠে সমস্ত ইটালীময় নিজের কীর্তিকলাপকে সর্বজনবিদিত করে তুলেছিল। এমন কী ওর খ্যাতি ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পৌচেছিল—সমুদ্রের ওপারেও। পরে জানতে পারলাম ফ্রেঞ্চ টেলিভিশান কোম্পানীও নাকি 'ভ্রাম্যমাণ কুকুর ল্যাম্পো'কে ওদের টেলিভিশনে টেলি-ট্রান্স্মিশন করে নিয়েছিল। আরও আশ্চর্য হলাম এবং আনন্দিতও হলাম যখন সানফ্রান্সিস্কো থেকে আমার মামীমার চিঠি পেলাম, কিছু খবরের কাগজের কাটিংসহ। এগুলি ছিল ভ্রাম্যমাণ কুকুর লাম্পো সম্বন্ধে। তাহলে সত্যিই ও পুরস্কৃত হ'ল। তার কৃতিত্বের মুকুটে একটি সেরা মাণিক্য বসানো হ'ল।

(ক্রমশঃ)

চড়ুইভাতি

শ্রীবিকাশ বসু

বড়দিনের দিন মিঠুন ও তার বন্ধুরা লরী ভাড়া করে, "দেখালো কারা? সবুজ সংঘ" বলতে বলতে ডায়মণ্ড হারবার থেকে পিকনিক করে ফিরে এল। ফিরে এসে পর্যন্ত মিঠুন সেই যে পিকনিকের গল্প শুরু করল, থামতে আর চায় না। বিবি বলল, 'বাবা, তোমরা কখনো পিকনিক করেছ?'

বাবা বললেন, 'নাঃ, আমাদের সময় এরকম ব্যাণ্ড বাজিয়ে লরী ভাড়া করে পিকনিক ছিল না। আমরা চড়ুইভাতি করেছি। এতো পয়সা তো লোকের ছিল না সে সময়।'

মিঠুন বলল, 'যাকে বলে বনভোজন, তাই না বাবা?'

বাবা বললেন, 'হাঁ। তবে ভোজন আর কোথায়। বনভোজন করতেন বড়রা। আমরা ছোটরা শুধু মুড়ি আলুচচ্চড়ি।'

বিবি বলল, 'তাহলে চড়ুইমুড়ি বলো, চড়ুইভাতি বলছ কেন?'

মিঠুন বলল, 'আচ্ছা বাবা, চড়ুইভাতি কথাটা কী করে হলো বলো তো? চড়ুই পাখির সঙ্গে কী এর কোন সম্পর্ক আছে?'

মিঠুনের এই এক সমস্যা, কোন্ শব্দের কী করে উৎপত্তি হ'ল তা তার জানা চাই।

এতক্ষণে তিতির এসে হাজির। সে বাবার দুই হাঁটুর মাঝে দাঁড়িয়ে বললো, 'ধ্যেৎ ওসব শব্দ-টব্দ ভালো লাগে না, বাবা তুমি চড়ুইভাতির গল্প বলো।'

বাবা বললেন, 'গল্প আর কি, আমাদের ছিল বিরাট আম জাম কাঁঠালের বাগান, তারই ছায়ায় আমরা 'ফিষ্ট' করতুম। আমরা মানে, আমাদের বিরাট যৌথ পরিবার—সব ঘর মিলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা দশ বারোজন হবে, তার ওপর পাড়ার দু'একটি ছেলেমেয়েও যোগ দিত।'

মিঠুন বলল, 'কত করে চাঁদা?'

বাবা বললেন, 'চাঁদা আবার কী? কেউ দিত আলু, কেউ দিত পেঁয়াজ, কেউ দিত তেল, কেউ বা মশলাপাতি। কেউ বা কিছু না দিয়েই পাত পেড়ে বসত। ভারী মজার ছিল সেই কলাপাতায় মুড়ি-আলুচচ্চড়ির ফিষ্ট। পয়সা একেবারে উঠত না তা নয়। এক পয়সা দু'পয়সা করে চার পয়সা চাঁদা উঠলেই মুড়ির দাম উঠে যেত। চার পয়সায় ছিল এক পালি মুড়ি।'

বিবি বলল, 'পালি আবার কী বাবা?'

'পালি হ'ল চাল, ধান, মুড়ি এই সব মাপবার ওজন—প্রায় আড়াই সেরের সমান।'

বিবি ঠানদি'র মত গালে হাত দিয়ে বলল, 'ওমা চার পয়সায় আড়াই সের!'

'হাঁ। তাও কোন কোন দিন এক পয়সাও চাঁদা উঠত না।'

মিঠুন বলল, 'সেদিন তোমরা কী করতে বাবা? শুধু আলুচচ্চড়ি তো খাওয়া যায় না।'

বাবা বললেন, 'সেদিন হ'ত চাল-ভাজা।'

তিতির বলল, 'চাল-ভাজা, সে আবার কী?'

মিঠুন বলল, 'কেন যার নাম চাল-ভাজা তার নামই মুড়ি, শুনিস নি? চাল ভেজেই তো মুড়ি হয়।' মিঠুন অনেক কিছু জানে।

বিবি বলল, 'কিসে রাঁধতে? উনুন কোথায় পেতে?'—পৃঃ ৪৮৪

তিতির নিতান্ত ছোট। এসব কিছু জানে না। সে বলল, 'তাই বুঝি?'

বিবি বলল, 'তাই বুঝি? তাই বুঝি? তুই থাম। বাবা তুমি গল্প বলো। চাল কোথা থেকে আসত?'

বাবা হেসে বললেন, 'চাল? চালের কোন অভাব ছিল না। অনেকই চাঁদা হিসেবে চাল দিত, তাই ভেজে নেওয়া হ'ত।'

তিতির বলল, 'তোমাদের দেশ ছিল কোথায় বাবা?'

মিঠুন বলল, 'তাও জান না, খুলনা জেলা।'

তিতিরের কাছে খুলনা জেলাও যা বর্ধমান জেলাও তা। সে কিছু না বুঝেই বলল, 'ও।'

বাবার এবার নিজের থেকে যেন মুখ খুলে গেল। তিনি বললেন, 'ওঃ, সেই চাল-ভাজা আর আলুচচ্চড়ি কী ফাইন যে লাগত, আজও মুখে লেগে রয়েছে!'

বিবি মেয়েমানুষ। তার রান্নাবান্নার খবর নেওয়া চাই। সে বলল, 'কিসে রাঁধতে? উনুন কোথায় পেতে?'

'উনুন আর কি! দুটো ইঁট পেতে নিলেই উনুন। কাঠ-পাতার আলে রান্না হ'ত।'

'এতো কাঠ-পাতা কোথায় পেতে?'

'বলেছি তো মস্ত বড় বাগান ছিল আমাদের। ঠাকুরদা সেখানে একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন বানিয়ে ফেলেছিলেন।'

'কত রকমের গাছ ছিল সেখানে?'

'সব রকমের। সে সব গাছের মধ্যে কোন ফলের গাছ বাদ ছিল না—কামরাঙা থেকে করমচা।'

বিবি বলল, 'করমচা! বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো!'

মিঠুন বলল, 'কেন শুনিস নি? যা বৃষ্টি ধরে যা—'

'ভিজে পাতায় করমচা। আমি বইয়ে পড়েছি।' মিঠুন সব কিছু বইয়ে পড়েছে।

তিতির বলল, 'সেই বাগানের কী হ'ল বাবা?'

'জানি না। দেশ ভাগ হয়ে গেল। আমরা চলে এলুম।'

তিতির এবার বলল, 'কী করে দেশ ভাগ হ'ল বাবা?'

বাবা বললেন, 'ঠিক জানি না। তবে জিন্না নামে একটা লোক ছিল। মস্ত পণ্ডিত লোক। সে বলল, মুসলমানদের বড় কষ্ট। ওদের জন্যে আলাদা একটা দেশ চাই। এই নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হ'ল। তারপর একদিন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' করতে করতে দেশ দু'ভাগ হয়ে গেল।'

মিঠুন বলল, 'তোমাদের সময়ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ ছিল বাবা?'

বাবা বললেন, 'হুঁ। মানে বুঝতুম না। কিন্তু বড়দের সঙ্গে আমরাও চেঁচাতুম। তবে আমরা ছোটরা 'জিন্দাবাদ' বলতুম না, আমরা 'জিন্নাবাদ' বলতুম। আমরা সত্যি সত্যি ভাবতুম জিন্নাকে বাদ দিতে বলছে। কিন্তু জন্নাকে আর বাদ দেওয়া গেল না। দেশ দু'ভাগ হয়ে গেল। সেই বাগানটাও হারিয়ে গেল।'

তিতির বলল, 'সেই বাগানটায় আর যাওয়া যায় না?'

যে ব্যাঙ্কে রক্ত থাকে

শ্রীঅমরনাথ রায়

মানুষের শরীরের একটি প্রধান উপাদান হলো রক্ত। পরিণত বয়সের একজন মানুষের শরীরে সর্বদা পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত চলাচল করে। যদি কোন কারণে এই রক্তের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণও খোয়া যায়, তাহলে মানুষের জীবন সংশয় হয়ে পড়ে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রক্ত দিতে পারলে প্রাণটা বেঁচে যেতেও পারে।

টাকার অভাব হ'লে টাকা যোগান দেবার জন্যে যেমন ব্যাঙ্ক আছে, তেমনি ব্যাঙ্ক আছে রক্তের। সে ব্যাঙ্কের নাম 'ব্লাড ব্যাঙ্ক'। মানুষের শরীরে রক্তের অভাব হ'লে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে তা সরবরাহ করা হয়। এই ব্যাঙ্কে মানুষের রক্ত সংগ্রহ করে তা সযত্নে রেখে দেওয়া হয়।

একজনের খাদ্য অপরের কাছে অনেক সময় বিষতুল্য হ'তে পারে। তেমনি একজনের রক্ত অপরের শরীরেও বিষতুল্য হ'তে পারে। সব মানুষের রক্ত উপাদানের দিক থেকে এক রকম নয়। তাই একজনের রক্ত অপর জনের শরীরে খাপ খেতে পারে, নাও পারে। একের রক্ত অপরের শরীরে খাপ না খেলে তার ফল মারাত্মক হ'তে পারে।

উপাদানের তারতম্য অনুসারে রক্তকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেই ভাগগুলি হলো O, A, B এবং AB. রক্ত কণিকায় A উপাদান থাকলে সে রক্তকে A, B উপাদান থাকলে B এবং এই উভয় উপাদানই থাকলে সে রক্তকে AB শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু রক্ত কণিকায় A এবং B এর মধ্যে কোন উপাদানই না থাকলে, সে রক্তকে O শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

যার দেহে A শ্রেণীর রক্ত আছে, তার দেহে B কিংবা AB শ্রেণীর রক্ত খাপ খায় না। জোর ক'রে ভিন্ন শ্রেণীর রক্ত দিলে তার ফল হয় মারাত্মক। কিন্তু যে কোন মানুষের শরীরে O শ্রেণীর রক্ত নির্ভয়ে দেওয়া চলে। ব্লাড ব্যাঙ্কে এই চার শ্রেণীর রক্তই হিম শীতল কক্ষে সযত্নে রাখা থাকে।

দুর্ঘটনাজনিত আঘাত অথবা অস্ত্রোপচারের ফলে যদি কারুর দেহে বেশী রক্তক্ষয় হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারেরা ব্লাড ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হন। রোগীর দেহের রক্ত পরীক্ষা করে তাঁরা দেখে নেন্—কোন্ শ্রেণীর রক্ত তার দরকার। তারপর ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে সঠিক শ্রেণীর রক্ত নিয়ে আসেন তাঁরা রোগীকে দেওয়ার জন্যে।

ব্লাড ব্যাঙ্কের মূলধন হলো রক্ত। মূলধন আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই। যে কোন সুস্থ মানুষই ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসতে পারে। রক্ত বিনা পয়সায় ব্যাঙ্ককে দান করা

যায়। আবার ইচ্ছা করলে রক্ত দানের বদলে উপযুক্ত মূল্যও নেওয়া যায়। ব্যাঙ্কে পরিণত বয়সের একজন মানুষের শরীর থেকে একসঙ্গে আড়াইশো থেকে চারশো সি. সি. রক্ত সংগ্রহ করা হয়। রক্ত দেওয়ার সময় দাতা কোন রকম অসুবিধা বা অস্বস্তি বোধ করেন না বা এই রক্ত দানে তাঁর শরীরেরও কোন ক্ষতি হয় না। উপযুক্ত খাদ্য পেলে মাত্র তিনি মাসের মধ্যেই দাতার শরীরে ঐ রক্তটুকু আবার সৃষ্টি হয়।

যাই হোক—এ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ দাতার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেন—সেটা কোন শ্রেণীর। তারপর উপযুক্ত লেবেল লাগানো বোতলে রক্তটাকে ভরে ৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় হিমকক্ষে রেখে দেন।

ব্লাড ব্যাঙ্কে কোন রক্ত কখনও ছয় সপ্তাহের বেশী সময় ফেলে রাখা হয় না। রাখলে, তা নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যেই সংগৃহীত রক্ত ব্যবহার করে ফেলা হয়।

কোন লোক ব্লাড ব্যাঙ্কে স্বেচ্ছায় ও বিনা পয়সায় রক্তদান করে থাকলে তার ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজনের সময় ব্লাড ব্যাঙ্কও তাকে বিনা পয়সায় সেই পরিমাণ রক্ত সরবরাহ করে থাকে। এই ভাবে যে কোন লোকই এই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারে এবং নিজের অথবা পরিবারবর্গের প্রয়োজনে টাকার মত এ ব্যাঙ্ক থেকে রক্তও তুলে নিতে পারে। ব্লাড ব্যাঙ্কে যার অ্যাকাউণ্ট নেই, প্রয়োজন হলে সেও এখান থেকে রক্ত কিনতে পারে।

সমাজে সাধারণ ব্যাঙ্কের চাইতে এই ব্লাড ব্যাঙ্কের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়, বরং বেশীই বলা যেতে পারে।

অন্ধকারে ও অব্যক্ত

শ্রীসমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারে	অব্যক্ত
আঁধারে শিশুর মত আলোক লাগিয়া	শিশু যথা মাকে ডাকে নামের নেশায়
ভাষাহীন বাক্যে আমি বেড়াই কান্দিয়া।	আমি ডাকি ভগবানে নির্বাক ভাষায়।

চ্যাম্পিয়ন স্কাইস্ক্রেপার

শ্রীঅনিল সোম

বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন স্কাইস্ক্রেপার হ'ল নিউ ইয়র্ক শহরের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং। এটি ৩৮০ মিটার উঁচু। কিন্তু এর কৌলীন্য এবার যেতে বসেছে।

নিউ ইয়র্ক শহরে আর একটি সংস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র, The World Trade Centre, যার দুটি বাড়ী হবে ৪১০ মিটার উঁচু। এদের প্রত্যেকটিতে থাকবে ১১০ তলা। এবং এখনও তৈরী হচ্ছে, ১৯৭৩ সালে সম্পূর্ণ হবার কথা। কিন্তু ১৯৭০ সালে শীতের আগেই উত্তরে বাড়ীটির প্রথম ২৪ তলা তৈরী হয়ে যাবে, ভাড়াটেরাও বসে যাবে, ওপরের বাকি ৮৬ তলার কাজ তখনও চলবে। দক্ষিণের বাড়ীটির নির্মাণ কাজ আট মাস পিছিয়ে থাকবে।

এই সংস্থার মোট বাড়ী থাকবে ৬টি ২টি বড় ও চারটি ছোট। ছোট ৪টির প্রত্যেকটি ৮ তলার। এগুলি ১৬ একর জায়গা জুড়ে অবস্থান করলেও এগুলিতে ভাড়া দেওয়ার মতন জায়গা থাকবে ২৩০ একর পরিমিত স্থান। তৈরী করতে মোট খরচ পড়বে ৬০কোটি ডলার।

মাটির তলায় থাকবে ৬ তলা, সেখানে ২,০০০ মোটর গাড়ী পার্ক করে রাখা যাবে। তা ছাড়া থাকবে গুদাম ও অপারেটিং যন্ত্রপাতি।

এটি হবে বিশ্ব সুপার মার্কেট, রপ্তানী-কারক ও আমদানী-কারকেরা এখানের আফিসে বসে বিশ্বের যে কোন জায়গার যে কোন জিনিসের বেচাকেনা করতে পারবেন। এক কথায় U. N. of trade আর কি!

ব্যর্থ অহমিকা

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

বারুদ স্ফুলিঙ্গ বলে, "ওরে মোম বাতি।
আমি তো মাতায়ে রাখি উৎসব-রাতি।
সদম্ভে আকাশে উঠি' আমি বার বার,
বিদীর্ণ করিয়া আসি নিশীথ আঁধার।"

মোম বাতি বলে হেসে, "ওরে দাম্ভিক,
তোর ও তো শিখা নয়, স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিক।
তাই সে ছড়ায় যবে হতাশার কালো,
তখনো অম্লান জ্যোতি জ্বলে মোর আলো।"

"অনাদরে ষষ্ঠী"

শ্রীজ্যোতির্ময় ছুই

অনেক দিন আগের কথা, তখন স্কুলে পড়ি। সবেমাত্র ফার্স্ট ক্লাসে অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছি। পণ্ডিতমশায়ের বিদ্‌কুটে ধাতুরূপ আর শব্দরূপ নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি। ক্লাসে গোলমাল করলে পণ্ডিতমশাই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিকৃত স্বরে বলতেন, 'পাকা কলা পেয়েছিস ?' আর তাঁর মারের ধরণটাও ছিল অভিনব, ধাতুরূপ শব্দরূপ একটু এদিক-ওদিক হলে নির্দয়ভাবে পেটের মাংস খাম্‌চে ধরতেন: সবে বাড়ী থেকে খেয়ে আসা ভাত-তরকারী হজমের পদ্ধতিটার মধ্যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটাতেন। প্রাণের দায়ে তাঁর ধাতুরূপ শব্দরূপ মুখস্থ করতে হ'ত। যেদিন না মুখস্থ হ'ত, সেদিন ভাল করে ভাত খেতে পারতাম না। ভাতের গ্রাসের মধ্যে পণ্ডিতমশায়ের ক্রোধ-বিকৃত মুখটা ভেসে উঠত আর পেটের মধ্যে কিরকম মোচড় দিত।

হিরেন ওরফে হিরু আমাদের সহপাঠি ছিল, ও তিন চারদিন পরে আজ এই স্কুল এসেছে। শিবপুরে ওর মাসীর বাড়ী গিয়েছিল। গতদিন পণ্ডিতমশাই কি পড়া দিয়েছিলেন তা ও জানত না। যথানির্দিষ্ট সময়ে পণ্ডিতমশায়ের পিরিয়ড্ এলো এবং যথাকালেই খর্বাকৃতি পণ্ডিতমশাই নেকড়ে বাঘের মত চেয়ারে এসে বসলেন। আমরা বলির পাঁঠার মত বসে আছি কার উপর প্রথম পণ্ডিতমশায়ের নেকনজর পড়ে। আমার তো অনাদরে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, সব একাকার হয়ে গিয়ে চোখের সামনে পণ্ডিতমশাইয়ের ভাঁটার মত গোল গোল চোখগুলো ঘুরছে, কখনও সেগুলো হারিয়ে সর্ষে ফুল জেগে উঠছে। আজ আমার পড়া তৈরী হয়নি। হাতড়ে হাতড়ে যতগুলো ঠাকুরের নাম মনে পড়লো, সবাইকার দুয়ারেই এ যাত্রা রক্ষের জন্য আবেদন করতে লাগলাম। হঠাৎ চমক ভাঙলো পণ্ডিতমশায়ের বাজ-খাঁই গলার আওয়াজে। হীরুর দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'এই হীরু, অনাদরে ষষ্ঠীর একটা উদাহরণ দে-দিকিন্।' হীরু ক'দিন মাসীর বাড়ীতে আদরেই ছিল, হঠাৎ অনাদরের প্রশ্নে মোটেই ভড়কালো না, সোজা উঠে বললো, 'গজুদের বাড়ী স্যার।' আমরা, মায় পণ্ডিতমশাই তাজ্জব হয়ে গেলাম হীরুর অনাসৃষ্টি কথায়। 'গজুদের বাড়ীতে কি রে ?' 'গজুর মায়ের স্যার গতকাল আবার একটা ছেলে হয়েছে। এই নিয়ে গজুর বারোটা ভাই-বোন স্যার। গজুর বাবা খুব গরীব স্যার। গজুর মা সেদিন আমার মায়ের কাছে দুঃখ করছিল, ছেলেগুলোকে আদর-যত্ন তো দূরের কথা ভাল করে খেতে দিতে পারি না....।' আর বলতে হ'ল না, পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে উঠে এসে হীরুর অবস্থা যা করলেন তা বর্ণনা না করলেও কারও নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। পরে আমরা হীরুর কাছে জেনেছিলাম, গজুর মায়ের উপর মা ষষ্ঠীর কৃপার (গজুর মায়ের কাছেই শুনেছিল) সঙ্গে গজুদের উপর আদর-যত্নের অভাব অর্থাৎ অনাদর যোগ করে ঐ উদাহরণটা সে দিয়েছিল, কিন্তু উদাহরণটা এত মর্মান্তিক হবে তা ও ভাবতে পারেনি।

সমস্যা

বন্দে আলী মিয়া

সকাল বেলা হাবুল সেদিন একটা চিঠি পেলে
পাটনা থেকে শ্বশুর তাহার মাছ পাঠালো রেলে।
ইষ্টিশানে রসিদ দিয়ে মাছ ছাড়াতে গিয়ে
দেখলো মাছের নেইকো মুড়ো—বলে : ব্যাপার কি এ ?
কেরানীটি বলে : এই মাছটি নাও—নয় তো হটো পিছু
যা এসেছে রয়েছে ঠিক তাই, জানিনে আর কিছু।
ছুটলো হাবুল ইষ্টিশানের মাষ্টার যেথা ছিলো
মুড়ো কাটা মাছের ব্যাপার বুঝিয়ে তারে দিলো।
শুনে সাহেব বললো হেসে : আই এ্যাম ভেরী সরি—
হঠাৎ এখন বিচার ইহার কেমন করে করি।
মুণ্ডু চুরি কঠিন ব্যাপার—বিনা তদন্তেই
বিচার তাহার হয় না কভু এমন আইন নেই—
দরখাস্ত করলে তবে বিচার শুরু হবে
ততটা দিন মাছটি তোমার ইষ্টিশানে রবে।
কি আর করে হাবুল তখন—বাড়ী ফিরে এসে
কেরানীটির নামে নালিশ ঠুকলো বিষম ক'ষে।
ছ'মাস পরে হাবুল পেলো জবাব একটি তার
চিঠি পড়ে ঘুরলো মাথা—মাছের মুড়ো ছার।
লিখছে তারা : খোঁজ করিয়া জেনেছি আজ ঠিক
শ্বশুর তোমার মাছ পাঠাতে ভুলেছে সব দিক।
মুড়ো সমেত মাছটা কিনা বলেন নাই তা ভুলে
তেমন কথা রসিদেতে লেখা নাই তো খুলে।
মোকদ্দমা নাকচ হলো—খরচা দিয়ো তার
মাছটা তোমার রেল গুদামে নাইকো এখন আর।
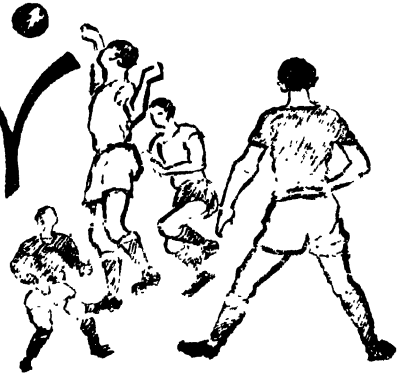
মেঠুড়ে

ক্রিকেট

প্রায় তিন মাস ধরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সফরের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ক্রিকেট দল গত ১ ফেব্রুআরি বোম্বাই থেকে জামাইকা যাত্রা করেছেন। ১৯৬২ সালের পর ১৯৭১ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দল আবার ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে খেলতে গেলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতের এটা তৃতীয় ক্রিকেট সফর। আর টেস্ট খেলার হিসেবে দু'দেশের ষষ্ঠ টেস্ট সিরিজ। কেন না, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলও এর আগে তিনবার ভারত সফর করে গেছেন।

এবারের ভারতীয় দলটি বেশিরভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া। দলে আছেন: অজিত ওয়াদেকার (অধিনায়ক, বোম্বাই, এস. ভেঙ্কটরাঘবন (সহ-অধিনায়ক তামিলনাড়ু), এম. এল. জয়সীমা (হায়দারাবাদ), সেলিম ডুরানি (রাজস্থান), দিলীপ সরদেশাই (বোম্বাই), আবিদ আলী (হায়দরাবাদ), বিষেন সিং বেদী (দিল্লী), ই. এ. এস. প্রসন্ন (মহীশূর), অশোক মানকড় (বোম্বাই), কে. জয়ন্তীলাল (হায়দরাবাদ), সুনীল গাভাসকার (বোম্বাই), জি. আর. বিশ্বনাথ (মহীশূর), ডি. গোবিন্দরাজ (হায়দরাবাদ), একনাথ সোলকার (বোম্বাই), জিজিবয় (পশ্চিমবঙ্গ—উইকেটকিপার) ও পি. কৃষ্ণমূর্তি (হায়দরাবাদ-উইকেটকিপার)। যদিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত আজও কোনো টেস্ট জিততে পারেনি, তবু যদি এবার ভারতীয় খেলোয়াড়রা অহেতুক ভয় কাটিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে মনপ্রাণে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে টেস্টে হারানো ভারতের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

ফুটবল

বহু খ্যাতনামা দলের সমাবেশে রোভার্সের খেলা এবার ভালোই জমেছিল। গতবারের কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলকে সেমি-ফাইনালে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রর কাছে হার

স্বীকার করতে হলেও কলকাতার লীগ রানার্স মোহনবাগান ফাইনালে মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রকে ১-০ গোলে পরাজিত করে রোভার্স বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

মোহনবাগান এবং মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র দু'দলই বাই পেয়ে চতুর্থ রাউণ্ড থেকে খেলা শুরু করে। ফাইনালে ওঠার পথে মোহনবাগান পরাজিত করে বিকানীরের আর্মড কনস্ট্যাবলারিকে ৪-০ গোলে, বাঙ্গালোরের এল. আর. ডি-ই দলকে ৫-০ গোলে এবং গোয়ার সালগাওকার স্পোর্টস ক্লাবকে ৩-০ গোলে। অপর দিকে গোরখা ব্রিগেডকে ৩-১ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ০-০ ও ১-০ গোলে হারিয়ে, মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র সর্বপ্রথম রোভার্স ফাইনাল খেলার অধিকার অর্জন করে।

এবার নিয়ে মোহনবাগান বারো বার রোভার্স ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। এর ভেতর একটানা সাত বার। বারো বারের ফাইনালের মধ্যে জয়ী হয়েছে মাত্র চার বার। এবারের জয়ের ক্ষেত্রে মোহনবাগান কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র যে একটা শক্তিশালী দল ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে দু'দিনের দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত জয় থেকেই তার প্রমাণ মেলে। ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গেও দু'দিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে তারা হেরে গেছে দ্বিতীয়ার্ধে সুভাষ ভৌমিকের দেওয়া একটি মাত্র গোলে।

ব্যাডমিণ্টন

ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনের সেমি-ফাইনালে হরটোনা ১৫-২, ১৫-১০ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে এবং মুলজাকি ১৫-১০ ও ১৫-১ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করে।

হকি

আগা খাঁ কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ অপূর্ব ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন ক'রে বোম্বাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে হারিয়ে আগা খাঁ কাপ বিজয়ী হওয়ার সম্মান লাভ করেছে। ইণ্ডিয়ান নেভী এই খেলায় সারাক্ষণ আক্রমণ ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেও, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ এর অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের জন্য শেষ পর্যন্ত ২ গোলে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আগা খাঁ কাপের এই সুবর্ণ-জয়ন্তী বছরে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্-এর এই জয় খুবই যে গৌরবের হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

১। তিন অক্ষরে নাম তার
সর্বস্থানে রয় ;
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে
পদবী এক হয়।

শ্রীবিবেকানন্দ প্রামাণিক

২। দুই চক্ষে দেখি,
আর দুই কর্ণে শুনি ;
দুই কর্ণে ব্যবসা চলে
শুনিয়াছ তুমি ?

শ্রীরঞ্জিৎকুমার ভট্টাচার্য

৩। আকাশে আছে, বনেতে আছে,
কবির কিবা নাম ?
এ ধাঁধার বললে জবাব
বুদ্ধির দেবো দাম'

শ্রীসন্তোষকুমার গোস্বামী

৪। তিন আখরে নাম তার
মাটির নিচে থাকে ;
মাঝের আখর দিলে বাদ
আমরা খাই তাকে।

শ্রীসুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৫। এমন একটি ইংরেজী শব্দ বার করো, যা থেকে 'আমি ইহা করি' এই অর্থটি পাওয়া যায়।

শ্রীনীলকণ্ঠ দেবনাথ

৬। তিন অক্ষরে এমন একজন দেবতার নাম করো, যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে অর্থ হয় 'প্রাণহীণ' এবং শেষ অক্ষর বাদ দিলে অর্থ হয় 'শিরোরুহ'।

শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল

৭। (ক) কোন্ সে বস্তু যা সব সময় সকলেরই একসঙ্গে বাড়ছে ? (খ) আলোতে কি দেখা যায় না ? (গ) পঁচিশ বছরে জন্মদিন এসেছে ছ'বার ; সেকি ভুল বলেছে ? (ঘ) কাঠের পা আর আসল পায়ের মধ্যে তফাত কোথায় ?

শ্রীসতীরঞ্জন আদক

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। উত্তিগড়, বোরদে ও দেশাই, দুরানী, জয়সীমা, মঞ্জরেকার, এঞ্জিনিয়ার ২। মাঝি ৩। খাতা

ফাল্গুনের সুরু হয়—শীত অন্তে, বসন্তে। চারিদিকে অর্থাৎ প্রকৃতিতে একটা সমারোহ ভাব থাকে। শুষ্ক গাছগুলি কিশলয়ে ছেয়ে যায়। পলাশের ডাল যেন আগুন-রাঙা হয়ে ওঠে—আর আমের নব-মঞ্জরীর মিষ্টি গন্ধ মন মাতায়—এই সময়টা বসন্তকাল। সকলে বলেন বসন্ত হলো ঋতুরাজ; সব ঋতুর সেরা এই নববসন্ত—কিন্তু তার থাকার সময় মাত্র দু'টি মাস। তারপরই খরতপ্ত হয়ে উঠবে প্রকৃতি।

বসন্তকালকে আমরাও আহ্বান জানাই—কঠিন শীতের স্পর্শ থেকে—মুক্তি পাই আমরা—চারিদিকে পত্রপুষ্পের শোভায় মন স্নিগ্ধ হয়।

কিন্তু বসন্তকালে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সময় মত দেহের যত্ন ও প্রকৃতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলেই নানারোগ আক্রমণ করে—তার মধ্যে বসন্ত রোগ একটি কঠিন ও ভয়াবহ অসুস্থতা। সেই জন্য প্রাকৃতিক নির্দেশ মেনে নিয়ে আহার, আচ্ছাদনে বেশ সতর্ক থাকতে হয়—অসুস্থতা আক্রমণ যাতে না করে সে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বসে কথা আসে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন (বিশেষ করে যারা শহরে থাকে) এই কোলকাতায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তোমরা সকলেই তো সংবাদপত্রে পড়ছ, শুনছ, দেখছও।

একটা অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তোমরা-আমরা, সবাই দেখতে পাচ্ছি আজ কি অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। অন্যায়কে চিরদিন দূরে রাখতে হয়—তাই মনে হয় এসব যা অশুভ, যা কল্যাণকর নয়, তাকে ত্যাগ করাই ভাল। মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এই কথাই বার বার বলি।

কোলকাতায় সেদিন এণ্ডরুজ জন্ম শতবার্ষিকী হয়ে গেল। সি. এফ. এণ্ডরুজ ছিলেন

(চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরুজ) বিশ্ব-পথিক ভারতবন্ধু। মানব-কল্যাণব্রতী এই বিরাট মানুষটি ভারতের সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন—তাদের ভালোবেসেছিলেন। তাঁর সেবাধর্ম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামকরণ করেছিলেন দীনবন্ধু। তাই তাঁকে বলা হতো দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ডরুজ।

সেদিন তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো মহাজাতি সদন ও সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল চার্চে। অনেক গুণীজনের সমবেশে সেদিনের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলো। আচার্য কৃপালনী বললেন, "দেশে যখন অধর্ম ধর্মের স্থান নিয়েছে, সমাজে যখন কেবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ চলেছে, আজকের মানুষ মহান্ এণ্ডরুজের জীবন ও বাণী থেকে কিছু গ্রহণ করবেন। তিনি ছিলেন শান্তির পূজারী—তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে এক পরিবার ভুক্ত ভাবতেন—সকলকে সকলের ভাই মনে করতেন।"

অজাতশত্রু দীনবন্ধু বিরোধীদের আপনজনই মনে করতেন, ক্ষমার চোখে দেখতেন। মিথ্যা ঘৃণা ও উচ্ছৃঙ্খলা তিনি কখনও বরদাস্ত করেন নি।

ভারতখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী কাকাসাহেব কার্লেকর বললেন, "এণ্ডরুজ সাহেব শুধু দীনবন্ধু নন, তিনি সর্ববন্ধু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি তাঁর দেশের লোকের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কখনও তাঁদের ঘৃণা করেন নি। তিনি ছিলেন প্রকৃত খৃষ্টান ও একজন মহান্ ভারতীয় সন্ন্যাসী।"

রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব বলে মানতেন, গান্ধীজীকেও তিনি শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে তাঁর অনেক দিন কেটেছিল। ওদিন সেখানেও শতবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল। প্রার্থনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর আশ্রম গায়করা তাঁর প্রিয় গানগুলি গাইলেন।

ভারতের নিপীড়িত মানুষের জন্য যে আদর্শ এণ্ডরুজকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা খৃষ্ট ধর্মের ঐতিহ্যই বহন করেন। এই বাণী পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি।

আমরাও ভারত-প্রেমিক এই মহান্ মানুষটিকে অবনত মস্তকে স্মরণ করি, শ্রদ্ধা জানাই।

তোমাদের অসংখ্য চিঠি তার মধ্যে স্কুল কলেজ বন্ধ, হামলা, পড়াশুনা স্থগিদ। কি করে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হবে, ছাত্ররা তাদের কাজ শুরু করতে পারবে, সকলে সুস্থ জীবন যাপনকরতে পারবে, এই সব নানা প্রশ্নে ভর্তি। তোমাদের কাছে আমরাও তো ঐ একই প্রশ্ন। এই কথা বলি যে, শান্ত সংযতচিত্তে থাকতে হয়—দেশের যখন ঘোর দুর্দিন আসে। প্রার্থনা করি আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। শুভেচ্ছা ও স্নেহসহ।

তোমাদের—মধুদি'

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১১।ই।এইচ।১৭, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ৬০ পয়সা

নালন্দা
আলোক চিত্র:
অরুণ সেন গুপ্ত
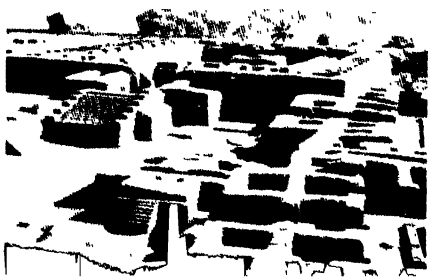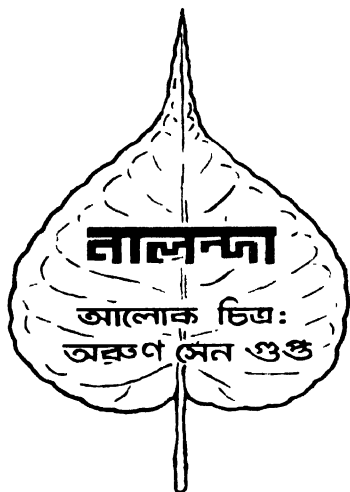
✱ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিক পত্রিকা ✱

৫১শ বর্ষ] চৈত্র ঃ ১৩৭৭ [১২শ সংখ্যা

প্রশ্ন ও উত্তর

শ্রীনবগোপাল সিংহ

প্রশ্ন

(১)

ঠিক সময়ে সুয্যিমামায় দেয় ভাঙিয়ে ঘুম,
ঘুম পাড়িয়ে আবার করে রাতটাকে নিঃঝুম।
পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদে লুকায় অমারাতে
কলায় কলায় বাড়ায় কমায় কে বা আপন হাতে ?
রাতের তারা দিনের নভে কোথায় থাকে মিশি ?
সন্ধ্যাবেলা কার ইশারায় ঘোরে সপ্তঋষি ?
দেখতে না পাই কভু, তবু দেখতে যে চাই তাকে ?
চালায় আলোর রথটাকে, বল তো খোকা কে ?

(২)

বৈশাখেতে কালবোশেখী বর্ষা যে বর্ষাতে
ঘাসের বুকে মানিক জ্বালায় শিউলি-ঝরা প্রাতে।
হেমন্তে বসন্তে শীতে যখন যা নিয়ম
কার সে নিপুণ চালনাতে হয় না ব্যতিক্রম।
চাই বা না চাই মিষ্টি হাওয়া বইছে অহরহ,
কর লাগে না তবু রবিকরের সমারোহ।
পঙ্কজেতে গন্ধঢালে মধু সে কিংশুকে—
অলক্ষ্যেরই এই জাদুকর, বল্ তো খুকু কে ?

উত্তর

(১)

পিতার বুকে মমতা আর মাতার বুকে স্নেহ
যে দেয়, যাহার দয়ায় বাঁচে শিশুর কচি দেহ।
ফুলের বুকে সুরভি দেয়, ফলের বুকে সুধা
ক্ষুধার তরে অন্ন যে দেয়, অন্ন তরে ক্ষুধা।
দুইটি রুটি এক বাটি জল যে দেয় নারিকেলে,
পঙ্কেতে যে পঙ্কজেরে ফোটায় অবহেলে,
মরুর মাঝে পান্থ-পাদপ, কিংবা মরুদ্যান
যে দেয়, খোকা বলে, "জানি সেই তো ভগবান।'

(২)

সাত-সাগরের জল থেকে যে তৈরী করে মেঘ
শ্রাবণে যে প্লাবন এনে বাড়ায় নদীর বেগ।
আকাশেতে বজ্র এবং ধরায় সরীসৃপ
এই উভয়ের মাঝেও যেজন বাঁচায় জীবন-দীপ।
বীজের মাঝে গাছের স্বপন, বীজের স্বপন গাছে
সৃষ্টি ও লয় ওতপ্রোত জড়িয়ে যেথায় আছে।
বুড়ীর বড়ি শুকোয় আবার বাঁচায় চাষার ধান,
খুকু বলে, "জানি জানি, সেই তো ভগবান।"

তুষার-ধবলের দেশে

শ্রীশৈবাল চক্রবর্তী

কাজ নেই তো হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলুম এমনি-এমনি। ভাইয়া এসে বল্‌ল, চুপচাপ বসে থেকে লাভ কি দাদা, চলুন পৃথিবীটা একটু প্রদক্ষিণ করে আসি।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ! ভাইয়া'র মুখে অমন সাধুভাষার বহর শুনে আমি তাজ্জব হব কি, আমার পকেটের অবস্থা ভেবে চমকে উঠে বললুম, আমার ট্যাকে একটি কানাকড়িও নেই, বিনে পয়সায় রেলে চড়ে শেষে জেলের ঘানি টানি আর কি! না, না ওসব সখ্ আমার নেই!

ভাইয়া বললে, দাদা'র যেমন কথা! মিথ্যে ঘানি টানতে যাবেন কেন? ঘানি টানা মোটেই ভাল কাজ নয়। আপনি আসুন না, নিখরচায় আপনাকে কেমন ত্রিভুবন চক্কর দিইয়ে আনছি!

বলে দু'জনে হাত-ধরাধরি করে, দরজা পেরিয়ে এক কলার খোসায় পা ফেলতেই শাঁ করে গেলুম উড়ে—উড়ছি তো উড়ছিই! শেষে দেখলুম, বাড়ীঘরগুলো যেন পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে! একটা পুঁচকে ছেলের ঘুড়িটা আর একটু হলেই গোড়ালিতে যেত আটকে! ভাইয়া বললে, দেখলেন তো! আপনি তো ভেবেই মরছিলেন! এখন দেখুন—

এতক্ষণ উড়ছিলুম, এবার নামার পালা! শোঁ-ও করে নামতে নামতে যে জায়গাটায় এসে জমি পেলুম পায়ের তলায়, তার চারদিকে খালি বরফ আর বরফ! দেখে তো আমরা অবাক! শুনলুম এখানে কুলপি মালাই খুব সস্তা! একটা লোক মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে বিকোচ্ছে পয়সায় পঞ্চাশটা! তাও নগদ পয়সা দিতে হচ্ছে না, তার বদলে খানিকটা কাঁচা বরফ খেয়ে নিলেই সে খুশী! খানিক দূরেই একজন বরফের উপর ডিগবাজী খাচ্ছে আর বলছে—

রেগে হই ঠাণ্ডা
তেতে হই ঠাণ্ডা
না হবি তো ঠাণ্ডা
মেরে দেব ডাণ্ডা।

বিনে-পয়সায় অত কুলপি খেয়ে ভাইয়ার অবস্থা তো কাহিল! তার পাকস্থলী-টাকস্থলী জমে সব ইট হয়ে গিয়েছে! শেষে সে ব্যামোও সারল বরফের সেঁক দিতে!

আর একটু এগুতেই দেখি একটা লোক তার সামনে বসে একটা টাক-মাথা লোকের চকচকে টাকের ওপর দু'হাতে বরফ ঘষছে আর বলছে—

জলে যখন ঘাস গজায়,
গজায় ঘাসের ডগায় ফুল;
তখন টেকো মাথায় ঘষলে বরফ
কেন জন্মাবে না চুল?

যে লোকটা বরফ ঘষছে, তার মুখটা বেশ হাসি-হাসি ; সে একটা পাগড়ি পরে বরফের, পায়ের নাগরাটাও সেই বরফেরই তৈরি! অবস্থা কাহিল টাক-মাথা'র! সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমি কেঁদে বাঁচি ভাই—

'যে লোকটা বরফ ঘষছে, তার মুখটা বেশ হাসি হাসি।'

বরফ-ঘষা লোকটি বলল, একটিও কথা বলবে না। বুদ্ধির গোড়ায় বরফ ঘষলে মাথা সাফ হয়, এ আমাদের শাস্তরে লিখেছে।

টাক-মাথা লোকটা কেঁদে-ককিয়েও ছাড় পেল না। তার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছিল তাও বরফেরই বিন্দু। যে বরফ ঘষছিল সে বলল, আমি এখানকার কবিরাজ। সব অসুখের সেরা ওষুধ যে বরফ তা আমি শাস্তর ঘেঁটে বার করেছি। গেঁটে বাত, আমবাত, চোখে ঘুম নেই দিনরাত, এসব রোগের এক দাওয়াই—বরফ! বলে দু'হাত ছুঁড়ে নেচে-গেয়ে উঠল—

বরফ খাও, বরফ মাখো
বরফ নিয়ে খেল,
চোঁয়া ঢেঁকুর উঠলে খানিক
বরফ গিলে ফেল।

গান শেষ করেই আবার মুঠো মুঠো বরফ নিয়ে ঘষতে লাগল সেই চকচকে টাকের উঠোনে!

ভাইয়া বলল, চলুন দাদা, আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, আরও কত কি কাণ্ড ঘটছে এখানে।

একটু দূরেই এক দোকান, বাইরে বরফের খড়ি দিয়ে লেখা,'বরফ বিতরণ বিপণি'। আসুন, বসুন, বিনামূল্যে বরফ খান! তুলো বরফ, ধুলো বরফ, শক্ত, নরম, লাল, নীল, চৌকো, চারকোণা। একশ আটত্রিশ রকমের বরফ এখানে মিলবে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা।

আর সে দোকানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে লোকে বরফ নিচ্ছে, খাচ্ছে, ইচ্ছে মতন। মিষ্টি সিরাপের লোভনীয় লাল, নীল, সবুজ আকাশী রঙের দুধমালাই, কিশমিশ বাদাম দেওয়া কুলপি আহা কি গন্ধ! খেতে খেতে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে লোকগুলো বলছে, উঃ আর তো পারি নে! বেদম হয়ে গেলুম! শুনে একধারে দাঁড়িয়ে-থাকা জমকালো পোশাক-পরা প্রহরী বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, খেতেই হবে রাজার হুকুম! এই সব দুধ-মালাই শেষ করতে হবে এখুনি! নতুন বরফের চালান এলো বলে, এগুলি শেষ না হলে সে মাল আমি রাখব কোথায় শুনি?

এমন সময় প্রহরীর চোখ পড়ল আমাদের ওপর। বলল, আপনারা বুঝি নতুন লোক? আসুন, আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই! বলে বরফের কুচি দিয়ে সাজানো মালা আমাদের গলায় পরিয়ে দু'জনের হাতে তুলে দিল চকোলেট মোড়া ঢাউস আইসক্রিম! তাতে দাঁত বসিয়েই আমি আর ভাইয়া অবাক! এমন মন-পাগল-করা আইসক্রিম যে কলকাতার সেরা দোকানীও কোনদিন বানাতে পারবে না, তা নিয়ে আমাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল! রইলুম দাঁড়িয়ে প্রহরী ও আমরা দু'জন। প্রহরী বলল, ওরা সব অফিসে গেল। এখন কত জলে কত বরফ সেই হিসেব কষা চলবে সারাদিন ধরে! তার কথা শেষ হয়েছে, এমন সময় ঝনঝন করে ঘণ্টা বাজিয়ে বরফে ঢাকা এক দুধ-সাদা গাড়ী এসে উপস্থিত। ভেতর থেকে ঝুপঝুপ করে তিনজন বরফের বর্ম-আঁটা সেপাই নেমে সেলাম করে দাঁড়াল। প্রহরী বলল, কি খবর? ওরা তিনজন ঠাণ্ডা গলায় বলল, খবর জবর! আজ রাতে বড় করে চাঁদ উঠবে তুষার-ধবলের মাথায় খবর পেয়েছেন রাজা! আর বরফ-প্রাঙ্গণে পরীরা নামবে তাঁকে তাঁর জন্মদিনের গান শোনাতে! তাই আজ রাজ্যি জুড়ে উৎসবের ডাক দিয়েছেন রাজা! সবাইকে সে খবর দিতে বেরিয়েছি আমরা। শুনে প্রহরী আমাদের দিকে ফিরে বলল, এ তো ভারী খুশীর খবর! এ উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্যে রাজার তরফ থেকে সানন্দে আহ্বান জানাচ্ছি আমি আপনাদের!

সে রাতের সে উৎসবের কথা কি বলব! বরফের ওপর জোৎস্না ফুটলে যে অমন বাহার হয়, তা গল্পে পড়িনি, রূপকথাতেও মেলেনি তার বর্ণনা! আর সেই সাতরঙা জ্যোৎস্নার মধ্যে

যখন বরফের পরীরা সাদা ফিনফিনে পোশাক পরে জুড়ল তাদের নাচ, তখন সব মিলিয়ে যে ছবি ফুটল, তা আঁকব আমার কলমের সে সাধ্যি কোথায়! ভিড়ের মধ্যে দেখা মিলল সেই কবিরাজ আর তার টাক-মাথা রুগীরও। কি আশ্চর্য! এখন আর তার মাথায় টাক নেই, বরফের মত ধবধবে একরাশ চুল নিয়ে বাতাস করছে খেলা!

আমরা বসেছিলাম একটা মস্ত কুলপি-মালাইয়ের পাহাড়ের পাশে। এরই নাম তুষার-ধবল। সুন্দর সাদা শৃঙ্গ যেন আকাশের মেঘকে চুমো খেতে চাইছে! রাজা তাঁর গোঁফে দুটো টুস্কি মারলেন, অমনি বরফ নিয়ে খেলা আরম্ভ হয়ে গেল! মস্ত উঁচু চূড়োটার মাথায় চ'ড়ে আমি আর ভাইয়া মুঠো মুঠো করে মালাই খাচ্ছি আর ফেলছি। আমাদের কাণ্ড দেখে রাজা হাসছেন, হাসছে আরও সবাই! হঠাৎ সেই পাহাড়েরই একটা চাঙড় ধ্বসে গিয়ে আমি আর ভাইয়া আঁতকে উঠলুম। শোঁ-ও-ও করে নীচে নামছি, নামছি তো নামছিই! মুঠো মুঠো করে বরফ ধরছি, কিন্তু কিছুতেই আমাদের আটকে রাখতে পারছে না! এই বুঝি পড়লাম, পড়লাম—হঠাৎ মাগো বলে চীৎকার করে উঠে দেখি, আমরা আমাদের বিছানায়। ভাইয়া আমাকে জড়িয়ে, আমি ওকে! আমাদের গা-হাত-পা সব ঠাণ্ডা, বোধহয় ভয়েই! পরে বড়মামাকে সব খুলে বলতে তিনি খানিক ভুরু কুচকে বললেন, কাল রাত্তিরে তোরা যে কুলপি মালাই খেয়েছিলি রাজা মালাইওলার কাছ থেকে, তাতে নিশ্চয় সিদ্ধি-মেশানো ছিল, আমি হলফ করে বলতে পারি। দাঁড়া, আসুক আজ রাস্কা! ছোট ছেলেদের সিদ্ধি খাইয়ে তিন-মুল্লুক ঘুরিয়ে আনার মজা বোঝাচ্ছি আমি ওকে! ব'লে মামা মাথা গরম করে, খড়ম খট-খটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর আমরা যেন তখনও সেই 'তুষার ধবল'-এর মাথায়, ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে হি হি করে হাসতে লাগলুম!

ইসমাইল খাঁ'র কবর

শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত

মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না, বহু চিন্তা করেও যার সমাধান খুঁজে বার করা অসম্ভব হয়। এমনি একটি রহস্যময় ঘটনার কথা এখানে তোমাদের শোনাচ্ছি।

গত বছর পুজোর ছুটিতে আমি মধ্য প্রদেশের ভূপাল শহরে বেড়াতে যাই। ভূপাল খুব সুন্দর জায়গা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। নবাবী আমলে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিলেন মুসলমান। অপূর্ব মুসলমানী স্থাপত্যের নিদর্শন এখনও বহু মসজিদ ও মিনারের মধ্যে দিয়ে ভূপালে বর্তমান রয়েছে। পনর দিনের ছুটি এই অপূর্ব শহরটিতে কি আনন্দেই না কাটতে লাগলো! শহরটির আশপাশে বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

দিন-দশেক ভূপাল শহরে কাটাবার পর আমি আশপাশের গ্রামগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্য বের হলাম। কয়েকটি গ্রাম ঘুরে একটি গ্রামে উপস্থিত হলুম; সেটির নাম শেখপুরা। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। শেখপুরা অত্যন্ত পুরোনো গ্রাম। অতীত যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ গ্রামটিতে একটু ঘুরলেই চোখে পড়ে। সেইসব স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখলেই মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব জেগে ওঠে, কল্পনার-দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে অতীতের সেই বিলাসময় সুলতান, নবাব ও আমীর-ওমরাহদের জীবন-কথা। হঠাৎ মনে আমার একটা ইচ্ছে জাগলো, এই গ্রামে দুটো দিন থাকতে পারলে মন্দ হতো না। মামুদ হোসেন বলে একজন অত্যন্ত সহৃদয় বৃদ্ধ আমাকে গ্রামটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন ও প্রয়োজনমত স্থান-গুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছিলেন। একটি বড় পুকুরের ধারে এসে তিনি কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "আচ্ছা, চলুন বাবুজী, দেখতে এসেছেন যখন তখন সব কিছু দেখে নেওয়াই ভালো।"

ঐ পুকুরের পাশেই ছিল একটা বড় ভগ্নপ্রায় বাড়ী। বাড়ীটার সামনের বাগানে বহু আগাছা জন্মেছে। বাড়ীটা দেখে যে-কেউ বলতে পারবে যে, এটি এককালে কোন এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আবাস ছিলো। আমরা দু'জনে বাড়ীটার মধ্যে ঢুকলাম। বাগানটা পেরিয়ে খানিকটা পরিষ্কার সমতল জমি, তারপরই বাড়ীটা আরম্ভ হয়েছে। সমতল ভূমি বা উঠানটিতে একটি কবর, খুব জমকালো। কবরের ওপরে উর্দুতে কি যেন লেখা রয়েছে। আমার ও ভাষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, কাজেই কি লেখা রয়েছে বুঝতে পারলুম না। বৃদ্ধ মামুদ হোসেন কিছুক্ষণ কবরটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "বাবুজী, এই হচ্ছে ইসমাইল খাঁ'র কবর! এক শয়তান তার শয়তানী-লীলা শেষ করে এই মাটির নীচে ঘুমুচ্ছে!"

আমার অত্যন্ত আগ্রহ হওয়ায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "হোসেন সাহেব, মেহের-বাণী করে এই ইসমাইল খাঁ'র কথা আমাকে একটু বলুন।" মামুদ হোসেন তখন ইসমাইল খাঁ'র বিবরণ আমাকে শোনাতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "বাবুজী, বাদশা শাজাহানের আমলেই ইসমাইল খাঁ'র জন্ম। বাল্যকাল থেকেই সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির বলে সকলেই তাকে এড়িয়ে চলতো। শাজাহানের পতনের পর আওরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন, সেই সময় থেকেই ইসমাইল খাঁ তাঁর দলে যোগ দেয়। পিতা শাজাহানকে বন্দী করে ও ভাইদের রক্তে হাত রাঙিয়ে আওরঙ্গজেব যখন ভারতবর্ষের রাজ-সিংহাসন অধিকার করলেন, তখন দেশব্যাপী একটা বিক্ষোভ ও হাহাকারের বন্যা বয়ে গেল। যে নিতান্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি 'সম্রাট এটা যথার্থ কাজ করেছেন' বলে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো, ইসমাইল খাঁ তাদেরই একজন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও গোঁড়া মুসলমান হিসাবে খুব শীঘ্রই ইসমাইল খাঁ বাদশা আওরঙ্গ-জেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ফলে, বছর দুইয়ের মধ্যেই প্রভূত অর্থ ও সম্মান সে অর্জন করতে সমর্থ হয়। হিন্দু-বিদ্বেষী হিসাবে সে আলমগীরের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। কিন্তু আসলে ইসমাইল খাঁ হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান বলতে যা বোঝায় তাও ছিল না। ওটা আওরঙ্গ-জেবের প্রিয়পাত্র হবার জন্য ছিলো একটা ভাল অভিনয়। সত্যিকারের মুসলমান ধর্মের শিক্ষাও সে কোনদিন গ্রহণ করেনি। সৎ প্রকৃতির, অসহায় মানুষের প্রতি অত্যাচারে তার ছিলো একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ তার ছিলো না; সুযোগ পেলেই মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে সে। একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন: একদিন ইসমাইল খাঁ অনেক অর্থব্যয়ে কেনা একটা আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভুপাল শহরে বেড়াতে বেরিয়েছে, এমন সময় পথে এক বৃদ্ধ মুসলমান তার অল্পবয়সী এক নাতির হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিলো। ইসমাইল খাঁ কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সজোরে তাদের উপর দিয়েই প্রায় ঘোড়াটা চালিয়ে দিলো। নাতি বেচারা ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে দেখে, বৃদ্ধ আর উপায়ন্তর না পেয়ে, তাঁর হাতের লাঠিটা দিয়ে ঘোড়ার পায়ে সজোরে এক আঘাত করে। যন্ত্রণায় ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠে এবং এক চুলের জন্য বৃদ্ধের নাতি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এই ব্যাপারে ইসমাইল খাঁ তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা—তার ঘোড়াকে কিনা আঘাত! তৎক্ষণাৎ তার আদেশে বৃদ্ধ ও তার নাতিকে বন্দী করা হলো। ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়া হলো পশু চিকিৎসালয়ে। চিকিৎসকেরা ঘোড়াটাকে দেখে বললেন, সামনের একটা পা জখম হয়েছে, অন্ততঃ মাসখানেক ঘোড়াটার বিশ্রাম প্রয়োজন। ইসমাইল খাঁ ভুপালের শাসনকর্তাকে গিয়ে বলল, এক বেতমীজ, বেওকুফ আমার অমন দামী ঘোড়াকে জখম করে দিয়েছে। তাকে আমি

আটকে রেখেছি, এখন নিজের হাতে শাস্তি দিতে চাই। স্বয়ং বাদশা আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র ইসমাইল খাঁকে ভূপালের শাসনকর্তা খুব সমীহ করে চলতেন। কাজেই ইসমাইল খাঁ'র কথায় তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী না হয়ে পারলেন না।

ইসমাইল খাঁ পরের দিন সমস্ত শহরে খবর ছড়িয়ে দিল যে, তার দামী ঘোড়াকে জখম করবার জন্য এক বদমাশ লোকের বিচার হবে। নির্দিষ্ট সময় বিচারের জায়গায় অনেক লোকের ভিড় জমল। এদের মধ্যে অনেকেই ইসমাইল খাঁ'র চেলা, মোসাহেব, অনুচর। কিছু লোক আবার ভয়ে ভয়ে এসেছে, তারা না এলে পাছে ইসমাইল খাঁ তাদের ওপর অত্যাচার করে।

খাঁ সাহেব নানা রকম হীরা-জহরতের কাজ করা কেদারাতে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে। আশপাশে তার মোসাহেবের দল প্রতি কথাতে কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ করছে। ইসমাইল খাঁ-র হুকুমে বন্দী দু'জন অর্থাৎ সেই বৃদ্ধ ও তার নাতিকে সেখানে আনা হ'ল। হতভাগ্য বন্দী দু'জনের অবস্থা দেখে চোখে জল ধরে রাখা যায় না! তাদের খালি পা, জামাকাপড় ছেঁড়া, সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড মারের দাগ। বাচ্চাটার ঠোঁট কেটে তখনও একটু একটু রক্ত পড়ছে। তারা কাঁপতে কাঁপতে এসে ইসমাইল খাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। ইসমাইল খাঁ রক্ত-চক্ষু বার করে রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো, শয়তান! তোরা আমার অমন দামী আরবী ঘোড়াটাকে জখম করে দিয়েছিস—জানিস, এর জন্য কি শাস্তি তোদের পেতে হবে? বৃদ্ধ হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, হুজুর, এইবারের মতো মাপ করুন আমাদের। আমার নাতিটা ঘোড়ার পায়ের লাথি খেয়ে মরে যেতে বসেছে দেখে, আমি আপনার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করেছিলাম। ইসমাইল খাঁ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো, তোর নাতি মরতো তো আমার কি? তার জন্য তুই আমার ঘোড়ার পায়ে মারবি?—ওরে কে আছিস, দুটো লাটি নিয়ে এই বুড়োটাকে আর ছোঁড়াটাকে মারতে থাক—যতক্ষণ না ওদের প্রাণ বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ একটানা মার দিয়ে যা। লোকে দেখে শিখুক, আমার অমর্যাদা করলে তার কি শাস্তি পেতে হয়!

শত শত লোকের আতঙ্কিত দৃষ্টির সামনে সেই বৃদ্ধ আর তার নাতিকে পিটিয়ে মারা হ'ল। দর্শকদের মধ্যে কেউ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, কেউ দু'হাতে চোখ ঢেকে পালাতে চাইল। কিন্তু ইসমাইল খাঁ'র প্রহরীরা জোর করে তাদের ধরে রাখলো। ইসমাইল খাঁ তার আসনের উপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলো, কুকুরের দল! দেখে নে, দেখে নে, আমি এইভাবেই বদমাশদের শায়েস্তা করি!

এই রকম অকথ্য অত্যাচার দিনের পর দিন ঘটতো। আর একদিন তার একটি ভৃত্য অন্যমনস্ক হয়ে পিক্‌দানিটা ভেঙে ফেলায়, ইসমাইল খাঁ'র আদেশে তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতটি

কনুই থেকে কেটে ফেলা হ'ল। এমনিভাবেই দিন চলছিলো, কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে তার শয়নকক্ষে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি ইসমাইল খাঁ'র বুকে ছোরা বিঁধিয়ে তাকে হত্যা করলে।

• বাবুজী, এই সেই শয়তান ইসমাইল খাঁ'র কবর! ওর শয়তানীর নানারকম কাহিনী এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই নামটিতে লোকের এত ঘৃণা ও ভয় যে, স্থানীয় কোন লোক তার পরিবারের কারোর নাম ইসমাইল রাখে না। এ ছাড়া ইসমাইল খাঁ'র নামে আরো একটা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। সে নাকি খুন হয়েছিল শুক্রবার রাত্রে। অবশ্য এটা একটা প্রবাদ। শুক্রবারই যে সে খুন হয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এখানকার লোকে বিশ্বাস করে যে, ইসমাইল খাঁ শুক্রবার রাতেই খুন হয়েছিলো এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রেই সে কবর থেকে বেরিয়ে তার বাড়ীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এটা সত্যি কি মিথ্যে তা বলতে পারবো না। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, স্থানীয় অনেক লোকই এই কথা বিশ্বাস করে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে একথা বিশ্বাসও করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। বুদ্ধি-বিবেচনা মত এ জিনিস হতে পারে না। কিন্তু বাবুজী, এই পৃথিবীতে সব জিনিস-ই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো কি ঘটে? তবে এটা পরীক্ষা করে দেখার সাহস অথবা ইচ্ছে কোনটাই আমার নেই। ঐ শয়তানটার কথা যত কম চিন্তা করা যায়, ততই ভালো। ওর কথা ভাবলে মন অপবিত্র হয়।"

হোসেন সাহেবের দীর্ঘ ও অসাধারণ বর্ণনা শেষ হলে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর এই ভয়ংকর চরিত্রের ইসমাইল খাঁ'র পরিচয় আমার মনে শিহরণ জাগিয়ে তুললো। অবশ্য গল্পের শেষ অংশ আমি বিশ্বাস করি না, আর কেনই বা করবে? তিনশো বছর আগেকার এক মৃত ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার রাত্রে কবর থেকে বের হয়ে আসে, এটা একটা উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। হঠাৎ ধা করে মাথায় একটা মতলব এসে গেল। আজই তো শুক্রবারের সকাল। আমার তো এই গ্রামে একদিন থাকার ইচ্ছা, তা আজই থাকি না কেন? মামুদ হোসেনকে একথা বলতে তিনি দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, "না না এ হতে পারে না। এ ঝুঁকি আপনি নেবেন না। আর এই ভাঙা বাড়ীতে আপনি থাকবেনই বা কোথায়? এ গ্রামে একদিন থাকতে চান তো ভাল কথা, আমার বাড়ীতে চলুন। আমার বাড়ীতে গেলে আমি খুবই খুশী হব।"

সেই রকমই ব্যবস্থা হ'ল। সারাদিন সেই গ্রামের অন্যান্য ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ দেখে রাত্রে হোসেন সাহেবের বাড়ী গেলাম। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তিনি আমার যত্ন করলেন। রাত্রে নানারকম সুখাদ্য খেয়ে বাইরের ঘরে নরম গদীর বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হোসেন সাহেব নিজে শুতে যাবার আগে আমার মশারি ঠিক মতো খাটানো হয়েছে কিনা দেখে গেলেন। আমি একটা ফন্দী এঁটে রেখেছিলাম। সেটা হ'ল এই যে, এখন এক ঘুম

দিয়ে নি, তারপর দুটো-তিনটের সময় ঘুম ভাঙলে টর্চটা নিয়ে চুপি সাড়ে ইসমাইল খাঁ'র কবর দেখে আসবো। অত রাত্রিতে সকলেই ঘুমিয়ে থাকবে, আমার ঐ বাড়ীতে যাওয়া কেউ টের পাবে না। রাস্তাটা তো আমি চিনি, টর্চের আলোতে ঠিক পৌঁছতে পারবো, অসুবিধে হবে না।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। হাত-ঘড়িটা রেডিয়াম ডায়ালের। অন্ধকারে দেখতে পেলাম রাত দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

'কে যেন আমার কলারটা মুঠো করে ধরেছে।'—পৃঃ ৫০৬

চুপি-সাড়ে উঠে জুতো পরে হাতে টর্চ নিয়ে, বাড়ার দরজা খুলে, আমি বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা এগিয়ে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারলাম, আমি ইসমাইল খাঁ'র বাড়ীর কাছে এসে গেছি। সমস্ত গ্রাম নিঝুম, সকলেই যে-যার বাড়ীতে ঘুমে অচেতন। কোথাও আলোর রেশ মাত্র নেই। চতুর্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঝিঁঝি পোকার একটানা শব্দ কানে আসছে, দূরে দূরে শেয়ালের চিৎকার। এই সময় হঠাৎ মনে হ'ল, আমার পাশ দিয়ে কি যেন দৌড়ে চলে গেল। প্রথমে আমি চমকে উঠেছিলাম, পরে আলো ফেলে দেখলাম একটা শেয়াল। আস্তে আস্তে আলো ফেলে খাঁ সাহেবের বাড়ীর বাগানের মধ্যে ঢুকলাম। ভূতের ভয় আমার ছিলো না, কিন্তু সাপের ভয় ছিলো। তাই ভাল করে টর্চের আলো চতুর্দিকে ফেলছিলুম, টর্চের আলো ক্রমে কবরের ওপরে এসে পড়লো, তারপর বারান্দায়। আমি বারান্দায় উঠে ঘরগুলিতে আলো ফেলতে লাগলাম। কে আবার থাকবে? মিনিট দশেক সেখানে কাটিয়ে যখন উঠানে নেমেছি, ঠিক সেই

মুহূর্তে পেছন দিকের জামায় জোরে টান পড়লো, কে যেন জামার কলারটা মুঠো করে ধরেছে! ঘাড়ে একটা উষ্ণ-শ্বাস অনুভব করলুম। একটা অজানা ভয়ে শরীরটা কেঁপে উঠলো। আতঙ্কিত কণ্ঠে "কে, কে?" বলে চেঁচাতে যাচ্ছি, এমন সময় প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। আমার হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়লো। আর্তনাদ করে উঠলুম আমি। সেই মুহূর্তে দূর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পেলুম। চার-পাঁচজন যেন চীৎকার করতে করতে আসছে, "বাবুজী বাবুজী।"

সামান্য ক্ষণের মধ্যেই লণ্ঠন, টর্চ-লাইট হাতে মামুদ হোসেন ও আরও পাঁচ-ছ'জন গ্রামের লোক এসে পড়লেন। আমি তখনও মাটিতে পড়ে। মামুদ হোসেন আমাকে দেখে বলে উঠলেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই, আপনি এইখানে এসেছেন! পড়ে গিয়েছিলেন নাকি? কি সর্বনাশ কপাল কেটে যে রক্ত পড়ছে!"

আমি তখন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছি। শুধু কপালটাই একটু কেটে গিয়েছিলো, শরীরের অন্য কোন জায়গায় চোট লাগেনি। হোসেন সাহেব বললেন, "হঠাৎ রাত্রিতে ঘুম ভেঙে যেতে আমার কিরকম যেন মনে হ'ল। আপনার ঘরে এসে দেখলাম মশারি তোলা, আপনি নেই। কলঘরে গেলাম, দেখলাম সেখানেও নেই। তখনই মনে হ'ল আপনি নিশ্চয় এখানেই এসেছেন। ধন্য সাহস আপনার! কোনরকম ভয় পেয়েছিলেন নাকি? পড়ে গেলেন কি করে?"

অনেকগুলো লণ্ঠনের ও টর্চের আলোতে জায়গাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, ভয় পাইনি।"

কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, বারান্দার রেলিং থেকে একটা কাঠের আঁকসি বেরিয়ে রয়েছে। সম্ভবত আমার জামাটা সেখানেই আটকে গিয়েছিলো। চলতে গিয়ে টান পড়ায় মনে হয়েছে কে টেনে ধরেছে। উঠানে পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলুম। মনের অবচেতনে হয়ত এটাই বুঝেছি যে, কেউ আমায় ধাক্কা দিয়েছে আর ঘাড়ের উপর উষ্ণ নিঃশ্বাসও হয়ত আমার কল্পনা।

এগুলো সবই তো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। আমার কিন্তু সন্দেহ ও সংশয় রয়েই গেছে। কিন্তু এক সঙ্গে কি এতগুলো ভুল হওয়া সম্ভব? সেই ধাক্কা কি আমি পরিষ্কার অনুভব করিনি? তবে কি প্রচলিত জনশ্রুতি সব সত্যি? কিন্তু কে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবে?

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় সাক্ষী ধানের ক্ষেত হাত জোড় করে বলল: "দোহাই হুজুর, কত কষ্টে ক্ষেতে ধান ফলালাম। দিদিমণি প্রথমে ক্ষেতে একটা গরু ছেড়ে দিল—দেখলুম ত্রিশ দিনে সব ধান খাবার আগেই ধান পেকে যাবে আর অর্ধেক ধান ঘরে উঠতে পারবে। এ খবর পাওয়া মাত্রই দিদিমণি একদিন ত্রিশটা গরু ছেড়ে দিল। দেখুন একমুঠো ধানও নেই—লোকে কি খাবে বলুন তো?"

ক্রিং, ক্রিং করে ঘণ্টি বাজিয়ে টেলিফোন জিজ্ঞাসা করল: "আর কারও কিছু বলার আছে?"

স্কুলের সব ছেলেমেয়ে বলে উঠল: "দিদিমণি আমাদের সকলকে গোল্লা দিয়েছে।"

ট্রানজিষ্টার রায় দিল: "আসলে দিদিমণির মাথা থেকে গোল্লা ছাড়া সব কিছু হারিয়ে গেছে। তাই খাতার পাতায় কেবল গোল্লা আঁকে।"

রেডিও: "এসো, আমরা দিদিমণিকে শূন্য মিটারে গোলায় চড়িয়ে শূন্যে পাঠিয়েছি।"

তুংকা দেখল, তার চারপাশে কিছু নেই, কেবল এক মস্ত বড় গোল্লা দাঁত বের করে হাসছে। আর তার ভেতরে অঙ্কের দিদিমণি। ভয়ে তুংকা চোখ বুজল।

সাত

চোখ খুলে তুংকা দেখল, সামনের বাগানে অজস্র লেবু আর লাল লাল করমচা ফলে রয়েছে। মাথায় পাগড়ী এক শেঠজী হাতের লোটা থেকে চুমুক দিয়ে ঘি খাচ্ছে। পাতলা ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, চশমা চোখে একদল লোক লেবুর পাতা আর করমচা তুলছে আর তারপর এক-একটা লেবুর পাতার ওপর এক-একটা করমচা রেখে বিড়বিড় করে মন্তর পড়ছে।

"লেবুর পাতায় করমচা
যা পদ্য মিলে যা।"

মন্তর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেবুর পাতা আর করমচা মিলে পদ্যের বই তৈরী হচ্ছে। কবিরা বইগুলো শেঠজীর হাতে তুলে দিচ্ছে। শেঠজী বইগুলো লোটার মধ্যে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা গলে গলে ঘি তৈরী হচ্ছে। শেঠজী লোটার মধ্যে একটা কবিতার বই দিয়ে চুমুক দিয়ে ঘি খেতে খেতে তুংকাকে বলল: "কি মহারাজ, থোড়া কাব্যিক ঘিউ সেবা হোবে?"

মাথা নেড়ে তুংকা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল। আর একটু দূরে যেতে তুংকা দেখল একটা নতুন কল। তার একদিকে দুটো মুখ আর একটা হাতল। অন্য দিকে একটা মুখ। টেলিফোন একমনে হাতল ঘুরিয়ে চলেছে। একপাশে দুটো চেয়ারে বসে বাংলার দিদিমণি চা খাচ্ছেন। তুংকাকে দেখামাত্র টেলিফোন হঠাৎ দিদিমণির হাত থেকে চায়ের পেয়ালা দুটো কেড়ে নিয়ে হাতল ঘোরাতে লাগল। তুংকা অবাক হয়ে দেখল, অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলেন নারায়ণ চাচা। নারায়ণ চাচা একটা আস্ত চকোলেটের আধখানা তুংকাকে দিয়ে বাকি আধখানা নিজের মুখে পুরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তুংকার মনে হ'ল, মনোজ কাকু আসলে বেশ ব্যাগাটেল খেলা যেত। ভাবামাত্রই টেলিফোন বলল: "কি তুংকা, কাকুকে ডেকে দেব? দাঁড়াও, আগে কাক আর কোকিল আসুক।" বলা মাত্র তার এক হাতে একটি দাঁড়কাক আর অন্য হাতে একটি কোকিল উড়ে এসে বসল।

টেলিফোন কাককে বলল: "পড় বাচ্ছ কা।"

আর কোকিলকে বলল: "পড় কোয়েলা কু।"

কলের এক মুখে কাক ডাকল 'কা' অন্য মুখে কোকিল ডাকল 'কু'। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগাটেল হাতে হাসতে হাসতে মনোজ কাকু হাজির। তুংকা কিছু বলার আগে টা টা বলে মনোজ কাকু পাশে দাঁড়াল। 'টাটা' লেখা বাসে চড়ামাত্র বাসটা ফুল স্পীডে দৌড়তে দৌড়তে দূরে মিলিয়ে গেল।

তুংকা ভাবতে লাগল, মা তো এখন দমদমে আর বাবা অফিসে। মনোজ কাকু টাটা গেল কেন? ভাবতে ভাবতে একজন মাতাল হাজির। তার দু হাতে দুটো দু'বোতল। ভয়ে তুংকা পালাতে চাইলে টেলিফোন বলল: "ভয় পেয়ো না, দেখ কি মজা হয়। দাঁড়াও মেশিনটাকে আগে ঠিক করে নি।"

একটা বোতাম টিপতে মেশিনের ওপর দিকে দুটো মুখ হয়ে গেল। মাতালের দু'হাত থেকে দুটো বোতল কেড়ে নিয়ে, টেলিফোন মেশিনের সামনে দুটো মুখ রেখে দু'দিকের হাতল ঘুরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দম দম করে আওয়াজ। তুংকা দেখল, সামনেই দমদমে ন' কাকুর বাড়ী। টেলিফোন মেশিনটার আর একটা বোতাম টিপলে তখন দেখা গেল মেশিনের আর একটা মুখ, আর নীচে দুটো মুখ। মাতালকে জোর করে ধরে টেলিফোন ওপরের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আর একটা বোতাম টিপল। তুংকা দেখল ন' কাকুর বাড়ীর সামনে তালগাছ থেকে ধুপ করে একটা তাল পড়ল। আর দরজা খুলে মা বেরিয়ে এলেন।

তুংকা বলল: "মা আমি তালের বড়া খাব।" বলতে বলতে দমদম, মা, সব মিলিয়ে গেল। দূরে গোলমাল শোনা যেতে টেলিফোন তুংকার হাত ধরে ছুটতে লাগল। কিছু দূর এসে তুংকা দেখল, বাংলার টিচার মালাদি আর রমাদি দাঁড়িয়ে। একটা কালো ড্রামে কাঁচা কয়লা জাল দেওয়া হচ্ছে। পাশে একটা টেবিল, একটা ক্যালেণ্ডার আর তার পাশে থার্মোমিটার। আর চারদিকে গোল করে ছেলেমেয়েদের দল। তুংকা টেলিফোনকে জিজ্ঞাসা করল: "এখানে কি হচ্ছে?"

টেলিফোন উত্তর দিল: "মাষ্টার তৈরী হচ্ছে।"

চিত্রা চেঁচিয়ে উঠল: "বারে আজ আমাদের ছুটি, আমরা মাষ্টার চাই না। তাছাড়া মালাদি, রত্নাদি তো রয়েইছেন।"

রত্না বলল: "আর ওঁরা খুব ভাল। আমাদের কতো যত্ন করে পড়ান আর কখনো বকেন না।"

পাশ থেকে মিনা বলল: "যতই খোসামোদ করো, রত্নাদি সন্ধি আর সমাসে ভুল করলে রমাদির মার খেতেই হবে।"

নমিতা: "আর কিছু ভুল না করলেও মালাদির বকুনি।"

ততক্ষণে টেবিল থেকে থার্মোমিটার লাফিয়ে ড্রামের মুখে হাজির। কয়লা গলে টগবগ করে ফুটছে। ক্যালেণ্ডারের তারিখ এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার পাঁচ বদলাতে লাগল। থার্মোমিটারের পারা নামতে লাগল। ক্যালেণ্ডারে তারিখ ৩০ পৌঁছুতে

টেলিফোন বাজল ক্রিং ক্রিং। থার্মোমিটারে তুংকা পড়ল শূন্য ডিগ্রী। এক মিস্ কালো মোটা লোক ড্রাম থেকে লাফিয়ে নীচে নামল। হাতে মোটা কালো লাঠি। চারিদিকে তাকিয়ে টেলিফোন জিজ্ঞেস করল: "কোথায় ছাত্রছাত্রীরা? এইসব বাচ্চাকে পড়ানো আমি অনেক দিন আগে ছেড়ে দিয়েছি।"

টেলিফোন বলল: "ওই যে আপনার ছত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন।" বলে দিদিমণিদের দিকে দেখিয়ে দিলে।

হুংকার ছেড়ে মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মাষ্টার মালাদিকে জিজ্ঞাসা করল: উলটো পুরাণের কাহিনী সরল বাংলা ভাষায় বর্ণনা করো।"

মালাদি মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল: "উলটো পুরাণের কাহিনী তো পড়িনি স্যার।"

মাষ্টার: "উলটো পুরাণ পড়োনি? পাস করলে কি করে? যাও, মাথা নীচু করে পা ওপরে করে দাঁড়িয়ে পুরোনো কথা ভাবো।"

তারপর রমাদির দিকে তাকিয়ে বলল: "তোমারও ঐ এক শাস্তি।"

মালাদি বলল: "এখানে এত ভিড়, পুরোনো কথা ভাবা যাবে না। আমরা টীচারস্ কমন-রুমে যাচ্ছি স্যার।

দিদিমণিরা আর টেলিফোন স্কুলের হলঘরের ভেতরে চলে গেল।

মাষ্টার এক লাফে ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে হেঁড়ে-গলায় আবৃত্তি করতে লাগল:

আমি হুঁদে মাষ্টার
বেত কাঁদে, কাঁদে পিঠ
কোথা পাব প্লাস্টার?

এমন সময় স্কুলের ভিতর থেকে মার মার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তুংকা দেখল, প্রথমে টেলিফোন তারপরে একজন তিব্বতের লামা মার মার করতে করতে ছুটে আসছে দেখেই মাষ্টার ড্রামের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। ড্রাম উলটে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে মারমুখো লামার বদলে রমাদি আর মালাদি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ড্রামও শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ততক্ষণে মাঠের মধ্যে স্কুল ফিরে এসেছে। ছেলেমেয়ে, দিদিমণিরা, মালী, চাকর, দাই, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, দোয়াত, কলম সকলে হাত ধরাধরি করে স্কুলের চারধারে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করেছে। মধ্যে রত্না, রেডিও, ট্রানজিষ্টার ও টেলিফোন। রেডিও ট্রানজিষ্টারে মিষ্টি পিয়ানোর গৎ বাজছে। রত্না সুর করে গাইছে:

"God bless our gracious school
Long live our noble school
God bless the school."

অন্য সকলে রত্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল।

সব শেষে রেডিও গাইল :

"For he is a olly good fellow."

আকাশে রুপোর থালার মত ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে। আর অগুণতি সরু সরু জ্যোৎস্নার সুতো চাঁদ থেকে পৃথিবীর গায়ে নেমে আসছে। সেই সুতো বেয়ে নেমে এলো ধবধবে সাদা হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার থেকে নামলেন সাদা ধবধবে পোশাক-পরা এক পরী, মাথার চুল সব সাদা। টেলিফোনের হাতে জ্যোৎস্না দিয়ে তৈরী একখানা সাদা চাদর দিয়ে বললেন : "স্কুলের জন্মদিনে চাঁদের উপহার। চাঁদের মা স্কুলের জন্য সনপাপড়ি আর সাদা পুলিপিঠে তৈরী করে বসে আছেন। স্কুলকে শীগগির তৈরী হতে বলে দাও।"

তুংকা : "আর আমাদের জন্যে ?"

পরী : "তোমাদের জন্য স্কুল নিজে খাবার নিয়ে আসবে। এবার থেকে ক্লাসের বদলে দিদিমণিরা চাঁদের মার তৈরী মিষ্টি তোমাদের পড়ার সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন।"

টেলিফোন স্কুলের গলায় সাদা ফুলের মালা পরিয়ে হাতে সাদা গোলাপ দিতে লাগল।

পরী আর স্কুল হেলিকপ্টার চড়ে বসবামাত্র, টলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বলে চলল : "হ্যালো, টেলিফোন কলিং, টেলিফোন কলিং। মিঃ ওয়্যারলেস, অল ক্লিয়ার সিগ্ন্যাল দিন।"

ওয়্যারলেস অল ক্লিয়ার সিগন্যাল দিতেই স্কুল আর হেলিকপ্টার শূন্যে মিলিয়ে গেল।

তুংকা, রিংকু, রত্নারা দেখল স্কুলের জায়গায় প্রকাণ্ড এক পুকুর, তাতে হাজার হাজার সাদা পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। কোনোটাতে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ম্যাডাম কুরী, ইন্দিরা গান্ধী, জ্যেঠু, বাবা, মা, কাকু সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে জোড় হাত করে স্কুলকে প্রণাম করছে। মধ্যে কালো ওয়েলার ঘোড়ায় চড়ে টেলিফোন। স্যাভেজের ডাকে তুংকার ঘোর কাটল। চোখ চেয়ে দেখল, কালো ওয়েলার ঘোড়ায় চড়ে টেলিফোন আকাশে মিলিয়ে গেল। রিসিভারটা স্ট্যাণ্ড থেকে মাটিতে পড়ে রয়েছে। আর স্যাভেজ রিসিভারটা চিবোবার চেষ্টা করতে করতে গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

তুংকা দেখল, সে তার নিজের ঘরে—সেখানে আর কেউ নেই। স্যাভেজকে ধমকে দিল : "শীগগির পালাও, তা না হলে মিঃ টেলিফোন তোমার কি দশা করে দেখবে।"

সমাপ্ত

জিব-কাটা চড়াই পাখি

(জাপানী রূপকথা)

শ্রীশৈলেশ ভড়

পাহাড়ের ওপর বাস করতো দু'টি বুড়ো-বুড়ী। বুড়ী ছিল ভারী ঝগড়াটে। স্বামীকে সে দু'চোখে দেখতে পারতো না। সব সময় এমন চীৎকার করে বকাবকি করতো যে, পাহাড়ের নীচের লোকেরাও তা শুনতে পেতো।

বুড়োর ছেলেপুলে কিছু ছিল না। তার একমাত্র বন্ধু ছিল একটি চড়াই পাখি। তার কাছে মনের দুঃখ জানিয়ে নিজেকে হাল্‌কা করতো।

একদিন এক কাণ্ড হলো।

বুড়ো গেছে মাঠে কাজ করতে। আর বুড়ী ঘুম থেকে অনেক বেলায় উঠে বাইরে এসে দেখলে, চড়াইটা দাঁড়ে বসে বেশ খুশি মনে দানা খাচ্ছে।

কারোর সুখ বুড়ী সহ্য করতে পারতো না। তাই পাখিটার সুখ দেখে তার মেজাজ গেল বিগড়ে। সে কাঁচি দিয়ে চড়াইটার আধখানা জিব কেটে দিয়ে ছেড়ে দিলে। আর পাখিটা যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে উড়ে চলে গেল। কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে রইল বাড়ীর উঠোনে।

মাঠ থেকে ফিরে এসে বুড়ো সব জানতে পারলো। কিন্তু দুঃখের কথা কাকেই বা বলবে? বন্ধু বলতে তো আর কেউ রইল না তার। তাই মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলো।

দিন যায়। মাস যায়। বছরও যায়।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে বুড়ো পাহাড়ের মাথায় উঠে এলো।

'সুপ্রভাত বন্ধুবর' জাপানী প্রথায় কে যেন সম্ভাষণ করলো না?

অবাক হয়ে ইতিউতি চেয়ে বুড়ো দেখলো সেই পাখি-বন্ধুকে। আধখানা জিব দিয়ে সে মানুষের মত কথা বলছে। বুড়ো খুশি হয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো। পুরনো বন্ধুকে পেয়ে দু'জনেই খুশি।

পাখি বললে, 'আমার বাসায় চলো, সেখানে আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। এসো আমার সঙ্গে।'

একটি গাছের ফোকরে সুন্দর একটি বাসা তৈরী করে চড়াই দিব্যি সংসার করছে। আর কী সুখের সংসার! কোন ঝগড়াঝাঁটি নেই, চীৎকার চেঁচামেচি নেই। শান্ত পরিবেশে শান্তির সংসার।

বুড়োর খুব ভালো লাগলো। আর তাকে সকলে এত আদর-যত্ন করলো যে, বুড়ো জীবনে কোনদিন কারোর কাছে তা পায়নি। বাড়ী যাবার কথা সে ভুলেই গেল।

দিন যায়। রাত যায়।

এক সপ্তাহ পরে বুড়ো বললে, 'আর নয়, এবার আমি বাড়ী যাব।'

বিদায়-লগ্নে সকলেরই চোখ সজল হয়ে উঠলো। চড়ুই তাকে উপহার দেবার জন্য এক রকমের দুটি ঝুড়ি নিয়ে এলো। একটি যেমন রীতিমত ভারী, অপরটি তেমনি হাল্‌কা।

পাখি বললে, 'এর মধ্যে যে কোনো একটা তুমি নিয়ে যাও।'

'আমি বুড়োমানুষ, হাল্‌-কাটাই আমায় দাও।'

'ঝুড়ির ডালাটা খুলে উপুড় করতেই ড্রাগনের মাথার মত প্রকাণ্ড এক বিষাক্ত সাপ'—পৃঃ ৫১৫

ঝুড়ি নিয়ে বাড়ী ফিরলো বুড়ো।

ওদিকে বুড়ী তো রেগেই আগুন। রীতিমত ঝগড়াঝাটি বকাবকি সুরু হয়ে গেল। বুড়ো তাকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু কে-কার কথা শোনে।

বুড়ী বললে, 'এতদিন কোথায় ছিলে?'

বুড়ো সব কথা বললো। তারপর ঝুড়িটা খুলতেই দেখা গেলো সেটা সোনা রুপো মণি-মুক্তায় ভর্তি। তার নীচে একটি সুন্দর টুপি। একটি মন্ত্রলেখা বই আছে। তোমার মনের ইচ্ছে জানালে তা পূর্ণ হবে। আর আছে একটি মোহর ভর্তি থলে যা কোনদিন শূন্য হবে না—যতই খরচ হোক না কেন?

বুড়ী হিংসেতে ফুঁসে উঠলো। বললে, 'আমারও এমনি একটা উপহার চাই। বলো, কোথায় আছে সেই চড়াইটা, আমি যাবো সেখানে।'

বুড়ো তাকে অনেক করে বোঝালো, 'আমরা যা পেয়েছি তাতেই দু'জনের জীবন বেশ
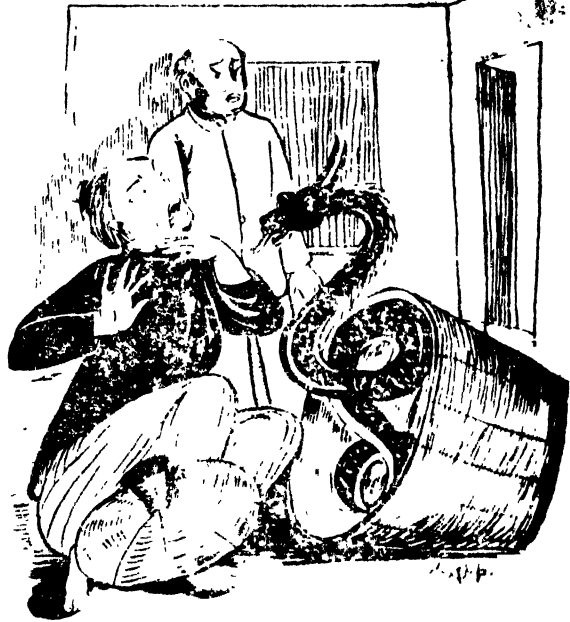
ভালোভাবে কেটে যাবে। বেশি লোভ করে লাভ কি? ওসব করতে নেই। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

বুড়ী নাছোড়বান্দা।

ঠিকানা জেনে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো চড়াই পাখির বাসার উদ্দেশে।

পাখি তাকে অবহেলা করলো না। জাপানী প্রথায় খাতির-যত্ন করে নিয়ে এসে বসালো তার বাসায়।

বুড়ী প্রথমেই বলে বসলো, 'আমার একটা উপহার চাই।'

'বেশ তো।' পাখি মনে মনে হাসলো। তারপর ঠিক এক রকমের দু'টি ঝুড়ি নিয়ে এলো।

বলা বাহুল্য ভারী ঝুড়িটাই বুড়ী পছন্দ করলো। ভারী যখন, তখন এর মধ্যে অনেক বেশি জিনিস আছে নিশ্চয়ই। এই মনে করে সে কষ্ট করে ঝুড়িটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী ফিরলো। একে বুড়োমানুষ, তায় ভারী ঝুড়ি। কষ্ট তো হবেই!

আর বাড়ী এসেই বুড়োকে তার বোকামির জন্য বেশ বকাবকি করলো। করণ ভারী ঝুড়ির বদলে সে কেন হাল্‌কাটা নিয়ে এলো।

যাই হোক, বুড়ী তার ঝুড়ির ডালাটা খুলে উপুড় করতেই ড্রাগনের মাথার মত প্রকাণ্ড এক বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে এসে বুড়ীর গায়ে চাপ দিতে লাগলো। ভয় পেয়ে বুড়ী আগেই আধমরা হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর চাপ সহ্য করতে না পেরে দমবন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

তারপর সাপটা ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় যে গেল তা আর দেখা গেল না।

বুড়ো মনে মনে বললে, 'বেশি লোভ করলে তার পরিণতি এমনিই হয়।'

এক যে আছে

শ্রীঅমিলেন্দু চক্রবর্তী

এক যে আছে ডিম
পেলেও বেজায় হিম
ফুটবে না।
উনুনেতে ঢোকাও
পাথর এনে ঠোকাও
টুটবে না॥

ছুঁড়ে দাও না আকাশে
মাটিতে কি ঘাসে
কোথাও তো সে থাকবে না।
জলেতে ডুবাও
তেলেতে চুবাও
গায়ে কিছু লাগবে না॥

সকলেই জানে তারে
তবুও কেউ জানে না,
সকলেই মানে তারে
তবুও কেউ মানে না।
বলো তো সে কে এবং কার?
(নিশ্চয়ই ডিম এবং ঘোড়ার!)

দুঃসাহসের এক ইতিহাস

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ মেরু অভিযানে বহু অভিযাত্রী পাড়ি দিয়েছেন। বিপৎসংকুল পথে অসীম সাহস আর ধৈর্য অভিযাত্রীদের পথ অতিক্রম করার শক্তি জুগিয়েছে। তবু বহু মানুষ ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন, কেউ বা পথের বুকে শেষ শয্যা রচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তবু চারজন মানুষ চারবার দক্ষিণ মেরু বিজয় করে ফিরে আসতে পেরেছেন। প্রথম যিনি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের সম্মান অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন নরওয়ের অধিবাসী। নরওয়ের এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী আমুণ্ডসেন ১৯১১ সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌছিলেন। এর একমাস পরে বৃটিশ অভিযাত্রী ক্যাপটেন স্কট আর তাঁর চারজন বন্ধু দক্ষিণ মেরুতে পৌছোলেও ফিরে আসতে পারেন নি।

১৯৫৮ সালে দু'বার পর পর মেরু-বিজয় করেছিলেন হিলারী, তার পরে ফুকস। আমাদের এই গল্প কিন্তু সার্থকতার দরজার সামনে পৌছেও যে সমস্ত অভিযাত্রীরা অভিযান সাফল্যমণ্ডিত না করতে পেরে ফিরে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজনের গল্প। নাম তাঁর স্যার আর্ণেষ্ট শ্যাকলটন। ১৯০৯ সালে যখন তিনি দক্ষিণ মেরু থেকে মাত্র সাতানব্বই মাইল দূরে পৌচেছেন, তখন ভয়াবহ এক ঝড়ের দাপটে তাঁকে অভিযান অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসতে হয়।

শ্যাকলটন কিন্তু এতে নিরস্ত হন না। ১৯১৪ সালে আবার তিনি দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

১৯১৪ সালের আগষ্টের আট তারিখে শ্যাকলটন প্লাইমাউথ বন্দর থেকে মেরু অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী এক জাহাজ 'এনডিউরান্স' করে যাত্রা সুরু করলেন। মেরু-বিজয় শ্যাকলটনের আগেই তো হয়ে গেছে, এখন মেরু অঞ্চলের আঠারশ মাইল ব্যাপী বিভিন্ন সমুদ্রের মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা খুঁজে দেখবার জন্যে শ্যাকলটনের এই যাত্রা।

ছ'টি বছর অভিযাত্রীদের কোন সংবাদ জানা গেল না।

১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে সমুদ্রের জল জমে যাওয়াতে 'এনডিউরান্স' বরফের বিরাট একটা চাঙড়ের মধ্যে আটক হয়ে রইল। সে কি একটু-আধটু বরফ! যেন বরফ দিয়ে মোড়া সুবিস্তৃত হকি আর ফুটবল খেলার মাঠ।

অক্টোবরের মাঝামাঝি বরফ ভেঙে সমুদ্রের ঢেউয়ের টানে আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের গায়ে আর অক্টোবরের সাতাশ তারিখের মধ্যেই জাহাজটা ডিমের খোলার মত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

জাহাজ ছেড়ে সঙ্গী সাতাশ জন মানুষ আর এক দঙ্গল কুকুর নিয়ে শ্যাকলটন বরফের বুকে

নেমে এলেন। সৌভাগ্য ওঁদের খুবই, সঙ্গে প্রচুর খাবার রয়ে গেছে, আর আছে তিনটে নৌকো। মাঝে মাঝে বরফের চাঙড় ভাসছে আর ওঁরা সকলে তিনটে নৌকো করে সমুদ্রের স্রোতের টানে আর বাতাসের অনুগ্রহে ভেসে চলেছেন।

কিন্তু তাই বা কতদিন? খাবার ক্রমশঃই কমে আসছে। বাধ্য হয়ে শীল ধরে খেতে হয় তার মাংস। এমন কি নিজেদের প্রিয় কুকুর মেরেও খেতে হলো ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে। নৌকো পাছে ডুবে যায় তাই সঙ্গের যা-কিছু ভারী জিনিসপত্র জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়, পকেটের সোনারুপোর মুদ্রাগুলো পর্যন্ত। সঙ্গে থাকে শুধু প্রিয়জনের ফটো আর চিঠিগুলি!

'জাহাজ দেখে মানুষগুলো হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে এল।'—পৃ ৫১৮

মাঝে মাঝে বরফের ওপর তাঁবু খাটিয়ে থাক্‌বার সময়, মাঝরাত্রে কঠিন বরফ ফেটে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায় ওরা। তিমি মাছ কখনও কখনও নীচের জল থেকে বরফ ভেঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। শিকারী তিমির যদিও পেঙ্গুইন আর শীল খাদ্য হিসেবে বেশী পছন্দ, তবু মাঝে মাঝে মুখ বাদলাতে দু'একটা মানুষ পেলে মন্দ কি! তাই সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে অভিযাত্রীরা।

যাই হোক এপ্রিলের পনরো তারিখে শ্যাকলটন আর তাঁর সঙ্গীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলিফ্যাণ্ট দ্বীপে পৌছোলেন। দ্বীপে একটা পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে, তার ওপর নৌকো দুটো রেখে, একটা আশ্রয় তৈরী হ'ল। কিন্তু খাবারের অভাবটাই দিনের-পর-দিন ভয়াবহ সমস্যা হয়ে উঠল। না খেয়ে তো এখানে থাকা যাবে না, তাই এখান থেকে চলে না গেলে বাঁচা যাবে না।

শ্যাকলটন বললেন, 'আমরা ছ'জন আপাততঃ এখান থেকে আটশ' মাইল দূরে দক্ষিণ জর্জিয়ায় যাবার চেষ্টায় করব, তোমরা বাকী মানুষরা এখানে থাকবে আমি জাহাজ নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত। খাবার যা আছে চারমাস চালে যাবে। মনে বিশ্বাস রেখো, আবার আমাদের দেখা হবে।

শ্যাকলটন যাত্রা সুরু করলেন, বাকী বাইশজন মানুষ দ্বীপে দাঁড়িয়ে রইল। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তবু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি?

অশান্ত সমুদ্রে নৌকোটা মোচার খোলার মত ভেসে যেতে লাগল। নৌকোর দাঁড়িদেরও না ঘুমিয়ে, না পেট-পুরে খেতে পেয়ে শক্তি-সামর্থ্যও এই দুর্বিনীত সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত নয়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ছ'টি মানুষের সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে গেছে, পোশাকের ঘষা খেয়ে তা যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট করে তুলেছে ওদের। আর পোশাক! সেগুলোর অবস্থা ছেঁড়া নেকড়ার মত, তা সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটা থেকে তো ওদের রক্ষা করতেই পারছে না, ঠাণ্ডায় ওরা যেন জমে যাচ্ছে। মাত্র বাইশ ফুট লম্বা আর সাত ফুট চওড়া নৌকোয় শুয়ে বিশ্রাম নেবারও উপায় নেই। দাঁড়ানোও চলবে না, তাতে নৌকো উলটে যাবার ভয়। তাই একই জয়গায় বসে থাকা, আর সেই অবস্থাতেই মাঝে মাঝে ঘুমোবার চেষ্টা করা।

আর্টিক অঞ্চল পেরিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মাঝে যখন ওদের নৌকোটা এসে পড়ল, তখন মনে হ'ল বিরাট ঢেউ ওদের গ্রাস করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের দিন বুঝি শেষ হ'ল, দূরে দেখা গেল দক্ষিণ জর্জিয়ার পর্বতশ্রেণী।

ঝড় উঠল হঠাৎ, তীরে নৌকো ভেড়াতে ওরা ব্যর্থ হ'ল দু'দুটো দিন ধরে। দু'টি অসুস্থ মানুষকে কাঁধে নিয়ে চারজন মানুষ ঝড় থামলে খাড়ির মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে ডাঙায় নেমে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পুরো এক সপ্তাহের বিশ্রামের পর দু'টি অসুস্থ মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে প্রচুর মাছ আর পানীয় জল নিয়ে পাহাড় পেরিয়ে তিমি-শিকারীদের আস্তানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন শ্যাকলটন।

ভয়াবহ পাহাড়ী রাস্তা। উঁচু খাড়াই পাহাড়, বরফ এত নরম যে চোরাবালির মত তা পায়ের তলায় হঠাৎ বসে গিয়ে বিপদ ডেকে আনে। চলতে চলতে পা দু'টো যেন মনে হয় শরীর থেকে খ'সে পড়বে। ওরা চারজন পথ হাঁটে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও। চোখ খুলে রাখার শক্তিটুকুও যেন ওদের নেই। এখন শুয়ে পড়লে আর উঠতেও পারবেন না ওঁরা, তা শ্যাকলটন বোঝেন। তাই মন শক্ত করে দুর্বল শরীর নিয়েও ওরা এগিয়ে চলেন। শ্যাকলটনের এক

চিন্তা এলিফ্যাণ্ট দ্বীপে তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষমান বাইশজন বন্ধুর কথা। তাছাড়া সমুদ্র উপকূলে দু'জন অসুস্থ বন্ধুও আছেন। না, থামা চলে না তাই—এক মুহূর্তের জন্যও না।

. বিপৎসংকুল পথে ত্রিশ ঘণ্টা ধরে হেঁটে পাহাড়ের বিপরীত দিকে তিমি-শিকারীদের আস্তানায় এসে পৌছোলেন শ্যাকলটন আর তাঁর তিনজন সঙ্গী। নতুন পোশাক আর খাবার পেলেন ওঁরা। কিন্তু কাজ না শেষ করা পর্যন্ত আরামের স্বস্তি কোথায়?

তিমি-শিকারীরা জাহাজ কোথায় পাবে? সপ্তাহের পর মাস কেটে যায়। জাহাজের যোগাড় হয় না। উৎকণ্ঠায় দিনরাত শ্যাকলটন ছটফট করতে থাকেন। জাহাজ না পেয়ে শ্যাকলটন বুঝি পাগল হয়ে যাবেন। অবশেষে চিলির সরকার 'ইয়েলকো' নামে একটা জাহাজ ওঁকে ধার দিলেন।

১৯১৬ সালে ৩০শে আগষ্ট শ্যাকলটন এলিফ্যাণ্ট দ্বীপে পৌছোলেন। উৎকণ্ঠিত শ্যাকলটন; ওরা কি এখনও বেঁচে আছে? রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে উপকূলের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে কতকগুলো সচল কালো বিন্দু। ওরা কি বাইশজনই বেঁচে আছে?

জাহাজ দেখে মানুষগুলো হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে এল।

—'তোমরা সকলেই বেঁচে আছ তা'হলে?' শ্যাকলটন 'ইয়েলকো' থেকে নামানো নৌকো করে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন ওদের।

—'হ্যাঁ, ভাল আছি আমরা।' সমস্বরে বলল ওরা চেঁচিয়ে।

পরম করুণাময় ঈশ্বরের উদ্দেশে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শ্যাকলটন।

দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাসের পাতায় এই উদ্ধার-কাহিনী চিরভাস্বর হয়ে আছে।

বাবলুর সখ

শ্রীশিবা বসুনী

সাত বছরের বাবলুর খুব কুকুর পোষার সখ। শুধু কুকুর কেন—বারান্দার খাঁচায় একটি লাল ঠোঁটওয়ালা টিয়া দুলবে আর কুটকুট করে লংকা খাবে—এ ইচ্ছেও ওর বহুদিনের। কিন্তু ওদের যেমন বাসা তাতে কুকুর টিয়া তো দূরের কথা, পায়ের কাছে একটি মেনি বেড়ালও যে ঘুরঘুর করবে এমন আশা নেই।

একখানা ঘর, ওপরে টিন, চারপাশের দেওয়াল চাটাইয়ের। ঘরে একটা বড় তক্তপোশ, তার তলায় একপাশে মা একটার পর একটা বাক্স-পাঁটরা সাজিয়ে রেখেছেন, দেশের বাড়ীর ভারী বাসন একধারে, পানের সরঞ্জাম আর একটুখানি জায়গায় রান্নাবান্নার জিনিস থাকে চৌকির ওপর। তক্তপোশ আর দেওয়ালের মাঝখানে একফালি জায়গায় ঠাকুমার বিছানা, কাঁথা পাতা। বাকি জায়গায় বাবুল আর ওর দাদা মাদুর পেতে পড়ে। এর মধ্যে কুকুরের জায়গা কোথায়?

কিন্তু বাবলু তা বুঝবে না। সে বলে—"আমার কুকুরের নাম রাখা হয়ে গেছে মা, টাইগার। টাইগারকে দড়ি দিয়ে বাইরে বেঁধে রাখব মা?"

মা বাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—"খেতে দিবি কি তোর টাইগারকে?"

"কেন, আমায় যা রুটি দেবে তার থেকে টাইগারকে ভাগ দেব। তুমি দেখে নিও মা টাইগারের যা তেজ, বাড়ীতে আর চোর ঢুকতে পারবে না কিছুতেই।" বাবলু বলে।

তার দাদা ওপাশ থেকে টিপ্পনী কাটে—"জায়গা পেলে তো ঢুকবে চোর। চোর এসে এমন জব্দ হবে, পালাবার পথ পাবে না।"

দাদায় কথার ভঙ্গীতে মা হেসে ফেলেন।

বাবলু একটু অপ্রতিভ হয় বলে—"বা রে, সব বাড়ীতেই চোর আসতে পারে আর আমাদের বাড়ীতে আসবে না বুঝি?"

পরের দিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বাবলু সত্যি-সত্যিই দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট খয়েরী কুকুর নিয়ে এল। মহা উৎসাহে চেঁচিয়ে বললে—"মা, দেখবে এস, আমি কি এনেছি।" মা পুকুর-ঘাটে বসে বাসন মাজছিলেন, এসে দেখে বললেন—"ও মা, সত্যিই তুই একটা কুকুর আনলি! এ পাগল ছেলে নিয়ে যে কি করি আমি!"

বাবলু কুকুরটার কানে হাত দিয়ে বললে "দেখেছ কান কি রকম লম্বা, এ খুব ভালো জাতের কুকুর।" দাদা বলল, "এটা নেড়ি কুত্তা ছাড়া আর কিছু নয়!" বাবলু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাল, কিন্তু প্রতিবাদ করবার মত সাহস নেই ওর।

কুকুরটাকে নিয়ে ও নানা ভাবে খেলা করতে লাগল। কিন্তু থাকবে কোথায় কুকুর?

বাধ্য হয়ে সেই পুকুর পাড়ের গাছেই বেঁধে রাখতে হ'ল তাকে। কিন্তু সন্ধ্যের পর আবার দড়ি বাঁধা কুকুর নিয়ে ও ফিরে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাটাইয়ের ফাঁকে দড়ি গলিয়ে ও কুকুরটাকে বাঁধল। তারপর রাস্তার টিউবওয়েলে হাত মুখ ধুতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে হুলুস্থুল কাণ্ড! কুকুরটা দড়ি ছিঁড়ে ঠাকুমার রুটিতে মুখ দিয়েছে, আর ওর পা লেগে ঠাকুমার দুধের বাটি উলটে পড়ে গেছে।

বাবলুর বাবা কারখানা থেকে ফিরে এসেই এই দৃশ্য দেখে কুকুরটাকে পেটাচ্ছেন—কুকুরটা করুণভাবে কেঁউ কেঁউ করছে, ওর ঠাকুমা চিৎকার করছেন। বাবলু এসে দাঁড়ান মাত্রই বাবা অবিশ্রান্ত চড় মারতে লাগলেন ওর গালে, পিঠে, যেখানে-সেখানে। বললেন, "হতভাগা পড়াশুনোর নাম নেই, কুকুর নিয়ে খেলা হচ্ছে! নিজে পায়না খেতে, কুকুরকে খাওয়াবে, বেরিয়ে যা তুই তোর কুকুর নিয়ে!" বাবলুকে ধাক্কা দিলেন তিনি। বাবলুর গাল, পিঠ সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল! তবুও ও কাঁদল না এবং একবারও বলল না যে—পড়াশুনোয় ও কোনদিন ফাঁকি দেয়নি।

"বেরিয়ে যা তুই কুকুর নিয়ে!" বাবলুকে ধাক্কা দিলেন তিনি।

আবার দড়ি-বাঁধা কুকুরটাকে ও নিয়ে চলল পুকুর পাড়ে। বেঁধে রাখল ওকে। দু'খানা রুটি পকেটে করে নিয়ে এসেছিল তাই খেতে দিল। আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ওর সাধের টাইগারকে ফেলে আসতে ওর মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আর মার খাওয়ার সাধ্য নেই ওর।

বৃষ্টি জোর বাড়তে লাগল। পড়া শেষ করে ও যখন হ্যারিকেনের আলোয় খেতে বসল, তখন টাইগারের জন্য ওর চোখে জল আসছে।

প্রায় সমস্ত রাত বাবলু টাইগারের জন্য ছটফট করল।

শেষ রাত্রে বাবলুর ঘুম ভেঙে গেল টাইগারের ডাকে। এক লাফে বাইরে এসে দেখে বাবা টাইগারকে বারান্দার এক পাশে শুকনো জায়গায় এনে বাঁধছেন। বাবলু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বাবা ঘর থেকে রুটি এনে টাইগারের মুখের কাছে ধরলেন। বাবলু বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টাইগারের খাওয়া দেখতে লাগল। তারপর বাবার দিকে চোখ তুলে বলল—"টাইগারকে আজই দিয়ে আসব বাবা—যেখান থেকে এনেছি।"

বাবা প্রথমটা কিছু না বলে বাবলুর মাথায় হাত রাখলেন। ভোরের আবছা আলোয় বাবলুর মনে হ'ল বাবার মুখখানা বড় করুণ। তিনি বললেন, "না, থাক। এনেছিস যখন তখন আর দিয়ে আসতে হবে না।"

আষাঢ়ে ছড়া

শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(কানাডা থেকে প্রেরিত)

(১)

ডাকসাইটে সেই যে ছিলো জাঁদরেল এক ভীম দারোগা
সেদিন রাতে স্বপ্নে ছাখে চিবুচ্ছে সে জুতোর ডগা!
স্বপ্নে যেমন আঁৎকে-ওঠা
ঘুমের বাজে--হায়-- বারোটা,
অমান ছাখে, স্বপ্ন তো নয়! --ঘুলিয়ে ওঠে, বাস্, আরো গা!

(২)

ভাবলে, চোখে পড়ছে বুঝি কোন্-না হবে দার্শনিকই-
মুখের তো নেই লাগাম কোনো, কিন্তু ভাষা রুশ না গ্রীকই?
ছিং টিং ছট বুঝতে গিয়ে
সপ্তাহ-মাস যায় গড়িয়ে---
বেচারি কান আঁৎকে ওঠে, যখন শোনে বলছেন কী!

পুলকবাবু বনাম পকেটমার

সৈয়দ হাসমত জালাল

অফিস শেষ হয়েছে। বাড়ী ফিরবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন পুলকবাবু। বাসে চাপবেন। কিছুক্ষণ পরে একটা বাস এলো। তিনিও চটপট উঠে পড়লেন। বাসে খুব ভিড়। কোনরকমে একটা জায়গা করে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন পুলকবাবু।

তারপর চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। যেন কাকে খুঁজছেন। হ্যাঁ, খুঁজছেন বটে। তবে চেনাশোনা কাকেও না। তিনি খুঁজছেন, পকেটমার। তাঁর মতে প্রত্যেক বাসেই পকেটমার ঘুরে বেড়ায়। আর যে বাসে ভিড়, তাতে তো কথাই নেই! তাই পুলকবাবুর এত সাবধানতা।

এই তো সেদিন পুলকবাবু বাসে চেপে যাচ্ছেন। পকেটমারের ভয়ে চারিদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এমন সময় দেখলেন, একটা পকেটমার এক ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। আর যায় কোথা! ছুটে গেলেন পুলকবাবু। খপ্ করে ধরে ফেললেন তার হাতটা। হাতে-নাতে ধরা পড়লো চোরটা। যাত্রীরা এতে বেশ খুশী হয়ে বাহবা দিলেন পুলকবাবুকে। আর চোরটার অবস্থা!···নাই বা বললাম। সেই দিন থেকে পুলকবাবু আরো উৎসাহিত হয়েছেন। তিনি এখন উঠে-পড়ে লেগেছেন পকেটমার ধরবার জন্যে। তারপর অবশ্য আর কোনোদিন পকেটমার ধরতে পারেন নি তিনি। তবে ওঁর চেষ্টা কিছুমাত্র কমেনি। সমানে চলেছে পুলকবাবুর প্রচেষ্টা, মানে পকেটমার ধরার চেষ্টা।

আরে! ওকে তো সন্দেহ হচ্ছে। ও নিশ্চয়ই পকেটমার—একটা লোককে দেখে ভাবলেন পুলকবাবু। লোকটা এক ভদ্রলোকের পকেটের দিকে চেয়ে খুব উঁকিঝুঁকি মারছে। খুব ভালো করে তাকিয়ে থাকেন পুলকবাবু ওর দিকে।

হঠাৎ একটা স্টপেজে এসে বাসটা থামলো। লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। বোধ হয় নামবে। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে যায় পুলকবাবুর সঙ্গে। অমনি পুলকবাবু চটপট মুখটা ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। একবার আড়চোখে তাকালেন লোকটার দিকে। হ্যাঁ, লোকটা নামবার জন্যেই এগিয়ে আসছে। তারপর পুলকবাবুর পাশ কাটিয়েই নেমে পড়লো লোকটা।

পুলকবাবু জানালা দিয়ে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করলেন একবার। কিন্তু ততক্ষণে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। পুলকবাবু এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। যাক্, বাঁচা গেল! পুলকবাবু খুব খুশী হলেন। পকেটমারটা বোধ হয় ওঁর ভয়েই নেমে গেলো। কিন্তু বলা তো যায় না, আরও পকেটমার হয়তো থাকতে পারে। এই ভেবে আবার চারিদিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু না, কাউকে তো তেমন সন্দেহ হচ্ছে না। এবারে নিশ্চিন্ত হলেন পুলকবাবু।

কিছুক্ষণ পরে বাসটা আবার থামলো। এখানে নেমে পড়লেন তিনি। তারপর বেশ খুশী মনেই এগিয়ে চললেন বাড়ীর দিকে। চলতে চলতে ভাবলেন, ছোট ছেলেটার জন্য এক ছড়া কলা নিয়ে যাবেন। তাই ডাকলেন একজন কলাওয়ালাকে। তার কাছে এক ডজন কলা নিলেন তিনি। তারপর মানিব্যাগটা বের করবার জন্যে পকেটে হাত ঢুকালেন। হাত দিয়েই চমকে উঠলেন পুলকবাবু—অ্যাঁ! সব্বোনাশ! পকেট থেকে যে ম্যানিব্যাগটা উধাও!

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতর পর)

॥ শিকারের সন্ধানে ল্যাম্পো ॥

আশপাশের মাঠ থেকে পোড়া বারুদের গন্ধ ও গুলির আওয়াজ জানিয়ে দিচ্ছে যে হেমন্তের শিকার-মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। জানিয়ে দিচ্ছে দেবী ডায়নার উপাসকের দল এখন উৎসাহ ও উত্তেজনায় পূর্ণ। আমাদের ষ্টেশনে অনেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোট প্রতীক্ষা-কামরাটিতে জড়ো হয়ে শিকার, জানোয়ার, রান্না, ইত্যাদির গালভরা লম্বা লম্বা জীবন্ত আলোচনা শুরু করে দিত। প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে চাইত, অন্যের চেয়ে সে বেশী বড় জন্তু শিকার করেছে। এরপর আলোচনার উত্তরণ হ'ত রকমারী কুকুর যথা—পয়েন্টার্স, সেটার্স, রিট্রিভার্স প্রভৃতির বুদ্ধির গল্পে। তারপরেই ভদ্রতার-মুখোশ আর থাকে না। নিজের নিজের কুকুরের প্রশংসায় ও অহংকারের গল্পে ভব্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এমন কী ল্যাম্পো যে আমাদের পায়ের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে গল্প শুনছিল, সেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। অতঃপর ক্লান্ত হয়ে তারা ল্যাম্পোর গল্প শুরু করে। ওরা বলে ল্যাম্পোর মধ্যেও শিকারী কুকুরের কিছু গুণ দেখা দিয়েছে। কেউ নাকি ওর মধ্যে অস্পষ্টভাবে এ্যাপিরেটের স্বভাব, খানিকটা সেটারের বিশেষত্ব, এমন কি ব্লাড-হাউণ্ডের গুণও দেখতে পেয়েছে। সে বলে একটু ধৈর্য ধরে শিক্ষা দিলেই ল্যাম্পো শিকারী কুকুরের কাজ করতে পারে। তখন আর ওকে বর্ণসংকর কুকুর বলে পরিচিত হতে হবে না।

আমার মনে সন্দেহ ছিল। একবার ওকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে গেলাম, মনে মনে কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম যে, ল্যাম্পোর মধ্যে শিকারী কুকুরের কোন চিহ্নই নেই। এ কথাও বলব যে, আমি নিজেও খুব ভাল শিকারী ছিলাম না। যদিও আমি প্রতি বছর কোয়েল, লার্ক, বুনো পায়রা প্রভৃতির সন্ধানে যেতুম এবং সেটার আসল উদ্দেশ্য ছিল একটা পরিবর্তনের স্বাদ পাওয়া। সত্যিকারের শিকারের চেয়ে ক'দিন খোলা মাঠে, বনে, ঘুরে বেড়াবার আনন্দই ছিল আমার কাম্য।

একদিনের জন্য শিকারে যাওয়া ঠিক করলাম। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, ল্যাম্পোকে সে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে ঘুমতে বাধ্য করা গেল। মনে হ'ল আমার এতসব আড়ম্বরেচ্ছায় ও যথেষ্ট উৎসাহী।

আমার কর্ডরয়ের ব্রীচেস্ বের করতে করতে স্ত্রী বল্লেন, "তোমার কী মনে হয় ও শিকারের ব্যাপারে ঠিক অভ্যস্ত হবে এবং ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে?"

আমি ল্যাম্পোর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি, "জানি না, দেখা যাবে কী হয়।"

স্ত্রী বলেন, "এক হিসেবে ভালই, বিনা পয়সায় একটি শিকারী কুকুর জুটে গেল!"

পরদিন প্রত্যূষের আগেই শয্যা ত্যাগ করে জনাল দিয়ে তাকাই। দেখি নক্ষত্রখচিত মসীকৃষ্ণ আকাশ। সুন্দর দিন খুশী হয়ে ভাবি।—"এই কুড়ের ধাড়ী! ওঠ, ওঠ!" ব'লে পা দিয়ে ল্যাম্পোকে গুঁতো মারতে ও চোখ খুলে তাকালো,—মনে হ'ল রেগে গেছে। ঘুমের সময়ে জাগিয়ে দেওয়া মোটেই পছন্দ করে না ল্যাম্পো। ও লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় বসল এবং আমরা—অন্ততঃ আমাদের মধ্যে একজন, পূর্ণ আশায় যাত্রাপথে পাড়ি দিল।

আমি বারাবাট্টার দিকে যাচ্ছিলাম। পশুপাখীতে ভরা, ঘন বনরাজিতে ঘেরা অপূর্ব জলরাশি। আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা খড়ের গাদার কাছে পেঁছলাম—বন থেকে ৫০০ বা ৬০০ গজ দূরে। গাড়ীর হেড লাইটের আলোতে বন্দুকের গুলি ভরে নিলাম। সব ঠিকঠাক করে কাঁধের ওপরে বন্দুক উঁচিয়ে আমরা চল্লাম। ল্যাম্পোর দিকে তাকিয়ে বল্লাম, "এবার আমাদের কাজ শুরু হবে।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই একটা মৃদু 'ঝুপ' শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, একটি জল-ভরা গর্তের মধ্যে পড়ে ল্যাম্পো উঠে আসবার চেষ্টায় হাবুডুব খাচ্ছে। আমি ওকে উঠে আসতে সাহায্য করলাম। বেশ রাগ ও বিরক্তি হ'ল। চেঁচালাম, "নাকের সামনে এক ইঞ্চিও দেখতে পাও না চোখে?" করুণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও গায়ের জল ঝেড়ে ফেল্লে। এতক্ষণে ভোর হ'ল। নেড়া গাছের ভেতর দিয়ে দেখা দিল শান্ত মসৃণ রুপোলী সমুদ্র

যেন একটি বিলিয়ার্ড টেবিল। ঘন বনে ঘেরা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে এট্রাসকান পপুলোনিয়া, তার সহজভেদ্য দেওয়ালের মাঝখানে যেন একটা প্রহরীর মত।

বনের মধ্যে পাখীদের কাকলি ও চলাফেরার খসখসানি শোনা যাচ্ছিল। নতুন প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ওরা তখন উড়ে যাবার আয়োজন করছিল। আমরা বনের ভেতরে ঢুকলাম। আমি বন্দুক ঘাড়ে সন্তর্পণে হাঁটছিলাম আর ল্যাম্পোর ওপরে নজর রেখেছিলাম। দেখে খুশী হলাম যে, বনের মধ্যে ঢুকেই ও শুঁকছে, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে আর কান দুটো অনবরত র‍্যাডারের মত ঘোরাচ্ছে। এসব ওর পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। ভাবলাম, হয়ত ওর দেহে কয়েকবিন্দু শিকারী কুকুরের রক্ত আছে। অকস্মাৎ পাখীর ত্রস্ত, ভীত কলরোল, ডানার ঝাপটানির শব্দে আমি চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলি, কিন্তু ভাল করে দেখি, উড়ে-যাওয়া প্রাণীটি বিশ্রীভাবে গিয়ে এট্রাসকানের একটা কবরের ওপরে বসল। কিন্তু ল্যাম্পো কোথায়? তাকিয়ে দেখি সে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলেছে একটা খড়ের গাদার পেছনে লুকোবার জন্যে। রেগে চেঁচাই, "বুড়ো, হাঁদা! ওটা তো একটা পেঁচা! ফিরে আয়।"

কম্পমান দেহে, দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে, সলজ্জ ল্যাম্পো এসে আমার সঙ্গে যোগ দেয়। মিলেট ও কাঠি দিয়ে তৈরী একটা কুঁড়েঘরের সামনে এসে আমরা থামলাম। আমি ভেতরে গিয়ে মাটিতে পা মুড়ে বসলাম। ল্যাম্পো এসে ওর মাথাটা আমার দুই পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হচ্ছিল কোন নিশাচর জন্তুর আওয়াজে। সহসা আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলাম, হাজার হাজার বুনো পায়রার দল তীর বেগে উড়ে চলেছে মাথার ওপর দিয়ে। একদল যখন নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল প্রায় জমির ওপর দিয়ে, আমি তখন উঠে দুইনলেই একসঙ্গে গুলি চালালাম। খুশী হয়ে দেখলাম আমার গুলি লেগে তিনটে পাখী পড়েছে। আমি কুঁড়েঘরটা থেকে বেরিয়ে এলাম পাখীগুলো তুলে আনব বলে। উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছিলাম, "বাহাদুর ল্যাম্পো, বাহাদুর কুকুর—যাও তুলে আনো।" কিন্তু হায়! অপাঙ্গে দেখি, যেখানে পাখীগুলো পড়েছিল, তার সম্পূর্ণ উল্টো দিকে তিনি বিদ্যুৎগতিতে পলায়মান। বুঝলাম ও পালাচ্ছে। কিন্তু তখন ওর পালানো নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমার মন ছিল শিকারের মালগুলো খুঁজে তুলে আনায়। একটাই মাত্র পেলাম, বাকী আর দুটোর, খোঁজা ছেড়ে ল্যাম্পোর খোঁজে মন দিলাম। ডেকে ডেকে গলার আওয়াজ নিঃশেষ হয়ে গেল। সমস্ত জঙ্গলময় সর্বত্র ওকে খুঁজে বেড়ালাম। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল। বুনো গোলাপের কাঁটায় পোশাক হ'ল ছিন্নভিন্ন। শেষ পর্যন্ত গাড়ীর কাছে এলাম, হয়ত সেখানে অপেক্ষায় বসে আছে ভেবে। কিন্তু সেখানে ল্যাম্পোর চিহ্ন নেই!

শুকনো ঘাসের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি ল্যাম্পোর প্রতীক্ষায়। এখন কি করা যেতে পারে? ল্যাম্পোকে এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে তো চলে যেতে পারি না! ও কখনও কি একা-একা ফিরে যেতে পারবে? সামান্য দু'এক গাল খাবার খেয়ে ক্লান্ত ভাবে আবার বনের মধ্যে ফিরে এলাম, যদি সেখানে ওকে দেখতে পাই ভেবে।

সূর্য নামে পাটে। পাখীর দল মাঠ থেকে ফিরে আসছে বনে, ঘুমবে বলে। পপুলোনিয়ার বাড়ীগুলোর জানলা দিয়ে আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল। সমুদ্রের জলরাশির ওপর দিয়ে মৃদু শব্দে বায়ু সঞ্চালিত হ'ল, নীরবতা ছেয়ে এল চারদিকে। বিষণ্ণ মনে আমি গাড়ীতে এসে বসলাম। যেদিনটি আনন্দে কাটাতে চেয়েছিলাম, এমনই বিষাদে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রথম কথা ল্যাম্পো যে কখনও শিকারী কুকুর হ'তে পারবে, সে আশা চিরতরে লুপ্ত হ'ল। তার চেয়েও নিরাশার কথা ওর অন্তর্ধান। তিন মাইল মেঠো রাস্তায় খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চালালাম। ভাবছিলাম, যদি ওকে দেখতে পাই। তারপর পিওম্বিনো-মুখী পিচ-ঢালা পাকা রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। এখানে খুব জোরে গাড়ী চালাচ্ছিলাম। তবুও যেতে যেতে একবার পপুলোনিয়া ষ্টেশনের ছোট রাস্তার দিকে তাকালাম। একটা সন্দেহ এলো মনে। তৎক্ষণাৎ ব্রেক ক'ষে গাড়ী ঘুরিয়ে নিলাম। এক মাইল না যেতেই ষ্টেশনে পৌঁছলাম। দেখলাম, আমার বন্ধু ষ্টেশন মাষ্টার জলের কলের কাছে দাঁড়িয়ে।

"নমস্কার, ল্যাম্পোকে এদিকে কাছাকছি কোথাও দেখেছেন কী?" প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

"হাঁ, নিশ্চয়! কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ আগে। সকালের দিকে। এগারোটার গাড়ী ধরে ও পিওম্বিনোর দিকে গেল।" কথাটা শুনেই বন্ধুকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নিলাম। বন্ধুবর আমার দিকে বিস্মিতভাব তাকালেন। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী চালালাম।

গ্যারাজের দরজা বন্ধ করতে করতে শুনতে পেলাম স্ত্রী বলছেন, "হ্যাঁ গো, ল্যাম্পোকে কেন সঙ্গে নিয়ে যাওনি? তুমি যে বলছিলে আজ শিকারে যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

রাগে মুখ আমার আরক্ত। ক্ষেপে প্রায় ছুটে আসছিলাম. হঠাৎ দেখতে পেলাম স্ত্রীর পেছনে ল্যাম্পো। কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে ফুস্‌ফুসের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চেঁচিয়ে বললাম, "অপদার্থের ঢেঁকি?" মারতে প্রায় হাত তুলি আর কী!

অবাক হয়ে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, "কী হয়েছে তোমার?"

"কিস্‌সু না, কিস্‌সু না।" উত্তর দিই।

শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার ওপরে লম্বা হয়ে পড়ি। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি, ওর পক্ষে নাকের সামনে পায়রা খুঁজে পাবার চেয়ে, চারমাইল দূরের ট্রেনের গন্ধ পাওয়া সহজ। (ক্রমশঃ)

মৈঠড়ে

ক্রিকেট

অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ইংলণ্ড বারো বছর পরে 'অ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার করেছে! এখানে উল্লেখ্য ছ টা টেস্ট সিরিজে ইংলণ্ড ২-০ টেস্টে বিজয়ী হয়েছে। দুটো জয়ই সিডনী মাঠে। বাকী চারটে টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ১৯৫৮-৫৯ সালে পিটার মের ইংলণ্ড দলকে রিচি বেনোর অস্ট্রেলিয়া দল ৪-১ টেস্টে পরাজিত করার পর দু'দেশের ভেতর অনুষ্ঠিত ছ-টা সিরিজে 'অ্যাসেজ' অস্ট্রেলিয়ার অধিকারে ছিল।

এডিলেডের ৬ষ্ঠ টেস্টে ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় দিনের চা বিরতির কুড়ি মিনিট পর যখন ৪৭০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করল এবং তৃতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ২৩৫ রানে শেষ হ'ল, তখন ২৩৫ রানে এগিয়ে থেকেও ইংলণ্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে ফলো অন করালেন না। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও কিছু রান করে চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে অসুবিধায় ফেলার উদ্দেশ্যে নিজেরাই আবার ব্যাট করতে নামলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ২৩৩ রান তুলে যখন ইলিংওয়ার্থ ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার সামনে মহা সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করেছেন কিথ স্ট্যাকপোল ও ইয়ান চ্যাপেল অনমনীয় দৃঢ়তায় সেঞ্চুরী করে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

সিডনীর মাঠে শেষ টেস্ট খেলাকে সপ্তম টেস্ট বলে ঘোষণা করা হয়। আসলে ছটাই টেস্ট খেলা হয়েছে। মেলবোর্ণ মাঠে তৃতীয় টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্যে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় একটা অতিরিক্ত টেস্ট সিরিজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ষষ্ঠ টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক বিল লরিকে অধিনায়ক ও দল থেকে অপসারিত করা হয়। সপ্তম টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব পদ গ্রহণ করেন ইয়ান চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো চতুর্থ দিনের খেলায় আহত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র কিথ স্ট্যাকপোল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আর অন্য কোন খেলোয়াড় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করতে পারেন নি। যার ফলে ইংলণ্ড ৬২ রানে জিতেছে।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দু'শ ন'টা টেস্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের

সংখ্যাই বেশী। অষ্ট্রেলিয়ার জয় আশিটা টেস্টে, ইংলণ্ডের জয় আটষট্টিটাতে, একষট্টিটা টেস্টে জয়-পরাজয় মীমাংসিত হয়নি।

দিলীপ সারদেশাই

১৯৬২-৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে পাঁচটা টেস্টেই ভারতের পরাজয়ের ফলে ওদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা মোটেই উঁচু ছিল না। কিন্তু কিংসটনের সাবিনা পার্কে প্রথম টেস্টে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভূমিকা ওদের চিন্তার কারণ হয়েছে। ভারত জয়ের সম্ভাবনার মধ্যে এসেও জয়ী হতে পারেনি। তবু ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ভারত যে সর্বপ্রথম 'ফলো অন' করাতে পেরেছে, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ ছাড়া দিলীপ সারদেশাইয়ের ডাবল সেঞ্চুরিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। ১৯৬১-৬২ সালে পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে পলি উমরিগরের ১৭২ (নট আউট) রানই ছিল এতদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত বড় রান। দিলীপ সারদেশাই সাবিনা পার্কের প্রথম টেস্টে করেছেন ২১২ রান। দিলীপ সারদেশাই ও একনাথ সোলকারের জুটিতে ১৩৭ রান এবং সারদেশাই ও প্রসন্নর জুটিতে ১২২ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

দিলীপ সারদেশাই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্টে ২১২ রান নিয়ে বাইশটা টেস্টে তিনি করেছেন ১৪০১ রান। এর মধ্যে একটা সেঞ্চুরি ও দুটো ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে। টেস্ট খেলায় ডাবল সেঞ্চুরির অধিকারী ভারতীয় খেলোয়াড় মাত্র চারজন। এই চারজনের মধ্যে ভিনু মানকড় ও সারদেশাই করেছেন দুটো করে ডাবল সেঞ্চুরি এবং উমরিগর ও পাতৌদির নবাব মনসুর আলী করেছেন একটা করে ডাবল সেঞ্চুরি।

কিংসটনের প্রথম টেস্টে ভারতেরই যে জয়ের সম্ভাবনা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ফলো অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে তাতে সময় পেলে তারা হয়তো জিততে পারত। সত্যিই পরাজয়ের মুখে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে কানাই সোবার্স-লয়েড় যে দৃঢ়তায় ব্যাটিং করেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

বৃষ্টির জন্যে পাঁচ দিনের টেস্ট চারদিনে শেষ হয়। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্যে একেবারেই খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক টসে জিতেও ভারতকে ব্যাটিং করতে দেন। মাত্র ৭৫ রানের মধ্যে ভারতের পাঁচটা উইকেট পড়ে যায়। আবিদ আলী,

জয়ন্তীলাল, অধিনায়ক ওয়াদেকর, দুরাণী ও জয়সীমা আউট হয়ে যান। এর পর অনমনীয় দৃঢ়তায় সারদেশাই ও সোলকার ব্যাটিং শুরু করেন ও পরের দিন যখন ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়, দেখা যায় তাদের প্রথম ইনিংসের স্কোর ৩৮৭ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেদিন ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে রান তোলে ৩৬। কিন্তু একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন ২১৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ফলো অনে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২ রানের ভেতর দুটো উইকেট হারাল, তখন ভারতের জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ওঠে ৩ উইকেটে ১৯২ এবং খেলা শেষ হবার সময় ৫ উইকেটে ৩৮৫। এর মধ্যে সোবার্সের ৯৩ এবং কানহাইয়ের ১৫৮ (নট আউট) জীবনের এক স্মরণীয় খেলা।

ইতোমধ্যে ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দুটো খেলায় জয়ী হয়েছে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে একদিনব্যাপী খেলায় ১০১ রানে এবং লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনদিনব্যাপী খেলায় ৯ উইকেট।

ফুটবল

ডুরাণ্ড কাপের ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল এ মরসুমে তিনটে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। লীগ ও আই. এফ. এ শীল্ড জয় করে তারা আগেই 'ডাবল' পেয়েছিল, এবার পেল 'ট্রিপল'।

ইস্টবেঙ্গলের ডুরাণ্ড জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার। এবার খেলার কথায় আসি। মোহনবাগান প্রথম খেলায় দিল্লীর প্রথম ডিভিসন টিম মডার্নইটসকে ৫-০ গোলে, পরের খেলায় বাঙ্গালোরের এল. আর. ডি. ই-কে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেণ্টারকে ২-১ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংকে ০-০ ও ৩-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে ওঠে রাজস্থানের আর্মড কনষ্টবলারিকে ৩-২ গোলে, মীরাটের শিখ রেজিমেন্টাল সেণ্টারকে ৪-২ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে বোম্বাইয়ের মফতলাল গ্রুপ অব মিলসকে ০-০ ও ১-০ গোলে হারিয়ে। ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ২-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার স্বীকার করে।

মোহনবাগান ফাইনালে মোটেই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। অপর দিকে পারস্পরিক যোগাযোগ, দৃঢ়তা ও উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয়ে ইস্টবেঙ্গল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। ফাইনালে খেলাটিকে হাবিবের ম্যাচ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হাবিব প্রতি অর্ধে একটা করে গোল করে জয়ের কাণ্ডারী তো হয়েছেনই, উপরন্তু অনবদ্য ক্রীড়াধারায় দর্শকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। অবশ্য হাবিবের সঙ্গে পুরোভাগে সমানভাবে তাল রেখে খেলেছেন স্বপন সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা ও অশোক চাটার্জী আর রক্ষণভাগে নাইম, সুনীল ভট্টাচার্য ও কাজল মুখার্জী।

মোহনবাগানও যে গোলের সুযোগ পায়নি এমন নয়, তবে ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় সংখ্যায় ছিল অনেক কম এবং আক্রমণেও তেমন ধার ছিল না।

মুষ্টিযুদ্ধ

নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন্সে হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে জো ফ্রেজিয়ার প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলী যাঁর পূর্বনাম কেসিয়াস ক্লেকে পয়েন্টে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, তিনি বছর আগে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে রাজী না হওয়ায় ক্লের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অল্পখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে ফ্রেজিয়ার হয়েছিলেন চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী। ক্লের খেতাব যখন কেড়ে নেওয়া হয় তখন ফ্রেজিয়ারই ছিলেন তাঁর সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী।

জো ফ্রেজিয়ার

মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে জরিমানা, কারাদণ্ড ইত্যাদির পর ফ্রেজিয়ারের সঙ্গে এই লড়াইয়ের আয়োজন। অবশ্য এই লড়াইয়ের আগে ক্লেকে জেরি কোয়ারী এবং অসকার বোনেভো‌েকে পরাজিত করতে হয়েছে। ফ্রেজিয়ারকে ক্লে পরাজিত করতে পারেন নি। পর পর একত্রিশটা লড়াইয়ে জয়ী মহম্মদ আলীকে বত্রিশতম লড়াইয়ে প্রথম হার স্বীকার করতে হয়েছে। অপর দিকে জো ফ্রেজিয়ার তাঁর পর পর সাতাশটা লড়াইয়ে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করলেন।

এই লড়াই হয় পুরো পনের রাউণ্ড। পয়েন্ট ডিসিশন। কিন্তু শেষ রাউণ্ডে বাঁ হাতের প্রচণ্ড ঘুষিতে ফ্রেজিয়ার আলীকে মাটিতে ফেলে দেন। বিচারকরা ফ্রেজিয়ারকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। এই লড়াইয়ে বিজয়ী ও বিজিত উভয়েই পেয়েছেন প্রায় দু' কোটি করে টাকা। আর খেলাধুলোর অর্থ সংগ্রহের সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে এই মুষ্টিযুদ্ধে
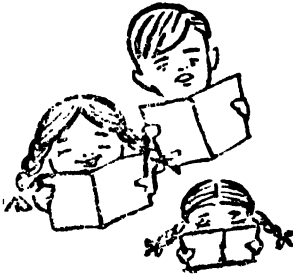
গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

আজকের কোলকাতা

শোন শোন ভাই সব
শোন বলি শেষটা,
গোল্লায় গেল ভাই
আমাদের দেশটা।
বোমা-গুলি বৃষ্টি
সারাদিনই চলছে,
তারই মাঝে সব কিছু
চলাচলও করছে।
ইস্কুলে-কলেজেতে
রোজ বোমা পড়ছে,
তবু ভাই ইস্কুল
আজও দেখি চলছে।
মুখ্যু কি হব সবে
আজ শুধু ভাবি তাই,
বাঁচবার পথ কই ?
দেশ ছেড়ে কোথা যাই ?

শ্রীজয়িতা মুখোপাধ্যায়

—

প্রকৃতির পরিহাস   শিল্পী : মেহেদী হাসান

বঙ্গ তোমায় দিলাম বিদায়

বঙ্গ তোমায় দিলাম বিদায়
যাচ্ছি চলে অনেক দূরে,
রাখাল ছেলের করুণ বাঁশী
(আজ) মন না মাতায় বঙ্গপুরে।
যাচ্ছি চলে প্রবাস-পথে
দেশান্তরি হচ্ছি আমি,
কোমল তোমার বক্ষেতে হায়
কাটতো আমার দিবস-যামী !
যে দেশেতে রোজ সকালে,
সোনার কমল উঠতো ফুটে
যেথা সুয্যিমামা ওঠার আগে
আনন্দে সব উঠতো জেগে।
সেই দেশে আজ ভায়ে ভায়ে
চলছে শুধুই খুনোখুনি !
আর কি থাকে সেথায় মানুষ
শান্তির পথ নিচছি চিনি।
বঙ্গ তোমায় দিলাম বিদায়
যাচ্ছি চলে অনেক দূর
বিষিয়ে গেছে দেশের মাটি,
(আজ) রক্তমাখা সোনার-পুর !

শ্রীঅরূপরঞ্জন ঘোষ

১। চার অক্ষরে নাম এক
ছাত্র পায় কৃতিত্বের ফলে,
প্রথম দুয়ে যাহা হয়
প্রাণ রক্ষা পায় দিয়ে গলে।
শেষ দুয়ে একই বস্তু
ভিন্ন নামে ভিন্ দেশে চলে।

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

২। পাঁচ অক্ষর নামে দেশ
সেথা বাস করি,
প্রথম তিনটি বাদে
বারো মাস ধরি।
প্রথম দু' অক্ষরেতে
বহা যে কঠিন,
প্রথম তৃতীয় মিলে
খাই প্রতিদিন।

শ্রীতাপস রায়

৩। এমন একটি তীর্থস্থানের নাম করো
যা একটি অসুখেরও নাম হয়।

শ্রীজয়কালী সাধুখাঁ

৪। তিন অক্ষরে নাম মোর
নহি আমি মিঠে,
কখনও পড়ি হাতে
কখনও বা পিঠে।
প্রথম অক্ষর নিয়ে তুমি
পান করো সুখে,
গরম সে লাগে ভাল
তোল যদি মুখে।
বাকী অংশ নিয়ে হয়
ইংরেজী সে কথা
সবচেয়ে কাছে রয়
জ্ঞানী থাকে যথা।

শ্রীসবিতা আশ

ছ' অক্ষরে ইংরেজী শব্দ
'নাউন' বোঝায়,
প্রথম দুই বাদ দিলে
'ভার্ব' হয়ে যায়।
শেষের চার ছাড়ো যদি
'প্রিপোজিসান' হয়,
কি নাম তাহার ভেবে
বলো মহোদয়।

শ্রীঅজিতকুমার সাহা

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। দেবতা ২। দোকান (দো-কান) ৩। ভানুসিংহ (রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম) ৪। কয়লা ৫। Idiot (I do it) ৬। কেশব ৭। (ক) বয়স (খ) অন্ধকার (গ) না, ফেব্রুয়ারী মাসে লিপিয়ার ২৯শে জন্ম হলে ২৫ বছরে ৬টি জন্মদিন হবে (ঘ) একটাতে মশা

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

এই চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকের আর একটি বছর শেষ হ'ল। ছোটদের পত্রিকা-জগতের সর্বপুরাতন মাসিক পত্র মৌচাক তার যাত্রা-পথের একান্নটি বছর পূর্ণ করে, আগামী ১৩৭৮ সালের বৈশাখে বাহান্ন বছরে পদার্পণ করবে। বাঙলা দেশের ছেলেমেয়েদের একটি পত্রিকার জীবনে এটি কম গৌরবের কথা নয়।

আমাদের চেয়ে এই গৌরবের যারা সত্যিকার অধিকারী তাঁরা হলেন—আমাদের সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকারা। তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যতীত এই সুদীর্ঘ দিন গৌরবের সঙ্গে পত্রিকাখানিকে বাঁচিয়ে রাখা কখনই সম্ভব ছিল না।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, এই মৌচাকের সূত্রপাত থেকে বাংলা দেশের বহু বিখ্যাত লেখক-লেখিকা ও শিল্পিগণ সকলেই মৌচাকে তাঁদের রচনা দিয়ে, চিত্র দিয়ে, শিশু-সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি এই মৌচাকের সাহায্যে বহু শিশু-সাহিত্যিকেরও সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। আজ তাঁদের সকলকেই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং বর্তমান শিশু-সাহিত্যিকদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

আজ বর্ষশেষে সে জন্য আমরা আমাদের প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকা ও তাঁদের অভিভাবকদের জানাচ্ছি যে, **এই চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে যাঁদের চাঁদা শেষ হবে, তাঁরা যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মনিঅর্ডার করে তাঁদের বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদাগুলি পাঠিয়ে দেন।** যারা এই চাঁদা মনিঅর্ডার করে পাঠাবেন না, অথবা ভবিষ্যতে গ্রাহক গ্রাহিকা থাকার বিষয় অসম্মতিও জানাবেন না, তাঁদের আমরা বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করে পাঠিয়ে দেব। এর জন্য অবশ্য তাঁদের সামান্য কিছু বেশী পয়সা ডাকখরচ হিসাবে লাগবে। কিন্তু আমরা আশা করব যে, এই ভিঃ পিঃতে পাঠান কাগজগুলি ফেরত দিয়ে তাঁরা যেন আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত না করেন।

আগামী বৈশাখ সংখ্যার মৌচাক নব-কলেবরে, লেখা ও ছবিতে মনোরম হয়ে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। চলতি উপন্যাসগুলির সঙ্গে আরও দুটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে আগামী বছরের গোড়া থেকেই। এছাড়া গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, খেলার কথা, ধাঁধা প্রভৃতির সঙ্গে থাকবে আরও বহু আকর্ষণীয় বিচিত্র বিষয়।

নতুন-বই

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

আরব্য রজনী —শ্রীতারাপদ রাহা। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে ডি. মেহরা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫·০০

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীতারাপদ রাহার অপূর্ব কীর্তি এই 'আরব্য রজনী' বইখানি। এর আগে এই বইয়ের ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আমরা তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি।

বর্তমানে এই সুবৃহৎ গ্রন্থের এটি ৪র্থ খণ্ড। এই খণ্ডে প্রধানতঃ সিন্দাবাদের সপ্তম সমুদ্রযাত্রার সাতটি বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে 'আবুনিয়া ও আবুনিয়াতয়েনের কাহিনী' 'কুড়ের বাদশা' ও 'স্বপ্নে পাওয়া ধন' প্রভৃতি আছে।

এই রচনা ছেলে-বুড়ো সবাই পড়ে মুগ্ধ হবে। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর—শ্রীমনোজ দত্ত। সেকাল একাল, ১৮বি, টেমার লেন, কলিকাতা৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০

ভারতের পুণ্যশ্লোক চিরস্মরণীয় পুরুষ, আমাদের জাতীয় শিক্ষার পথিকৃৎ, মহামত বিদ্যাসাগরের দেড়শততম জন্মোৎস সম্প্রতি সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হ'ল। ৫ উপলক্ষে তাঁর উপর লেখা বড়দের ছোটদের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে ছোটদের জন্য রচিত মনোজ বাবুর ৫ বইখানি তাদের মধ্যে একটি। ছে ছোট বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগ জীবনের বিশিষ্ট কাহিনীগুলি নিয়ে ভা সুন্দর করে এই বইখানি লিখেছেন লেখ

ছুটির ঘণ্টা (কিশোর পত্রিকা)- শ্রীঅমিয় কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা : হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূ ০·৩০

'ছুটির ঘণ্টা'র ১ম বর্ষের ৩য় সং আমাদের হাতে এসেছে। এই সংখ্যা শিবরাম চক্রবর্তীর একটি ধারাবাহি উপন্যাস আছে। তাছাড়া আরও আ বিশেষ উপভোগ্য কয়েকটি রচন আগাগোড়া কাগজটি পাইকায় ছাপ প্রচ্ছদপটটি সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯।ই।এইচ।১৭, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ·৬০ পয়সা